আরতি

ত্রিকা ও সমালোচনী।

সিংহ, পৌষ, ১৩১৫। { ১ম সংখ্যা।

যাত্রী।

আর কেন বসে তবে,
য যেতেছে তোমার;
রি' ভাসাও জীবন তরী
া তব কর্ণ-ধার।
কিছুই তোমার নয়,
ফল সকলি তাঁহার;
ন, মান আর অপমান;
মাত্র তব অধিকার।
নাহি ভয় এক বিন্দু,
ন্ত অশনি-পতন,
সত্যের পতাকা ধরি
র বীরের মতন।
নির্ভয়ে প্রফুল্ল চিতে
হও নিরন্তর,
অমর হইবে মরি'
ন্তু যুগ যুগান্তর।

অঙ্কশাস্ত্র।

(দুই একটী কথা)

আর্য্য জাতির একটী শাখা প্রাচীন ভারতে
উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। উভয় দেশেই আর্য্য
উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষে পাটিগ
মিতির এবং গ্রীসদেশে জ্যামিতি ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে
সেই সময়ের অবস্থা ধরিতে গেলে ভারতবর্ষ হইতে
কিন্তু আলেকজেণ্ডার ও তাঁহার পরবর্ত্তিগণের সময়ে

ভারতের ঋষিগণ চিরদিনই পৃথিবীর সকল
জ্ঞানরত্ন সংগ্রহ করিয়াছেন; কখনও তাহাতে পশ্চা
হউক অথবা দর্শন বিজ্ঞান আলোচনাতেই হউক ভা
পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষের মুনি
কখনও ব্যর্থ হয় নাই। কৃত্রিম অনিষ্টকর পদার্থ
স্থান পায় নাই। কিন্তু গ্রীসদেশে তাহা হয় নাই।
সাহায্যে জ্যামিতি ও জ্যোতিষ,—অধ্যয়ন ও অ
করিয়াছিল। গ্রীকেরা ভারতবর্ষের পাটিগণিত,
সহিত পরিচিত হইয়াও তাহা আয়ত্ত করিতে পারেন

এই উভয় দেশেই অঙ্ক শাস্ত্রের উন্নতির মূল কা
বস্তুর সহিত বস্তুর, ভাবের সহিত ভাবের সম্বন্ধ নির্ণয়
সম্বন্ধ হইতে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ন্যায়ের কার্য্য।
ব্যতীত আর কিছুই নহে। বস্তুর প্রতি যাঁহারা অ
জ্যামিতিতে ও ভাবের প্রতি যাঁহারা অধিক দৃষ্টি রাখি
বীজগণিত ও ত্রিকোণমিতিতে সিদ্ধি লাভ করিয়
জ্যামিতি, বীজগণিত ও জ্যামিতির তুলনা করিলে
হৃদয়ঙ্গম হইবে। প্রাচীন গ্রীসদেশের লোকেরা ব
সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। ভারতের ঋষিরা মনে
করিয়াছেন। বস্তু হইতে বস্তুর ভাব ও সম্বন্ধ তাহ
করিয়াছে। এই দুইয়ের তুলনাদ্বারা ভারতের ঋষি

আমাদের উদ্দেশ্য নহে। এতকাল পরে তদ্দ্বারা ক্ষুদ্রমতি আমাদের আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াও কোন ফল হয় নাই।

গ্রীসদেশের পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষের সহিত পরিচিত হওয়ার পরও কেন যে অঙ্ক গণনার দশমিক প্রণালী ব্যবহৃত চিহ্নগুলি অবলম্বন করেন নাই ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। অপরপক্ষে আরব পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষ ও গ্রীসের সহিত পরিচিত হইবার পরই উভয় দেশ হইতে গণিত শাস্ত্রের উচ্চ সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের পণ্ডিতেরাও আরবদেশের জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিতে ইতঃস্তত করেন নাই।

[illegible]চনা সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেক বিষয়ে আরবদেশীয় [illegible]কট ঋণী। বর্ত্তমান সভ্যজগৎ আরবদেশ হইতে অঙ্ক গণনা [illegible]লী কিমিতি ও বীজগণিত গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে অঙ্কশাস্ত্রে যে [illegible]নতি সাধিত হইয়াছে তাহা অসামান্য সন্দেহ নাই কিন্তু তাহাতে প্রাচীন শাস্ত্রের [illegible]কান অংশে গৌরবের লাঘব হইয়াছে বলা যায় না। অনেকস্থলে প্রাচীন [illegible]স্কার হইয়াছে।

[illegible] অঙ্কশাস্ত্র বস্তুবিজ্ঞানের সাহায্যে বিশেষ পুষ্টিলাভ করিয়াছে। প্রয়োজনানুসারে মানুষের মানসিক শক্তির বিকাশ হইয়া থাকে। বস্তুবিজ্ঞানের উন্নতি বর্ত্তমান সময়ে অঙ্কশাস্ত্রের উন্নতির একটী প্রধান কারণ। ক্রমে বিস্তার প্রকৃতির নিয়ম। বিধাতার শুভ ইচ্ছায় পাশ্চাত্য জগতের সহিত দেড় শত বৎসর হইল ভারতের পরিচয় লাভ হইয়াছে। আর্য্যজাতির দুইটী শাখা ভারতবর্ষে পুনঃ মিলিত হইয়াছে। একের উন্নতির ফল অপরে লাভ করিতেছেন। ইহা হইতে বর্ত্তমান সময়ে ভারতসন্তানের উন্নতির যে সূত্রপাত হইয়াছে তাহা সময়ে বহু বিস্তার লাভ করিবে। আমাদের জগদীশ, প্রফুল্ল ও আশুতোষ বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্রের আলোচনাদ্বারা পাশ্চাত্য জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন এরূপ আশা করা অন্যায় নহে। ইহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বহু লোক ভারতবর্ষে যশের মন্দিরে প্রবেশ লাভ করিবেন।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মজুমদার।

নক্ষত্রপুঞ্জ ও নীহারিকা।

পরিষ্কার আঁধার রজনীতে আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে অসংখ্য নক্ষত্ররাজি দেখিতে পাওয়া যায়। একটু অভিনিবেশ পূর্ব্বক চারিদিকে তাকাইলে দেখা যাইবে নক্ষত্রগুলি আকাশের সর্ব্বত্র সুশৃঙ্খল ভাবে বিন্যস্ত নহে। কোথাও বহু সংখ্যক নক্ষত্র একত্র ঘন স
একটা মাত্র মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে।

নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে কৃত্তিকাটী (Pleiades) প্র
লোকে কৃত্তিকাকে "সাত বোন্ কৃত্তিকা" বলে;
নক্ষত্র খালি চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায়। যাহ
তাহারা দশটী পর্য্যন্ত দেখিতে পায়। অতি স
এই নক্ষত্রপুঞ্জে চল্লিশ পঞ্চাশটী নক্ষত্র দৃষ্টিগোচ
৬২৫টী পর্য্যন্ত গণিতে পারা গিয়াছে।

পার্শিয়ুস্ (Perseus) ও কেসিওপিয়ার (Ca
উজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জ আছে। খালি চক্ষে উহা
ন্যায় বোধ হয়। দূরবীক্ষণদিয়া দেখিলে ঘন
সংখ্যক নক্ষত্ররাজি দৃষ্টিগোচর হয়।

হারকিউলিয়স্ (Hercules) নক্ষত্র মণ্ড
সাধারণ দূরবীক্ষণদ্বারা ইহার অস্পষ্ট জ্যোতিঃ ম
"রসের" (Lord Rosse's) দূরবীক্ষণদ্বারা এ
তারকা দেখা গিয়াছে।

ছায়াপথের বৃত্তান্ত অতিশয় বিস্ময়জনক।
আকাশের উত্তর দক্ষিণে বৃত্তার্দ্ধের ন্যায় ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। ছায়াপথের সমগ্র অংশটী আমরা দেখিতে পাই না। যে অর্দ্ধাংশ প্রকাশ পায় আমরা তাহাই দেখি। দিনের বেলায় প্রখর সূর্য্যকিরণে মৃদুজ্যোতিঃ ছায়াপথ আকাশের গায় অদৃশ্য অবস্থায় থাকে। ছায়াপথ সুবিস্তীর্ণ মণ্ডলের ন্যায় অনন্ত আকাশে বিরাজিত। উহা বহু দূরে অবস্থিত। অত্যুৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণদ্বারা প্রত্যক্ষ করিলে সমগ্র ছায়াপথে কোটি কোটি নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ছায়াপথটী যেন ঘন বিন্যস্ত তারকা-কুসুম-নির্ম্মিত হারের ন্যায় আকাশে অবস্থিত। উহার সীমা নাই, অন্ত নাই।

সমগ্র ছায়াপথটী নক্ষত্রপুঞ্জের সমষ্টি মাত্র। নক্ষত্রপুঞ্জের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া ছায়াপথের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। ছায়াপথে যে কত নক্ষত্রপুঞ্জ তাহা গণনা করিয়া বলিবার সাধ্য নাই। সেই নক্ষত্রপুঞ্জের নক্ষত্ররাজিও নিতান্ত নগণ্য নহে। আমাদের সূর্য্যের ন্যায় বৃহৎ নক্ষত্রের সংখ্যাও বড় কম হইবে না।

নক্ষত্রপুঞ্জ ব্যতীত আকাশে আরও এক প্রকার জ্যোতিষ্ক আছে। উহাদিগকে "নীহারিকা" বলে। ইংরেজিতে নীহারিকাকে নেবিউলা (Nebula) বলে। নেবিউলা শব্দের অর্থ বাষ্প বা মেঘ। নীহারিকা আকাশের গায় মৃদুজ্যোতিঃ মেঘ খণ্ডের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। খালি চক্ষে নীহারিকা প্রত্যক্ষ করা যায় না। নীহারিকা বহু দূরে অবস্থিত এই জন্য উহার দূরবীক্ষণ ব্যতীত দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু আয়তনে নীহারিকাগুলি ক্ষুদ্র নহে। সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র নীহারিকাটীও আমাদের সূর্য্য হইতে অনেক বড়। সুতরাং নীহারিকার বিবরণ বড় উপেক্ষার বিষয় নহে। নীহারিকাগুলি স্বীয় আলোকে জ্যোতিষ্মান।

যে সকল উজ্জ্বল মেঘ খণ্ডকে পূর্ব্বে পণ্ডিতেরা নীহারিকা বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, ভাল দূরবীক্ষণদ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে উহারা বাস্তবিক নীহারিকা নহে,—নক্ষত্রপুঞ্জ মাত্র। খুব দূরে আছে বলিয়া সাধারণ দূরবীক্ষণে নক্ষত্রগুলিকে পৃথক বোধ হয় না। সার উইলিয়ম হর্শেল প্রথমে ... করিয়াছিলেন। এখন যে সকল জ্যোতিষ্করাজি নীহারিকা বলিয়া পরিচিত সেগুলিও আরও ভাল দূরবীক্ষণ আবিষ্কৃত হইলে নক্ষত্রপুঞ্জ প্রমাণিত হইবে। ... দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন প্রকৃতই কতগুলি নীহারিকা আছে, সেগুলি কিছুতেই নক্ষত্রপুঞ্জ হইতে পারে না।

সার উইলিয়ম হগিন্স (Sir William Huggins) সর্ব্ব প্রথম মেঘবৎ প্রতীয়মান প্রচ্ছন্ন নক্ষত্রপুঞ্জ হইতে নীহারিকা পৃথক ও স্বতন্ত্র প্রমাণ করেন। তিনি বলেন নীহারিকা জ্যোতিষ্মান বাষ্পপুঞ্জ মাত্র। নীহারিকার অস্তিত্ব এখন সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু যে বাষ্পপুঞ্জ নীহারিকার উপাদান সেই বাষ্পপুঞ্জের প্রকৃতি আজ পর্য্যন্তও নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই।

এণ্ড্রোমেডার নিকটবর্ত্তী নীহারিকাটী দূরবীক্ষণ আবিষ্কারের পূর্ব্ব হইতেই জ্যোতির্ব্বিদগণের নিকট পরিচিত ছিল। এই নীহারিকাটী বোধ হয় খুব নিকটবর্ত্তী এবং অতিশয় উজ্জ্বল, এই কারণ উহা খালি চক্ষেই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সার উইলিয়ম হর্শেল ১৭৮৬ হইতে ১৮০২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করিয়া আড়াই হাজার নীহারিকা আবিষ্কার করেন এবং ঐ সকল নীহারিকার

একটা তালিকা নির্ম্মাণ করেন। হর্শেলের মৃত্যুর পর তৎপুত্র সার জন হর্শেল উত্তমাশা অন্তরীপে গিয়া ১৭০৮টী নূতন নীহারিকা আবিষ্কার করিয়া পূর্ব্বোক্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেন। এ পর্য্যন্ত প্রায় আট হাজার (৭৮৪০) নীহারিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভবিষ্যতে হয়-তো নীহারিকার তালিকায় আরও নূতন নীহারিকার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইবে। নীহারিকাগুলির আকার ও আয়তন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। সার রবার্টবল্ লিখিয়াছেন সমুদ্রতীরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আট হাজার উপলখণ্ড যেমন আকার ও আয়তনে বিভিন্ন আকাশের নীহারিকাগুলিরও তেমনি আকৃতিগত বৈষম্য আছে। বৈষম্য থাকিলেও পরস্পরের মধ্যে বস্তুগত সাদৃশ্য রহিয়াছে।

কালপুরুষ (Orion) নক্ষত্রের মধ্যস্থিত পেটিকার নিম্নে একটী অতি নীহারিকা আছে। ইহা খুব বৃহৎ এবং উহার মাঝে মাঝে কয়েকটী নক্ষ বিরাজমান।

অর্গাস্ (Argus) নক্ষত্রের নিকটবর্ত্তী নীহারিকাটীর বাষ্পে ঐ নক্ষ উপাদান বিদ্যমান। কোন কোন নীহারিকা দেখিয়া বোধ [illegible] যেন ঘনী হইতেছে। কোন কোন নীহারিকা নক্ষত্রসমূহের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

কেহ কেহ অনুমান করেন নীহারিকাগুলি কালে ঘনীভূত হইয়া নক্ষ পরিণত হইবে; এবং অনেক নক্ষত্রই নীহারিকা হইতেই উৎপন্ন হইয়া এক সময়ে জ্যোতিষ্করাজি বাষ্পাকারে শূন্যমার্গে ঘূর্ণ্যমান অবস্থায় বিরাজিত ছি ক্রমে যখন উহাদের অভ্যন্তরভাগ ঘনীভূত হইয়া কঠিন হইতে আরম্ভ করি তখন উহা অধিকতর প্রবল বেগে ঘুরিতে লাগিল। সেই সময় কেন্দ্রাপসারিণী গতি মাধ্যাকর্ষণকে অতিক্রম করাতে উপরের বাষ্পরাশি দূরে উৎক্ষিপ্ত হইল এবং ঐ বিক্ষিপ্ত বাষ্পরাশি আবার শূন্যপথে ঘুরিতে লাগিল। ঐ সকল জ্যোতিষ্মা বাষ্পরাশিকেই আমরা নীহারিকা বলিয়া থাকি। অনন্ত আকাশের সুদূর প্রান্তে নীহারিকা হইতে আবার নক্ষত্র উদ্ভূত হইতেছে। নীহারিকা হইতে কোটী কোটি সূর্য্যের উৎপত্তি হইয়াছে ও হইতেছে। সৃষ্টিতথ্য কি অনির্ব্বচনীয় রহস্যপূর্ণ বিধাতার অসীম রাজ্যে প্রতিনিয়ত কত অভিনব অচিন্তনীয় ব্যাপার সংঘট হইতেছে তাহা ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব জানিতে ও বুঝিতে অক্ষম। সৃষ্টিবৈচিত্র্যের আমরা যৎকিঞ্চিৎ রহস্য অবগত হইয়াই বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া পড়ি।

c

ধর্ম্মদেবতা।

শালগ্রাম শিলা বনের ভিতর আছিল পড়ে,
গেল বৎসর কত,
ব্রাহ্মণ এক কুড়ায়ে তাহারে আনিল ঘরে,
পূজায় রহিল রত।
"স্বপ্নে ঠাকুর বলে তায় নিতি যেন,—
বনে বেশ ছিনু ঘরেতে আনিলি কেন?
সব যাবে তোর যাবে রে
রেখে আয় বন ভিতরে।"
ব্রাহ্মণ বলে "ঠাকুর! তাহা-ত পারিনে!
যে ভয় দেখাও ও ভয়েতে আমি ডরিনে।"

(২)

ঝাঁপি কাঁখে করে গেলেন কমলা, গেল ধন,
প্রিয়জন গেল মরি,
শুকাইয়া গেল সাজান বাগান সুশোভন,
ফুল-কলি গেল ঝরি;
স্বপ্নে ঠাকুর বলে তায় নিতি যেন,
"বনে বেশ ছিনু ঘরেতে আনিলি কেন?
সব গেল তোর গেল রে
রেখে আয় বন ভিররে।"
ব্রাহ্মণ বলে "দেবতা! তাহা-ত পারিনে,
ভেঙ্গে যা'ক মোর খেলার ঘর তাহে ডরিনে।

(৩)

সব গেল ছাড়ি, ভেঙ্গে গেল বাড়ী তবু হায়!
দেবতার কৃপা নাহি,
ঘৃণ্য ব্যাধির হ'ল যে বিকাশ সারা গায়
ব্রাহ্মণ ধরাশায়ী।
স্বপ্নে ঠাকুর বলে নিতি নিতি রে
"সকলি পাইবি আমারে ছাড়িয়া দে,

সব গেছে তোর যাহা আছে তাহা যাবে রে
রেখে আয় বন ভিতরে।"
ব্রাহ্মণ বলে "দেবতা! তাহা-ত পারিনে,
হয়েছি ভিখারী ডাকাতির ভয় করিনে।"

(৪)

ব্রাহ্মণ ধীরে ধর্ম্মদেবেরে উঠায়ে
লইল বক্ষে করি,
চক্ষের জল পড়িতে লাগিল গড়ায়ে,
(বলে) "বনে বুকে এসো সরি ;
সকলি গিয়াছে সুখ, সম্পদ, প্রিয়জন,
হৃদয় আমার আজিকে হয়েছে ঘনবন,
সুখে থাক হৃদি দেবতা
আর মুখে কেন ও কথা?"
কঠিন দেবতা চাহিল ঈষৎ হাসিয়া,
বিপদ, বেদনা, ব্যাধি, দূরে গেল ভাসিয়া।

(৫)

ঝাঁপি কাঁখে করি, এলেন কমলা মৃদু হাসি।
ব্রাহ্মণ বলে "মাতা,
কোন্ ছলে ওগো থাকিবে হেথায় পুনঃ আসি
তাই ভাবি পাই ব্যথা।"
কমলা বলেন, "ধর্ম্মদেবতা ছাড়ি,
কতক্ষণ আর আমি রে থাকিতে পারি?
সব ফিরে আসে পিছুনে
কে রবে ধর্ম্ম বিহনে"
ব্রাহ্মণ বলে "এসো যেও পুনঃ চলি,
তোমা' পেয়ে যেন ধর্ম্মেরে নাহি ভুলি।"

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

রাজ-কাহিনী।

(১)

সন্ধ্যার পর একটি রোগী দেখিয়া ভবানীপুর দিয়া আসিতেছি এমন সময় মনে হইল একবার কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলে হইত। কার্য্যের আধিক্য বশতঃ এবং অনবরত "কল্" থাকায় প্রায় পক্ষাধিক কাল তাঁহার সহিত দেখা করিতে পারি নাই।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু কেবল বাংলায় নয় সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে 'কন্সাল্টিং ডিটেক্টিভ' বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। যে সমস্ত ঘটনার কোন কিনারা হইত না তাহাই কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু ওরফে গোবিন্দ বাবুর হস্তে ন্যস্ত হইত। গোবিন্দ বাবুর অনুসন্ধান-প্রণালী একটু পৃথক,—তাহা পাঠক পরবর্ত্তী ঘটনা হইতে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। তিনি সুযোগ পাইলেই বিজ্ঞানের আলোচনা করিতেন এবং নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক উপায়ে অনুসন্ধান কার্য্য সহজ করিয়া লইতেন।

যাহা হউক, শীঘ্রই তাঁহার বাড়ীর সেই সুপরিচিত দরজার নিকটে উপস্থিত হইলাম; দ্বারে আঘাত করিবা মাত্র ভৃত্য তাঁহার সমীপে লইয়া গেল। গোবিন্দ বাবু আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, সহাস্যে বলিলেন "কি ডাক্তার, তবে বালিগঞ্জে ভালই আছ? এখানেও বেশ পসার করিয়া লইয়াছ দেখিতেছি। ভাল।"

"কিসে বুঝিলেন?"

"অনুমান মাত্র; আরও বলিতে পারি, তুমি অল্পদিন হইল কলিকাতার বাহিরে কোনও 'কল্'এ গিয়াছিলে; কিন্তু ডাক্তার তোমার ভৃত্যটি অত্যন্ত আহাম্মক—জিনিস-পত্রে একেবারেই যত্ন নাই।"

আমি গোবিন্দ বাবুকে চিনিতাম বুঝিলাম তিনি ইহার সকলই অনুমান করিতেছেন মাত্র। বলিলাম,—"গোবিন্দ বাবু, যদি কয়েক-শতাব্দী পূর্ব্বে ইউরোপে জন্মগ্রহণ করিতেন তবে যাদুকর বলিয়া আপনাকে জীবন্ত দগ্ধ করিত; সত্যই আমি গত বৃহস্পতিবার শ্রীরামপুরের নিকটে গিয়াছিলাম। তারপর চাকর সম্বন্ধে যে অনুমান করিয়াছেন তাহাও সত্য; আর একটু হইলেই আমার ঘড়ীটা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল আর কি?—কিন্তু আপনি এ সকল কি হইতে অনুমান করিলেন?

"অতি সহজ ; প্রথমে ধর তোমার পসারের কথা ; তুমি প্রায় পক্ষাধিক কাল এখানে অনুপস্থিত, তুমি আমার অনুসন্ধান-প্রণালী দেখিতে এত ভালবাস যে বিনা কার্য্যে কখনই এখানে অনুপস্থিত হও না—কেমন ? তোমার অসুখও হয় নাই—তাহা হইলে তোমার স্ত্রী সর্ব্বাগ্রে আমায় সংবাদ দিত ; ইহা হইতে এই বুঝিলাম, তুমি এত বেশী 'কল্' পাইতেছ যে এখানে আসিবার সময় পাও না। তার পর অন্য অনুমানদ্বয় তোমার জুতাজোড়া হইতে।"

"কিরূপে ?"

"বাটী হইতে যখন বাহির হও তখন জুতা চাকরে ব্রাস করিয়া দিয়াছিল-তো ?

"হাঁ"।

"এই দেখ স্থানে স্থানে গভীর কর্দ্দমের চিহ্ন স্পষ্ট রহিয়াছে ; ইহা হইতে প্রথম অনুমান করিলাম যে তোমার চাকরটা অন্যমনস্ক ; দ্বিতীয় অনুমান করিলাম যে তুমি কলিকাতার বাহিরে গিয়াছিলে— কারণ আজকাল কলিকাতায় একেবারেই কর্দ্দম নাই।"

"আশ্চর্য্য !"

"কিছুই আশ্চর্য্য নয় ; তুমি কোথা হইতে রোগী দেখিয়া আসিতেছ ?"

"কিরূপে অনুমান করিলেন রোগী দেখিয়া আসিতেছি ?"

"পকেটে ষ্টেথিস্কোপ্ রহিয়াছে—শরীর হইতেও আইডোফর্ম্মের গন্ধ বাহির হইতেছে,—এরূপ অবস্থায় তুমি যে হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছ এরূপ অনু[মান] করা ন্যায় সঙ্গত নয় ;" এই বলিয়া গোবিন্দ বাবু উচ্চহাস্য করিলেন।

"সত্য কথা বলিতে কি, আপনি যখন ধাঁধা হইতে উদ্ধার করেন তখন [তাহা] জলের ন্যায় সহজ হইয়া যায়, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কিছুতেই অনুমান করা যায় না।"

"তাহার কারণ তোমরা কেবল দেখিয়াই যাও, লক্ষ্য কর না ; আর আমি প্রত্যেক বস্তু বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া থাকি। যাক্—তুমি আমার অনুসন্ধান কার্য্যে আমোদ অনুভব করিয়া থাক ;—এই পত্রখানা পাঠ কর—ইহা একটু পূর্ব্বে পাইয়াছি।"

এই বলিয়া একখানা পত্র দিলেন,—

"মহাশয়, আটটা বাজিতে যখন পনের মিনিট অবশিষ্ট থাকিবে তখন আমি আপনার নিকট উপস্থিত হইব ; আমার একটী গুরুতর এবং গোপনীয় কার্য্য আপনাদ্বারা করাইয়া লইতে চাই। ভারতবর্ষের মধ্যে আপনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

ডিটেক্‌টিভ তাহা অবগত আছি—আশা করি আমি নিরাশ হইব না। ইতি”

পত্রে নাম নাই। আমি বলিলাম “পত্রখানা রহস্যপূর্ণ, সন্দেহ নাই; ইহা হইতে কি অনুমান করেন?”

“আচ্ছা, তুমি আগে বল, তারপর আমি বলিব।”

আমি গোবিন্দ বাবুর অনুমান প্রণালী অনুসরণ করিয়া বলিলাম,”—পত্রখানা যে কাগজে লিখিত উহা খুব মূল্যবান,—হয়তো শতকরা ৫৲ টাকাতেও পাওয়া যাইবে না। ইহা যেমন পুরু তেমনি একটু বিশেষত্ব পূর্ণ।”—

“সহজ কথায় বল, ইহা সাধারণ কাগজ নয়। ইহা আলোকের সম্মুখে ধর—কি দেখিতে পাইতেছ? উপরের লাইনে লেখা আছে বড় হাতের ডি, ছোট হাতের এল্ এবং এ, আর বড় হাতের আর, (D-la R.) কেমন? নীচে লেখা আছে বড় হাতের পি এবং ছোট হাতের এস্ (Ps.); ইহা হইতে এই অনুমান হয় যে প্যারিস্ নগরীতে ডিলারিউ কোম্পানী কর্ত্তৃক এই কাগজ প্রস্তুত হইয়াছে। তুমি বোধ হয় অবগত আছ যে, এই ‘ডিলারিউ’ কোম্পানী পৃথিবীর সমস্ত রাজা এবং সম্রাটদের কাগজ বিক্রেতা; ইহার দোকানের শাখা ইয়োরোপের সমস্ত দেশেই আছে—এই কাগজখানি প্যারিসের শাখা হইতে [illegible]স্তুত, ইহা হইতে অনুমান হয় যে, এই কাগজের অধিকারী ফরাসী রাজ্যে বাস [illegible]রে—কারণ ইংরাজ রাজ্যের সমস্ত কাগজই, হয় ইংলণ্ড, নতুবা জর্ম্মান রাজ্যে [illegible]স্তুত হইয়া থাকে—ফ্রান্স্ হইতে আসে না।”

“এমন সময় একটা গাড়ীর শব্দ শুনা গেল, শব্দ শুনিয়া গোবিন্দ বাবু [illegible]লিলেন, “গাড়ীটা জুড়ী বোধ হয়”; তৎপরে বাতায়নের সাহায্য লইয়া [illegible]লিলেন, “হাঁ জুড়ীই বটে; গাড়ীটা ব্রুহাম,—ঘোড়াজোড়া নিশ্চয়ই লক্ষপতির [illegible]ইবে। ডাক্তার, ইহার সহিত বড়লোক সংশ্লিষ্ট আছে- মনে রাখিও।”

———::———

(২)

আমি উঠিতে চাহিলে গোবিন্দ বাবু বলিলেন “এখানেই [illegible] ঘটনাটা অত্যন্ত আমোদজনক বোধ হইতেছে—ইহা ত্যাগ করা নির্ব্বুদ্ধিতা।”

“তাহা তো বুঝিলাম; কিন্তু আপনার মক্কেল আমার সম্মুখে—”

“সে জন্য ভাবিও না ডাক্তার; ঘটনায় হয়তো তোমার বিশেষ সাহায্য আবশ্যক হইতে পারে।”

ধীর পদ-শব্দ দ্বারের নিকটবর্ত্তী হইলে গোবিন্দ বাবু বলিলেন “আসুন!”

পরক্ষণেই আগন্তুক প্রবেশ করিলেন। লোকটীকে দেখিয়া মান্দ্রাজী বলিয়া বোধ হইল। পরিচ্ছদ মূল্যবান, আকৃতি গম্ভীর ও স্থির, দৃষ্টি গর্ব্বপ্রকাশক। গৃহে প্রবেশ করিয়াই তিনি ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় বলিলেন, "আশা করি, আমার পত্র যথা সময়ে পাইয়াছেন, আমি লিখিয়াছিলাম অন্য—" মুখের কথা মুখেই রহিল কে কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া একবার তাঁহার দিকে এবং একবার আমার দিকে তাকাইতে লাগিলেন।

গোবিন্দ বাবু সহাস্যে একখানি চেয়ার দিয়া বলিলেন, "অনুগ্রহ করিয়া বসুন; ইনি আমার একজন বন্ধু—ডাক্তার। ইনি সকল সময় আমাকে সহায়তা করিয়া থাকেন।—কিন্তু আপনাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিব?"

আগন্তুক বলিলেন "আমাকে রামশঙ্কর আয়ার বলিবেন—কেরিকেল রাজ্যে আমার জমিদারী। যাহা হউক, আমার বক্তব্য অত্যন্ত গোপনীয়—আপনি অনুগ্রহ করিয়া কক্ষান্তরে আসিলে ভাল হয়।"

আমি উঠিতে চাহিলাম, গোবিন্দ বাবু বাধা দিয়া বলিলেন "আপনি আমাকে যাহা বলিবেন তাহা ইঁহার সম্মুখেও বলিতে পারেন।"

"কিন্তু, প্রথমতঃ আপনাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে আমি যাহা বলিব তাহা অন্ততঃ দুই বৎসরের মধ্যে প্রকাশ করিতে পারিবেন না। তাহার পরে প্রকাশ করিলে কোনও ক্ষতি হইবে না।"

গোবিন্দ বাবু সংক্ষেপে বলিলেন, "প্রতিজ্ঞা করিলাম।"

আমিও প্রতিজ্ঞা করিলে আগন্তুক বলিলেন, "ক্ষমা করিবেন, যে ব্যক্তি আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন না। আমি তাঁহার দূত মাত্র।"

গোবিন্দ বাবু চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুনিতে লাগিলেন;—

"ঘটনাটা লজ্জাজনক; এবং ভারতের একটি বিখ্যাত পরিবারের সহিত সংশ্লিষ্ট; আমি ফরাসী-মিত্র কেরিকেল-পতির কথা বলিতেছি।"

গোবিন্দ বাবু চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই বলিলেন "তাহা পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছি।"

ইহাতে আগন্তুক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গোবিন্দ বাবুর দিকে তাকাইয়া রহিলেন—

গোবিন্দ বাবু অনেকক্ষণ পর চক্ষু উন্মিলন করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "মহারাজ, অনুগ্রহ করিয়া সকল কথা খুলিয়া বলিলে আমার যতদূর সাধ্য সাহায্য করিব।"

আগন্তুক লম্ফদিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া পদচারণ করিতে লাগিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় উপবেশন করিয়া বলিলেন, "গোপন করিবার আবশ্যক কি ? আপনার অনুমান সত্য ; আমিই কেরিকেল-পতি।"

গোবিন্দ বাবু বলিলেন,—"ঠিক, গোপন করিবার কিছুই আবশ্যক নাই ; আমি পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলাম যে—আপনি কেরিকেল-পতি—মহারাজ রামশঙ্কর সিংহ আয়ার বাহাদুর।"

"আপনি বোধ হয় প্রথমেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে আমি এই প্রথম ছদ্মবেশ গ্রহণ করিয়াছি। এই ঘটনার কথা কাহাকেও বলি এমন বিশ্বাসী কেহ না থাকায় আমি স্বয়ং মান্দ্রাজ হইতে এখানে অগ্য আসিয়াছি। বলা বাহুল্য আপনাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করাই আমার আগমনের উদ্দেশ্য।"

"তাহা হইলে আরম্ভ করুন।"

"প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি যুবরাজ ছিলাম তখন পিতার অনুমতি ক্রমে একবার দেশ ভ্রমণে বাহির হই ; নানা দেশ ঘুরিয়া বোম্বে আসি, সেখানে মিস্ তোরাব্ নাম্নী একটি পরমাসুন্দরী পার্শী রমণীর সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়।"

গোবিন্দ বাবু বাধা দিয়া বলিলেন "সেই রমণীর সহিত ঘনিষ্ঠতা হওয়ায় তাহাকে যে সকল পত্রাদি লিখিয়াছিলেন তাহাই চান বুঝি ?"

"ঠিক তাহা নহে ; পত্রাদি আমি বহু পূর্ব্বেই সংগ্রহ করিয়াছিলাম। তাহার চ একত্রে আমার একখানি ফটো তোলাইয়া ছিলাম—সেই ফটোখানা শ্যক।"

"উহা মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন কি ?"

"হাঁ ; সে উহা বিক্রয় করিতে চাহে না,—"

"তবে উহা চুরি করিতে হইবে।"

"পাঁচ বার বলপূর্ব্বক উহা লইতে চেষ্টা করিয়াছি ; দুইবার গুণ্ডাদ্বারা রাস্তায় তাহাকে ধরিয়া বস্ত্র অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি ; দুইবার তাহার অনুপস্থিতে তাহার বাড়ী অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি ও একবার রেলে [illegible] মালপত্র অনুসন্ধান করাইয়া দেখিয়াছি।"

"কিছু ফল হয় নাই ?"

"কিছুই নয়।"

কিছুক্ষণ পরে গোবিন্দ বাবু বলিলেন "সে ঐ ফটোদ্বারা কি করিতে চায় ?"

"আমার সর্ব্বনাশ।"

"তাহা-ত বুঝিলাম; কিরূপে?"

"আমার সহিত তাঞ্জোর রাজকন্যার বিবাহের কথা হইয়াছে; সে পরমাসুন্দরী কিন্তু তাঞ্জোর-পতি অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির লোক; যদি কোন প্রকারে উক্ত পার্শী মহিলার সহিত আমার প্রণয়ের চিহ্নস্বরূপ ঐ ফটো তাঁহার হাতে পড়ে তবে বিবাহ তো হইবেই না বরং একটী দুর্নাম রটনা হইবে।"

"মিস্ তোরাব্ কি বলে?"

"উহা তাঞ্জোর পতির নিকট পাঠাইতে চায়।"

"আপনি নিশ্চয় জানেন সে এখনও ফটো পাঠায় নাই?"

"হাঁ, কারণ সে বলিয়াছিল যে দিন আমাদের বিবাহ প্রকাশ্যে ঘোষিত হইবে সেই দিন যদি তাহাকে একলক্ষ টাকা পাঠাই—তবে সে ফটোখানি পাঠাইবে।—আমাদের বিবাহ আগামী সপ্তাহে ঘোষিত হইবে।"

গোবিন্দ বাবু হাই তুলিয়া বলিলেন, "এখনও এক সপ্তাহ বিলম্ব আছে। ইহার মধ্যে একটা কিছু নিশ্চয়ই করা যাইবে। আপনি এ কয়দিন অবশ্য কলিকাতাতেই থাকিবেন?"

"হাঁ একটা কিছু কিনারা না করিয়া যাই কেমন করিয়া? আমি পার্কষ্ট্রীটে বাসা লইয়াছি। রামশঙ্কর আয়ার পার্কষ্ট্রীট, এই ঠিকানায় পত্র লিখিলেই আমি পাইব।"

"তাহা হইলে যাহা যাহা হয় আপনাকে পত্রে জানাইব।"

"মনে রাখিবেন আমি বিশেষ ব্যস্ত রহিলাম।"

"কিন্তু টাকা সম্বন্ধে?—"

"আমার কার্য্যোদ্ধার হইলে পাঁচ হাজার টাকা দিব।"

"বর্ত্তমান খরচের জন্য টাকা আবশ্যক।"

মাহরাজ পকেট হইতে একটা মাণিব্যাগ বাহির করিয়া পাঁচখানি এক টাকার নোট লইয়া গোবিন্দ বাবুকে দিলেন—গোবিন্দ বাবু একখানি রসি দিলেন।

গোবিন্দ বাবু বলিলেন, "মিস্ তোরাবের ঠিকানা কি?"

"পেয়ারা বাগান, বালিগঞ্জ।"

"আর একটী কথা—ফটোখানি কি আকারের?"

"কেবিনেট্ সাইজের।"

রাজা বিদায় লইলেন।

আমি উঠিলাম, গোবিন্দ বাবু বলিলেন "কল্য বেলা ৩টার সময় আসিও — এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅঃ —

রামসদয় কর্ম্মকার।

(তৃতীয় প্রস্তাব)

তন্ত্র ও মন্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী গঙ্গামদকের আদেশানুসারে, মহেশ-পত্নী সেই বিরাট সভাস্থলে যন্ত্রাঙ্কিত কাষ্ঠাসনোপরে নীরব হইয়া উপবেশন করিলে, মদক মহাশয় তাহাকে যে সকল অদ্ভুত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন তাহাতে সমাগত নরনারী বর্গ বিস্মিত হইতে লাগিল। অপরিচিত গঙ্গারাম মদকের মুখ হইতে এরূপ প্রশ্ন সমূহ নিঃসৃত হইবে, গ্রামের লোকেরা তাহা কখনও কল্পনা করে নাই। মহেশ-পত্নী ও মদক মহাশয় মধ্যে পরস্পর যে আশ্চর্য্য কথোপকথন হইতেছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

গঙ্গা—তোমার নাম কি ?—যদি সত্যকথা না কহিয়া মিথ্যাবাক্য দ্বারা অথবা নানা প্রকার ছলনা দ্বারা তুমি আমাকে প্রতারিত করিতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে আমি তোমার দেহস্থ শোণিত পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইব।

স্ত্রীলোক—আমার নাম রামসদয় কর্ম্মকার। এই গ্রামে আমার জন্মস্থান। মহেশচন্দ্র আমার ভাগিনেয় অর্থাৎ সহোদরার সন্তান।

গঙ্গা—তোমার কোন ভূসম্পত্তি আছে বা ছিল কি না ?

স্ত্রীলোক—কি আশ্চর্য্য !! কি কৌতুককর প্রশ্ন !! তুমি কি জান না, এই বাটী, এই ভূমি, এই সমুদয় সম্পত্তি আমার নিজের। আমি কি ইহাদের একমাত্র স্বত্বাধিকারী নহি ? এ কথা কি এই গ্রামের পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা অস্বীকার করিতে পারে ?

গঙ্গা—তুমি এখানে কেন আসিয়াছ ?

স্ত্রীলোক—কি আশ্চর্য্য !! আমি এখানে কেন আসিয়াছি, এ কথা কেমন করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ ? আমার বাটীতে আমি আসিব, ইহাতে নূতনত্ব কিছু আছে কি ? আমার ঘরে আসিতে আমার কি অধিকার নাই ?

গঙ্গা—তুমি কি ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া যাও নাই ?

স্ত্রীলোক—আমি মরিয়া গিয়াছি বটে কিন্তু আমার এখনও "সদ্গতি" হয় নাই। অপঘাতে মরণ হইলে শীঘ্র মুক্তি হয় না।

গঙ্গা—তুমি কি তোমার ভাগিনেয় মহেশকে তোমার সমুদয় সম্পত্তি দান করিয়া যাও নাই? মহেশ কি তোমার উত্তরাধিকারী নহে? তোমার ভাগিনেয়কে তুমি কি তোমার সমুদয় সম্পত্তির সত্বাধিকারী কর নাই?

মহেশ-পত্নী—না; নিশ্চয় না। দুরাত্মা মহেশ অসদুপায়ে আমার সম্পত্তি হস্তগত করিয়াছে এবং এই পাপাত্মা ঘোরতর অধার্ম্মিক ভাবে আমার প্রাণ বধ করিয়া আমার যথাসর্ব্বস্ব অধিকার করিয়া বসিয়াছে। ইহার যথোচিত শাস্তি হওয়া আবশ্যক।

মদক—মহেশ তোমাকে কি প্রকারে প্রাণে বধ করিল?

স্ত্রীলোক—ভাতের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া আমাকে খাইতে দিয়া ছিল, ঐ বিষসংযুক্ত অন্ন ভোজন করিয়া আমি মরিয়াছি। পাপাত্মা মহেশ এইরূপে আমাকে অপঘাত মৃত্যুর বশবর্ত্তী করিয়াছিল।

মদক—কোথায় সে এরূপ করিয়া ছিল?

মহেশ-পত্নী—পুরীধামে তীর্থযাত্রা উপলক্ষে যাইবার সময় পথিমধ্যে ঐ দুরাত্মা এইরূপ দুষ্ট ব্যবহার দ্বারা আমাকে মারিয়াছে।

মদক—ইহা কেহ দেখিয়াছিল অথবা কেহ ইহার সাক্ষী আছে?

স্ত্রীলোক—মহেশ ভিন্ন আর কেহ ইহা জানে না। মহেশচন্দ্র যদি ইহা অস্বীকার করে তাহা হইলে তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া রুধির পান করিব।

মদক—তুমি এখন কি করিতে চাও?

মহেশ-পত্নী—আমি সেই মৃত রাসমদয়ের আত্মা; দুরাত্মা মহেশের যথেষ্ট শাস্তি না দিয়া আমি এই গৃহ পরিত্যাগ করিব না। প্রতিহিংসাই এক্ষণে আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। আমি জীবিতাবস্থায় কখনও কাহারও সহিত কলহ করি নাই বা কাহারও অনিষ্ট চেষ্টা করি নাই, কিন্তু এখন এই মহাপাপী মহেশের আমি সর্ব্বনাশ সাধন না করিয়া পরিতৃপ্ত হইব না। মহাভারতোক্ত ঘটৎকোচ নামক পুরুষ, মৃত্যুর পরে যেরূপ প্রতিহিংসা পরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিল, জীবিতাবস্থায় তাহার কোটি অংশের একাংশও ছিল না। আমি এক্ষণে ঘটৎকোচের প্রকৃতি সম্পন্ন।

মদক—আমার বিবেচনায় এতটা ক্রোধ করা উচিত নয়। কিঞ্চিৎ সংযম আবশ্যক।

স্ত্রীলোক—সংযম!! অপাত্রে অমৃত বিলাইতে নাই। যাহা হউক, আমার যে সকল স্থাবর, অস্থাবর ও জঙ্গম সম্পত্তির স্বত্ব দখল করিয়া মহেশচন্দ্র এই গ্রামের লোকদিগকে আমার "উত্তরাধিকারী" বলিয়া মিথ্যা পরিচয় দিতেছে, সেই সকল সম্পত্তির স্বত্ব বর্জ্জন না করিলে আমি এই গৃহ ছাড়িব না এবং মহেশকেও নিরাপদ বা শান্তিময় হইতে দিব না। দুষ্টের পাপের যথোচিত প্রায়শ্চিত্ত হওয়া আবশ্যক। যেখানেই সে থাকুক না কেন, আমি তাহার পশ্চাতে থাকিয়া তাহাকে নির্য্যাতিত করিতে থাকিব। তাহাকে কখনই সুখী হইতে দিব না। জগত দেখুক, পাপীর কোথাও শান্তি নাই। মহেশ যদি পর্ব্বতগুহায় লুকায় অথবা সাগরজলে ডুবে তাহা হইলেও সে পরিত্রাণ পাইবে না।

গঙ্গামদক ও মহেশ-পত্নীর মধ্যে পরস্পর যে কথা বার্ত্তা হইল, দর্শকগণ তাহা শ্রবণ করিয়া বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইয়া গেল। কথোপকথন কালে দেখা গিয়াছিল, এক কোণে নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া মহেশচন্দ্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিল। গ্রামের লোকেরা মহেশকে সভার মধ্যস্থলে দাঁড় করাইয়া জিজ্ঞাস করিল "মহেশ! এই সকল কথা কি সত্য?" বুকে হাত দিয়া, আকাশের দিকে অশ্রুপূর্ণ লোচন দ্বয় নিক্ষেপ করিয়া, অনুতপ্ত মহেশ বলিল "কেমনে আর অস্বীকার করিতে পারি?" এই কথা কহিয়া রামসদয়ের অপমৃত্যু সম্বন্ধীয় যাবতীয় ঘটনা আদ্যন্ত সরল অন্তঃকরণে বিবৃত করিতেলাগিল। লোকেরা স্তম্ভিত হইয়া তাহা শ্রবণ করিতে করিতে রোমাঞ্চিত কলেবর হইতে লাগিল। অশ্রুতে মহেশের মুখমণ্ডল সিক্ত হইয়া গেল। প্রেতাধিকৃতা মহেশ-পত্নীকে সম্বোধন করিয়া সুদক্ষ গঙ্গামদক পুনরপি কহিল "এখন কি প্রকার বন্দোবস্ত হইলে তুমি সন্তুষ্ট হইতে পার তাহা জানিতে ইচ্ছা করি? মহেশের স্ত্রী বলিল "আমি (রামসদয় কর্ম্মকার) অপুত্রক, আমার সহধর্ম্মিনীও মৃত্যুমুখে পতিতা হইয়াছেন। আমার সমুদয় সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ আমাদের কুলপুরোহিতকে দান করিতে ইচ্ছা করি। একচতুর্থাংশ গরিব লোকদিগের সাহায্যে ব্যয়িত হইবে; একচতুর্থাংশ পুষ্করিণী ও দিঘী খননে দেওয়া হইল এবং বাকি সিকিভাগ একটি মন্দির ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠায় দান করিলাম। মহেশ কিছুই পাইবে না। এক সপ্তাহ কাল মধ্যে মহেশকে এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া গ্রামান্তরে যাইতে হইবে, এই গ্রামে থাকিলে মহেশের প্রাণ বধ করিব। এই সমুদয় কথায় সম্মত হইয়া মহেশ যদি প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হয় এবং গ্রামের প্রধান প্রধান পুরুষ দিগের সম্মুখে রাজীনামা লিখিয়া তাহাতে স্বহস্তে দস্তখত করে তাহা হইলে

মহেশকে আমি ক্ষমা করিব, নতুবা নহে।" মহেশচন্দ্র এই কথা শুনিয়া স্বীকৃত হইল এবং বহুলোকের সম্মুখে রাজীনামাপত্র লিখিয়া তাহাতে স্বহস্তে নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়া দিল।

মহেশ-পত্নী এই সময়ে নীরব হইয়া বসিয়া ছিল অকস্মাৎ গঙ্গারাম মদক একটা শঙ্খদ্বারা ধ্বনি করায় সে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। মূর্চ্ছান্তে প্রকৃতিস্থা হইয়া লজ্জা বশতঃ অন্তঃপুরে দৌড়িয়া পলায়ন করিল। স্ত্রীলোকটিকে এই সকল ঘটনার কথা জিজ্ঞাসা করায় কহিল "আমি ইহার কিছুই জানি না। এ সকল কথা শুনিয়াছি বা করিয়াছি এরূপ মনে হয় না।" ইহার কয়েকমাস পরে সর্পাঘাতে মহেশের মৃত্যু হয় এবং তাহার স্ত্রীও পরলোক গমন করে। মহেশের বংশে আর কেহ জীবিত রহিল না।

সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গারাম মদক, বহু পুরস্কার ও সম্মান প্রাপ্ত হইয়া স্বগ্রামে আসিয়া পৌছিলেন। বনপাশ কামারপাড়া গ্রামের শত শত নরনারী আজি পর্য্যন্ত গঙ্গা ময়রার নামোচ্চারণ ও শতমুখে তাহার প্রশংসা করে। (সমাপ্ত)

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

বিক্রমপুরের ইতিবৃত্ত। (৯)

উত্থান ও পতন জগতের স্বাভাবিক নিয়ম। পাঠান রাজবংশের দুই শতাব্দীর সুদৃঢ় সিংহাসন দাউদের সঙ্গে সঙ্গে চূর্ণ হইয়া গেলে ধীরে ধীরে মোগল-গৌরব-রবি ভারতাকাশে উদিত হইতে আরম্ভ করিল। এ সময়ে বাংলায় সুলতান হুসেনশাহের জ্যেষ্ঠপুত্র নসরৎ শাহ স্বাধীনভাবে রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন। ইনিও পিতার ন্যায় সিংহাসনারোহণের পর বহু সদ্‌গুণাবলীর পরিচয় দিয়াছিলেন। অন্যান্য মুসলমান সুলতানগণের ন্যায় ভ্রাতা ও অন্যান্য নিকট-আত্মীয়গণকে, চক্ষু-উৎপাটন ইত্যাদি করিয়া নির্য্যাতন করার পরিবর্ত্তে ইনি পিতৃদত্ত বৃত্তি দ্বিগুণ করিয়া দিয়া যথেষ্ট মহত্ব ও সৌজন্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। নসরৎ যখন বাংলায় স্বীয় প্রভুত্ব ও প্রাধান্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যবিস্তারে মনোযোগী হইয়াছিলেন, তখন

ভারতে মোগলের অভ্যুদয়।

ভারতের অপর প্রান্তে তৎকালীন দিল্লীশ্বর ইব্রাহিম লোদীকে পাণিপথের ভীষণ যুদ্ধে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পরাস্ত ও নিহত করিয়া মোগলসাম্রাজ্য সংস্থাপক

বাবর শাহ দিল্লীর অধীশ্বর হইলেন। এইরূপে ভারতে মোগলের অভ্যুদয় হইল। বাবর শাহ কষ্টার্জ্জিত দিল্লীসিংহাসন বেশী দিন ভোগ করিতে পারিলেন না, চারি বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া ১৫৩০—৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। বাবরের মৃত্যুর পর তৎপুত্র হুমায়ুন দিল্লীসিংহাসন অধিকার করেন। হুমায়ুনের সময়েই সের খাঁ বঙ্গদেশ স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়া, পরিশেষে দিল্লী-সিংহাসন পর্য্যন্ত অধিকার করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন। সের শাহ যখন দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্যোগ করেন, সে সময়ে খিজির খাঁ নামক এক ব্যক্তিকে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া যান। খিজির খাঁ বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইবার পর বঙ্গের শেষ স্বাধীন নরপতি মামুদ শাহের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহ-সূত্রে খিজির খাঁ পূর্ব্ব রাজবংশের অনুগৃহীত বহু আফগানকে স্বীয় দলভুক্ত করতঃ স্পর্দ্ধিত হইয়া সের খাঁর অধীনতা অস্বীকার করিয়া রাজদ্রোহিতার ভাব প্রকাশ করিলে, সের খাঁ পুনরায় বঙ্গদেশে আসিয়া খিজির খাঁকে দমন করেন এবং তিনি বঙ্গদেশকে কয়েক খণ্ডে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক প্রদেশে এক এক জন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। ইহার শাসন সময়ে বাঙ্গলার ভূমির বন্দোবস্ত হয়। ইনি উৎপন্নের এক চতুর্থাংশ রাজকর ধার্য্য করিয়া বাংলার ভূমির বন্দোবস্ত করেন। সের শাহ সুবর্ণ গ্রাম হইতে সিন্ধু নদের তীর পর্য্যন্ত একটী সুবৃহৎ বর্ত্ম প্রস্তুত করাইয়া তাহার উভয় পার্শ্বে বৃক্ষ রোপণ ও প্রয়োজনানুরূপ পান্থনিবাস বা সরাই নির্ম্মাণ ও কূপ ইত্যাদি খনন করিয়া জনসাধারণের বিশেষ মঙ্গল সাধন করেন। ইহার শাসন সময়ে দেশে দস্যুভয় ছিল না, পথিক ও বণিকগণ নির্ভয়ে পথিমধ্যে দ্রব্যাদি নিক্ষেপ করিয়া নিদ্রা যাইত। ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথমে ইহার দ্বারাই ঘোড়ার ডাকের প্রচলন হয়। ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সের শাহ কাল-কবলে পতিত হন।

সের শাহের মৃত্যুর পরে তৎপুত্র সেলিম দিল্লী-সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তাহার নিকট-আত্মীয় মহম্মদ খাঁ শূরকে বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। সেলিম মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার তনয়কে নিহত করিয়া ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তদীয় শ্যালক মহম্মদ আদিল শাহ দিল্লী-সিংহাসন অধিকার করেন। এই সুযোগ মহম্মদ খাঁ শূর স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া জৌনপুরের কতকাংশ স্বীয় অধিকার ভুক্ত করেন ও স্বীয় নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলন করেন। আদিল শাহ মহম্মদের এইরূপ অবৈধাচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় হিন্দুসেনাপতি হিমুকে বাংলায় প্রেরণ করেন, হিমু কুল্পীর নিকটস্থ ছাপরঘাটার যুদ্ধে বঙ্গেশ্বরকে পরাজিত ও নিহত

করেন (১৫৫৫)। মহম্মদ খাঁর মৃত্যুর পরে তৎপুত্র খিজির খাঁ বাহাদুর শাহ নাম ও বাংলার মনসদ গ্রহণ করিয়া গৌড়ের স্বাধীন নরপতিরূপে সম্রাট আদিলের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া মুঙ্গেরের যুদ্ধে ৯৬৩ হিজিরায় (১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে) তাঁহাকে নিহত করিয়া পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আদিল নিহত হইলে হুমায়ুন পুনরায় দিল্লী অধিকার করেন ও অল্প কয়েক দিন পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। হুমায়ুনের মৃত্যুর পরে মোগল-কুল-রত্ন আকবর শাহ দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিকে স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। বাহাদুর শাহের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা জালালউদ্দীন বঙ্গ-সিংহাসন অধিকার করেন, তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার যুবকপুত্র সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, কিন্তু ইনি গিয়াসউদ্দীন নামক এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিহত হন। অতঃপর কেওরাণী বংশীয় সলেমান ও তাঁহার ভ্রাতা তাজখান্ আসিয়া বাংলা অধিকার করেন। ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তাজখাঁর মৃত্যু হইলে সলেমান গৌড় হইতে উহার অপর তীরবর্ত্তী তাঁড়া নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। এবং সেখান হইতে সম্রাটের নিকট উপঢৌকন প্রেরণ করিয়া তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধন করেন। ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে সলেমানের মৃত্যুর পর তৎপুত্র বয়াজিদ রাজা হন, কিন্তু ইহার আচরণে উত্যক্ত হইয়া আফগান সর্দ্দারগণ তাঁহাকে বিনষ্ট করিয়া তাঁহার ভ্রাতা দাউদকে সিংহাসন প্রদান করেন। দাউদ সিংহাসনারোহণ করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার ১৪০০০০ পদাতিক, ৪০০০০ অশ্বারোহী, ৩০০০০ কামান ও অন্যান্য অস্ত্র ও ৩৬০০ হস্তী ও বহু শত যুদ্ধ নৌকা ইত্যাদি প্রস্তুত আছে; ইহাতে তাঁহার মনে রাজ্য-বিস্তার-লালসা বৃদ্ধি পাইল এবং আপনাকে স্বাধীন নরপতি জ্ঞানে বাংলা ও বিহার সর্ব্বত্র স্বীয় নামে খুতবা পড়িবার হুকুম দিলেন। দাউদ গাজিপুরের সন্নিহিত জমানিয়া নামক একটা মোগল দুর্গ বলপূর্ব্বক অধিকার করায় আকবর দাউদের বিরুদ্ধে সেনাপতি মনিয়াম খাঁকে ও রাজা টোডর মল্লকে পাঠাইয়া দেন। মেদিনীপুরের ও বালেশ্বরের মধ্যবর্ত্তী মোগলমারি নামক স্থানে ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মোগল পাঠানের ভীষণ যুদ্ধ হয়, সে যুদ্ধে প্রথমতঃ পাঠানদিগের জয়ের সম্ভাবনা হইয়া উঠে, কিন্তু অবশেষে মোগলদিগেরই জয় হয়। দাউদ যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন, কিন্তু পরিশেষে সম্রাটের কৃপায় উড়িষ্যার শাসনভার লাভ করেন। এবং মনিয়াম খাঁ বাংলার শাসন কর্ত্তা

আকবর শাহ।

বঙ্গে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা।

নিযুক্ত হন। মনিয়াম তাঁড়া হইতে পুনরায় গৌড়ে রাজধানী পরিবর্ত্তন করেন এবং অল্পকাল পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। মনিয়ামের মৃত্যুর পরে দাউদ পুনরায় বাংলা আক্রমণ করেন কিন্তু নব নিযুক্ত শাসনকর্ত্তা খান্ জহান্ ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার ছিন্নশির দূতহস্তে আগ্রায় আকবর বাদশাহের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। দাউদের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার পাঠান-রবি অস্তমিত হইয়া বাংলার পাঠান রাজ্য লোপ পাইল।

মোগল সুবেদার।

এইরূপে বাংলাদেশ মোগলসাম্রাজ্য ভুক্ত হইলে তথায় এক এক জন অধীন শাসনকর্ত্তা বা সুবেদার নিযুক্ত হইয়া শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন। খান্ জহানের পরে মুজঃফর খাঁ,—এবং মুজঃফর খাঁয়ের পরে ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা টোডর মল্ল বাংলার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। কিন্তু তাঁহার সহিত মুসলমান সেনাপতিদিগের মনের মিলন না হওয়ায় সম্রাট আকবর তাঁহার হস্ত হইতে শাসনভার গ্রহণ করিয়া খাঁ আজিনের প্রতি অর্পণ করেন। রাজা টোডর মল্লের প্রতি রাজস্ব বন্দোবস্তের ভার অর্পণ করেন। রাজা টোডর মল্ল সমগ্র বাংলাদেশকে ১৯ সরকারে ও ৬৮২ পরগণায় বিভক্ত করেন। বৃহত্তর

ওয়াসিল-তুমার-জমা ও সরকার বাজুয়া

বিভাগগুলি সরকার ও ক্ষুদ্রতর বিভাগগুলি পরগণা বা মহাল নামে অভিহিত হইয়াছিল। কতকগুলি মৌজা বা গ্রাম লইয়া পরগণার সৃষ্টি, আর কতকগুলি পরগণা লইয়া সরকার গঠিত হয়। এইরূপে সমগ্র বঙ্গরাজ্য টোডর মল্ল ১৯ সরকার ও ৬৮২ পরগণায় বিভক্ত করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের ভূমি তৎকালে খালসা ও জায়গীর নামে অভিহিত হইত, যে জমীর জমা বা আয় রাজকোষে আসিত তাহাকে খালসা ও যাহার আয় কর্ম্মচারীদের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে ব্যয়িত হইত তাহার নাম জায়গীর ছিল। টোডর মল্ল খালসা ভূমির ৬৩,৪৪,২৬০ টাকা ও জায়গীর ভূমির ৪৩,৪৮,৮৯২ টাকা মোট ১,০৬,৯৩, ২৬০ টাকা সমগ্র বঙ্গরাজ্যের জমা নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার এই জমা বন্দোবস্তের যে কাগজ প্রস্তুত হইয়াছিল তাহাই ওয়াশীল-তুমার-জমা নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। বিক্রমপুর সরকার সোণার গাঁয়ের অন্তর্গত একটী মহাল বা পরগণা ছিল। সোণার গাঁ ৫২ পরগণায় বিভক্ত ছিল, এই বায়ান্ন মহালের রাজস্ব ১০,৩৩,১৩,৩৩৩ দাম বা ২,৫৮,২৮৩ টাকা ছিল, তন্মধ্যে বিক্রমপুরের রাজস্বই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। "মেঘনা নদের পূর্ব্বতীর ব্যাপিয়া শীলহাটের

দক্ষিণ ও ত্রিপুরার পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত সরকার সোণার গাঁ বিস্তৃত ছিল। ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজা মানসিংহ বঙ্গের ষষ্ঠ সুবেদাররূপে আগমন

বারভুঁইয়া।

করেন। ইহার সময়ে রাজমহলে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজধানী স্থাপিত হয় এবং ঢাকা বাদসাহের নামানুসারে জাহাঙ্গীরনগর নামে প্রসিদ্ধ লাভ করে। মানসিংহের বাংলাদেশের শাসনভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্ব হইতে যখন বিহার ও উড়িষ্যায় আফগান বিদ্রোহী হইয়া নানারূপ উৎপাত করিতে আরম্ভ করে, সে সময়ে ধীরে ধীরে বাংলাদেশের বিভিন্নাংশে অল্পে অল্পে ভৌমিক বা ভূঁইয়াগণ স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রয়াস পান। ভৌমিক বা জমিদার একই কথা। ষোড়শ শতাব্দীব মধ্যভাগে এ সমুদয় ভৌমিকগণের অভ্যুদয় হয়। সম্রাট আকবর শাহের রাজত্বকালেই ইহাদের অভ্যুদয় হয় এবং পরিশেষে সেলিম বা জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্ব সময়ে ইহরা পরাজিত হন। এই সময়ে ভৌমিকগণ প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার অত্যাচার উৎপীড়নে ব্যথিত হইয়া আপনাদের সম্পত্তি ও সম্মান রক্ষার জন্য দলবদ্ধ হইয়া নিয়মিত রাজস্ব প্রদানে বিরত হন, এবং আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। বারভূঁইয়ার ইতিহাস বঙ্গের গৌরব। ইহারা এক সময়ে যেরূপ বীর্য্যবত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা আজিও বঙ্গের কুটীরে কুটীরে পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। ইহাদের মধ্যে আবার বিক্রমপুরের কেদার রায় ও যশোহরের প্রতাপাদিত্য যে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা বাঙ্গালীজাতির নিকট চির গৌরবময় পুণ্য ইতিহাস।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

পৌরাণিক সময় নিরূপণে জ্যোতিষ।

পূজ্যপাদ স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় তাঁহার "বেদপ্রবেশিকা" নামক পুস্তকে "মধুচ্ছন্দার আবির্ভাব কাল" শীর্ষক প্রবন্ধে কয়েকটা জ্যোতিষ বিষয়ক প্রমাণের অবতারণা করিয়াছেন। নিম্নে সেই অংশ উদ্ধৃত করা গেল।

"এই ধ্রুব তারার নিম্নে ও গ্রহ সমূহের উর্দ্ধে, সপ্তর্ষিমণ্ডল নামক সাতটী উজ্জ্বল তারকা দৃষ্টিগোচর হয়। * * * জানা যায় যে তাঁহারা (প্রাচীনেরা) ভাবিতেন যে, নক্ষত্র চক্রে এই সপ্তর্ষিমণ্ডলের এক প্রকার অদ্ভুত গতি আছে।

তাঁহারা অনুমান করিয়া ছিলেন যে, সপ্তর্ষিমণ্ডল (নক্ষত্র চক্রের) এক এক নক্ষত্রে মনুষ্য পরিমাণের এক এক শত বৎসর কাল অবস্থান করেন।

কৃতবিদ্য পাঠকগণকে বলা বাহুল্য যে, এইরূপ সংস্কার ভ্রমাত্মক। আমরা এক্ষণে বিলক্ষণ জানি যে, অন্যান্য তারকার ন্যায় সপ্তর্ষিমণ্ডলও নিশ্চল। বাস্তবিক নক্ষত্র চক্রে ইহাদের গতি কিছুমাত্র নাই।" (১৬৪ পৃঃ)

উপরোক্ত বিষয়ে বটব্যাল মহাশয়ের সহিত আমার মতভেদ আছে। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে বোধ হয় যে প্রাচীন দিগের মতই ঠিক। তবে বটব্যাল মহাশয়ের ন্যায় বিদ্বান লোকের মত ভুল বলিতে আমার সাহস হয় না, কারণ আমার জ্যোতিষের জ্ঞান সামান্য এবং সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান নাই বলিলেও হয়। এইজন্য ভয়ে ভয়ে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি লিপিবদ্ধ করিলাম, আশা করি আম আপেক্ষা কোন বিজ্ঞ জ্যোতিষী আমার ভ্রম হইয়া থাকিলে সংশোধন করিয়া বাধিত করিবেন।

এই বিষয়ের মীমাংসার পূর্ব্বে জ্যোতিষ শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ পাঠকদিগের জন্য প্রথমে কয়েকটী জ্ঞাত তথ্যের বিষয় লিখিত হইতেছে।

সূর্য্য আকাশের নক্ষত্রদিগের মধ্যে সম্বৎসরে যে পথে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে (সকলেই জানেন সূর্য্যের ঐ গতি বাস্তবিক পৃথিবীর সূর্য্য প্রদক্ষিণের গতির জন্যই বোধ হয়) তাহা বৃত্তাকার ও তাহাকে নক্ষত্র চক্র, ভচক্র ও অয়ন (Ecliptic) ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। পৃথিবীর বিষুব রেখাকে পরিবর্দ্ধিত করিলে আকাশে যে বৃত্ত অঙ্কিত করে তাহাকে বিষুব বৃত্ত (Equator) বলে। অয়ন-মণ্ডল ও বিষুব-বৃত্ত ইহারা উভয়ে আকাশের বিভিন্ন স্থান অধিকার করিয়া থাকে, এবং ইহাও দেখা যায় যে ঐ দুইবৃত্ত দুইটী বিন্দুতে পরস্পরকে কর্ত্তন করে। ঐ দুই বিন্দু ঐ উভয় বৃত্তেরই ব্যাসের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত এবং উহাদিগকে বিষ্ণুপদ ও হরিপদ (Equinoctial points) বলে। কাজে কাজেই বিষুব বৃত্তের যে স্থলে বিষ্ণুপদ ও হরিপদ আছে অয়ন-মণ্ডলের অর্দ্ধাংশ তাহার উত্তরে ও অপর অর্দ্ধাংশ তাহার দক্ষিণে অবস্থিত।

বিষুব বৃত্তের কেন্দ্র হইতে ঐ বৃত্ত সমতলের (Plane of the equater) সহিত যে লম্ব রেখা (Perpendicular) অঙ্কিত করা যায় তাহা পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু ভেদ করিয়া যায় ও ঐ রেখাকে পৃথিবীর মেরুদণ্ড (Axis) বলা হয়। ঐ মেরুদণ্ড পরিবর্দ্ধিত করিলে আকাশের যে দুই স্থলে মিলিত হয় তাহাদিগকে বিষুব রেখার মেরু বলা যাইতে পারে। উত্তর দিগের মেরুকে

উত্তরমেরু বলা হয় ও উহার নিকট যে নক্ষত্র আছে তাহাকে ধ্রুব নক্ষত্র (Pole star) বলে। ফলতঃ যদি কোন নক্ষত্র ঠিক ঐ মেরুর উপর থাকে তাহা হইলে সেই নক্ষত্রের কোনই গতি লক্ষিত হইবে না, উহা স্থির দেখাইবে। যাহাকে ধ্রুব নক্ষত্র বলা যায় তাহা যদি ঠিক মেরুর উপর না থাকে তাহা হইলে ঐ ধ্রুব নক্ষত্র মেরুর চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে থাকিবে—স্থির থাকিবে না। উহার গতির পরিমাণ মেরু হইতে উহার দূরত্বের উপর নির্ভর করিবে। বাস্তবিক যে নক্ষত্রকে আমরা ধ্রুব নক্ষত্র বলিয়া থাকি তাহা ঠিক মেরুর উপরে নাই, এ জন্য উহা ঐরূপ গতি বিশিষ্ট (ঐ গতি বিনা যন্ত্রে কেবল চক্ষে পরিলক্ষিত হয় না)।

অপর পক্ষে যদি কোনও কারণে পৃথিবীর মেরুদণ্ডের অবস্থিতি পরিবর্ত্তিত হয় তাহা হইলে ধ্রুব নক্ষত্রেরও পরিবর্ত্তন হইবেক। বাস্তবিক মেরুদণ্ডের ঐরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, ইহা যেরূপ পূরাকালের হিন্দু জ্যোতিষীরা জানিতেন তাহা আধুনিক ইউরোপীয় জ্যোতিষীরাও জানেন। এ কথা জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞ পাঠক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। যাঁহারা তাহা জানেন না তাঁহাদের অবগতির জন্য নিম্নে ঐ বিষয় লিখিত হইল।

বিষুব চক্রের মেরু যেরূপে নিরূপিত হইল সেইরূপে অয়ন-মণ্ডলের কেন্দ্র হইতে অয়ন তলের (Plane of the Ecliptic) উপর লম্ব উত্তোলন করিলে অয়ন-মণ্ডলের মেরু নিরূপিত হয়। এই দুই প্রকারের মেরুকে যথাক্রমে বিষুব-মেরু (Poles of the Equater) ও অয়ন-মেরু (Poles of the Ecliptic) বলা যাইবে।

উত্তর বিষুব মেরু ও উত্তর অয়ন মেরুর মধ্যে প্রায় ২৩ অংশ (23 degrees) স্থান ব্যবধান আছে।

অয়ন-মণ্ডলকে সমান ২৭ ভাগে বিভাগ করিয়া হিন্দু জ্যোতিষীরা প্রত্যেক ভাগকে অশ্বিনী আদি নক্ষত্র সংজ্ঞা দিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যাইবে প্রত্যেক নক্ষত্রের পরিমাণ সমগ্র অয়ন-মণ্ডলের $\frac{৩৬০}{২৭}$ = ১৩⅓ অংশ বিষ্ণুপদই (Vernal Equinox) মেষরাশির অন্তর্গত অশ্বিনী নক্ষত্র নামে অভিহিত হয়।

পূরাকালের হিন্দু জ্যোতিষীরা জানিতেন যে ঐ বিষ্ণুপদ অয়ন-মণ্ডলের এক স্থানে স্থির থাকে না—উহার গতি আছে। ঐ জন্য তাঁহারা গণনার সময় অয়নাংশ শোধন করিয়া লইতেন—এ কথা, যে কোন বঙ্গীয় পঞ্জিকাকার অবগত আছেন। আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাও ইহা জানেন। ঐ বিষ্ণুপদের গতিকে ইংরাজীতে Precession of the Equinoxes বলে। ঐ গতির

পরিমাণ বৎসরে প্রায় ৫০ বিকলা (Seconds)। এই হিসাবে বিষুপদ প্রায় ২৫০০০ বৎসরে অয়ন-মণ্ডল একবার সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ করিয়া আইসে।

এখন বুঝা যাইতেছে যে যখন অয়ন-মণ্ডল ও বিষুব বৃত্ত যে বিন্দুদ্বয়ে পরস্পরকে ছেদন করে ঐ বিন্দুদ্বয় স্থির নহে। এই কারণে অয়ন-মেরু ও বিষুব-মেরুর পরস্পর আপেক্ষিক অবস্থান (Relativo positions)ও স্থির নহে বাস্তবিক অয়ন-মেরু স্থির আছে ও উহার চতুর্দ্দিকে বিষুব-মেরু ২৫০০০ বৎসরে প্রায় ২৩ অংশ দূরে একটী বৃত্ত অঙ্কিত করে, অর্থাৎ আমরা যাহাকে ধ্রুব নক্ষত্র বলি তাহা সকল সময়ে একই নক্ষত্র হইতে পারে না। আজি যাহাকে ধ্রুব নক্ষত্র বলা যায় কাল তাহাকে আর ধ্রুব নক্ষত্র বলা যাইবে না।

যদি বিষুপদ হইতেই অশ্বিনী আদি নক্ষত্র গণনা আরম্ভ করা যায় তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে যখন ঐ বিষুপদ স্থির নহে তখন অশ্বিনী আদি নক্ষত্র বলিয়া আকাশের যে স্থান আমরা নির্দ্দেশ করি তাহাও বাস্তবিক স্থির নহে। কাজে কাজেই অধুনা যে স্থির জ্যোতিষ্ক মণ্ডল অশ্বিনী নক্ষত্রে আছে দেখা যায় তাহা অতীতকালে যে অন্য নক্ষত্রে ছিল ও ভবিষ্যতকালে যে অন্য নক্ষত্রে থাকিবে তাহার সন্দেহ নাই। এ কথা অন্যরূপেও বলা যায় যথা :— কোন এক বিশেষ স্থির জ্যোতিষ্ক মণ্ডল অয়ন মণ্ডলের রাশি চক্রে পরিভ্রমণ করে (Apparent motion due to the precession of the Epuinoxes) এবং নিরূপিত সময়ে এক নক্ষত্র ভোগ করে। বটব্যাল মহাশয়ের পুস্তক হইতে উদ্ধৃত অংশ হইতে প্রমাণ হইবে যে সপ্তর্ষি মণ্ডলের নক্ষত্রচক্রে এইরূপ গতি প্রাচীন হিন্দু ঋষিরা জ্ঞাত ছিলেন। প্রাচীন ঋষিদিগের ঐরূপ জ্ঞান ভ্রমাত্মক নহে।

প্রাচীন ঋষিদিগের সপ্তর্ষি মণ্ডলের উক্ত গতির জ্ঞান যে কেবল কল্পনা বা অনুমানের উপর নির্ভর করে না তাহা উপরোক্ত যুক্তি হইতেই প্রমাণ হইবে। এ সম্বন্ধে নিম্নে আরও কিছু যুক্তি দেওয়া যাইতেছে।

বটব্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন (১৬৫ পৃঃ)—"সপ্তর্ষিমণ্ডলের যে দুই তারাকে ইংরাজীতে (Pointer) বলে অর্থাৎ ধ্রুবের সহিত যাহা সমসূত্রপাতে অবস্থিত ইহারা যে নক্ষত্রে অবস্থান করে, সপ্তর্ষি মণ্ডল সেই নক্ষত্রেই আছেন ধরা যায়।"

বটব্যাল মহাশয় কেবল Pointers দুইটীকেই সপ্তর্ষি মণ্ডলের (Great Bear) অবস্থিতি নিরূপণের জন্য স্থির করিলেন কেন তাহা ঠিক বুঝা যায় না। Great Bear এর লেজের শেষভাগে যে তারা আছে তাহা ধরিলে সপ্তর্ষি মণ্ডলের অবস্থিতির অনেক ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হইবে। যাহা হউক যদি Pointers

দুইটীই অবস্থান নির্দ্দেশের জন্য গ্রহণ করা যায় তাহা হইলেও আমাদের মূল বিষয়ের বিশেষ কোন বৈলক্ষণ্য হইবে না এ জন্য আমরাও ঐ দুইটী তারকাকেই সপ্তর্ষি মণ্ডলের অবস্থান নিরূপণের জন্য গ্রহণ করিব।

পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে যাহাকে ধ্রুব নক্ষত্র বলা যায় তাহা বাস্তবিক চিরকাল এক স্থানে স্থির ভাবে থাকে না। এখন এই ধ্রুব নক্ষত্রের ও Pointers নক্ষত্রের সহিত সমসূত্রপাতে রেখা অঙ্কিত করিলে অয়ন-মণ্ডলের যে নক্ষত্রে ঐ রেখা মিশিবে সেই নক্ষত্রেই সপ্তর্ষি মণ্ডল আছে জানিতে হইবে। ধ্রুব নক্ষত্র যখন সর্ব্বদা এক স্থানে থাকে না তখন ঐ রেখাও সকল সময়ে অয়ন মণ্ডলের একই স্থানে মিশিবে না। এই জন্যও বোধ হইবে যে সপ্তর্ষি মণ্ডল নক্ষত্র হইতে নক্ষত্রান্তরে ভ্রমণ করে। (Apparent motion due to the shifting of the pole)।

এই উভয় যুক্তি হইতে বুঝা যাইবে প্রাচীন হিন্দুদিগের মতই সত্য—কল্পনা নহে—এবং বটব্যাল মহাশয়ের বিবেচনাই ভ্রমাত্মক। আমি পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি যে যদি আমার এই মত ভ্রমাত্মক প্রমাণিত হয় তবে তাহা কোন বিজ্ঞ জ্যোতিষী সংশোধন করিয়া দিলে বাধিত হইব।

এ স্থলে বটব্যাল মহাশয়ের আরও কয়েকটী কথা উল্লেখ না করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিতে পারিলাম না। বটব্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন (১৬৫ পৃঃ)

"প্রাচীনেরা সপ্তর্ষি মণ্ডলের উপরি বর্ণিত গতির অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া তদ্দ্বারা সময় নিরূপণের একটা উপায় উদ্ভাবন করিয়া ছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় তাঁহারা দেখিয়া রাখেন যে সপ্তর্ষি মণ্ডল মঘা নক্ষত্রে। এবং তাহার পর এক এক নক্ষত্রে এক এক শতাব্দ গণনা করিয়া গিয়াছেন, অবশেষে যে সময়ে নন্দ মগধরাজ্যে অভিষিক্ত হয়েন, সেই সময়ে তৎকালের পঞ্জিকাকারেরা এইরূপ লিখিয়াছেন যে, তখন সপ্তর্ষি মণ্ডল পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে। * * * * বাস্তবিক পাঠকবৃন্দ যদি এক্ষণেও নভোমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করেন, দেখিতে পাইবেন যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালেও সপ্তর্ষি মণ্ডল উপরি বর্ণিত নিয়মে যেমন মঘা নক্ষত্রে ছিল, আজিও তেমনি আছে এবং অবশ্যই নন্দাভিষেকের সময়েও অবিকল তাই ছিল। ইহাতে প্রণিধানের যোগ্য কথা এই ;—(১) গণনার প্রারম্ভে বাস্তবিক সপ্তর্ষি মণ্ডল মঘাতে আছে ইহা দেখিয়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও কলিকালের প্রারম্ভ নির্ণীত হইয়া ছিল। এই সময়ে দৃক্‌গণিতৈক্য (দর্শন ও গণনে ঐক্য) ছিল। (২) তাহার পর একটা বাধা নিয়মে ক্রমশঃ গণনা হইতে থাকে। বহুকাল

এইরূপ নিয়মে গণনা হইতে হইতে, নন্দের সময় কেবল গণিতের দ্বারা সপ্তর্ষি মণ্ডল পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে আসিয়াছে বলিয়া পরিকল্পিত হয়। এই সময় ঘোর কলিকাল। নানা কারণে এই সময়ে বিদ্যার অবনতি ঘটিয়াছিল। এই সময়ে কেহ আর দৃক্‌গণিতৈক্য করিয়া দেখেন নাই যে বাস্তবিক সপ্তর্ষি মণ্ডল কোথায়। এমন কি, ঐরূপ ঐক্য করিয়া দেখিতে যতটুক বিদ্যার প্রয়োজন, বোধ হয়, সে বিদ্যাই কাহারও ছিল না।"

বড়ই দুঃখের বিষয় যে বটব্যাল মহাশয়ের ন্যায় পণ্ডিত ও বিজ্ঞ ব্যক্তি উপরোক্ত কথাগুলি লিখিয়া গিয়াছেন। যে সকল পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণ আমাদিগের দেশের পুরাতন গৌরবে বিশ্বাস করেন না ও সর্ব্ব বিষয়েই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতাকে দেশীয় অতীত শিক্ষা ও সভ্যতা অপেক্ষা উন্নত বলিয়া মনে করেন, সেরূপ লোকের লেখনী হইতে এই সকল কথা নিঃসৃত হইলে কিছুই বলিবার ছিল না। কিন্তু বটব্যাল মহাশয়ের বেদপ্রবেশিকা দেখিয়া তাঁহাকে সে শ্রেণীর লোক বলিয়া মনে হয় না এইজন্য এই সকল কথা বলিতে হইতেছে। নিম্নে আমার যুক্তি প্রদর্শিত হইল।

বটব্যাল মহাশয় প্রথম হইতেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে প্রাচীন হিন্দুদিগের সপ্তর্ষি মণ্ডলের গতি বিষয়ে যে জ্ঞান ছিল তাহা কল্পনা মাত্র—তাহারত কোনই সত্যতা নাই, তবে আবার কিরূপে সেই সত্যেরই উপর নির্ভর করিয়া পরবর্ত্তী প্রাচীনেরা নন্দের রাজত্বকালের যে গণনা করিয়াছেন তাহা তিনি প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন? যে সময়ে প্রাচীনেরা সপ্তর্ষি মণ্ডলের গতি আছে কল্পনা করেন বটব্যাল মহাশয়ের মতে সে সময়ে বিদ্যার অবনতি ছিল না। তখন দৃক্‌গণিতৈক্য ছিল। যদি ইহা সত্য হয় তবে সেই প্রাচীনেরাই ঐরূপ মিথ্যা গণনার নিয়ম করিবেন কেন? যখন বিদ্যার অবনতি ঘটে সেই সময়েই গণনার নিয়ম হইয়াছিল ইহাও যুক্তিসিদ্ধ নহে। কারণ যাহারা কিছুই জানে না তাহারা কিরূপে নিয়ম স্থির করিতে পারে? যে সময়ে জ্ঞানের উন্নতির অবস্থা সেই সময়েই প্রাকৃতিক নিয়ম সকল স্থিরীকৃত হয়। এ কথাও বলা যায় না যে ঐতিহাসিক সময় নিরূপণের (Chronology) হিসাবে নন্দের রাজত্বের সময় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কত পরে হইয়াছিল তাহা তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন, পরে হিসাব করিয়া সপ্তর্ষি মণ্ডলের অবস্থিতি সেই অনুসারে স্থির করেন—কারণ সময় নিরূপণই যখন উদ্দেশ্য তখন সহজজ্ঞানে বৎসর জানা থাকিলে আর কে নক্ষত্র মণ্ডলের অবস্থিতি দ্বারা উহার নির্দ্দেশ করে?

পরে এ কথাও বলা যাইতে পারে যে সপ্তর্ষি মণ্ডল কোন্ নক্ষত্রে আছে ইহা স্থির করিতে বিশেষ গভীর জ্যোতিষের জ্ঞান প্রয়োজন হয় না। মুসলমানদিগের অধিকার সময়েই আমাদিগের দেশের জাতীয় অবনতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল বলিতে হইবে। নন্দের রাজ্যাভিষেকের সময় নিশ্চয়ই ইহা অপেক্ষা অনেক উন্নত অবস্থা ছিল বলিতে হইবে। কিন্তু সেই মুসলমানদিগের সময়ও ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের অনেক অনেক বিখ্যাত মান মন্দির ছিল। জ্যোতিষচর্চ্চাও যে অল্প ছিল এ কথাত বলা যায় না।

শ্রীসর্ব্বরঞ্জন লাহিড়ী।

মনোরথ।

(১)

স্বদেশী অন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। মনোরথ স্বদেশীভাবে গ্রাম মাতাইয়া তুলিয়াছে। মাথায় পাগড়ী, হাতে নিশান বা লাঠি লইয়া মনোরথের "ভলান্টিয়ারের" দল পাড়ায় পাড়ায় বাড়ী বাড়ী গান করিয়া ভিক্ষা করে, বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ সকলকে মায়ের দিব্য দিয়া বিলাতী জিনিস ব্যবহার না করিতে মিনতি করে। আজ সভা করিতে হইবে, মনোরথ সকলের আগে, কোন নিকটবর্ত্তী গ্রামে স্বদেশী প্রচারের প্রয়োজন, অমনি মনোরথ দলবল সহ চলিল। ঘাটে বা ষ্টেশনে কোন স্বদেশী নেতার অভ্যর্থনা করিতে হইবে, সকলের আগে মনোরথের দল, দলের আগে মনোরথ 'বন্দে' বলিয়া নেতার সম্মুখে দণ্ডায়মান। নেতা গাড়ীতে চড়িবেন মনোরথ সকলের আগে দু'হাতে ভিড় ঠেলিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া দেয়। নেতা নৌকায় চড়িবেন, মনোরথ আগে জলে নামিয়া নৌকা টানিয়া তীরের কাছে আনে। সভায় নেতার দেহ রক্ষকস্বরূপ মনোরথ ছায়ার ন্যায় বিরাজমান। মনোরথের বিশ্রামের অবসর নাই, আহারের সময় নাই, আত্মসুখে তৃপ্তি নাই। এরূপ স্বদেশপ্রেমের সহিত অসীম কার্য্যপ্রিয়তার সম্মিলন অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

গ্রামের ছেলে বুড়ো, মেয়ে পুরুষ সকলের মুখেই মনোরথের সুখ্যাতি। মনোরথই গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করিল, মনোরথ আছে, তাই গ্রামে স্বদেশী আছে। স্বদেশী-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মনোরথের বাগ্মীতার অসামান্য বিকাশ হইয়াছে। তাহার বক্তৃতা শুনিয়া গ্রামবাসিগণ মুগ্ধ হইল। সকলই একাবক্যে বলিতে

লাগিল 'একদিন মনোরথ সুরেন্দ্র বাড়ুজ্যে কি বিপিন পালের স্থান অধিকার করিবে। তাহার জ্বালাময়ী বক্তৃতায় কংগ্রেস-মণ্ডলে তড়িত-প্রবাহ ছুটিবে।'

ছয় মাসের মধ্যেই উৎসাহী বক্তা ও অক্লান্তকর্ম্মী যুবক মনোরথের নাম জেলাময় বিস্তৃত হইল। মনোরথ পড়াশুনায় মন্দ ছিল না। এল্ এ পাশ করিয়া ঢাকায় বি-এ পড়িতেছে। মনোরথের পিতা হরিহর ভট্টাচার্য্য গ্রাম্য ব্রাহ্মণ গৃহস্থ। কিছু জমাজমি ও নগদ টাকা ছিল, তাহাতে মোটা ভাত কাপড় চলিয়া কিছু টাকা বাঁচিত। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের তাহাদ্বারা মনোরথের কলেজের পড়ার খরচ চালাইতেন। ঢাকায় তাহার মাতুলের বাসায় থাকিয়া সে পড়িত সুতরাং কলেজের বেতন, পুস্তকের দাম ও অন্যান্য খুচরা খরচপত্র বাবদ মাসে ১০।১২ টাকা চালাইতে তার পিতার বিশেষ কোন কষ্ট হইত না। কিন্তু ঢাকায় থাকা তাহার ভাল লাগিল না। সে মনে করিত তাহার শক্তি বিকাশের পক্ষে ঢাকা নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্র। কলিকাতার বিস্তৃত ক্ষেত্রে স্বীয় প্রতিভা দেখাইবার অবকাশ পাইলে এতদিন তাহার যশঃ দেশময় ছড়াইয়া পড়িত। কিন্তু পিতার সঙ্কীর্ণতা ও কার্পণ্যই তাহার জীবনের ভবিষ্যৎ উন্নতি-পথ এখন রুদ্ধ করিয়া রাখিতেছে; যদি সে এ বাধা ভাঙ্গিয়া না বাহির হইতে না পারে তবে এই স্বদেশ প্রেমের প্রবল স্রোত ক্রমে ক্ষীণ ও শুষ্ক হইয়া যাইবে।

এমন গুরুতর সমস্যায় মনোরথ যখন কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া ভবিষ্যৎ চিন্তায় ম্রিয়মান তখন তাহার জীবনক্ষেত্র বিস্তারের বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইল। রমানাথ চৌধুরী নামক একজন খ্যাতনামা ডেপুটী-কন্যার সহিত মনোরথের বিবাহ-প্রস্তাব হইল। মনোরথের ন্যায় খাটি স্বদেশী ও বয়কটওয়ালার নিকট এ প্রস্তাব করিতে কেহ সাহস করিল না। অবশেষে উভয় পক্ষের আত্মীয় ও মনোরথের বন্ধু সতীশ দুঃসাহস করিয়া অসম্ভব কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিল। সতীশ মনোরথের উচ্চ আকাঙ্ক্ষার কথা জানিত; আরও জানিত দারিদ্র্যই তাহার উন্নতির গুরুতর বিঘ্ন। যদিও ডিপুটী-কন্যার সহিত বিবাহ-প্রস্তাবের কথা শুনিয়া মনোরথ সতীশের উপর অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিল, এমন কি চির-বিচ্ছেদেরও ভয় দেখাইয়াছিল, তথাপি সতীশ নিরাশ হইল না। সুচতুর সতীশ কৌশলে বাক্‌জাল বিস্তার করিয়া মনোরথকে বুঝাইয়া দিল স্বয়ং ভগবানই তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ দেখাইয়া দিতেছেন। এ সুবর্ণ সুযোগ পরিত্যাগ করা তাহার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। মনোরথ একদিন সতৃষ্ণ নয়নে কলিকাতার বিরাট কর্ম্মক্ষেত্রের দিকে চাহিয়াছিল এবং কল্পনার সাহায্যে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের

গৌরবময়ী চিত্র অঙ্কিত করিতেছিল আর স্বীয় দারিদ্র্যের কথা ভাবিয়া অদৃষ্টকে দোষ দিতেছিল। সুতরাং সতীশের যুক্তিপূর্ণ উপদেশ অতি সহজেই তাহার মর্ম্ম স্পর্শ করিল। তখন মনোরথের হৃদয়ে বিবাহের পক্ষে স্বতঃই বহুবিধ সঙ্গত যুক্তি জাগিয়া উঠিতে লাগিল। রমানাথ বাবু না হয় স্বদেশীর বিরোধীই হইলেন কিন্তু তাঁহার কন্যা যখন মনোরথের ন্যায় স্বদেশী নেতার সঙ্গিনী হইবেন তখন তিনি তাহার মতানুবর্ত্তিনী হইবেনই।

তারপর জীবনের উন্নতির জন্য, দেশের কাজের জন্য ভগবান তাহাকে যে সব শক্তি দিয়াছেন, সেই সব শক্তি বিকাশদ্বারা ভগবানের ইচ্ছা পূরণ করিবার জন্য তা'র কলিকাতায় যাওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। পিতা তাহাকে যে সুযোগ দিতেছেন না, এখন ঈশ্বরের সাহায্যে সে সুযোগ সে পাইতেছে। ভগবান স্বয়ংই তাঁ'র কার্য্যের জন্য এই সুযোগ তার সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। ইহা কি সে ছাড়িতে পারে? মনোরথ বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইল।

মনোরথ বিবাহ সম্বন্ধে পিতামাতার মতামতের প্রতীক্ষা করা উচিত মনে করিল না। যদি তাঁহারা অমত করেন তাহা হইলে মনোরথের জীবনব্রত পণ্ড হইয়া যাইবে। এ বিবাহ আত্ম-সুখ-সমৃদ্ধির জন্য নহে—স্বদেশ-সেবার জন্য। দেশের কল্যাণের জন্যই মনোরথ দাসত্ব-শৃঙ্খলাবদ্ধ ডিপুটীর কন্যার পাণিগ্রহণে সম্মত হইয়াছে। নতুবা মনোরথের ন্যায় স্বরাজপন্থী কখনই এতটা ন্যূনতা স্বীকার করিত না। সদাশিবের কালকূট ভক্ষণের ন্যায় মনোরথ স্বজাতির কল্যাণের জন্য ডিপুটী-কন্যার পাণিপীড়ণ করিয়া আত্মীয় বন্ধুগণের বিদ্বেষ-বিষ নিরাপত্তে গলাধঃকরণ করিল।

(২)

বিবাহের পূর্ব্বে মনোরথ মনে করিয়াছিল শ্বশুরগৃহে 'স্বদেশীর' অনেক অনাচার দেখিতে পাইবে। শ্বশুর একে ডিপুটী তার উপর সাহেবী ষ্টাইলের বিশেষ পক্ষপাতী সুতরাং তাহার এরূপ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। মনোরথ শ্বশুরগৃহের প্রত্যেক বিষয় নীরবে লক্ষ্য করিতে ভুলিল না। অন্তঃপুরে স্বদেশীর অসামান্য প্রভাব দেখিয়া তাহার হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ জাগিল। সযত্নে রক্ষিত স্বদেশী জিনিসগুলিতে মনোরথ অন্তঃপুর-চারিণী মহিলাদিগের অসামান্য স্বদেশানুরাগের পরিচয় প্রাপ্ত হইল।

মনোরথের মনে পড়িল সতীশ তাহাকে বলিয়াছিল "ডিপুটীকন্যা নিতান্তই বিলাতী ভাবাপন্ন হইবে এরূপ কথা দর্শন-শাস্ত্রের যুক্তি বহির্ভূত।" তখন

সে সতীশের দূর-দৃষ্টির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিল না। মনোরথ যে কয়দিন শ্বশুরগৃহে ছিল সে কয়দিনের মধ্যে স্বদেশীর কোন ব্যভিচার তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। তবে আজন্ম বিলাতীভাবে প্রতিপালিত ও শিক্ষিত এবং সাহেব মহলে সুপরিচিত শ্বশুর মহাশয় যে দুই একটা বিষয়ে অনাচার করিতেন তাহা মনোরথ উপেক্ষা করিতে প্রস্তুত। তথাপি এই কয়েকটী বিষয়েও সংস্কার করিতে পারিবে বলিয়া মনোরথের বিশ্বাস জন্মিল।

কলিকাতা যাইবার সময় শ্বশুর রমানাথ বাবু বলিলেন "বাবা এইবার পরীক্ষার বৎসর, সভা সমিতিতে যাও যাইবে কিন্তু একবারে "হুজুগে" মাতিও না। লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইতে পারিলে দেশের অনেক কাজ করিতে পারিবে।" অন্তঃপুরে শাশুড়ীও এই কথাগুলিরই প্রতিধ্বনি করিলেন।

মনোরথ তাহার কর্ম্মক্ষেত্র কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিল। কলিকাতা আসিবার জন্য তাহার কতই ব্যাকুল আগ্রহ ছিল। কলিকাতার চিত্র অঙ্কিত করিয়া মনোরথ বিনিদ্র নয়নে কত রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছে। রাজধানীতে পৌঁছিয়া মনোরথ কয়েকদিন সভা-সমিতিতে গিয়াছিল এবং কলেজস্কোয়ারে দুই একটা বক্তৃতাও করিয়াছিল কিন্তু শ্বশুর শাশুড়ীর উপদেশ তাহার উদ্দাম উৎসাহকে বড়ই দমন করিয়া রাখিতে লাগিল। পরীক্ষায় ফেইল হইলে কি প্রকারে শ্বশুর শাশুড়ীকে মুখ দেখাইবে, নব-পরিণীতা স্ত্রীই কিরূপ অপদার্থ মনে করিবে? এই সকল চিন্তা মনোরথের প্রবল স্বদেশানুরাগকে নির্দ্দয়ভাবে সংযত করিয়া রাখিল। মনোরথের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিপিন বাবু কি সুরেন্দ্র বাবুর প্রধান শিষ্য হওয়ার সুযোগ ঘটিল না। সে বি, এল্ পড়ার সময় দেশ- সেবা করিতে পারিবে মনে করিয়া অন্তরে সান্ত্বনা লাভ করিল।

বি, এ, পরীক্ষার পর মনোরথ শাশুড়ীর একান্ত অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া শ্বশুরভবনে গমন করিতে বাধ্য হইল। পুত্রবৎসলা জননী মনোরথের শ্বশুর বাড়ী গমনের সংবাদ পাইয়া অতিশয় দুঃখিতা হইলেন। মনোরথ পরীক্ষার জন্য পূজায় বাড়ী আসে নাই, স্নেহশীলা জননী তাহার প্রতীক্ষায় পথপানে চাহিয়া ছিলেন। পুত্রকে খাওয়াইবার জন্য কত সামগ্রী তিনি সযত্নে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি নিরাশ হইয়া অন্তরে বড়ই যাতনা অনুভব করিলেন। কিন্তু মনোরথের পিতা যখন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন তখন দয়াবতী মহিলা স্বামীকে বুঝাইয়া দিলেন মনোরথের শ্বশুরবাড়ী যাওয়াই ভাল হইয়াছে। পুত্রতো আমাদেরই, শ্বশুর শাশুড়ী কুটুম্ব মাত্র,

তাহাদের মন রক্ষা করাই উচিত।"

মনোরথ বেশ আমোদ প্রমোদের সহিত শ্বশুরগৃহে দিনযাপন করিতে লাগিল। রমানাথ বাবুর বাসার চা'র আড্ডা সহর বিখ্যাত। অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং উচ্চ রাজকর্ম্মচারী আসিয়া প্রাতঃকালে চা'র বৈঠকে যোগদান করেন এবং বিচিত্র গল্পের উচ্ছাসে ও হাসির তরঙ্গে গৃহ মুখরিত হইয়া উঠে। রমানাথ বাবুর বড় জামাতা আসিলে বাড়ীর ভিতরে আর একটী ছোট শাখা-বৈঠক বসিল। শালিকা ও শালকগণ সেই বৈঠকের প্রধান সভ্য। আমাদের মনোরথও সেই বৈঠকে যোগদান করিল। শ্বশুরগৃহের চা'র উৎসব দেখিয়া মনোরথ কলিকাতায় গিয়া স্বদেশী চা-পান আভ্যাস করিয়াছিল। চা ডিপার্টমেণ্টের পরিচালন ভার মনোরথের শাশুড়ীর হস্তে ছিল। মনোরথ যে দিন আসিয়াছে তাহার পর দিন প্রাতে শাশুড়ী আরও আড়ম্বরের সহিত চা প্রস্তত করিয়া কয়েক পেয়ালা চা, কয়েকখানা বিস্কুট ও পুডিং জামাতাদিগের সম্মুখে স্থাপন করিলেন। বড় জামাতা ও শালকদ্বয় দুই পেয়ালা চা গ্রহণ করিলেন। মনোরথ জানিত এ চা বিলাতি চিনিদ্বারা প্রস্তত, বিস্কুটও বিলাতি, তাই সে মাথা হেট করিয়া বসিয়া রহিল। শাশুড়ী বুঝিতে পারিয়া বলিলেন "বাবা, আমার মাথার দিব্য আজ এই চা খাইতেই হইবে, কাল তোমার জন্য অন্য বন্দোবস্ত করিব।" সকলই একবাক্যে এ কথার অনুমোদন করিল। মনোরথের প্রতিজ্ঞা শিথিল হইল। সে চা'য়ের পেয়ালাটী গ্রহণ করিয়া এক নিশ্বাসে শূন্য করিয়া ফেলিল। চা'র বৈঠক ভাঙ্গিলে মনোরথ স্বীয় কক্ষে গমন করিল। তথায় সুবালা তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। স্বামীকে একা পাইয়া সুবালা কহিল—তুমি না বড় স্বদেশী, অনায়াসে বিলাতি চিনির তৈয়ারি চা আর বিলাতি বিস্কুটগুলি খেলে !„ মনোরথ মাথায় যেন বজ্রপাত হইল। তাহার বক্তৃতা শুনিয়া কত স্ত্রীলোক হাতের বিলাতি চুড়ি ভাঙ্গিয়াছে, বিলাতি জ্যাকেট দগ্ধ করিয়াছে, আজ সে আপন পত্নীর নিকট স্বীয় অপরাধের কি কৈফিয়ত দিবে খুজিয়া পাইতেছিল না। তবু একটা উত্তর দেওয়া আবশ্যক তাই বলিল—"কি করবো! মা নিজে বল্লেন।"

সুবালা। মার কথায় তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলে? মা, বাবা সকলইতো আমাকে বলিয়াছেন কিন্তু আমিতো প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গি নাই।

মনোরথ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল—"কি! তুমি চা খাও না কবে থেকে?

সুবালা। যে দিন তোমার সহিত আমার পরিণয় হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত।

আরতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

৮ম বর্ষ। | ময়মনসিংহ, মাঘ, ১৩১৫। | ২য় সংখ্যা।

মাধবাচার্য্য।

শ্রীচৈতন্য দেবের সমসাময়িক "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" প্রণেতা মাধব, এবং "চণ্ডীকাব্য" রচয়িতা মাধব এক ব্যক্তি নন, ইহারা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি।

চৈতন্য মহাপ্রভু ১৪০৭ শকে ফাল্গুণী পূর্ণিমা দিনে অর্থাৎ দোলযাত্রার দিনে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

মাধবাচার্য্য মহাপ্রভুর মন্ত্রশিষ্য এবং 'পড়ুয়া', তিনি "শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল" এবং "প্রেমরত্নাকর" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া ছিলেন। তাঁহার বাসস্থান ময়মনসিংহ জিলান্তর্গত মেঘনা নদীর তীরবর্ত্তী নবীনপুর বা নৈনপুর গ্রামে ছিল। বর্ত্তমান সময় নৈনপুরকে গোসাইপুর কহিয়া থাকে। মাধবাচার্য্য প্রভুর পিতামহের নাম ধরণীধর বিশারদ, পিতার নাম পরাশর ও পুত্রের নাম জয়রামচন্দ্র গোস্বামী।

চণ্ডীকাব্য রচয়িতা মাধব, মহাপ্রভুর সপার্ষদে অপ্রকট হওয়ার পর অর্থাৎ প্রভুর নবদ্বীপ-লীলাবসানের বহু দিন পরে গৌড়মণ্ডলে আবির্ভূত হন। তিনি ব্রাহ্মণ বংশে প্রসিদ্ধ সপ্তগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারও পিতার নাম পরাশর। ইনি কবিত্ব শক্তিসম্পন্ন ও কীর্ত্তন ব্যবসায়ী ছিলেন। এই মাধবাচার্য্য প্রথমতঃ সুন্দরবনের দেবতা ব্যাঘ্রারোহী দক্ষিণ রায়ের পালা গান রচনা করিয়াছিলেন ও কীর্ত্তনে দল জুটাইয়া গান করিয়া অর্থোপার্জ্জন করতঃ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন

ইহার কিছুকাল পরে মাধব চণ্ডীকাব্য রচনা করেন এবং চণ্ডী গীতের একজনউৎকৃষ্ট গায়ক বলিয়া সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন ও একজন প্রধান "কীর্ত্তনীয়া" বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়াছিলেন। এই "কীর্ত্তনীয়া" মাধবাচার্য্য যে সময় প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন সেই সময় বাঙ্গলায় সংগীত রচনা ও সংগীতানুষ্ঠানে বৈষ্ণব কবিগণের সর্ব্বময় প্রাধান্য।

মাধবাচার্য্য প্রভুর শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি গীতিকাব্য ও অসংখ্য পদকর্ত্তা মহাজনগণের মধুবর্ষী পদাবলী সমূহ তখন বঙ্গের সর্ব্বত্র গীত হইতেছিল। এই সকল সংগীতানুষ্ঠানে জনসাধারণের রুচিরও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিল, ও ভগবান গৌরহরির প্রতি জনসাধারণের ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিল।

এই সময়ে সংগীতে গৌরচন্দ্রিকা আসন পাতিয়াছেন, গৌর প্রভুর মহিমা কীর্ত্তন শুনিতে লোকহৃদয় আকর্ষিত হইয়াছে ও একটু মাতিয়াছে। তাই কীর্ত্তনীয়া মাধব স্বরচিত চণ্ডী গীতেও লোকরঞ্জনার্থ গৌর প্রভুর মহিমা বর্ণনা করিয়া 'ধুয়া' সকল সন্নিবেশিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

চণ্ডীকাব্য প্রণেতা মাধব, কেবল লোকরঞ্জনার্থই যে গৌর বিষয়ক 'ধুয়া' লিখিয়াছিলেন তাহা নহে। গৌরচন্দ্রে ও বৈষ্ণব ধর্ম্মে তাঁহার একটু বিশ্বাসও ছিল। তিনি সঙ্গীত-শাস্ত্র-বিশারদ একজন সঙ্গীতপটু গায়ক ছিলেন। গৌর বিষয়ক ও কৃষ্ণ বিষয়ক সংগীতে তাঁহার মন আকৃষ্ট ও আর্দ্র হইত। এই হেতুই গৌরাঙ্গ প্রভুর প্রতি তাঁহার হৃদয়ের একটু টান জন্মে, ইহাতেই বিশ্বাসাভাসের উৎপত্তি। এই বিশ্বাসাভাসই পরিণামে প্রকৃত বিশ্বাস ও নির্ম্মল শ্রদ্ধায় পরিণত হইয়াছিল।

মাধব চণ্ডীকাব্য ১৫০১ শকে রচনা করেন। গ্রন্থ রচনার কাল ও আত্ম পরিচয় তিনি এইরূপে লিখিয়াছেন।

যথা :—

পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার।
একাব্বর নামে রাজা অর্জ্জুন অবতার॥
অপার প্রতাপী রাজা বুদ্ধে বৃহস্পতি।
কলি যুগে রামতুল্য প্রজা পালে ক্ষিতি॥
সেই পঞ্চগৌড় মধ্যে সপ্তগ্রাম স্থল।
ত্রিবেণীতে গঙ্গা দেবী ত্রিধারে বহে জল॥

সেই মহানদী-তট-বাসী পরাশর।
যাগ যজ্ঞে যপে তপে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর॥
মর্য্যাদায় মহোদধি দানে কল্পতরু।
আচারে বিচারে বুদ্ধে সম দেবগুরু॥
তাঁহার তনুজ আমি মাধব আচার্য্য।
ভক্তিভরে বিরচিনু দেবীর মাহাত্ম্য॥
আমার আসরে যত অশুদ্ধ গায় গান।
তার দোষ ক্ষমা কর কর অবধান॥
শ্রুতি তালভঙ্গ অন্য দোষ না নিবা আমার।
তোমার চরণে মাগি এই পরিহার॥
ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত।
দ্বিজ মাধবে গায় সারদা চরিত॥
সারদার চরণ-সরোজ-মধু লোভে।
দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হ'য়ে শোভে॥ চণ্ডীকাব্য।

দুঃখের বিষয়—"বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" প্রণেতা দীনেশচন্দ্র সেন মহোদয়ও এই চণ্ডীকাব্য প্রণেতা মাধব ও শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল প্রণেতা মাধবকে একই ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া ভ্রম করিয়াছেন।

এরূপ ভ্রম হইবার কারণ এই— শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের গ্রন্থকারের নাম মাধব ও তাঁহার পিতার নাম পরাশর এবং চণ্ডীকাব্য প্রণেতার নামও মাধব তাঁহারও পিতার নাম পরাশর। এই নাম সাম্য দেখিয়াই বোধ হয় দীনেশ বাবু বিশেষ বিবেচনা না করিয়া উভয় গ্রন্থকারকে একব্যক্তি বলিয়া অবধারণ করিয়া লইয়াছেন।

এখন দেখিতে হইবে এই উভয় মাধব একব্যক্তি কি না, এবং এক সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন কি না।

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল প্রণেতা মাধবাচার্য্যের জন্মস্থান ও বাসস্থান নৈনপুর বা গোসাইপুর মেঘনা নদীর তীরে। বিশেষতঃ তিনি শ্রীচৈতন্য প্রভুর সমসাময়িক ও পার্ষদ মহান্ত ছিলেন এবং বৈষ্ণব সমাজে সবিশেষ সম্মানিত ছিলেন। তাহা অবিসংবাদিত কথা।

এই মাধবাচার্য্য শ্রীচৈতন্য দেবের পড়ুয়া অর্থাৎ ছাত্র ছিলেন। যথা :—

মহা প্রভুর পড়ুয়া বড় বুদ্ধিমন্ত।
তর্কশাস্ত্রে হোর তঁহি অতি সুপণ্ডিত॥ মহাপ্রসাদবৈভব।

বিদ্যা বিলাসমত্তস্তু প্রভু গৌরহরিঃ স্বয়ং।
বিললাস যদাবঙ্গে বহু শিষ্যগণৈঃ সহ॥
লব্ধা পদ্মাবতী তীরে তৎ পাদাব্জস্তু মাধবঃ।
আত্মানং সার্থকং মত্বা নবদ্বীপং ততোঽগমৎ॥

মাধববংশতত্ত্ব।

মাধবাচার্য্য শ্রীচৈতন্য দেবের কেবল পড়ুয়া নহেন, মন্ত্রশিষ্যও ছিলেন।

যথা—

জানি আমি তোঁয়া গুরু চৈতন্য গোসঞী।
অধমক তুঁহি সর্ব্ব কাঁহা আন নাই॥
যেহি কৃষ্ণ সেহি গুরু ভিন্ন দেহা নহে।
গুরু কৃষ্ণ একঐছে সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে॥

মহাপ্রসাদবৈভব।

ততঃ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যঃ প্রেমকল্পদ্রুমোভবৎ।
ততস্তু মাধবাচার্য্যঃ শক্তিসঞ্চারণাদিতঃ॥

মহাপ্রসাদবৈভব। প্রণালিকা শ্লোক।

তদৈব মাধবাচার্য্যং প্রিয় ছাত্রং মহাপ্রভুঃ।
স্নেহেন দীক্ষয়ানাস শক্তিসঞ্চারয়ন্ স্বয়ং॥
কথয়ামাসতত্বানি সম্যক বিস্তারয়ন্ ক্রমাৎ।
ভজনস্তব সামর্থ্যং প্রেমভক্তিং ততোঽদদৎ॥

মাধববংশতত্ত্ব।

মহাপ্রভুর শাখা বর্ণনায়ও ইঁহারই নাম পাওয়া যায়।

ভাগবতাচার্য্য চিরঞ্জীব রঘুনন্দন।
মাধবাচার্য্য কমলাকান্ত শ্রীযদুনন্দন॥

চৈতন্য চরিতামৃত।

এই শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল প্রণেতা মাধবাচার্য্য রাঢ়ীশ্রেণীর বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয় কুলীন ছিলেন।

যথা—

ব্রজে যা মাধবী সখী বিশাখাযূথবল্লভা।
সৈবাত্র মাধবাচার্য্যোবন্দ্যবংশোমহত্তমঃ॥

ভোগমালা

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল প্রণেতা মাধবাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর শাখা প্রচারকার্য্যে নিত্যানন্দ প্রভুর সহকারী ছিলেন বিধায় তিনি নিত্যানন্দ শাখায়ও পরিগণিত ছিলেন।

যথা—

প্রভু আজ্ঞায় নিত্যানন্দ গৌড়েরে চলিলা।
তার সঙ্গে প্রভু আজ্ঞায় তিন জন আইলা॥
শ্রীরামদাস মাধব বাসুদেব ঘোষ।
প্রভুসঙ্গে গোবিন্দ রহে পাইয়া সন্তোষ॥

চৈতন্য চরিতামৃত, আদ্য খণ্ড ১০ম পঃ।

শ্রীরামদাস আর গদাধর দাস।
চৈতন্য গোঁসাইর ভক্ত রহে তার পাশ।
নিত্যানন্দে আজ্ঞা যবে হৈল গৌড়ে যাইতে।
মহাপ্রভু এই দুই দিল তার সাথে॥
অতএব দুই গণে দোঁহার গণন।
মাধব বাসু ঘোষের এই বিবরণ॥

চৈঃ চঃ আদ্য খণ্ড ১১শ পরিচ্ছেদ।

মাধবাচার্য্য নিজকৃত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

সর্ব্ব অবতার শেষে করিল প্রবেশ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্র গুপ্ত জ্যোতির্বেশ॥
প্রেমভক্তি রসামৃত করেন প্রকাশ।
দ্বিজ শ্রীমাধব কহে তাঁর দাস দাস॥

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।

মাধবাচার্য্য কৃত প্রেমরত্নাকর গ্রন্থের মঙ্গলাচরণের শ্লোকটী এই :—

শ্রীচৈতন্য পদারবিন্দমমলং সম্ভাব্য হৃদম্বুধৌ।
ভাবোন্মাদিত বৈষ্ণবানিরমনং জ্ঞানেন্দু সংকোচনং॥
স্বপ্রেমদ্যুমণিপ্রকাশ বহনোৎফুল্ল সতামঞ্জসে।
তৎ পাদাশ্রয় মাধবো বিতনুতে শ্রীপ্রেমরত্নাকরং॥

এই সকল প্রমাণানুসারে মাধবাচার্য্য প্রভু যে শ্রীচৈতন্য দেবের পার্ষদ মহান্ত পড়ুয়া ও মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপেই প্রমাণিত হইতেছে।

মাধবাচার্য্য যখন শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গ্রন্থ রচনা করেন, তখন তাঁহার জনক জননীকে নবদ্বীপে লইয়া যাইয়া গঙ্গাবাস করাইতে ছিলেন।

যথা—

জনক জননী বন্দ যত গুরুজন।
সানন্দিত হয়ে বন্দ সবার চরণ॥
সুরধুনী তীরে কৈলা বাস নবদ্বীপ।
যথায় চৈতন্যচন্দ্র অদ্বৈত সমীপ॥ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।

এই সকল প্রমাণানুসারে স্থিরীকৃত হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল প্রণেতা মাধবাচার্য্য শ্রীগৌরাঙ্গের ছাত্র ও শিষ্য ছিলেন এবং তাঁহার মাতা পিতা নবদ্বীপে গঙ্গাবাস করিতে ছিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ দেব ১৪০৭ শকে আবির্ভূত হইয়া ১৪৫৫ শকে অন্তর্হিত হইয়া ছিলেন।

চৌদ্দ শত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দ শত পঞ্চান্নে হৈলা অন্তর্দ্ধান॥ চৈতন্য চরিতামৃত।

চণ্ডীকাব্য রচয়িতা মাধবের পিতা সপ্তগ্রামে গঙ্গাতীরে বাস করিতেন, এবং তিনি ১৫০১ শকে * চণ্ডীকাব্য রচনা করেন। সুতরাং এই দুই মাধব যে বিভিন্ন স্থানবাসী ও ভিন্ন সময়ের লোক তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

চণ্ডীকাব্য প্রণেতা মাধবের সময় ১৫০১ শক। তখন সপ্তগ্রামের রাজা মুসলমান জাতীয় একাব্বর †।

আর শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচনার কাল ১৪৫০ শকের মধ্যে কোন এক সময় তখন সপ্তগ্রামের রাজা হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন।

যথা—

হিরণ্য গোবর্দ্ধন দুই সহোদর।
সপ্তগ্রাম বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর॥
মহৈশ্বর্য্যযুক্ত দোঁহে বদান্য ব্রাহ্মণ্য।
সদাচার সৎকুল ধার্ম্মিক অগ্রগণ্য॥

চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৬শঃ পঃ।

ইহাতেও ইহারা যে ভিন্ন সময়ের লোক তাহা সুদৃঢ়রূপে প্রতিপাদন করিতেছে।

বিশেষতঃ নিত্যানন্দপ্রভুর সপ্তগ্রাম ভ্রমণ বৃত্তান্ত বৃন্দাবনদাস ঠাকুর চৈতন্য

---

* ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত ইত্যাদি। চণ্ডীকাব্য।
† একাব্বর নামে রাজা অর্জ্জুন অবতার ইত্যাদি। ”

ভাগবতের অন্ত্য খণ্ডের ৫ম অধ্যায়ে বিস্তারিতরূপে লিখিয়াছেন। তাহাতে উদ্ধারণ দত্ত ও তৎ সম্পর্কিত বণিক বংশের সহিতই প্রভুর সমাগম হইয়াছিল এরূপ লিখিত হইয়াছে। তখন সপ্তগ্রামে যদি প্রভুদিগের পার্ষদ মহান্ত মাধবাচার্য্য কেহ থাকিতেন তবে অবশ্য নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণ সমীপে তিনি উপস্থিত হইতেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীরাধারমণ গোস্বামী।

সৈনিকের স্বপ্ন।

সন্ধ্যার আঁধার ধীরে ঢাকিল আকাশ,
বিশ্রামের তূর্য্যধ্বনি উঠিল তখন,
গগনে হইল শত তারকা বিকাশ,—
সহসা প্রহরীদল জাগিল যেমন।
অবশ সহস্র সৈন্য শায়িত ধরায়,
ক্লান্ত ঘুমে, আহতেরা মৃত্যু প্রতীক্ষায়।

শার্দ্দুল কবল হ'তে রক্ষিতে তথায়
মৃতদেহ, অগ্নিশিখা জ্বলিছে ভীষণ ;
শুইয়া তাহারি কাছে তৃণের শয্যায়
দেখিলাম রজনীতে মধুর স্বপন।
আজো সেই সুখ-স্মৃতি অন্তরে আমার
নীরবে দিতেছে ঢালি তৃপ্তি সুধা-ধার।

ছাড়িয়া যুদ্ধের দৃশ্য অতীব ভীষণ
দূরান্তরে জানি আমি চলেছি কোথায়,
আকাশে মধ্যাহ্ন রবি, হেমন্ত তখন,
হাসিছে ধরণী নব শ্যামল শোভায়।
কি করে অজ্ঞাতে প্রিয় জন্মভূমি বুকে
পড়িনু আসিয়া যেন প্রীতি-ফুল্লমুখে !

রাখাল বসিয়া স্নিগ্ধ তরুর ছায়ায়
গাইছে আপন মনে সুমধুর গীতি,
হতভাগ্য নির্ব্বাসিত সৈনিক হিয়ায়
সহসা উঠিল জাগি অতীতের স্মৃতি।
সুস্নিগ্ধ কুটির মম দেখিনু সমুখে—
ছুটিয়া পশিনু তায় উৎকণ্ঠিতবুকে।*

প্রাণের অধিক প্রিয় শিশুগুলি আসি
"বাবা" বলে চারিদিকে ঘেরিল আমায়,
বসন্তে উঠিল যেন ফুটি ফুল রাশি,
প্লাবিত ভগন গৃহ ত্রিদিব শোভায়;
নীরবে দাঁড়ায়ে প্রিয়ে স্নিগ্ধ গৃহকোণে
দেখিছে সে দৃশ্য আহা! অতৃপ্ত নয়নে।

কহিল আনত মুখে প্রেয়সী আমার,
"হইয়াছ তুমি নাথ! ক্লান্ত অতিশয়,
দুর্ব্বার সংগ্রামে যেতে দিব না-গো আর,
জুড়াও এখানে থাকি ব্যথিত হৃদয়।"
দেখা দিল অশ্রু আসি দুইটী নয়নে
মুছাইয়া দিনু তাহা সস্নেহ চুম্বনে

দ্রবিল কঠিন হৃদি; নিশা অবসানে
ভেঙ্গে গেল কিন্তু হায়! মধুর স্বপন!
নীরব হইল মম আকুল শ্রবণে
প্রেয়সীর সুধা মাখা সান্ত্বনা বচন!
বহুদিন চলে যায় আজো অনিবার
জাগ্রত সে সুখ-স্মৃতি অন্তরে আমার।

---

* Campbell's Soldier's dream নামক ইংরেজী কবিতার ছায়া লইয়া লিখিত।

রাজ-কাহিনী।

৩

পরদিবস ঠিক তিনটার সময় ভবানীপুরে কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু তখনও বাড়ী প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। তাঁহার ভৃত্য বলিল তিনি যে প্রাতে আটটার সময় বাহির হইয়াছেন আর ফিরিয়া আসেন নাই। তখন আমার আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে তিনি মিস্ তোরাবের অন্বেষণেই বাহির হইয়াছেন। গোবিন্দ বাবু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা জানিবার জন্য আমার অতিশয় কৌতূহল জন্মিল। যদিও এই বিষয়টীতে ভয়ানক খুন অথবা জাল জুয়া-চুরির কোন সম্বন্ধ ছিল না তথাপি এই অভিনব ক্ষেত্রে ও গোবিন্দ বাবুর সূক্ষ্ম কার্য্য-প্রণালী ও অসামান্য বিচার-শক্তির পরিচয় পাইব তৎসম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। তাই আমি কৌতূহল-উদ্দীপ্ত চিত্তে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পর হঠাৎ দ্বার উন্মুক্ত হইল; অপরিষ্কার জীর্ণবাস পরিহিত একটা পশ্চিম দেশবাসী সইস গৃহে প্রবেশ করিল। যদিও আমি অনেকবার গোবিন্দ বাবুকে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আত্মগোপন করিতে দেখিয়াছি তথাপি সেদিন তাঁহাকে প্রথম দৃষ্টিতে কিছুতেই চিনিতে সক্ষম হইলাম না। সইস বেশধারী গোবিন্দ বাবু দ্রুতপদে গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যে সাজ পরিবর্ত্তন করিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তখন আমরা উভয়েই হাস্য সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইলাম। গোবিন্দ বাবু একখানি চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিলেন এবং হাস্যোৎফুল্ল নয়নে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—

"কি ডাক্তার। খবর কি?"

"খবর যে কিছু রহস্যপূর্ণ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

"হাঁ ডাক্তার, বড়ই মজার সংবাদ। আমি আজ এতটা বেলা কিরূপে অতিবাহিত করিয়াছি তুমি তাহা কল্পনাও করিতে পারিবে না।"

"আপনি যে মিস্ তোরাবের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিয়াছেন তাহা অনুমানে কতকটা বুঝিতে পারিতেছি।"

"ঠিক বলিয়াছ। কিন্তু ব্যাপারখানা কিছু অভিনব। আমি যতটা রহস্য উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহা আমূল তোমাকে বলিতেছি। আমি আজ ৮টার কিছু পর সইসের বেশে বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়াছিলাম, পেয়ারা বাগানে

পৌঁছিয়া অতি সহজেই আমি তোরাবের বাড়ী বাহির করিতে সমর্থ হইলাম। বাড়ীখানি অতি সুন্দর;—একটী সুবৃহৎ গৃহ, উহার চারিদিকে নানাজাতি বৃক্ষলতা সুশোভিত বাগান; সম্মুখে ফটক। রাস্তা হইতে অট্টালিকার কয়েকটী কামড়া দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। আমি বাহির হইতে বাটীখানি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বাগানের সংলগ্ন একটী আস্তাবলে প্রবেশ করিলাম। সইসদিগের মধ্যে বড়ই সহানুভূতি থাকে, বহু বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে আমি এই তথ্য অবগত হইয়া ছিলাম। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমি সেই আস্তাবলের সইসদিগের সহিত মিশিতে সমর্থ হইলাম এবং কৌশলে মিস্ তোরাব সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিয়া লইলাম।

আমি যাহা জানিলাম সংক্ষেপতঃ তাহা এই— তোরাব অসামান্য-রূপলাবণ্যবতী যুবতী। তোরাব চির হাস্যময়ী; সঙ্গীতে তাহার অসাধারণ অনুরাগ। আরও জানিলাম, এই যুবতী অধিকাংশ সময়ই গৃহে অতিবাহিত করে। কেবল অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় সে প্রত্যহ একবার বেড়াইতে বাহির হইয়া থাকে। একজন বাঙ্গালী নব্য ব্যারিষ্টার ব্যতীত অন্যকোন পুরুষকে কথনও তাহার বাড়ীতে আসিতে দেখা যায় নাই। এই ব্যারিষ্টারটী প্রত্যহই একবার আসিয়া থাকেন।

আমি আস্তাবল হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় পাদচারণ করিতে করিতে সংগৃহীত তথ্যগুলির সূক্ষ্মরূপে আলোচনা করিতে লাগিলাম। সর্ব্বাগ্রে ব্যারিষ্টারের সহিত মিস্ তোরারেব সম্বন্ধ নির্ণয় করা আবশ্যক বোধ হইল। তোরাব কি ব্যারিষ্টারের 'মক্কেল' না প্রেমিকা। যদি মক্কেল হয় তাহা হইলে পূর্ব্বোল্লিখিত ফটো নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে সে ব্যারিষ্টারের নিকট অর্পণ করিয়াছে। আর যদি প্রণয় সম্বন্ধ ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে পূর্ব্বপ্রেমিকের ফটো তোরাব কথনই ইহাকে প্রদর্শন করিবে না।

আমি এখন ব্যারিষ্টারের গৃহই অন্বেষণ করিব কি তোরাবের বাটী তালাস করিব এই বিষয় চিন্তা করিতে ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ আমার চিন্তাস্রোত আন্দোলিত করিয়া একটী সুন্দর বৃহৎ ফিটন্ আসিয়া তোরাবের বাড়ীর সম্মুখে থামিল। গাড়ীর দ্বার উন্মুক্ত হইলে একটী সাহেবী বেশধারী বাঙ্গালী যুবক অবতরণ করিলেন এবং যুবকটী দ্রুতপদে ফটক অতিক্রম করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। দ্বারে প্রহরীরা তাঁহাকে সেলাম করিল। আমি মনে করিলাম এই ব্যক্তিই পূর্ব্বোক্ত ব্যারিষ্টার হইবেন। যুবক একবারে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ

করিলেন। আমি উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাঁহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম। অর্দ্ধ ঘণ্টা পর যুবক ফিরিয়া আসিলেন। গাড়ীতে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে তিনি পকেট হইতে একটী সোণার ঘড়ী খুলিয়া সময় দেখিলেন এবং কচোয়ানকে বলিলেন "আধ ঘণ্টার মধ্যে আমাকে বৌ-বাজার-গির্জ্জায় পৌছাইয়া দিতে পারিলে পাঁচ টাকা পুরস্কার দিব।"

মুহূর্ত্ত মধ্যে গাড়ীখানি ধূলা উড়াইয়া পবন গতিতে ছুটিল। আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তথায় দাঁড়াইয়া কি করিব ভাবিতে লাগিলাম। এমন সময় একখানি লেণ্ডো গলির ভিতর হইতে বাহির হইয়া তোরাবের ফটকে আসিয়া থামিল। তৎক্ষণাৎ একটী স্ত্রীলোক দ্রুতগতিতে আসিয়া গাড়ীতে আরোহণ করিল। আমার বোধ হইল যেন আমার নয়ন সম্মুখে সহসা বিদ্যুল্লতা চমকিল। রমণী অসামান্য-সুন্দরী। যুবতী গাড়ীতে উঠিয়াই বলিল—"বৌবাজারের গির্জ্জা—আধ ঘণ্টায় পৌছাইলে পাঁচ টাকা পুরস্কার।"

আমি মনে করিলাম এই সুযোগ পরিত্যাগ করা অনুচিত। ইহারা কি উদ্দেশ্যে যাইতেছে অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। এই সময় দৈবাৎ একখানি খালি গাড়ী যাইতেছে দেখিতে পাইলাম। আমি এক লাফে গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। গাড়োয়ান আমার সাজসজ্জা দেখিয়া কিছু চিন্তিত হইল। বোধ হয় ভাড়াপ্রাপ্তি সম্বন্ধে তাহার সন্দেহ জন্মিয়াছিল। আমি তাহার হাতে একটী টাকা দিয়া বলিলাম "আধ ঘণ্টার মধ্যে বৌবাজারের গির্জ্জায় পৌছাইয়া দিলে আরও চার টাকা দিব—শীগ্‌গির গাড়ী হাকাও।"

আমি বৌবাজারের গির্জ্জার নিকট আসিয়া গাড়ী হইতে নামিলাম এবং গাড়োয়ানকে বাকী টাকা প্রদান করিয়া গির্জ্জার দিকে ছুটিলাম। গির্জ্জার সম্মুখে পূর্ব্বোল্লিখিত দুইটী গাড়ীই দেখিতে পাইলাম কিন্তু গাড়ী শূন্য। আমি দ্রুতপদে গির্জ্জায় প্রবেশ করিলাম। তথায় মিস্ তোরাব, সেই ব্যারিষ্টার ও একজন পাদ্‌রি ব্যতীত অন্য কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। তাহারা তিন জন বেদির সম্মুখে দাঁড়াইয়া কি আলাপ করিতেছেন। সহসা ব্যারিষ্টার দরজার দিকে ফিরিলেন এবং আমাকে দেখিতে পাইয়া দৌড়িয়া আসিলেন।

ব্যারিষ্টার আমার হাত ধরিয়া বলিলেন—"এস শীগ্‌গির এস, তোমাকে একটা কাজ করিতে হইবে।"

আমি তো অবাক! আমি বলিলাম "কি কাজ করিতে হইবে মশায়?"

ব্যারিষ্টার অধিকতর অধীর হইয়া বলিলেন—"আর বিলম্ব করিও না, মাত্র

তিন মিনিট সময় আছে, ইহার পর অনুষ্ঠান 'বে-আইনি' হইবে।"

আমার কৌতূহল ও বিস্ময় আরও বৃদ্ধি হইল। না জানি কোন্ নূতন সমস্যা উপস্থিত হইয়া আমার গন্তব্য পথকে অধিকতর দুর্গম করিয়া তুলে।

ব্যারিষ্টার আমাকে চিন্তা করিবার অবকাশ প্রদান করিলেন না; তিনি আমাকে টানিয়া লইয়া বেদির নিকট উপস্থিত করিলেন। আমি দুই একটী কথায়ই বুঝিতে পারিলাম তোরাবের সহিত এই ব্যারিষ্টারের বিবাহ সম্পন্ন হইতেছে কিন্তু পাদ্রি কোন কারণ বশতঃ একজন সাক্ষ্য ব্যতিরেকে বিবাহ সুসম্পন্ন করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। ব্যারিষ্টার আমাকে সাক্ষ্য স্বরূপ তথায় দাঁড় করাইয়াছেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে শুভকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। মিস্ তোরাব আমাকে এক মোহর বক্‌সিস্ প্রদান করিল। ব্যারিষ্টার আমাকে অতিশয় ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

আমি দেখিলাম ঘটনাস্রোত অন্য দিকে ছুটিয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল এই দম্পতী শীঘ্রই স্থানান্তরে চলিয়া যাইবে সুতরাং আমাকে অতি সত্বর কার্য্য সমাধা করিতে হইবে।

আমি যুবক যুবতীর কথাবার্ত্তা শুনিবার জন্য তাহাদের গাড়ীর সমীপবর্ত্তী হইলাম। কিন্তু তাহারা বিশেষ কিছুই আলাপ করিল না। শুধু তোরাব বলিল—"আমি এখন একবার বাসায় যাইব;—পাঁচটার সময় বাগানে দেখা হইবে।"

অতঃপর দুইজনই শকটারোহণে গৃহে প্রস্থান করিল।

ডাক্তার! সারাদিন আহার হয় নাই, বড়ই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই আবার কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে হইবে। এখন তোমার সাহায্যের প্রয়োজন হইবে।"

আমি—আমি সর্ব্বদাই আপনাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত।

কৃষ্ণগোবিন্দ—তোমাকে যে কার্য্যের ভার দিব তাহা সম্পূর্ণ ন্যায়ানুমোদিত নাও হইতে পারে।

আমি—উদ্দেশ্য ভাল হইলে আমি তাহা করিতে কুণ্ঠিত হইব না।

কৃষ্ণগোবিন্দ—উদ্দেশ্য খারাপ নয়।

আমি—তবে আমি সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করিলাম। আমাকে কি করিতে হইবে বলুন।

কৃষ্ণগোবিন্দ—একটু অপেক্ষা কর, আমি আহারের কাজটা শেষ করিয়া আসি

কয়েক মিনিটের মধ্যে কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু আহার সমাপন করিয়া আসিলেন। তখন অপরাহ্ণ পাঁচটা বাজিয়াছে। কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু বলিলেন—ডাক্তার! সাতটার সময় আমাদিগকে পেয়ারা বাগান তোরাবের বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত থাকিতে হইবে। আর মাত্র দুই ঘণ্টা সময় আছে।"

আমি—তার পর?

কৃষ্ণগোবিন্দ—তার পর যাহা ঘটিবে তাহার বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছি। তোমার যে অভিনয় করিতে হইবে তাহাই বলিতেছি। তোরাবের বাটীর সম্মুখে কোন অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটিতে পারে, কিন্তু তুমি তাহাতে যোগদান করিও না। এই ব্যাপারের অবসানে আমি তোরাবের গৃহে নীত হইব। তারপর ৪।৫ মিনিট পরই বসিবার ঘরের জানালা উন্মুক্ত হইবে। তখন তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে। সেই সময় আমার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে; যখন আমি হাত তুলিব তখনই তুমি গৃহের মধ্যে আমার প্রদত্ত একটা জিনিস নিক্ষেপ করিবে এবং "আগুন আগুন" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিবে। মনে থাকিবে?

আমি—নিশ্চয়।

কৃষ্ণগোবিন্দ—জিনিসটা তেমন সাংঘাতিক কিছুই নয়—একটা বড় হাউই বাজী মাত্র। তুমি উহার সল্তায় অগ্নিসংযোগ করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে গৃহাভ্যন্তরে নিক্ষেপ করিবে। ইহার বেশী তোমাকে আর কিছুই করিতে হইবে না। যখন তুমি 'আগুন' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিবে তখন তোমার সহিত আরও অনেক লোক কণ্ঠ মিলাইয়া চীৎকার করিবে। অতঃপর তুমি গলির মাথায় আসিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিও।

আমি—এ অতি সহজ কাজ; আপনি আমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন।

কৃষ্ণগোবিন্দ—বেশ কথা, এখন সময় হইয়াছে; আর বিলম্ব করা যায় না।

এই বলিয়া কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে রোমান কেথলিক পাদ্রির সাজ লইয়া বাহির হইলেন। পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনের সহিত তাহার মানসিক ভাবেরও যেন পরিবর্ত্তন হইল। অসীম দয়া ও বাৎসল্য ভাব যেন তাঁহার বদনে ফুটিয়া উঠিল। আমার মনে হইল গোবিন্দ বাবু যদি ষ্টার থিয়েটারে কর্ম্ম গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে তিনি অদ্বিতীয় অভিনেতা হইতে পারিতেন।

আমরা একখানি ভাড়াটে গাড়ীতে আরোহণ করিয়া পেয়ারা বাগানে পৌঁছিলাম। সাতটা বাজিবার তখনও প্রায় আধ ঘণ্টা বিলম্ব আছে। রাস্তায় তখনও লোকের ভিড় আছে। আমরা তোরাবের বাড়ীর সম্মুখেই পাদচারণ করিতে লাগিলাম।

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু বলিলেন—"ডাক্তার! তোরাব 'ফটো' খানি কোথায় রাখিয়াছে তাহা জানিবার জন্যই এই অভিনয়। ফটো কখনই তোরাব তাহার সঙ্গে রাখে না। কেবিনেট সাইজের ফটো স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদের ভিতর ঢাকিয়া চলাফেরা করা অসম্ভব। বিশেষতঃ দুই বার তাহাকে ধরিয়া ফটো তালাস করা হইয়াছে। তোরাব ইহা অন্যের নিকটও দেয় নাই, কারণ স্ত্রীলোক কখনই স্বীয় গুপ্ত বিষয় অন্যের নিকট প্রকাশ করে না। তার পর আবশ্যক হইলে তোরাব ইহা এই সপ্তাহের মধ্যেই তাঞ্জোর-পতির নিকট প্রেরণ করিবে! সুতরাং নিশ্চয়ই সে নিজ গৃহেই 'ফটো'খানি রাখিয়াছে।

আমি—তাহার বাড়ী তো দুইবারই তালাস করা হইয়াছে।

কৃষ্ণগোবিন্দ—তাহারা তালাস করিতে জানে না।

আমি—আপনি কিরূপে তালাস করিবেন?

কৃষ্ণগোবিন্দ—আমাকে তালাস করিতে হইবে না। তোরাবই আমাকে 'ফটো' বাহির করিয়া দেখাইবে।

আমি—এ কি সম্ভব?

কৃষ্ণগোবিন্দ—আচ্ছা দেখিও আমার কথা সত্য হয় কি না।

এমন সময় একখানি সুবৃহৎ গাড়ীর শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। দেখিতে দেখিতে একখানি 'লেণ্ডো' আসিয়া তোরাবের বাড়ীর সম্মুখে থামিল। তোরাব গাড়ী হইতে মাত্র মাটিতে পা দিয়াছে এমন সময় একজন ভিক্ষুক ছুটিয়া আসিয়া বলিল—"দুইটী পয়সা দে মা।" তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই আর একজন অধিকতর বলবান লোক পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিকে সবলে দূরে নিক্ষেপ করিয়া তোরাবের সম্মুখীন হইল এবং কাতর স্বরে পয়সা যাচ্ঞা করিল। দেখিতে দেখিতে একজন একজন করিয়া দশ বার জন বলিষ্ঠ ভিক্ষার্থী তথায় সম্মিলিত হইল এবং ভিক্ষার জন্য পরস্পর ঠেলাঠেলি অবশেষে ভয়ানক মারামারি আরম্ভ করিল। ক্রোধোন্মত্ত ভিক্ষুকদল কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া তোরাব ভয়ে কাঁপিতে লাগিল; তাহার চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল, বদনমণ্ডল আরক্তিম আভা ধারণ করিল।

তোরাবের রক্ষকদ্বয় বহু চেষ্টা করিয়াও অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না। এমন সময় একজন পাদ্‌রি এই বেপমানা মহিলাকে আকস্মিক বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বেগে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু পাদ্‌রি তোরাবের নিকটবর্ত্তী হইবা মাত্র একজন দুর্দ্দান্ত ব্যক্তির বিরাট লাঠির আঘাতে ভূপতিত হইলেন। তাহার মুখ হইতে অনবরত রক্তধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল।

এই সময় ভিক্ষুকের দল ভীত হইয়া একে একে প্রস্থান করিতে লাগিল। এই অবসরে তোরাব দ্রুতপদে ফটকে গিয়া দাঁড়াইল। তখন কয়েকজন সহৃদয় দর্শক আহত পাদ্‌রিকে সাহায্য করিতে উপস্থিত হইলেন।

তোরাব আগ্রহের সহিত তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল—"লোকটা কি গুরুতর আঘাত পাইয়াছে?"

দুই তিনটী লোক সমস্বরে উত্তর করিল—"লোকটা মরিয়া গিয়াছে।"

আর একজন লোক বলিল—"না, না, এখনও মারা যায় নাই; কিন্তু হাসপাতালে নিতে নিতেই মরিয়া যাইবে!

একজন স্ত্রীলোক তোরাবের নিকট অগ্রসর হইয়া বলিল—"এই লোকটী খুব সাহসী। ইনি ছিলেন বলে, না হইলে এই দস্যুগুলি জোর করিয়া আপনার ঘড়ী চেন্ কাড়িয়া লইত।"

আর একজন লোক ব্যগ্রতার সহিত বলিল—"লোকটী নিশ্বাস ফেলিতেছে এখনও মরেনি। তাহাকে এমন ভাবে রাস্তায় ফেলিয়া রাখা উচিত নয়। ইহাকে কি কিছুকালের জন্য আপনার বাড়ীতে রাখিব?"

তোরাব—"বেশ তো। ইহাকে আমার বসিবার ঘরে নিয়া চলুন।"

দুই তিনজন লোক পাদ্‌রিকে বহন করিয়া তোরাবের বসিবার ঘরে লইয়া গেল এবং তাহাকে একটী 'সোফায়' শয়ন করাইল। আমি তখন বসিবার ঘরের জানালার দিকে দৃষ্টিস্থাপন করিয়া কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর সঙ্কেতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। হায়! তখন কি নিদারুণ মর্ম্মবেদনা আমার হৃদয়ে দংশন করিতে লাগিল। এই সুন্দরী ললনার স্নিগ্ধোজ্জ্বল বদনমণ্ডল দর্শন করিয়া আমার ছলনা করিতে ইচ্ছা করিল না; আমি কেন এই ষড়যন্ত্রের সহায় হইলাম। তাহার সহৃদয়তায় আমি আরও লজ্জিত ও মনঃক্ষুব্ধ হইলাম। কিন্তু যখন মনে হইল আমরা তাহার অনিষ্ট করিবার জন্য এই ছলনা করিতেছি না; তোরাব যাহাতে রাজার ক্ষতি করিতে না পারে আমরা তাহারই উপায় করিতেছি মাত্র, তখন হৃদয় সবল হইল, চিত্ত দৃঢ় হইল। এই সময়ে গৃহে প্রচুর বায়ু প্রবাহিত হইবার

জন্য বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইল; আমিও সেই মুহূর্ত্তে কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর সংকেত প্রত্যক্ষ করিলাম এবং ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া হস্তস্থিত হাউইএ অগ্নি সংলগ্ন করিয়া গৃহাভ্যন্তরে নিক্ষেপ করিলাম ও 'আগুন আগুন' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম। আমার চীৎকার শুনিয়া আরও ১২।১৪ জন স্ত্রীলোক ও পুরুষ 'আগুন আগুন' বলিয়া ভীষণ চীৎকার করিল। কক্ষ হইতে প্রচুর ধূমরাশি জানালা দিয়া বাহির হইতে লাগিল। আমি দেখিতে পাইলাম কয়েকটী লোক গৃহ মধ্যে ভয়ে ছুটাছুটি করিতেছে। কিয়ৎক্ষণ পর আমি কৃষ্ণগোরিন্দ বাবুর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। তিনি সকলকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিতেছেন—"আগুন নয়,এই লোকগুলি আমাদিগকে অকারণ ভয় দেখাইতেছে।"

আমি তৎক্ষণাৎ তোরাবের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিলাম এবং কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর কথা মত গলির কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। অল্পকাল মধ্যেই কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইলেন।

তিনি আমাকে বলিলেন—"ডাক্তার! তোমার কাজটী বেশ সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিয়াছ।"

আমি—ফটো কি হস্তগত হইয়াছে ?

কৃষ্ণগোবিন্দ—হস্তগত হয় নাই, কিন্তু ফটো কোথায় আছে দেখিয়াছি।

আমি—কিরূপে দেখিলেন ?

কৃষ্ণগোবিন্দ—আমিতো পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম যে তোরাবই আমাকে ফটো দেখাইবে।

আমি—আপনার কথা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

তখন কৃষ্ণগোরিন্দ বাবু সহাস্যে বলিলেন—"ডাক্তার! তোমাকে সকল কথা খুলিয়া বলিতেছি।

সন্ধ্যার সময় তোরাবের বাড়ীর সন্মুখে যে সকল স্ত্রী পুরুষ সমবেত হইয়াছিল ইহারা সকলই আমার আজ্ঞাবহ অনুচর মাত্র। ভিক্ষুকদিগের ঝগড়া, আমার মূর্চ্ছা ও পতন সকলই ভাণ। আমি সঙ্গে করিয়া এক শিশি লাল রং লইয়াছিলাম, মাটিতে পড়িয়া ঐ রং দ্বারা আমি মুখ রঞ্জিত করিয়া দেই। সন্ধ্যার অস্পষ্টালোকে তাহাই রক্ত বলিয়া তোরাবের ভ্রম হইয়াছিল। তারপর ডাক্তার তোমার অভিনয়; তুমি তোমার কার্য্য অতি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছ। তোমার দক্ষতায়ই আমি সকলমনোরথ হইয়াছি। গৃহে আগুন লাগিলে সকলেই

সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান সামগ্রী উদ্ধার করিতে ব্যস্ত হয়। মাতা সন্তানের কাছে ছুটে, কুমারী মূল্যবান অলঙ্কারের বাক্স টানিয়া বাহির করে। আমি জানি তোরাবের নিকট ঐ রাজার "ফটোগ্রাফ্" অতি মূল্যবান, সুতরাং আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল গৃহে আগুন লাগিয়াছে শুনিলে সে নিশ্চয়ই সর্ব্বাগ্রে "ফটো"খানি উদ্ধার করিতে ব্যাকুল হইবে। বাস্তবিক তাহাই হইয়াছে। গৃহ যখন ধূমরাশিতে আচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং বাহিরে যখন "আগুন আগুন" বলিয়া প্রবল চীৎকার উত্থিত হইল তখন তোরাব আর নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না, সে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া গৃহ প্রাচীরের একটী ক্ষুদ্র ছিদ্রে হস্ত প্রদান করিল। সে "ফটোখানি" অর্দ্ধেক বাহির করিয়াছিল মাত্র, কিন্তু যখন আমি বলিলাম আগুন লাগে নাই, উহারা মিছি মিছি চীৎকার করিয়াছে তখন সে ফটোখানি আবার পূর্ব্বস্থানে রাখিল এবং নিক্ষিপ্ত "হাউই" বাজীটার উপর একবার কটাক্ষপাত করিয়া কক্ষান্তরে প্রস্থান করিল। আমি তখন "সোফা" হইতে উঠিলাম। একবার ইচ্ছা হইল ফটোখানি এখনই আত্মসাৎ করিয়া লই কিন্তু তোরাবের কচোয়ান্ সেই সময় আমার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বসিয়াছিল, সুতরাং তাড়াতাড়িতে কার্য্য পণ্ড হইবে মনে করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিলাম।"

আমি আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম ইহার পর কি করিবেন?

কৃষ্ণগোবিন্দ—এখন কাজ একমত শেষ হইয়া আসিয়াছে বলিলেও হয়। কাল প্রত্যূষে রাজাকে নিয়া তোরাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিব। ইচ্ছা করিলে তুমিও আসিতে পার। তোরাব আটটার পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করে না। শয়ন-গৃহ হইতে বাহির হইয়া তোরাব যখন আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বসিবার ঘরে আসিবে তখন সে আমাদিগকেও দেখিবে না এবং 'ফটো'ও পাইবে না।

আমরা রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটার সময় কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। এই সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে বলিল—"নমস্কার কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু!—ভাল আছেন তো?"

তখন রাস্তায় অনেক লোক যাতায়াত করিতেছে। ইহাদের মধ্যে একটী তরুণ বয়স্ক "অলেষ্টার" পরিহিত সুন্দর যুবক দ্রুতপদে চলিয়া যাইতেছে দেখিতে পাইলাম। আমার মনে হইল সেই যুবকই কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুকে নমস্কার জানাইয়াছে।

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু বলিলেন—"এই কণ্ঠস্বর আমি পূর্ব্বে আরও শুনিয়াছি।

কিন্তু রাস্তার জনতার মধ্যে যুবক কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল!

সেই দিন কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর বাড়ীতেই রাত্রি-যাপন করিলাম। পর দিন প্রাতে আমরা চা'র টেবিলে বসিয়াছি এমন সময় রাজা স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা কিছু ব্যগ্রতার সহিত বলিলেন :—

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু! কার্য্য উদ্ধার করিতে পাড়িয়াছেন কি?

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু—এখনও পারি নাই, তবে আশা আছে।

রাজা—আমার আর বিলম্ব সয় না।

কৃষ্ণগোবিন্দ—একখানি গাড়ী ডাকিলেই এখন বাহির হইতে পারি।

রাজা—আমার 'ব্রুহাম' দ্বারে অপেক্ষা করিতেছে।

তখন কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর অভিপ্রায় অনুসারে রাজা ও আমি তাঁহার সহিত চলিলাম। গাড়ী পেয়ারা বাগান অভিমুখে ছুটিল। কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু রাজাকে বলিলেন—গত কল্য তোরাবের বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

রাজা—কাহার সহিত?

কৃষ্ণগোবিন্দ—একজন বাঙ্গালী ব্যারিষ্টারের সহিত।

রাজা—তোরাব তাহাকে ভালবাসিতে পারে না।

কৃষ্ণগোবিন্দ—আমার বিশ্বাস সে তাহাকে ভালবাসে।

রাজা—আপনার এরূপ বিশ্বাস হইবার কারণ কি?

কৃষ্ণগোবিন্দ—তাহা হইলেই আপনার ভয়ের কোন কারণ থাকে না। তোরাব তাহার স্বামীকে ভালবাসিলে সে আর আপনার প্রেমের প্রত্যাশী হইবে না, সুতরাং আপনার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার জন্য আর চেষ্টা করিবে না।

রাজা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"ইহা সত্য; কিন্তু তোরাব রাণী হইবারই উপযুক্ত রমণী।" এই কথা বলিয়া তিনি মৌনভাবাবলম্বন করিলেন।

তখন আমরা তোরাবের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। গাড়ী থামিলে আমরা নামিলাম। দ্বার দেশে একটী স্ত্রীলোকের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। স্ত্রীলোকটী কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর প্রতি তীব্র কটাক্ষ পাত করিয়া বলিল:—

আপনার নাম বোধ হয় কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু।

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু—হাঁ।

স্ত্রীলোক—আমার কর্ত্রী বলিয়া গিয়াছেন আপনি আজ এ গৃহে আগমন করিবেন। তিনি আজ প্রাতে রেঙ্গুন চলিয়া গিয়াছেন।

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু চমকিত হইয়া বলিলেন—কি! তিনি একবারে এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন?

স্ত্রী—হাঁ; তিনি আর ফিরিবেন না।

রাজা অধিকতর ব্যাকুল হইয়া বলিলেন—সব আশা ফুরাইল!

"আচ্ছা, একবার দেখা যাউক"—এই বলিয়া কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু বেগে গৃহে প্রবেশ করিলেন। আমরা তাহার অনুসরণ করিলাম।

গৃহে প্রবেশ করিয়া কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু প্রাচীরের একটী ক্ষুদ্র ছিদ্রে হস্ত প্রদান করিলেন এবং তিনি ইহার ভিতর হইতে একখানি চিঠি ও একটী 'ফটো' বাহির করিলেন। কিন্তু আমরা যে 'ফটো' খুজিতে ছিলাম উহা সেই ফটো নয় ইহা তোরাবের নিজের 'ফটো।' চিঠিখানি কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর নামে লিখিত।

চিঠিখানি কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু খুলিয়া পাঠ করিলেন। চিঠিখানি এইরূপ—

প্রিয় কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু,

আপনি একজন অদ্বিতীয় "ডিটেকটিভ্" আপনার শক্তি অসামান্য। আমি পুর্ব্বেই আপনার নাম শুনিয়াছিলাম এবং অনুমান করিয়াছিলাম, রাজা কলিকাতা আসিয়া আপনার সাহায্য গ্রহণ করিবেন। আমার অনুমান সত্য হইয়াছে তাহা লিখা বাহুল্য। যে দিন রাজা কলিকাতা পদার্পণ করিয়াছেন সেই দিন হইতে আপনার উপর আমার তীক্ষ্ণদৃষ্টি। তথাপি অসামান্য বুদ্ধিবলে আপনি প্রায় কার্য্যোদ্ধার করিয়া আনিয়াছিলেন কিন্তু আগুনের ব্যাপার যে মুহূর্ত্তে ঘটে, সেই সময়েই আমার চৈতন্য হয়। তথাপি আপনার ন্যায় বৃদ্ধ পাদরিব অনিষ্ট করিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। কচোয়ান্ কে আপনার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে বলিয়া আমি কক্ষান্তরে গিয়া পুরুষের বেশ ধারণ করিলাম। এ বেশ আমি আবশ্যক মত অনেকবারই ধারণ করিয়াছি। আপনি আমার বাড়ী হইতে প্রস্থান করিলে আপনার অনুসরণ করি। আপনার দ্বারদেশে একজন বালক আপনাকে অভিবাদন করিয়াছিল বোধ হয় আপনার স্মরণ আছে,—আমিই সেই বালক।

তার পর আমি আমার স্বামীর বাসায় গমন করি। তাহার নিকট সকল কথা বলিলে এই স্থান ত্যাগ করিয়া যাওয়াই তাহার পরামর্শ হইল। কুমীরের সহিত ঝগড়া করিয়া জলে বাস করা, আর মহাশয়ের ন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত ভারতবর্ষে বাস করা প্রায় সমান। আমরা রেঙ্গুনে চলিলাম। আপনি আসিয়া পিঞ্জর খালি দেখিবেন।

"ফটোগ্রাফ" সম্বন্ধে রাজাকে নিশ্চিন্ত থাকিতে বলিবেন; তাহার আর কোনও

অনিষ্ট আমি করিতে চাই না। আমি আত্ম-রক্ষার জন্য এই অব্যর্থ অস্ত্র রাখিতেছি। এই অস্ত্র আমার নিকট থাকিলে রাজা ভবিষ্যতে আমার অনিষ্ট করিতে সাহস পাইবেন না। আমার নিজের একটী ফটো রাখিয়া গেলাম। রাজা ইচ্ছা করিলে আমার স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ ইহা রক্ষণ করিতে পারেন। এখন কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু! বিদায় হইলাম। বিনীতা—

তোরাব।

রাজা পত্রখানি নিবিষ্ট চিত্তে শ্রবণ করিয়া বলিলেন—কি অসাধারণ বুদ্ধিমতী রমণী! কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু! আমি তো আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম তোরাবের অসামান্য দূর-দৃষ্টি! হায়! তোরাব-ই রাণী হইবার উপযুক্ত মহিলা! তোরাব যদি সম্ভ্রান্ত হিন্দু কুলে জন্মগ্রহণ করিত, তবে আমি তাহাকে আজ জীবন-সঙ্গিনী করিয়া কত সুখী হইতাম।" কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু বলিলেন—মহাশয়! আমি আপনার কার্য্যোদ্ধার করিতে সমর্থ হইলাম না তজ্জন্য বড়ই লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়াছি।

রাজা—আপনার লজ্জিত হইবার কোনই কারণ নাই। আপনি আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। তেরাব যখন বলিয়াছে আমার অনিষ্ট করিবে না তখন আর আমার চিন্তা নাই। তাহার কথার অন্যথাচরণ সে কখনও করে না। ফটোখানি পুড়িয়া ফেলিলে আমি যেমন নিশ্চিন্ত হইতাম এখনও তেমনি নিশ্চিন্ত হইয়াছি।

কৃষ্ণগোবিন্দ—মহাশয় নিশ্চিন্ত হইয়াছেন শুনিয়া আমিও আনন্দিত হইলাম।

রাজা—আমি আপনার নিকট চির-ঋণী রহিলাম। যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কার স্বরূপ এই অঙ্গুরিটী গ্রহণ করুণ।

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু—মহারাজ, যদি পুরস্কারই দিতে চান তাহা হইলে একটী মূল্যবান জিনিস আমি যাচ্ঞা করিতে চাই?

রাজা—সেই জিনিসটী কি?

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু—তোরাবের ফটোখানি।

রাজা একটু চমকিত হইয়া বলিলেন—তোরাবের ফটো! আচ্ছা তাহাই গ্রহণ করুণ। কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু ফটো লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু একজন স্ত্রীলোকের চতুরতায় কিরূপ ব্যর্থ-মনোরথ হইয়াছিলেন আজও তিনি তাহার বন্ধুবান্ধবের নিকট গল্প করিয়া থাকেন। তাঁহার মুখে তোরাবের প্রশংসা ধরে না।* শ্রীঅঃ—

---

* Adventures of Sherlock Holmes হইতে গৃহীত।

প্রার্থনা।

অসীম অনন্ত তুমি,—ক্ষুদ্র শক্তি মম,
কেমনে পাইব বল তোমার সন্ধান ?
তব রূপ চারিদিকে দেখি অনুপম,
তোমায় না পেলে নাথ! জুড়াবে না প্রাণ
মধুর প্রভাতে কিম্বা গোধূলি-বেলায়
তোমার মাধুরী-রাশি হ'তেছে ক্ষরিত,
প্রদীপ্ত এ বিশ্ব তব আলোক-মালায়,
তোমারি সৌন্দর্য্যে ধরা সদা সুসজ্জিত।
সত্যের বিমল করে নাশি কুহেলিকা
দেখাও কোথায় তব অমৃত-আধার,
চুমিতে ও পাদ-পদ্ম, হে জীবন সখা!
ব্যাকুল মানস-ভৃঙ্গ আছে অনিবার।
নিস্পন্দ তন্ময় চিত্তে মৌন-মগ্ন হ'য়ে
রহিব নীরবে তব সৌন্দর্য্যে ডুবিয়ে।

শ্রীবিন্দুবাসিনী দাসী।

অক্সিজেন।

(অম্লজান)

দুইটী ছোট কাচের নল নেও; নলের এক মাথা খোলা ও এক মাথা বন্ধ। নল দুইটী জলে পূর্ণ কর এবং অঙ্গুলীদ্বারা খোলা মুখ বন্ধ রাখিয়া একটী কাচের জল পাত্রে খোলা মুখের দিকটা অল্প ডুবাইয়া দেও। নল দুইটী স্থান চ্যুত না হয় তজ্জন্য কিছু দিয়া আটকাইয়া রাখ। কাচের নল হইতে জল পড়িয়া যাইবে না। বায়ুর চাপে নলের মধ্যে উপরেই থাকিবে।

বৈদ্যুতিক ব্যাটারির তারের দুই মাথা দুইটী নলের ভিতর প্রবিষ্ট করাইয়া দেও। এখন ব্যাটারি ও তারের মধ্যে বিদ্যুৎ চলিতে থাকিবে। কাচের নলের ভিতর যে জল আছে তাহা লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে যে জলের মধ্যে বুদ্বুদ

উঠিতেছে এবং কাচের নলের ভিতরকার জল কমিয়া যাইতেছে। আরও দেখিতে পাইবে যে, যে অনুপাতে এক নলের স্থান খালি হইতেছে তাহার দ্বিগুণ অনুপাতে অপর নলের স্থান খালি হইতেছে। একটী নল সম্পূর্ণ খালি হইবা-মাত্র দুইটী নল উঠাইয়া আন। যে নল সম্পূর্ণ খালি হয় নাই তাহার জল উঠাইয়া আনিবার সময় পড়িয়া যাইবে।

দুইটী শুষ্ক পাটশলায় আগুন ধরাইয়া দেও, এখন প্রজ্জলিত দুইটী পাটশলার মাথা দুইটী নলের ভিতর দেও। একটার আগুন নিভিয়া যাইবে ও একটা অধিকতর তেজে জ্বলিতে থাকিবে। একটী নলের ভিতর হাইড্রোজেন ও অপরটীর ভিতর অক্সিজেন আছে। যে নলটী বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার সময় সম্পূর্ণ জল শূন্য হইয়াছিল তাহাতে হাইড্রোজেন আছে। বৈদ্যুতিক ক্রিয়ায় জল দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া এক নলে হাইড্রোজেন ও অপর নলে অক্সিজেন গিয়াছে।

বিদ্যুতের সাহায্যে সাধারণতঃ অক্সিজেন প্রস্তুত করা হয় না। বাজারে ক্লোরেট অব পটাস বলিয়া চিনির মত দেখিতে এক প্রকার সাদা জিনিস পাওয়া যায়। বালকেরা ক্লোরেট অব পটাস ও মনঃশিলা মিশাইয়া পাথরের সহিত কাগজে মোরাইয়া পটাস বাজী প্রস্তুত করে; উহা মাটিতে মারিলে বন্দুকের ন্যায় শব্দ হয়। কাচের শিশিতে ক্লোরেট অব পটাস রাখিয়া উত্তাপ দিলে অক্সিজেন বাহির হইয়া আইসে। বাঁক-নলের মধ্য দিয়া এই অক্সিজেন সংগ্রহ করিতে হয়। অতি সাবধানতার সহিত এইভাবে অক্সিজেন প্রস্তুত করিতে হয়। সময় সময় কাচপাত্র ফাটিয়া সাংঘাতিকরূপে আঘাত প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব নহে।

মার্কুরি অক্সাইড্, মেঙ্গেনিস দ্বি অক্সাইডে উত্তাপ দিলে অক্সিজেন বহির্গত হয়। মেঙ্গানিস দ্বি অক্সাইড্ লোহার মরিচার ন্যায় একটী পদার্থ। ক্লোরেট অব পটাস ও মেঙ্গেনিস দ্বি অক্সাইড্ একত্র করিয়া উত্তাপ দিলে অপেক্ষাকৃত অল্প উত্তাপেই অক্সিজেন বাহির হইয়া আইসে।

আমরা দেখিয়াছি যে অক্সিজেন দহন ক্রিয়ার সাহায্য করে। অক্সিজেন বায়ুতে আছে বলিয়াই আগুন জ্বলে। কয়লার আগুনে ফু দিলে আগুন তেজে জ্বলে এবং তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, তাহার কারণ আগুনে অধিক বায়ু দেওয়াতে অধিক অক্সিজেন পায়। কামারের হাপরের বাতাস ও মুখের ফু'তে মূলতঃ কোনও প্রভেদ নাই। সাধারণ হাপরের সাহায্যে আগুনের তেজ এত বৃদ্ধি পায় যে লোহা গলনোন্মুখ হয় এবং সেই অবস্থায় একটী লোহা অপর একটী লোহার সহিত অল্প আঘাতে মিশিয়া যায়; ইহাকে "ওয়েলডিং" করা বলে।

জুয়েল ল্যাম্পের চিমনির ভিতর দিয়া বায়ু প্রবাহিত করিবার উপায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে এ জন্য জুয়েল ল্যাম্প তেজে জ্বলে।

বারুদে আগুন লাগাইয়া দিলে দ্রুতবেগে দহনকার্য্য হইয়া বহু পরিমাণ বাষ্পের সৃষ্টি হয়। কোন রুদ্ধ স্থানে এই বাষ্পের সৃষ্টি হইলে বিস্ফোটন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। বারুদের মধ্যে পোটাসিয়াম নাইট্রেট্ সোরা আছে। পোটা-সিয়াম নাইট্রেটকে অক্সিজেন বাহক বলা যায়। কোন দহনশীল জিনিসের সহিত সোরা মিশাইয়া আগুন দিলে সোরা হইতে অক্সিজেন দ্রুত বাহির হইয়া দ্রুতবেগে দহনকার্য্য সম্পাদন করে। বারুদে কয়লা ও গন্ধক দুইটী দহনশীল জিনিস আছে।

কোনও দহনশীল জিনিসের সহিত ক্লোরেট অব পোটাস মিশাইলে সামান্য আঘাতেই অক্সিজেন বাহির হইয়া পরে। একারণ ক্লোরেট অব পোটাস ও গন্ধক মিশাইয়া বন্দুক-কামানের জন্য বারুদ প্রস্তুত হইতে পারে না।

বায়ুতে অক্সিজেন প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। জীব-জন্তু নিশ্বাসের সঙ্গে বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করে। অক্সিজেন ফুস্ফুসে প্রবেশ করিয়া শরীর হইতে কার্ব্বন (অঙ্গার) গ্রহণ করিয়া কার্ব্বন দ্বি অকসাইড বাষ্পে পরিণত হয় এবং প্রশ্বাসের সঙ্গে বাহির হইয়া পরে। ফুস্ফুসের মধ্যে অক্সিজেন সর্ব্বদা ধীরে দহন কার্য্য করিতেছে। ইহাতে উত্তাপের সৃষ্টি হইয়া হৃদ্পিণ্ডের ক্রিয়া চলিতে থাকে। ইহাতে শরীর হইতে অঙ্গার ক্ষয় হয় বটে কিন্তু আমরা আহারদ্বারা তাহার স্থান পূর্ণ করিয়া থাকি।

জলের মধ্যে সামান্য চূণ মিশাইলে তাহা চিনির ন্যায় মিলাইয়া যায়। এই জলের ভিতর অক্সিজেন প্রবিষ্ট করাইলে কোনই পরিবর্ত্তন হয় না কিন্তু এই জলের উপর মুখ দিয়া ফু দিলে সাদা চূর্ণ দেখা দেয়। এই চূর্ণ চকখড়ী ব্যতীত আর কিছুই নহে। জলের চূণ কার্ব্বন দ্বি অক্সাইড্ সহযোগে কেলসিয়াম্ কার্ব্বোনেট অর্থাৎ চকে পরিণত হইয়াছে।

কেবল জীব-জন্তু-শরীরে যে পৃথিবীতে এই ধীর দহনকার্য্য চলিতেছে তাহা নহে অনেক জিনিসের উপর অক্সিজেনের এইরূপ ক্রিয়া হইতেছে। একখণ্ড লৌহ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়া দেও কিছুকাল পর তাহার উপর মরিচা পরিবে। কড়াই পরিষ্কার করিয়া রাখিতে না রাখিতে মরিচা লাগিয়া যায়। মরিচা আয়ার্ণ অক্সাইড্ মাত্র। লোহাতে একবার মরিচা ধরিলে তাহা একটী বহিরাবরণের ন্যায় হইয়া লোহাকে অক্সিজেনের আক্রমণ হইতে রক্ষা করে।

রাসায়নিক উপায়ে লৌহচূর্ণ প্রস্তুত হইলে বায়ুতে আনিবা মাত্র তাহা জ্বলিয়া যায়।

বায়ুতে যদি কেবল অক্‌সিজেন থাকিত তাহা হইলে আমাদের ফুস্‌ফুস এত শীঘ্র ক্ষয় হইত যে আমরা বাঁচিতে পারিতাম না। বায়ুতে নাইট্রোজেন অধিক পরিমাণে থাকিয়া অক্‌সিজেনের ক্রিয়াকে নরম করিয়া দিয়াছে।

একটী বদ্ধ কাচের আবরণ মধ্যে, কোন পাত্রে রাখিয়া পারদে উত্তাপ দিলে পারদের উপরি ভাগ রক্ত বর্ণ ধারণ করে। অর্থাৎ পারদ ক্রমে মার্করি অক্‌সাইডে পরিণত হয়। মার্করি অর্কসাড্‌ লোহার মরিচার সমধর্ম্মী পদার্থ। কাচের আবরণস্থিত অক্‌সিজেন গরম অবস্থায় পারদকে আক্রমণ করিয়া মার্করি অক্‌সাইড্‌ প্রস্তুত করে। এই ভাবে কাচের আবরণস্থিত বায়ুর অক্‌সিজেন ক্রমে ক্ষয় হইয়া যায় এবং নাইট্রোজেন পড়িয়া থাকে। এই অবস্থায় এই কাচের অবরণের ভিতর জ্বলন্ত শলাকা প্রবেশ করাইলে নিভিয়া যায়, আর জ্বলে না।

কতকটা বায়ু নিশ্বাসের সহিত টানিয়া নিয়া কোনও পাত্রে ছাড়িয়া দিলে তাহা পরীক্ষা করিলে দেখিবে যে অক্‌সিজেন কার্ব্বন দ্বি অক্‌সাইডে পরিণত হইয়াছে; নাইট্রোজেন অবিকৃত অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে।

জীব-জন্তু বায়ু হইতে অক্‌সিজেন নিয়া কার্ব্বন দ্বি অক্‌সাইডে পরিণত করিয়া ছাড়িয়া দেয়। পৃথিবীতে জীব-জন্তুর সংখ্যা সামান্য নহে এবং কত যুগ হইল পৃথিবীতে জীব জন্তু বাস করিতেছে। যদি নিশ্বাস প্রশ্বাসে অক্‌সিজেন শুধু ক্ষয় হইত এবং প্রকৃতিতে তাহার পুনরুদ্ধারের পথ না থাকিত, তবে বহু যুগ পূর্ব্বেই পৃথিবী জীব-জন্তুর বাসের অযোগ্য হইত। বায়ুতে যে কার্ব্বন দ্বি অক্‌সাইড্‌ জমে বৃক্ষপত্রের সবুজ অংশ, সূর্য্যালোকে, তাহা গ্রহণ করিয়া অঙ্গার ভাগ লইয়া যায় এবং অক্‌সিজেন বায়ুতে ছাড়িয়া দেয়। এই উপায়ে প্রকৃতি নিজ শক্তিতে অক্‌সিজেনের নিয়ত উদ্ধার সাধন করে। জীবের শরীরের একাংশ বৃক্ষে প্রবেশ করিতেছে। জীব বৃক্ষ হইতে আহার্য্য গ্রহণ করিয়া শরীর পুষ্ট করিতেছে। উদ্ভিদ্‌ ও জীব-জগতের এই আদান প্রদান অতি বিস্ময়জনক ব্যাপার।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মজুমদার।

মনোরথ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৩)

মনোরথ সুবালার নিকট বড়ই অপ্রতিভ হইল। ডিপুটীর মেয়ে সুবালা এরূপ খাটি স্বদেশী হইতে পারিবে সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। মনোরথ পূর্ব্বে মনে করিয়াছিল সুবালাকে তাহার ভবিষ্যৎ কর্ম্মক্ষেত্রের সঙ্গিনী করিতে অনেক বেগ পাইতে হইবে কিন্তু ফল বিপরীত হইল।

সেই ঘটনার পর হইতে সুবালা স্বামীর জন্য নিজ হস্তে পৃথক করিয়া স্বদেশী চিনি দিয়া চা প্রস্তুত করিয়া দিতে লাগিল। চা পান করিতে করিতে প্রতিদিনই মনোরথের মনে হইত, "হায়! একটী অতি সামান্য ঘটনায় আমি সুবালার নিকট কত খাট হইয়া পড়িয়াছি। সুবালা আমাকে কত অপদার্থ মনে করিয়াছে।"

কিন্তু মনোরথের আত্ম-মর্য্যাদা-জ্ঞান অধিক দিন অবিচলিত রহিল না। নীতি শাস্ত্রে বলে সংসর্গগুণে লোকের মতির পরিবর্ত্তন হয়। দীর্ঘকাল ডিপুটী গৃহে বাস করায় মনোরথের যেন স্বদেশ-প্রেম-স্রোত দিন দিন মন্দীভূত হইতে লাগিল। মনোরথ তাহার এই ভাব-পরিবর্ত্তনের প্রতি লক্ষ্য করিতে ছিল কি না বলিতে পারে না তবে পরিবারের সকলই তাহা অনুভব করিতে লাগিল।

মনোরথ বি, এ, পরীক্ষায় পাশ হইয়া আইন পড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু দুই বৎসর পড়িয়া তৃতীয় বৎসরে পরীক্ষা দিতে হইবে। তারপর বহুদিনে কি হয় কে জানে। হয়তঃ বহুদিন দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে। ধনী কন্যা মূর্ত্তিমতী কমনীয়তা, কবিত্বময়ী সুবালা কঠোর গৃহকর্ম্মে পিষ্ট ও শুষ্ক হইবে। এই চিন্তাও তাহার পক্ষে অসহনীয় মনে হইত। তারপরে, একে শ্বশুর গৃহের পারিবারিক জীবনের উচ্চ আদর্শে তার মন আকৃষ্ট, তাহাতে আবার মধ্যে মধ্যে শ্বশুরের কর্ম্মস্থলে নবনিয়োজিত যুবক ডেপুটিগণের সঙ্গে মিশিয়া ক্রমে তার মনে হইতে লাগিল সাংসারিক জীবনে ইহারাই ধন্য! দারিদ্র্য ও গ্রাম্যতা হইতে বহু উচ্চে ইহারা কেমন সুখে, কেমন আরামে জীবন কাটাইতেছেন। তার ভাগ্যে কি এমন হইতে পারে না? শ্বশুর কি তাহাকে— না-না ছি! সে কি কখনও অমন—অসঙ্গত, ও বিসদৃশ কথা মনে করিতে পারে? সে যে দেশের সেবায় আপনার সকল শক্তি দান করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

কিন্তু তার শক্তিই বা এমন বেশী কি? এক বিদ্যা ও জ্ঞান, তা-ত বহু লোকেরই আছে। দেশ,বিদ্যা ও জ্ঞানের কাঙ্গাল নহে। অর্থের কাঙ্গাল। তার যদি বহু অর্থ থাকিত, দেশের সেবায় দান করিয়া দেশের বহু উপকার করিতে পারিত। অর্থ তার নাই কিন্তু উপার্জ্জনে তার শক্তি নিয়োগ করিলে ক্ষতি কি? যদি সে অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে—,প্রকাশ্যে না পারে গোপনে দান করিলেওত কত কাজ হইবে! তবে এটা—এমন অসঙ্গত কাজেই বা কি?

পিতা মাতার নিতান্ত অনুরোধে মনোরথ একবার দেশে গেল। ছেলের দল ও যুবকের দল নাচিয়া উঠিল। মনোরথ বাবু বাড়ী আসে না-ত গ্রামের স্বদেশী যেন মরিয়া যাইতেছে। আবার সভা করিয়া ও সঙ্কীর্ত্তন করিয়া মৃতপ্রায় স্বদেশীকে তাহারা জাগাইয়া তুলিবে। সকলে দল বাঁধিয়া মনোরথের কাছে গেল। মনোরথ কহিল "আচ্ছা পরামর্শ করিয়া যা হয় করা যাইবে।"

মনোরথের কথায় তেমন আগ্রহের কোন লক্ষণ নাই দেখিয়া সকলেই যেন একটু ক্ষুণ্ণ হইল।

মনোরথ তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিল—দ্যাখ ভাই, মিছা হৈ চৈ করিয়া কি হইবে? সভায় ও বক্তৃতায় দেশ উদ্ধার হয় না, কাজ চাই, কাজ কর। এখন Silent work এর দিন। তখন তাদেরই মধ্যে একজন কহিল, তা বটে, তবে মধ্যে মধ্যে বক্তৃতারও দরকার। না হইলে লোকের উৎসাহ থাকে না। কাজ-ত কর্ত্তেই হবে।

মনোরথ কহিল, "তা বটে। তবে বক্তৃতাগুলো বাড়াবাড়ি হ'য়ে যাচ্চে। এমন Powerful Government কে অনর্থক চটিয়ে—কাজে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হচ্চে।"

সত্যপ্রসাদ কিছু মুখর প্রকৃতির ছিল; সে বলিয়া উঠিল, মনোরথের বুঝি ডিপুটী হবার ইচ্ছে আছে। তাই ডিপুটীর জামাই হ'য়ে এখন সুর বদ্‌লে যাচ্চে।"

মনোরথের মুখ লাল হইয়া উঠিল। আত্ম সম্বরণ করিয়া একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া মনোরথ বলিল "তোমরা এমন মনে ক'ল্লে আর কি ক'রবো, যারা কাজ ক'ত্তে চায়, যাদের Statesman like view তারা অবস্থা বুঝে তাদের policy অন্তত: বদ্‌লায়। এর নাম tact and statesmanship. তার পর ধর যদি ডিপুটীই হ'তে পারি, তাতেই বা দোষ কি গবর্ণমেণ্টের কু-নজরে থেকে বাহাদুরী নেওয়া যেতে পারে, প্রকৃত কাজ করা বড় শক্ত কিন্তু চাকরির

একটা mask পরে গোপনে অনেক কাজ করা যেতে পারে।”

নবীন কহিল, “যাক্ ওসব কথায় কাজ নাই। কাজই যদি ক’র্‌তে চাও ভাই, তবে এস গ্রামে আমরা একটা জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করি। তাহা হইলে আমরা দেশের প্রকৃত মানুষ গড়িতে পারিব।”

সকলই একবাক্যে নবীনের কথায় সম্মতি প্রদান করিল। মনোরথও বাধ্য হইয়া কার্য্যে যোগদান করিতে স্বীকার করিল। বিপুল আয়োজনে গ্রামে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ আরম্ভ হইল। কিন্তু কলিকাতার কোন দরকারী চিঠি আসিয়াছে বলিয়া মনোরথ দুই দিন পরই সঙ্গীদিগের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিয়া বিদায় হইল।

মনোরথ এত সতর্ক হইয়াও নিয়তির অনুশাসন ব্যর্থ করিতে সমর্থ হইল না। গ্রাম্য যুবকদিকের নিভৃত কন্‌ফারেন্সেও একজন গুপ্তচর উপস্থিত ছিল। সে মনোরথের tact, policy, statesmanship ও service এর mask ইত্যাদি বিষয় অতিরঞ্জিত ভাষায় জেলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট রিপোর্ট করিল।

(৪)

মনোরথের শ্বশুরের ইচ্ছা মনোরথকে ডেপুটী করাইয়া দেন। এই সময় মনোরথের জেলায় যিনি মাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তাঁর সঙ্গে রমানাথ বাবুর বিশেষ পরিচয় ছিল। সাহেব রমানাথ বাবুকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেন। তাঁর ইচ্ছা মনোরথকে লইয়া তিনি সাহেবের সঙ্গে দেখা করেন এবং বলিয়া কহিয়া একটা Recommendation যোগাড় করেন। ইহার কিছুকাল পরে পূজার ছুটি আসিল। মনোরথ বাড়ীতে গেল; কারণ শ্বশুর-শাশুড়ীকে দেখিবার জন্য মনোরথের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুবালা এবার পূজায় শ্বশুরগৃহে গিয়াছে। পূজার পর রমানাথ বাবু মনোরথদের জেলার সহরে গিয়া জামাতাকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পত্র লিখিলেন। মনোরথ আসিল। শ্বশুর নানা কথার ছলে মনোরথের মনের ভাব বুঝিয়া চাকরির প্রস্তাব করিলেন। মনোরথ একটু ইতস্ততঃ করিয়া স্বীকার করিল।

পরদিন প্রাতে শ্বশুরের একটা বিলাতী কাপড়ের সুট পরিয়া শ্বশুরসহ মনোরথ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠিতে গেল। বিলাতী কাপড়ের পোষাক দেখিয়া মনোরথ প্রথমে একটু আপত্তি করিয়াছিল। কিন্তু শ্বশুর কহিলেন “ওসব পাগ্‌লামো বাবা, এখন ছাড়। তোমার নামে এম্‌নিই কি সব Report আছে তার ঠিক নাই। সাহেবরা আজকাল এ সব বড় লক্ষ্য করে।

আমার এই পোষাকই পর। দরকার হ'লে, এই পোষাকের খাতিরেও কাজ উদ্ধার হইতে পারে।"

মনোরথ আর আপত্তি করিল না। ভাবিল, "যখন চাকরী করিতেই বলিয়াছি, পোষাকে যদি সুবিধা হয় তবে ক্ষতি কি? চাকরী পাইলেও-ত সাহেবদের কাছে যেতে মধ্যে মধ্যে এ সব পরিতে হইবে, আজও না হয় পরিলাম। পরে আমার খাটি স্বদেশী ধর্ম্ম পালনে কে বাধা দিবে?"

উভয়ে সাহেবের কুঠিতে পৌঁছিলেন। কার্ড পাইয়া সাহেব উভয়কে নিজ কামরায় ডাকিলেন। রমানাথ বাবু জামাতাকে সাহেবের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। মনোরথ সসম্ভ্রমে লম্বা সেলাম করিল। সাহেব একটু হাসিয়া 'হাতনাড়া' দিয়া মনোরথকে বসিতে বলিলেন। জীবনে প্রথম এই—সাহেবের সাদর করস্পর্শ। সাহেবের সস্মিত সম্ভাষণে মনোরথের হৃদয়ে কি ভাব উঠিয়াছিল, ধমনীতে শোণিত কি ভাবে ছুটিয়াছিল, জানি না—তবে সূক্ষ্মদর্শী কেহ থাকিলে তার লক্ষ্য হইত, মনোরথের মুখ ভরিয়া, চক্ষু ভরিয়া যেন একটা সলজ্জ উচ্ছ্বাসের আভা উঠিল। মনোরথ বসিয়া ধীরে ধীরে চাপকানের প্রান্ত কুঞ্চিত করিতে লাগিল, গৃহবিস্তৃত চিক্কণ মাদুরের উপর নিঃশব্দে, তাহার চঞ্চল চরণ ধীরে নৃত্য করিতে লাগিল। রমানাথ বাবু আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া জামাতার বিদ্যা ও গুণাবলীর পরিচয় প্রদান করিতে প্রার্থনা জানাইলেন। সাহেব একটু হাসিয়া গৃহান্তর হইতে আপন Confidential Clerkকে ডাকিয়া আস্তে২ কি বলিলেন। কেরাণী লাল ফিতায় জড়ান কতকগুলি কাগজ লইয়া আসিল। সাহেব সেই কাগজ খুলিয়া রমানাথ বাবুকে পড়িতে দিলেন। কাগজ পড়িয়া রমানাথ বাবুর মুখ শুকাইল। সেই সব কাগজে স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম হইতে দিনের পর দিন মনোরথের সকল সভার কথা, বক্তৃতার কথা বিবৃত রহিয়াছে। তার পর আরো সর্ব্বনাশ—গ্রামে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা—তার পর ব্যয়ভার বহনের কথা—Tact, policy, statesmanship, silent work—service এর mask—সকল কথাই রহিয়াছে।

রমানাথ বাবু কাগজ রাখিয়া শুষ্ক মুখে সাহেবের দিকে চাহিয়া কহিলেন, Sir,————"

সাহেব অমনি উঠিয়া কহিলেন, "Well, good morning, Ramanath Baboo. Thank you for your kind visit. But I am busy now".

রমানাথ বাবু উঠিয়া কহিলেন, "But sir he is thoroughly cured of

all those follies now. Consider sir,—he was a mere boy then. But now——

সাহেব কহিলেন, "Well, if he was a boy six months ago, he can't be old enough for service now. He should wait till he is of age".

তার পর—কাগজে তার Tact, statesmanship প্রভৃতির দিকে অঙ্গুলীদিয়া দেখাইয়া সাহেব কহিলেন, "Well I don't think these are a mere boy's words. If they are the boy must be far too clever for our poor service. I say good bye, I am busy„

রমানাথ বাবু আবার বলিলেন, "Sir, he is quite changed now. Please, look at his dress. It's all British made".

সা। Well, that may be a mere mask. Who knows? Good bye.

শ্বশুর জামতা অগত্যা সাহেবকে সেলাম করিয়া নিস্ক্রান্ত হইলেন।

(৫)

মনোরথ নিরাশ হইয়া শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। অনুতাপের তীব্র বৃশ্চিক দংশনে তাহার হৃদয় জ্বলিয়া যাইতেছিল। হায়! মনোরথ কেমনে সকলকে মুখ দেখাইবে। তাহার বন্ধুগণ এই সংবাদ শুনিয়া উপহাস করিবে। মনোরথ বুঝিতে পারিল তাহার কিরূপ অধঃপতন হইয়াছেন। উচ্চ আশাই তাহার এই শোচনীয় পরিণামের কারণ।

আজ মনোরথ ভাবিতে লাগিল কোথায় গেলে সে হৃদয়ের জ্বালা ভুলিতে পারিবে, কে তাহাকে সান্ত্বনা করিবে। সুবালার কথা মনে হইল। কিন্তু সুবালা তো তাহার নৈরাশ্যের কথা শুনিয়া একবিন্দুও সহানুভূতি প্রকাশ করিবে না। আর সুবালার নিকট এই দুঃখের কথা বলিলে যে মনোরথ তাহার কাছে কত হীন হইয়া পড়িবে! মনোরথের চক্ষে জল আসিল!

রাত্রে সুবালার সহিত মনোরথের সাক্ষাৎ হইল। সুবালা অতি সহজেই স্বামীর ভাবান্তর লক্ষ্য করিল; বুঝিতে পারিল আজ তাহার স্বামীর হৃদয়ে প্রবল ঝটিকা বহিতেছে।

সুবালার মনে হইল "হায়! স্বামী যদি আমাকে দুঃখের ভাগী করিতেন তাহা হইলে আমি কত তৃপ্তি লাভ করিতাম। যে দুঃখ তাঁহার পক্ষে দুর্ব্বহ,

হইয়াছে তাহা উভয়ে বহন করিতাম।"

সুবালা সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "আজ তোমাকে এরূপ দেখিতেছি-কেন? নিশ্চয়ই কোন গুরুতর দুঃখের কারণ উপস্থিত। তোমার পায়ে ধরি কি হইয়াছে বল।"

মনোরথের সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। মনোরথ অপরাধীর ন্যায় আদ্যন্ত সকল কথা অনুতপ্ত হৃদয়ে সুবালার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিল।

সুবালা, স্বামীর বিষাদ-মেঘ এক ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া হৃদয়-আকাশ নির্ম্মল করিয়া দিতে প্রয়াস পাইল।

সুবালা বলিল—"এই কথা! ভগবান তোমার সহায় তাই তিনি তোমাকে ব্রত-ভঙ্গ করিতে দেন নাই। তিনি তোমাকে উচ্চতর কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। এ তো সুখের কথা।"

মনোরথ, পত্নীর সান্ত্বনা বাক্য শুনিয়া লজ্জায় মরিয়া গেল। সুবালা স্বর্গের দেবী, মনোরথ তাহার তুলনায় নিজকে নরকের কীট সদৃশ মনে করিতে লাগিল।

মনোরথ ভাবিল—"আমি কেন এ কথা সুবালার নিকট প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে বিষ খাইলাম না!"

সে রজনী মনোরথের অতি কষ্টে প্রভাত হইল।

পরদিবস ৩০শে আশ্বিন। বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে রাখী-উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। সঙ্গীত-ধ্বনিতে গ্রাম্য পথ মুখরিত হইতেছে। মনোরথ শয়নগৃহে কারাবদ্ধ অপরাধীর ন্যায় ম্লানমুখে উপবিষ্ট হইয়া নীরবে গ্রাম্য বালকদিগের সঙ্গীত ধ্বনি শ্রবণ করিতে ছিল আর ভাবিতেছিল দুই বৎসর পূর্ব্বে মনোরথই সকলকে স্বদেশ-প্রেমে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। এমন সময় গৃহে সুবালা আসিয়া উপস্থিত হইল।

সুবালা বলিল—"তুমি এখনও বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছ? "চাকুরির দুঃখ কি এখনো গেল না? ছি!

মনোরথ কহিল—"চাকুরি-ত আমি তোমারি জন্য চাহিয়া ছিলাম, সুবালা!"

সুবালা—"আমার জন্য কেন? তোমার পিতা কখনো চাকুরি করেন নাই; তোমার মা'র কি তা'তে চলে নাই?"

মনোরথ—"মা'র যাতে চলিয়াছে, তোমার কি তা'তে চলিবে?"

সুবালা—"কেন চলিবে না? আমার শাশুড়ীর চেয়ে আমার পদ এমন কি বড় যে চাকুরির টাকা নইলে আমার চলিবে না?"

আমার জন্য তুমি ভেব না। আমি তোমার ঘরের মোটা ভাত কাপড়ে বেশ সুখে আছি ও থাকিব। আর ভুল করো না। মোটা ভাত কাপড়ে বেশ দিন যাবে। দেশের কাজে তোমার সমগ্রশক্তি নিয়োগ কর। আমার এই রাখী হাতে পর, দেখো যেন এর মান থাকে। এই বলিয়া সুবালা মনোরথের হাতে রাখী পরাইয়া দিল।

(সমাপ্ত)

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত।

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ-সমালেচনা।

অমিয় পাঠ—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রায় প্রণীত। মূল্য ৵০ দুই আনা। কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। এই পুস্তকখানি বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রদিগের জন্য রচিত হইয়াছে। আমরা এ পর্য্যন্ত যতগুলি শিশুপাঠ্য পুস্তক দেখিয়াছি তাহাদের মধ্যে 'অমিয় পাঠ' বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এই পুস্তকের ভাষা অতিশয় প্রাঞ্জল, বিষয়গুলি নীতিগর্ভ এবং সুকুমার মতি বালকদিগের উপযোগী। গ্রন্থোক্ত বিষয়গুলি শিশুগণের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য গ্রন্থকার অনেকগুলি সুন্দর চিত্র-সন্নিবেশ করিয়াছেন। অমিয় পাঠের মুদ্রাঙ্কন উৎকৃষ্ট হইয়াছে। এক কথায়, গ্রন্থকার বালকদিগের চিত্তাকর্ষণ করিবার জন্য যত্নের ত্রুটি করেন নাই।

ঠাকুরদাদার ঝুলি—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রণীত। প্রকাশক ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স্, কলিকাতা। মূল্য ২৲ দুই টাকা। আমরা গত বৎসর 'আরতি'তে দক্ষিণা বাবুর "ঠাকুরমার ঝুলি'র সমালোচনা করিয়াছি। এ বৎসর আবার তাঁহার 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি। দক্ষিণা বাবু খনির তিমিরগর্ভে প্রবেশ করিয়া কতকগুলি বিলুপ্তপ্রায় রত্নোদ্ধার করিয়াছেন এবং ঐ সকল রত্ন সুনিপুণ হস্তে গাঁথিয়া তিনি মাতৃ ভাষার কণ্ঠে সুচারু মালা উপহার প্রদান করিয়াছেন।

ঠাকুরদাদার ঝুলি পড়িতে পড়িতে কত পুরাতন কথা প্রাণে জাগিয়া উঠিয়াছে। জীবন-মধ্যাহ্নে সরলতাময় কৈশোর যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। শৈশবে কত আগ্রহের সহিত বিনিদ্র নয়নে ভাই বোন্ সকলে মিলিয়া এই সকল গল্প শ্রবণ করিয়াছি। বাল্যবন্ধুদের কত

মধুর মিলন-অভিনয়-স্মৃতি ঐ সকল গল্পের স্তরে স্তরে বিজড়িত রহিয়াছে। হায়! কালের স্রোতে, অবস্থার পরিবর্ত্তনে ঐ সকল বন্ধুগণ আজ বিচ্ছিন্ন হইয়া কে কোথায় চলিয়া গিয়াছে! ঠাকুরদাদার ঝুলি পাঠ করিয়া আজ যেন আবার তাহাদের মিলন-সুখ অনুভব করিলাম।

এক একটী গল্প শেষ করিয়াছি আর নীরবে কতবার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়াছি। ঠাকুরদাদার ঝুলি পড়িয়া কবি টেনিসনের কথা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি।

That a sorrow's Crown of sorrrw is remembering happier things.

আর্য্যনারী—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত এম্‌-এ ও শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রণীত। মূল্য ১৲ এক টাকা। ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছি। আমাদের বর্ত্তমান নৈতিক অধঃপতনের দিনে এই শ্রেণীর গ্রন্থের যত প্রচার হয় ততই মঙ্গল। দুখঃ-দারিদ্র্য-প্রপীড়িত বাঙ্গালী হিন্দুর হৃদয় জুড়াইবার একটী স্থান ছিল, সেইটী আমাদের অন্তঃপুর। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার খরস্রোত সেই নিভৃত প্রদেশেও প্রবেশ করিয়াছে। ভোগবিলাসের প্রবল বন্যায় হিন্দুর সংযম, আচার, নিষ্ঠা, ধর্ম্মকর্ম্ম সব ভাসিয়া গিয়াছে! ঐহিক সুখই শিক্ষিত নর-নারীর একমাত্র কামনার বস্তু হইয়াছে! আধ্যাত্মিক শিক্ষার অভাবই আমাদের বর্ত্তমান অবনতির কারণ।

'আর্য্যনারী'তে অনেকগুলি আদর্শ রমণীর জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার ভাষা অতি সরল সুতরাং বালিকারাও পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিবে। কিন্তু জীবনীগুলি অতিশয় সংক্ষিপ্ত হওয়াতে গ্রন্থখানি নীরস হইয়াছে। এই শ্রেণীর গ্রন্থের এই দোষ অপরিহার্য্য। চিত্রে সমুদ্রের গাম্ভীর্য্য ও বিশালত্ব পরিব্যক্ত করা অসাধ্য। Lamb's Tales এ শেক্ষপিয়ারের চরিত্র মাধুর্য্য নাই; কেবল সংক্ষিপ্ত উপাখ্যান আছে। এ দোষ গ্রন্থকারদের নয়।

আরতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

৮ম বর্ষ। } ময়মনসিংহ, ফাল্গুন, ১৩১৫। { ৩য় সংখ্যা।

স্বর্গারোহণ।

যাও কবিবর!

সেই অমৃতের দেশে, মণ্ডিত যশের বেশে,

ওই উর্দ্ধে আলোকিত দিব্য দেব-ঘর।

জরা নাই, মৃত্যু নাই, শোক নাই, দুঃখ নাই,

বিরাজে আনন্দে যেথা সকল নির্জ্জর।

আজি কর্ম্ম অবসানে, যাও সেই সুখ-স্থানে,

ফুরালো ধূলির খেলা ধরার উপর।

মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম, হৃদে কৃষ্ণ মোক্ষধাম,

কৃষ্ণ কৃষ্ণ অবিরাম জপে রত কর।

যাও কবিবর।

যাও কবিবর!

ওই-ত সন্ধ্যার শিরে, দেব-রথ নামে ধীরে,

অলক্ত সোপান-শ্রেণী শোভে স্তরেস্তর।

পূরিত নন্দন-বাসে, বিশ্ব বিমোহিয়া আসে

সারথি সে দ্বিতীয়ার দেব সুধাকর।

প্রেমিক কবির দেহ —অমূল্য মণির গেহ,

সে বিনে কে নিবে বল দেবের গোচর।

কিরণে করিয়ে স্নান, অমৃত করিয়ে পান,

বিভূতি চন্দনে চর্চ্চি পূত কলেবর;

গৈরিক বসন পরে, গৈরিক উষ্ণীষ শিরে,
উঠ রথে গরীয়ান্, উঠহ সত্বর।
ফুরায়ে গিয়েছে ভোগ, আজি এ সাধন-যোগ,
উঠ রথী মহামতি, উঠ যোগিবর।
অই শুন হরিধ্বনি, শৈলে শৈলে প্রতিধ্বনি,
উৎকর্ণ সে কর্ণফুলী সহিত সাগর।
সান্ত সে অনন্তে মিশে —জলবিন্দু সিন্ধুচ্ছ্বাসে,
অবোধ আমরা হই বিরহ-কাতর।
যাও কবিবর।

যাও কবিবর!
এই ধূলি এই মাটি, এত নহে নিত্য খাঁটি,
আছে গেহ পরিপাটী ত্রিদিব উপর।
কনক তোরণ-দ্বারে, আগ্রহে প্রতীক্ষা করে',
রয়েছেন দেব-বালা হাতে লয়ে বর।
কুঞ্জে কুঞ্জে অপ্সরার, উথলে সঙ্গীত-ধার,
কি আনন্দ, নহবৎ বাজায় কিন্নর।
স্বর্ণদী, মন্দার-বন, বিকচ কুসুমগণ,
সৌরভে গৌরবে যথা ফিরে পুষ্পশর।
নিত্য যাহা বিশ্বলোকে কাব্যে কল্পনায় দেখে,
কবিতার লীলা-ভূমি সুখের আকর।
যাও হে বঙ্গের কবি, সেই কল্পনার ছবি,
আজিকে হইবে তব নয়নগোচর।
যাও কবিবর।

যাও কবিবর!
বসন্তপঞ্চমী আসে, বাসব বিনোদ-বাসে;
বাণীর অর্চ্চনা করে দেবতানিকর।
তোমাকে লইতে বরি' পাঠায়ে দেছেন হরি,
তুমি হবে পুরোহিত, বঙ্গ-পিকবর।
কল কল কল রবে, মঙ্গল গাহিবে যবে,
অবাক্ হইবে শুনি' অমরী অমর।

পারিজাত পুষ্পাঞ্জলি, "জয় মা ভারতি" বলি,
বঙ্গের হইয়ে দিও চরণ উপর;
নিবেদন করো পায়, তাঁরি আশীর্ব্বাদ, তায়
মুকুলিতা বঙ্গভাষা সরস সুন্দর।
যাও কবিবর!

যাও কবিবর!
বাণী-মন্দিরের পাশে, হীরক-নির্ম্মিত বাসে,
আছেন দয়ার নিধি বিদ্যার সাগর।
বঙ্কিম, হেম, মধু, কাব্য-গগনের বিধু,
আছেন ভারতচন্দ্র কবি-গুণাকর।
আনন্দে তাঁ'দের সনে, চির শান্তি-নিকেতনে,
বঙ্গের মঙ্গল চিন্তা করো নিরন্তর।
যাও কবিবর!

যাও কবিবর!
তুমি যা গিয়েছ রাখি, তাই লয়ে তৃপ্ত থাকি,
মায়ের সে মহামূল্য মাণিক্যলহর—
সে "প্রভাস" সে "পলাশী" "রৈবতক" অবিনাশী,
"কুরুক্ষেত্রে" গাঁথা তব অমিয় অক্ষর।
"অমিতাভ" "রঙ্গমতী" নিত্য ঢালে নব প্রীতি,
"অবকাশ-রঞ্জিনীর" গীতি মনোহর।
নয়নের অন্তরালে, যদিও গিয়েছ চলে,
প্রাণে প্রাণে সত্তা তব জাগে চরাচর।
নয়ন মুদিয়া কবি, হেরিব তোমার ছবি;
নয়ন মেলিয়া কবে কে দেখে অমর?
চিরদিন ভক্তিভরে, কাব্য-সুধা পান করে,
করিবে তর্পণ তব যত নারী নর।
অনন্ত সুখের স্বর্গে যাও কবিবর! *

শ্রীমনোমোহন সেন।

* কবিবর নবীনচন্দ্রের পরলোক গমন উপলক্ষে ময়মনসিংহ সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

উৎকল-প্রসঙ্গ।

আধুনিক "বেঙ্গল" সংজ্ঞার ভিতর ওড়িশা, বেহার ও ছোটনাগপুর অবলীলাক্রমে স্থান লাভ করিয়াছে। আচার ব্যবহারে ওড়িয়াগণ বাঙ্গালীদের নিকটবর্ত্তী। শিক্ষিত ওড়িয়াকে বাঙ্গালী বলিয়াই ভ্রম হয়। রেলগাড়ীর পূর্ব্বে হাঁটাপথে পিতামহীগণ এবং রেলগাড়ীতে নিদ্রা দিয়া সম্প্রতি সকলেই সুদূর জগন্নাথের দেশে গিয়াছেন ও অবিরাম যাইতেছেন। দার্জ্জিলিঙ্গে হিমালয় দর্শন অপেক্ষা পুরীতে সমুদ্র দর্শন সুসাধ্যতর হইয়াছে। কিন্তু উৎকলের স্থূল বিবরণ এখনও অনেকের অজ্ঞাত।

আমরা বলি 'উড়িষ্যা' ও 'উড়িয়া', উৎকলবাসীরা স্বয়ং বলেন 'ওড়িশা' ও 'ওড়িয়া'। ওড়িশার সকলেই প্রাচীন রীতিনীতির পক্ষপাতী। সে দেশে স্কুল কলেজের এলাকার বাহিরে লেখা-পড়ার কাজে এখনও কাগজের বেশী আদর হয় নাই। সাংসারিক জমা খরচ, জমিদারী হিসাব প্রভৃতি এখনও তালপত্রে লিখিত হয়। সুতরাং আদালতের নথিগুলিও তালপত্রের গুরুভারে আক্রান্ত। লোহার তীক্ষ্ণাগ্র সূঁচদ্বারা, বিনা কালীতে, অক্ষর অঙ্কিত করিতে হয়। এজন্য তালপত্রের লেখাগুলি চিরস্থায়ী। বাম হইতে দক্ষিণে সরল রেখায় আঁচর কাটিলে পাতা ছিঁড়িয়া যায়; এজন্য বর্ণমালার ঊর্দ্ধমাত্রারেখা অর্দ্ধবৃত্তাকারে চালনা করিয়া অক্ষর-যোজনা করিতে হয়। বোধ হয় এই কারণে উৎকল বর্ণমালার গঠন গোলাকার।

শব্দের উচ্চারণ বানানের অনুগত। বাঙ্গালার ন্যায় অকারান্ত শব্দের হসন্ত উচ্চারণ নাই। যথা, ফল, ফল্ অ। একটু বাড়াবাড়িও আছে। যথা, ঘি=ঘিঅ; পো (ছেলে)=পোঅ। স্বরবর্ণ ঋ এবং ঌ বাঙ্গালায় রি, লি; ওড়িয়া উচ্চারণ রু, লু। সুতরাং কটকের সামন্ত (শ্রীযুক্ত) হৃদয়কৃষ্ণ মহান্তি মহাশয়ের নিকট ইংরেজীতে চিঠি লিখিতে হইলে Rudaya Krushna বানানে শিরোনামা দিতে হইবে। বাঙ্গালায় ঌ স্বরবর্ণের অস্তিত্ব নাই। কিন্তু ওড়িয়া লেখা-পড়াতে কুশিক্ষিত লোকের উত্তেজনায় উক্ত ঌ বর্ণ 'ল' এর সঙ্গে এখনও জীবন সংগ্রাম করিতেছে। কুশিক্ষিতেরা মুঁ 'কলু' (আমি করিলাম) স্থলে 'ক ঌ' লিখিয়া থাকে। তদ্রূপ, 'দেলু' (দিলাম) স্থলে দে ঌ ইত্যাদি।

৫ই তারিখ, ৬ নম্বর, ৭৲ টাকা, ৮ জন এই কথাগুলি ওড়িয়া ভাষায় যথাক্রমে তা ৫ রিখ, ন ৬ ম্বর, ট ৭৲ কা, জ ৮ ন এইরূপ হইবে। সুশিক্ষিত

ব্যক্তিগণ এইরূপ লিখেন; ছাপার অক্ষরেও ঐরূপ মুদ্রিত হয়। যে দেশে যে নিয়ম। আমাদের দেশে হাতের লেখায় অনেকে 'করিতে করিতে' স্থলে 'করিতে২' লিখেন কেন?

কএকটী ফল ও শস্য বাচক শব্দ নিম্নে প্রদত্ত হইল। আশা করি পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে না।

আম, আঁব… …	আম্ব	আমন ধান … …	শারদ
কাঁঠাল … …	পনস	আশু, আউশ… …	বিয়ালি
নারিকেল… …	নড়িয়া	খরো ধান … …	ডালুয়া
পেঁপে … …	অমৃত ভাণ্ড	তিল … …	খসা
আনারস… …	সপরি	তিসি … …	পিসি
কলা … …	কদলী	পাট … …	ঝঁট

শেষোক্ত ওড়িয়া ঝঁট (পাট) শব্দ হইতেই ইংরেজী Jute শব্দের উৎপত্তি। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির এক সাহেব কর্ম্মচারী ডাক্তার রক্সবরো ১৭৯৫ সনে শিবপুরের বোটানিকাল গার্ডেনে কার্য্য করিতেন। তিনি তাঁহার ওড়িয়া মালীর কাছে ঝঁটের বিষয় অবগত হইয়া উহার চাষ রপ্তানি দ্বারা বিস্তর লাভের কথা বিলাতে ডিরেক্টরদের জানান। ইংরেজী চিঠিপত্রে 'ঝঁট পরিশেষে Jute নাম ধারণ করে। বিস্ময়ের কারণ নাই, কারণ কালীক্ষেত্র হইতেই ক্যাল্‌কাটা নামের সৃজন। ওড়িশার কথিত ভাষাতে অনেক সাধু শব্দের ব্যবহার আছে। যথা;

গাড়ী … …	শকট	চিঠি … …	ভাষা
ষাঁড় … …	ষণ্ড	বাতাস …	পবন
পাতা … …	পত্র	হঠাৎ …	অকস্মাত
কলার পাতা …	কদলী পত্র	স্ত্রী …	ভার্য্যা, ইত্যাদি।

পূর্ব্ববঙ্গেও আছে;—পক্ষী, অঙ্ক, শঙ্খ, পুস্তক প্রভৃতি।

ইদানীং অন্নপ্রাশনের সময় বাঙ্গালীর ছেলের নাম বাছাই করা নিতান্ত সোজা কথা নহে। পিতা মাতা কাব্যোদ্যান হইতে বাছিয়া বাছিয়া 'চারুচিকণ' কত রকমারি নাম চয়ন করেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। হেমচন্দ্র, নয়েন্দ্র. নলিনী. জ্যোৎস্না, কনকলাল, কুসুমকুমার প্রভৃতি মিহি নাম না

হইলে পিতা মাতার মনঃপূত হয় না। বীরভদ্র, গদাধর, প্রভৃতি মোটা আওয়াজের নাম বিলুপ্ত হইতেছে। প্রতিযুগে ব্যক্তিগত নামের 'ফ্যাশন' আলোচনা করিলে জাতীয় ইতিহাসের অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। নিম্নলিখিত উদাহরণ ওড়িশার আধুনিক ব্যক্তিগত নামের আদর্শ বলা যাইতে পারে। আর্ত্তত্রাণ শতপথী, দধিভাবন পাণিগ্রাহী, চতুর্ভুজ পণ্ডা, কৃপাসিন্ধু মহান্তি, পরমানন্দ মহাপাত্র, বীরভদ্র পট্টনায়ক, দামোদর দাস, দৈত্যারি সাহু, কালন্দি রাউত, মাগুনি নাএক, ভিকারী সামল, সপনি বারিক, কন্দ্রু জেনা ইত্যাদি। সংক্ষিপ্ত ডাক নাম যথা; পহলী (প্রহ্লাদ), দনাই (জনার্দ্দন), আন্দ (আনন্দ), যুজিষ্টি (যুধিষ্টির) ইত্যাদি। অনেক ছেলের নাম অপ্রতি (অপ্রত্যয়); অর্থাৎ ইহার বড় সহোদরগণ বাল্যে মৃত; এটী যে বাঁচিবে বিশ্বাস নাই। ব্রাহ্মণীদের পদবী দেবী; কিন্তু অপর স্ত্রীলোকেরা দাসী নহে, "দেয়ী"। যেমন, প্যারীমণি দেয়ী। ইতর জাতীয় স্ত্রী নামের আদর্শ—নাকফুরী বেওয়া।

ওড়িশার হিন্দু রাজাগণ মুক্তহস্তে উপাধি বিতরণ করিতেন। বহু দীনহীন লোক উত্তরাধিকার সূত্রে এই সকল ত্যজ্য উপাধি ভোগ দখল করিতেছেন। 'উত্তর কবাট' রাজ্যের উত্তর দ্বারের রক্ষক। 'দক্ষিণ-কবাট' দক্ষিণদ্বারের প্রহরী। জগন্নাথ-মন্দিরের পূর্ব্ব দ্বারের নাম সিংহদ্বার। উহা সর্ব্বপ্রধান দ্বার। সুতরাং 'পূর্ব্বকবাট' উচ্চতম সম্মান বোধক; এই উপাধিটী জি-সি-এস্-আই এর মত বিরল। একটী উপাধিগ্রস্ত দীর্ঘ নামের উদাহরণ শুনুন। কাননগুই ভুঞা ব্রজমোহন হরিচন্দন মঙ্গরাজ উত্তর কবাট নরেন্দ্র মহাপাত্র মহাশয়।

বাঙ্গালা দলিলের ভূমিকা "লিখিতং শ্রীরামচন্দ্র পিতা ৺দশরথ ইত্যাদি"। এরূপ স্থলে ওড়িয়ায় লিখিতে হইবে—শ্রীরামচন্দ্র পুত্র ৺দশরথ ইত্যাদি। সাকিন লিখিয়া প্রগণা (পরগণা) লেখা চাই। থানা ও পোষ্ট-আপিশ পরিবর্ত্তনশীল, পরগণার নড়চড় নাই।

ব্রাহ্মণেরা মাতাকে 'মা' সম্বোধন করেন বটে; কিন্তু করণ (কায়স্থ) ও নিম্নজাতীয়গণ মধ্যে জননীর ডাক নাম 'বউ'। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ননা, জ্যেষ্ঠা ভগিনী নানী বা অপা। খুড়ার নাম দাদা, জেঠার সম্বোধন বড়বাপ। পিতামহ গোসাই বাপ বা গুস্-বাপ।

বাঙ্গালীদের অনুকরণে শিক্ষিত মহলে তামাক সেবনের জন্য হুকার আদর হইয়াছে। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে হুকাটি কব্জে পাওয়ার এখনও ঢের দেরী।

শালপাতার আবরণে চুরুট প্রস্তুত হয়; ইহাকে ধুঁয়াপত্র কহে। শোলার মুখে চক্‌মকি ঠুকিয়া কৃষকেরা এই চুরুটের ধূমপান করে। কেরাণী বা উকীলের মুহুরীদের কলমের ন্যায় নির্ব্বাপিত চুরুটের অবশিষ্টাংশ তাহারা কানে গুঁজিয়া রাখে; এবং পরে আবশ্যকমত পুনরায় ব্যবহার করে। ওড়িয়াদের মত অহিফেন সেবন প্রিয় জাতি বোধ হয় ভূ-ভারতে আর দ্বিতীয় নাই। গবর্ণমেণ্ট আফিমের মূল্য যতদূর সম্ভব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিতেছেন; কিন্তু তবু কাটতির হ্রাস নাই। এক ভদ্রকের মত ক্ষুদ্র মহকুমাতেই প্রতিমাসে ছয় মণ এই বিষ ক্রয় হয়। ময়মনসিংহের তুলনায় বালেশ্বর অতি ক্ষুদ্র জেলা। সরকারী বার্ষিক রিপোর্টে প্রকাশ, গত বৎসর ময়মনসিংহে (জনসংখ্যা ৩৯ লক্ষ) আফিম বিক্রয় ৩০ মণ; বালেশ্বরে (জন সংখ্যা ১০ লক্ষ) আফিম্ বিক্রয় প্রায় ২০০ মণ। ভাবিবার বিষয় নহে কি? চীনেদের উপর টেক্কা দেওয়ার বেশী বিলম্ব নাই। এ নেসা যাহাকে একবার ধরিয়াছে তাহার আর নিস্তার নাই। সূর্য্য, শস্য বা সলিল বিনা প্রাণ ধারণ বরং সম্ভব, কিন্তু আফিম ছাড়া আফিম সেবীর দেহের ভিতর প্রাণটী কিছুতেই থাকিতে রাজী নহে। একজন বৃদ্ধ ওড়িয়া ভৃত্যের মুখে শুনিয়াছি, বাবু সাহেব, এখন আর তেমন কি দেখিলেন। ছেলেবেলায় আমরা দেখিয়াছি, মা শিশুর মুখে একটু আফিম দিয়া ঘুম পাড়াইয়া গৃহকর্ম্ম করিতে যাইত। শিক্ষার বিস্তার ব্যতীত অহিফেন সেবন কমিবার সম্ভাবনা নাই। অপরিমিত মূল্য বৃদ্ধি করিলে গরীবের স্ত্রীপুত্রের অন্নের পরিমাণ হ্রাস হইয়া থাকে। পাঠকগণ ওড়িয়া ভৃত্য নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে তাহার অহিফেনে অনুরাগ আছে কি না তাহা জানিয়া লইবেন।

বঙ্গদেশে গাত্র-হরিদ্রা প্রথা কেবল বিবাহ প্রভৃতি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ। ওড়িশার স্ত্রীসমাজে হলুদ লেপন সাবান ব্যবহারের ন্যায় দৈনিক ক্রিয়া বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বালক বালিকা যুবতী ও প্রৌঢ়া সকলেই গায়ে হলুদ মাখিয়া স্নান করিয়া থাকে। সুতরাং পরিধান বস্ত্রে হলুদের দাগ সর্ব্বদা বিদ্যমান। প্রাচীন গাত্র-হরিদ্রা প্রথার অনুকূলে কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার আবিষ্কার হইয়াছে কি না জানি না। হলুদে গায়ের রং ফরসা হয় না কি?

উৎকলে পোষ্যপুত্র গ্রহণ প্রথার বড় অপব্যবহার দৃষ্ট হয়। অসঙ্গতিপন্ন গৃহস্থেরাও ঔরসজাত পুত্র থাকা সত্ত্বে আর একটী 'দত্তক' গ্রহণ করিয়া থাকে। নতুবা জীবনের একটী বাসনা যেন অতৃপ্ত রহিয়া যায়। চারি পাঁচটী ছেলে থাকিলে একটীকে নিজ পরিবারের মধ্যেই অন্যকে দান করিতে পারিলে মঙ্গল

অপূর্ব্ব আত্ম-প্রসাদের সঞ্চার হয়। আমি জানি, কোন সমৃদ্ধ পট্টনায়ক পরিবারের এক বৃদ্ধ ভদ্র লোক তিনবার সংসার করেন। প্রথম দুই পক্ষেই উপযুক্ত পুত্র পৌত্রাদি বর্ত্তমান। তৃতীয় পক্ষে আর সন্তান হইল না। তিনি প্রথমপক্ষজাত এক পৌত্রকে তৃতীয় পক্ষের ভার্য্যার কোলে 'দত্তক' রাখিয়া মহাপ্রস্থান করেন!

আশ্চর্য্য বা অনুধাবনের বিষয় এই, প্রাচীন হিন্দু-রীতি-নীতির পূর্ণ প্রভাবস্থল উৎকলে বাল্য-বিবাহ প্রথার সমাদর নাই। ব্রাহ্মণসমাজে অল্প বয়সে কন্যাদান নিন্দনীয় নহে; কিন্তু কায়স্থ বা করণদের মধ্যে সচরাচর যোড়শ বর্ষবয়সে কন্যা সম্প্রদান হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণগণ রজোদর্শনের পূর্ব্বে এবং অপর জাতিগণ উহার পরে কন্যার বিবাহ স্থির করেন। গৃহস্থ ঘরে পঁচিশ বৎসর বয়স্কা কুমারী বিরল নহে। ১০ এর স্থলে ১২, আইনের এই ভ্রমসংশোধন কালে যখন বঙ্গদেশে ভীষণ চীৎকার উপস্থিত হইয়াছিল তখন ওড়িশার লোক বঙ্গবাসীর কাণ্ড দর্শনে একেবারে অবাক হইয়া রহিয়াছিল।

আর এক কথা। ওড়িশার কায়স্থ সমাজে বিবাহের পর কন্যাগণ আর পিত্রালয়ে প্রত্যাগমন করিতে পারে না। সুতরাং বিবাহের মঙ্গলোৎসব ও কোলাহলের ভিতর কন্যার পিতা মাতা যে চেষ্টা করিয়াও হৃদয়ের গুরুপীড়া গোপন রাখিতে পারেন না তাহা বলাই বাহুল্য। এই জন্যই বোধ হয় লোকের বাল্য-বিবাহে প্রীতি নাই। পিতৃগৃহ হইতে বিদায় লইবার সময় নবোঢ়া কন্যা করুণস্বরে যে বিলাপগীতি গান করে তাহা বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। কুমারীগণ শৈশব হইতেই এই বিলাপগান শিক্ষা করিয়া থাকে। দুঃখের বিষয়, স্থানাভাবে কএকটী সানুবাদ গান উদ্ধৃত করিয়া পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারিলাম না। বারান্তরে ইচ্ছা রহিল। পিত্রালয়ে প্রত্যাগমন সম্বন্ধে যে নিষেধ বিধি আছে অর্থবান ব্যক্তিগণ তাহা অবশ্য লঙ্ঘন করিতে পারেন। অর্থে সর্ব্বে বশাঃ। মোট কথা, বিবাহের সময় যৌতুক স্বরূপ জামাতাকে যাহা প্রদত্ত হইয়াছিল পুনরায় তাহা দিতে পারিলে কন্যা পিত্রালয়ে আসিতে পারে। এইরূপ যতবার কন্যা পিতৃগৃহে আসিবে ততবার সমপরিমাণ যৌতুক দিতে হইবে। এই সময় জামাতা সস্ত্রীক শ্বশুরালয়ে শুভাগমন করিলে জামাতাকে স্বতন্ত্র গৃহে রাত্রিবাস করিতে হয়। পিতার আবাসে কন্যার স্বামীসহবাস নিষিদ্ধ।

করণ বা কায়স্থ সমাজে আর একটী কুপ্রথা আছে। উপপত্নীভাবে

গৃহ-পরিচারিকা রাখা নিন্দার বিষয় নয়। দাসীর গর্ভজাত সন্তানগণ "সাগর-পেশা" বা গোলাম-কায়স্থ বলিয়া সমাজে স্থান পায়।

'পখাল' (প্রক্ষালিত অন্ন বা পান্তাভাত) অতি প্রিয় খাদ্য। গৃহস্থেরা রাত্রে প্রচুর পরিমাণে অন্ন রন্ধন করে। তাহার কিঞ্চিৎ আহার করিয়া বাকী সব জল-সিক্ত করিয়া রাখে। পরদিন প্রাতে ও মধ্যাহ্নে উহাই প্রধান ভোজ্য। মান্তান ও পূজারি বা পাচক ব্রাহ্মণদেরও অনেকেই দিনমানে দুই বা ততোধিকবার পখাল ভোজন করিয়া থাকেন। ওড়িশায় Elephantiasis রোগ অতি প্রবল। পণ্ডিতেরা পান্তাভাত ভক্ষণ ইহার কারণ বলিয়া অনুমান করেন।

সকলেই জানেন জগন্নাথ দেবের মন্দিরে দেউলের অভ্যন্তরে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র একত্র একপাত্রে অন্নাহার করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করেন। পুরী সহরে একাদশীর উপবাস নাই। পাণ্ডাগণ বলেন, প্রভু জগদ্বন্ধুর আদেশে "একাদশী" লৌহ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই বলিয়া পাণ্ডারা মন্দিরের প্রস্তর-ভিত্তিতে এক ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সে যাই হোক, শ্রীক্ষেত্রের বাহিরেও একাদশীর নিরম্বু উপবাস নাই। ব্রাহ্মণ ও করণ বিধবাগণ একাদশীতে ফল ও মিষ্টান্ন আহার করিতে পারেন। তাঁহারা করাঙ্গুলির আভরণ (দুই বা ততোধিক স্থূল-গঠন অঙ্গুরীয়) ত্যাগ করেন না। অপর জাতিদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। বয়সে বড় অবিবাহিত দেবরের সম্মতি থাকিলে বিধবা ভ্রাতৃ-জায়া তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। "বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর" চিরবিদিত গানের শেষ চরণ (পছন্দ করেছি বর না হতে হুকুম et seq. স্মরণ করুন।

ওড়িশার ধোপা অতি নিকৃষ্ট জাতি। ইহারা কুক্কুট মাংস ভক্ষণ করে। রজকের দুই কর্ম্ম। কাপড় কাচা এবং জ্বালানি কাষ্ঠ ছেদন। এই দুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন কর্ম্মের ঐক্য কেন জানি না। ঘন ঘন মলিন বস্ত্র আছাড় দেওয়া এবং কাষ্ঠে পুনঃ পুনঃ কুড়ালি প্রহার, এতদুভয়ে শারীরিক ক্রিয়ার সাদৃশ্য আছে বটে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই "সভাসুন্দর" রজক ব্যতীত অন্য কোন জাতি কুড়াল-দ্বারা কাঠ চেলাইতে সম্মত নহে। নগরগত বাঙ্গালীর এই রহস্য জানিয়া রাখা উচিত; নতুবা প্রবন্ধ লেখকের জনৈক বন্ধুর মত অপ্রতিভ হইতে হইবে। বন্ধুবর ভৃত্যকে আদেশ দিলেন, একজন মজুর ডাকিয়া কাঠ চেলাইতে হইবে। ভৃত্য বলিল, হুজুর, আমি তা আগেই ঠিক করিয়াছি; ধোপা কাল আসিবে। বন্ধু বলিলেন, আমি তা বলিনা; কাপড় তেমন ময়লা হয় নাই,

দুই দিন পরে ধোপা আসিলেও চলিবে। এখন রান্নার জন্য কাঠের উপায় কি। গাছ আছে, একটা মজুর ডাক। ভৃত্য উত্তর করিল, বাবুসাহেব, আমিও তাই বলিতেছি, ধোপা কাল আসিবে; বলেন তো আজই ডেকে আনি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপরমেশ প্রসন্ন রায়।

নবীনচন্দ্র।

কবিবর নবীনচন্দ্র আর ইহ জগতে নাই। বঙ্গ-কাব্য গগনের পূর্ণ শশধর চির অস্তমিত হইয়াছেন। আজ বাঙ্গালার ঘরে ঘরে শোকের বিষাদময়ী ছায়া। জন্ম মৃত্যু বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধান; কিন্তু যেমন যায় তেমন তো আর আসে না! জননীর অঙ্ক শূন্য করিয়া এক একটী সন্তানরত্ন খসিয়া পড়িতেছে, কিন্তু তাহাদের স্থান আর পূরণ হইতেছে না।

কবি গিয়াছেন কাব্য রহিয়াছে; কবির জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে কিন্তু তাঁহার প্রতিভার আলোকে বঙ্গভূমি চির সমুজ্জল থাকিবে। নবীনচন্দ্র বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারে যে সকল অমূল্য রত্নরাজি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। যতদিন পৃথিবীতে বাঙ্গালী জাতি থাকিবে, বঙ্গভাষা থাকিবে ততদিন নবীনচন্দ্রের কীর্ত্তির ধ্বংস নাই।

বঙ্গসাহিত্যে নবীনচন্দ্রের স্থান নির্দ্দেশ করিবার শক্তি আমাদের নাই। সমসাময়িক ব্যক্তিরা মহাপুরুষদিগের মহিমা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। মহম্মদ ও যীশু, সক্রেটিস ও গ্যালিলিও হোমার ও সেক্ষপিয়র ইঁহাদের জীবিতকালে আদর হয় নাই বরং ইঁহারা নিগ্রহই লাভ করিয়াছেন। পর্ব্বতের অধিবাসীরা উহার বিশালতা অনুভব করিতে পারে না কিন্তু দূরবর্ত্তী দর্শক অভ্রভেদী গিরিমালার বিরাট গাম্ভীর্য্য দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হয়। নিরপেক্ষ ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগের নিকট নবীনচন্দ্রের অলৌকিক প্রতিভা পূর্ণ প্রতিভাত হইবে। আমরা নবীনচন্দ্রের কাব্যাবলী পাঠ করিয়া তাঁহার কবি প্রতিভার যেরূপ পরিচয় পাইয়াছি এই প্রবন্ধে তাহার ক্ষীণ আভাস মাত্র প্রদান করিতে প্রয়াস পাইব।

নবীনচন্দ্রের কবি-জীবনে তিনটী সুস্পষ্ট স্তর রহিয়াছে। যিনি একটু অভিনিবেশ পূর্ব্বক তাঁহার কাব্য পাঠ করিবেন তিনিই তাহা অনুভব করিবেন।

অবকাশ-রঞ্জিনী প্রথম স্তরের কাব্য, পলাশির যুদ্ধ ও রঙ্গমতী দ্বিতীয় স্তরের কাব্য আর রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস, অমিতাভ গীতা, চণ্ডী ও খৃষ্ট তৃতীয় স্তরের কাব্য। অবকাশরঞ্জিনীতে নবীনচন্দ্রের কবিত্বশক্তি কোরকে, পলাশির যুদ্ধ ও রঙ্গমতীতে স্ফুটনোন্মুখ আর রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রবাসে পূর্ণ বিকশিত। কোরকের সহিত প্রস্ফুটিত কুসুমের যে সম্বন্ধ, নবীনচন্দ্রের প্রথম স্তরের কাব্যের সহিত তৃতীয় স্তরের কাব্যেরও সেই সম্বন্ধ। তাঁহার কাব্যের ভিতর দিয়া তাহার অসামান্য প্রতিভার ক্রমবিকাশ পরিলক্ষিত হয়।

অবকাশ-রঞ্জিনী কবির প্রথম উদ্যমের ফল। এই গীতি-কাব্যে তিনি নব যৌবনের উচ্ছ্বাসরাশি তাঁহার স্বাভাবিক উদ্দীপনাময়ী মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় পরিব্যক্ত করিয়াছেন। নবীনচন্দ্রের সেই হৃদয়োন্মাদক বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া সেই সময়ে গুণগ্রাহী সুধিগণ বলিয়াছিলেন, সারস্বতকুঞ্জে একজন প্রতিভাবান্ কবির আবির্ভাব হইয়াছে।

সুললিত পদ বিন্যাসে নবীনচন্দ্র অদ্বিতীয়। এমন সুমধুর শব্দ-গ্রন্থন-কৌশল আর কহারও দেখি নাই। যিনি অবকাশ-রঞ্জিনী পাঠ করিবেন তিনিই কবির অসামান্য শব্দ চাতুর্য্য ও কবিত্ব-মাধুর্য্য অনুভব করিয়া মুগ্ধ হইবেন। নবীনচন্দ্রের কাব্য ভাষার তাজমহল।

অবকাশ-রঞ্জিনীর "পিতৃহীন যুবক" কবিতায় নবীনচন্দ্র আত্মকাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। কবি মিল্টন যেমন Samson Agonistesএ স্বীয় জীবনের দুর্ব্বিসহ দুঃখ কাহিনী মর্ম্মান্তিক করুণ ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন, নবীনচন্দ্রও "পিতৃহীন যুবকে" তাঁহার জীবন নাটকের একটী বিষাদ পূর্ণ অঙ্ক চিত্রিত করিয়াছেন। এই কবিতার প্রতি ছত্রে অশ্রুর উৎস। তিনি এক স্থানে স্বীয় জীবনের উচ্চ আশা সকল ব্যর্থ হইয়াছে ভাবিয়া গভীর নৈরাশ্যের সহিত লিখিয়াছেন—

আশার অঙ্কুর যত করিনু রোপন
ফলবতী না হইতে হইল নিধন।
জীবনের তরি, বিদ্যা অনন্ত সাগরে
ভাসিয়ে, যাইবে বড় সাধ ছিল মনে
যশের মন্দিরে, যথা আনন্দে বিহরে
অমর কবীশ বৃন্দ, কনক আসনে,
কল্পনার সূত্রে গাঁথি কবিতার হার
সাজাইব মাতৃভাষা দিয়া উপহার।

প্রকাশিলে জ্ঞানচন্দ্র, ফুটিলে নয়ন
প্রবেশিব ধর্ম্মারণ্যে; পঙ্কিল হৃদয়
চৈতন্যের ভক্তি-স্রোতে করি প্রক্ষালন
জুড়াইব অনুতাপ ;——

আজ আর এই কথা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না যে, কবি বাল্যজীবনে যে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলেন তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছে। "যশের মন্দিরে" "অমর কবীশবৃন্দ" যে স্থানে বিরাজিত তিনি আজ তথায় "কনক-আসন" লাভ করিয়াছেন।

পলাশির যুদ্ধ ও রঙ্গমতী দ্বিতীয় স্তরের কাব্য। অবকাশ-রঞ্জিনীতে কবি আপন সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য, প্রেম-বিচ্ছেদ ইত্যাদি হৃদয়োচ্ছ্বাস সুললিত ছন্দে গ্রথিত করিয়াছেন। পলাশির যুদ্ধ ও রঙ্গমতীতে তিনি "ব্যক্তিত্বের" সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া "জাতীয়তার" বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কবির "আমিত্ব" "জাতিত্বে" বিলীন হইয়া গিয়াছে।

"পলাশির যুদ্ধ" সর্ব্বজন-আদৃত কাব্য। পলাশির যুদ্ধই নবীনচন্দ্রের কবিযশঃ সৌরভ দেশ ব্যাপ্ত করিয়াছিল। এই তীব্র উদ্দীপনা পূর্ণ কাব্য পড়িয়া এককালে বাঙ্গালার নরনারী মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়াছিল। "পলাশির যুদ্ধে" কবি বাঙ্গালার জাতীয় ইতিহাসের একটী চিরস্মরণীয় অধ্যায় তাঁহার স্বাভাবিক তীব্র জ্বালাময়ী ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন। "পলাশির যুদ্ধে" কবি যখনই স্বদেশের শোচনীয় অধঃপতনের কথা ভাবিয়া রোদন করিয়াছেন "তাঁহার কবিতা গৈরিক নিস্রববৎ তীব্র উদ্দীপনা উদ্গীর্ণ করিয়াছে।"

রঙ্গমতীতে নবীনচন্দ্রের স্বদেশ-প্রেম উচ্চতর গ্রামে আরোহণ করিয়াছে। পলাশির যুদ্ধের স্বদেশানুরাগের উদ্বেল উচ্ছ্বাস রঙ্গমতীতে জীবন্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে! পূর্ব্বে নবীনচন্দ্র অশ্রুজলে যে স্বদেশ-প্রেম পরিব্যক্ত করিয়াছিলেন রঙ্গমতীতে তাহা রক্ত মাংসের চরিত্র সমাবেশে উজ্জ্বলতর করিয়াছেন। রঙ্গমতীর নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য বর্ণনা অতুলনীয়। বায়রণের Childe Harolde অথবা স্কটের Lady of the Lake এর সহিত ইহার বর্ণনাও কবিত্বের তুলনা হইতে পারে। রঙ্গমতীর সহিত Lady of the Lake এর অনেকটা সাদৃশ্য আছে। স্কট যেমন সুনিপুণ চিত্রকরের ন্যায় তদীয় কাব্যে স্বীয় জন্মভূমির প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী সযত্নে অঙ্কিত করিয়াছেন নবীনচন্দ্রও তেমনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চন্দ্র-শেখরের ঐন্দ্রজালিক মাধুর্য্য রঙ্গমতীতে প্রতিফলিত করিয়াছেন। "সীতাকুণ্ডের"

অপূর্ব্ব শোভা, চম্পক-কানন বেষ্টিত পবিত্র ব্যাসাশ্রমের মনোহর মাধুর্য্য, চারু নির্ঝরিণী "কুমারী কুণ্ডের" মুখর-উচ্ছ্বাস, ভয়াকুল চঞ্চলগতি কুরঙ্গযূথ, বৃক্ষারূঢ় বন্য কুক্কুট দল,—সকলই রঙ্গমতীতে চিত্রিত হইয়াছে। এমন কি ক্ষুদ্র বন্য কুসুমটীর কথাও তিনি বিস্মৃত হন নাই। প্রকৃতির প্রিয় কবি Words-worth এর মত নবীন চন্দ্রেরও

"—the meanest flower that blows can give
Thoughts that do often lie too deep for tear."

এক সময়ে স্কটের গ্রন্থাবলীতে স্কটলণ্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা পাঠ করিয়া ইউরোপের বহুসংখ্যক ভ্রমণকারী, কবির জন্মভূমি দর্শন করিতে যাইতেন; নবীন চন্দ্রের জন্মভূমি কাননকুন্তলা শৈল কিরীটিনী, চট্টলের শোভা দর্শন করিবার জন্য কি বাঙ্গালীর প্রাণ ব্যাকুল হইবে না?

আমরা এখন তৃতীয় স্তরের কাব্যের কথা বলিব।

নবীনচন্দ্র প্রথম যৌবনে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন :—

"প্রকাশিলে জ্ঞানচন্দ্র, ফুটিলে নয়ন,
প্রবেশিব ধর্ম্মারণ্যে";

কবি তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি "ধর্ম্মারণ্যে" প্রবেশ করিয়া ভাব-পুষ্পের যে সুচারু মালা গাঁথিয়া মাতৃভাষার কণ্ঠে উপহার প্রদান করিয়া গিয়াছেন তাহার স্বর্গীয় সৌরভে দুঃখদারিদ্র্য প্রপীড়িত বঙ্গবাসী অনন্তকাল হৃদয়ের জ্বালা ভুলিতে সমর্থ হইবে। নবীনচন্দ্রের রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস, অমিতাভ, গীতা, চণ্ডী ও খৃষ্ট ধর্ম্ম-চিন্তার এক একটী পবিত্র উৎস। আমরা রৈবতক কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসের কথাই বিশেষভাবে আলোচনা করিব। এই তিনটী কাব্যই নবীনচন্দ্রের অবিনশ্বর কীর্ত্তি, এই তিন কাব্যই নবীনচন্দ্রকে "মহাকবির" আসনে স্থাপন করিয়াছে। রৈবতক কুরুক্ষেত্র প্রভাসের ন্যায় কাব্য মহাকবি, ভিন্ন অন্যে লিখিতে পারে না। একজন সমালোচক লিখিয়াছিলেন—"কুরুক্ষেত্রে দেখিলাম বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা নবীনচন্দ্রের মাদকতা বা কবিত্ব মিশ্রিত হইয়া আমাদিগের স্বর্গভ্রান্তি উপস্থিত করিয়াছে। এই দুই শক্তি যদি নবীন বাবুর নিজস্ব হইত, তবে বোধ হয় মধুসূদন ও হেমচন্দ্র তাঁহার অনেক পশ্চাতে যাইতেন। কুরুক্ষেত্রের কল্পনায় নবীনবাবু সম্পূর্ণরূপে বঙ্কিম বাবুর নিকট ঋণী।" সাহিত্যসেবকগণ অবগত আছেন কুরুক্ষেত্রের মৌলিক চিন্তা নবীন বাবুর নিজস্ব, নবীন বাবু বঙ্কিম বাবুর নিকট ঋণী নহেন।

নবীন বাবু, মধুসূধন, হেমচন্দ্রের উপরে কি নীচে সে বিচার করিবার শক্তি আমাদের নাই; নিরপেক্ষ ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা নবীনচন্দ্রের স্থান নির্দ্দেশ করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণের জীবনব্রত—ধর্ম্ম ও ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন এই বিরাট কল্পনা সম্পূর্ণ নূতন। ঐ মৌলিক কল্পনাই নবীনচন্দ্রের বিশেষত্ব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তৃতীয় স্তরে নবীনচন্দ্রের কবি-প্রতিভা পূর্ণ বিকশিত। এখানে তিনি ব্যক্তিত্ব ও জাতিত্ব অতিক্রম করিয়া সার্ব্বভৌম মানবতায় Humanityতে উপনীত হইয়াছেন। আত্ম-প্রেম স্বজাতি প্রেমে বিবর্ত্তিত হইয়া ভগবৎপ্রেম পারাবারে ছুটিয়াছে। আধ্যাত্মতত্বের উচ্চসোপান হইতে কবি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের মানবদেহে ভগবানের পরম আত্মাপ্রত্যক্ষ করিতেছেন—

এক ভগবান সর্ব্বদেহে অধিষ্ঠান
সর্ব্বময় এক অদ্বিতীয়!
কেবা তুমি, কেবা আমি, কেবা শত্রু মিত্র কেবা?
কারে বল প্রিয় বা অপ্রিয়।

নবীনচন্দ্রের ধর্ম্মমত অতি উদার। অমরকবি মিল্টনও তাঁহার স্বধর্ম্মের সংকীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে যাইতে পারেন নাই, কিন্তু নবীনচন্দ্র সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের সীমাবদ্ধ স্থানে বিচরণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন নাই। তিনি বুঝিয়াছেন ধর্ম্ম এক, কেবল সাধন পথ ভিন্ন। কবিবর রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসে যেমন শ্রীকৃষ্ণের জীবন-ব্রত বর্ণন করিয়াছেন, তেমনি "অমিতাভে" মহাযোগী বুদ্ধদেবের "নির্ব্বাণতত্ত্ব" ও "খ্রীষ্টে" ঈশার আত্মত্যাগের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। পরিশেষে মহাত্মা মহম্মদের লীলা বর্ণন করিবার সময় পাইলেন না বলিয়া গভীর খেদের সহিত অমিতাভের উপসংহার করিয়াছেন।

সুবিখ্যাত ইংরেজ সমালোচক মেথু আর্ণল্ড বলিয়াছেন কাব্য জীবন-সমালোচনার নামান্তর। এই সংজ্ঞা নবীনচন্দ্রের কাব্যে সর্ব্বতোভাবে প্রযোজ্য। রৈবতক কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস কাব্যাকারে দর্শন শাস্ত্র। কবি কঠোর দার্শনিকতা ও কবিত্বের সংমিশ্রণে এই তিনটী মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। চিন্তাশীল দার্শনিকের মত নবীনচন্দ্র জীবনের কঠোর সমস্যা সকল মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। জীব, জগৎ ও ঈশ্বর এই তিনের পরস্পরে সম্বন্ধ বিশ্লেষণ করাই রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস কাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয়।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে রৈবতক কুরুক্ষেত্র প্রভাস প্রভৃতি কাব্যের সমালোচনা করা অসম্ভব। আমি কেবল নবীনচন্দ্রের কবি প্রতিভার পূর্ণ পরিণতি

সম্বন্ধে আর দুই একটী কথা বলিয়া এইপ্রবন্ধ শেষ করিব।

কার্লাইল বলিয়াছেন—

Poet is ever as of old, the seer ; whose eye has been gifted to discern the god like mystery of God's universe and decipher some new lines of its celestial writing. [Essays on Goethe]

যিনি কেবল সুললিত শব্দ গ্রথিত করিয়া কবিতা রচনা করেন তাঁহাকে আমরা কবি বলি না। যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিগূঢ় রহস্য সমূহ উদ্ঘাটন করিয়া ভগবানের লীলা পরিব্যক্ত করেন তিনিই কবি।

সুবিখ্যাত ইংরেজ চিত্রকর সার যশুয়া রেণল্ড চিত্র সম্বন্ধে বলিয়াছেন —যাহা প্রকৃতি অপেক্ষা অধিকতর মনোরম, যাহা স্বভাবাতিরিক্ত তাহাই চিত্রকরের অঙ্কনীয়। যাহা নিত্য দৃষ্ট হয়, তাহা আঁকিয়া ফল কি? কাব্য সম্বন্ধেও এ কথা সত্য। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"যাহা প্রকৃতির প্রতিকৃতি মাত্র, সে সৃষ্টিতে কবির তাদৃশ গৌরব নাই। তাহার কারণ সে কেবল প্রতিকৃতি, অনুলিপি মাত্র। তাঁহাকে সৃষ্টি বলা যায় না। যাহা স্বভাবানুযায়ী অথচ স্বভাবাতিরিক্ত, তাহাই কবির প্রশংসনীয় সৃষ্টি।"

আদর্শ সৃজনেই কবির কৃতিত্ব। যে আদর্শ দেখিয়া মানবজাতি বিস্মিত মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত হইবে সে আদর্শ মহান্ বিরাট ও পূর্ণ সৌন্দর্য্যের আধার হওয়া প্রয়োজন। নবীনচন্দ্র মহাকবি; তিনি তাঁহার মহাকাব্যে এক মহান্ উজ্জল আদর্শ অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। অনন্তকাল মানবজাতি সেই আদর্শ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইবে। খণ্ড ভারতে উদার পরার্থপরতা ও মহান্ আত্মত্যাগের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া এক বিরাট মহাভারত প্রতিষ্ঠা নবীনচন্দ্রের আদর্শ; ইহাই তাঁহার দার্শনিকতার মূল মন্ত্র। নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

এক ধর্ম্ম একজাতি
একই সাম্রাজ্য নীতি
সকলের এক ভিত্তি সর্ব্বভূত হিত।
সাধনা নিষ্কাম কর্ম্ম
লক্ষ্য সে পরম ব্রহ্ম
একমেবাদ্বিতীয়ং করিব নিশ্চিত,
ওই ধর্ম্মরাজ্য মহাভারত স্থাপিত।

মহাকবি নবীনচন্দ্রের বিরাট আদর্শ, দেশ বিশেষ বা জাতি বিশেষের সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ নহে। সে আদর্শ, জগতের সমগ্র জাতীর আদর্শ; সে আদর্শ বিশ্বপ্রেমের আদর্শ। ভগবান এক এবং অদ্বিতীয়, বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল মানবে তাঁহার আত্মাবিরাজিত, জগতের হিতসাধনই একমাত্র সনাতন ধর্ম।

"সোঽহং সঙ্গীতে পূর্ণ বিশ্ব সমুদয়!
জগতের সুখ যাহা, আমাদের সুখ তাহা,
সকলে জগৎ সুখে সমর্পিলে প্রাণ,
হয় ধরাতলে কিবা স্বর্গ অধিষ্ঠান!"

কি মহান্ আদর্শ, কি উদার কল্পনা, গভীর বিশ্ব প্রেম। এই আদর্শের সম্মুখে, ক্ষুদ্র স্বার্থ, ক্ষুদ্র প্রেম, ক্ষুদ্র আশা কোথায় তিরোহিত হইয়া যায়। প্রাণ গভীর সার্ব্বজনীন প্রেমে ডুবিয়া যায়।

হে বঙ্গের মহাকবি! তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হউক; তোমার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হউক তোমার স্বপ্ন সত্য হউক।

* * * * * * *

হে বরেণ্য! তোমার জীবন-ব্রত অবসান হইয়াছে, তোমার তপস্যা সফল হইয়াছে। হে কর্ম্মবীর তুমি কঠোর সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছ। যাও বাণীবর-পুত্র! দিব্যধামে গিয়া চিরশান্তিলাভ কর; কবিকুঞ্জে মধুসূদন-বঙ্কিম-হেমচন্দ্রের সহিত মিলিত হও। তোমার যে হৃদয় উন্মাদক পীযূষবর্ষী বীণার ঝঙ্কারে বাঙ্গালী মুগ্ধ হইয়াছিল সেই বীণা ধ্বনিতে নন্দন কানন মুখরিত কর।

হে বঙ্গকবিকুঞ্জপিক! আমরা তোমারজন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করিব না। আমরা তোমার বিরহ শোকে মুহ্যমান হইব না। হে ভগবৎ প্রেম বিহ্বল কবি! তুমিই শিখাইয়াছ, স্বর্গে মর্ত্ত্যে সম্বন্ধ আছে। হে বিশ্বাসিন্ তুমিই বুঝাইয়াছ মানবাত্মা অবিনশ্বর। তোমার নশ্বরদেহ মাটিতে মিশিয়াছে, দেহ কারাগার ভগ্ন করিয়া তোমার পবিত্র আত্মা আজ বঙ্গবাসীর আত্মায় আত্মায় মিশিয়াছে; আগে দূরে ছিলে এখন প্রাণে আসিয়াছ; মৃত্যু ব্যবধান দূর করিয়া দিয়াছে। হে অমর কবি! আজ স্বর্গ হইতে আশীর্ব্বাদ কর বাঙ্গালী তোমার মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া মনুষ্যত্ব লাভ করুক।

মহর্ষি বৌধায়ন।

মহর্ষি বৌধায়ন একজন ধর্ম্মশাস্ত্রকার। বৌধায়নসূত্র প্রকাশিত হইয়াছে এবং ইয়োরোপীয় কোন কোন ভাষায় তাহার অনুবাদ হইয়াছে।

মহর্ষি বৌধায়ন কোন্ সময় জীবিত ছিলেন তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। বর্ত্তমান সময়ে যে সমস্ত স্মৃতি সংহিতা দৃষ্ট হয়, তাহার কোন কোন গ্রন্থ সূত্রাকারে লিখিত, অবশিষ্ট অধিকাংশই পদ্যময়। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে সূত্রাকারে রচিত সংহিতাগুলি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। গৌতম সংহিতা, বৌধায়ন সংহিতা, আপস্তম্ব সংহিতা এবং বশিষ্ট সংহিতা সূত্রাকারে রচিত। কিন্তু সংহিতার প্রাচীনত্বদ্বারা ঋষির কাল নির্ণয় করা যায় না।

এক্ষণ আর্য্য সমাজে যে সমস্ত সংহিতা প্রচলিত আছে তন্মধ্যে মনুসংহিতার আদর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

মন্বর্থ বিপরীতা যা সা স্মৃতি র্ন প্রশস্যতে।

কিন্তু এ কথা প্রকৃত নহে কারণ বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে মিতাক্ষরা প্রচলিত, মিতাক্ষরা যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির টীকা, এবং যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির বচন অনুসারে এক্ষণ ভারতের সর্ব্বত্র দায়াধিকার নির্ণয় হইয়া থাকে।

মানব ধর্ম্ম শাস্ত্রকার মহর্ষি মনু অতি প্রাচীন ঋষি। তাঁহার সময় নির্ণয় করা সুকঠিন; বৈদিক গ্রন্থেও মানব ধর্ম্মশাস্ত্রের উল্লেখ আছে। কিন্তু আমরা যে মনুসংহিতা পাঠ করিয়া থাকি, তাহা মনু রচিত সংহিতা নহে, তাহা মহর্ষি ভৃগু রচিত মনুসংহিতা অর্থাৎ মহর্ষি মনুর বহুকাল পরে ভৃগু মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া যে সংহিতা রচনা করিয়াছেন তাহাই বর্ত্তমান মনুসংহিতা।

বর্ত্তমান যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ও মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য রচিত নহে। টীকাকার বিজ্ঞানেশ্বর ও তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

"যাজ্ঞবল্ক্য'শিষ্যঃ কশ্চিৎ প্রশ্নোত্তররূপং যাজ্ঞবল্ক্যপ্রণীতং ধর্ম্মশাস্ত্রং সংক্ষিপ্য কথয়ামাস। যথা মনুনোক্তং ভৃগুঃ। মিতাক্ষরা।"

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ভগবান বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হন, কিন্তু বর্ত্তমান যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ভগবান বুদ্ধদেবের পরবর্ত্তী কালে রচিত বলিয়া অনুমান হয়। কারণ, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার আচারাধ্যায়ের নিম্নলিখিত শ্লোকে বৌদ্ধশ্রমণদিগকে নিন্দা করা হইয়াছে।

স্বপ্নে বগাহতেত্যর্থং জলং মুণ্ডাংশ্চ পশ্যতি
কষায়বাসসশ্চৈব ক্রব্যাদাংশ্চাধিরোহতি ॥

মণ্ডলিক সংস্করণ ২৭২।

"মুণ্ডান্ মুণ্ডিতশিরসঃ" ইতি মিতাক্ষরা। পরাশর সংহিতায়ও দৃষ্ট হয় :—

পরাশরোদিতং শাস্ত্রং সুব্রতঃ প্রোক্তবান্ মুনিঃ।

জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের সংস্করণ।

ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন মহর্ষি বৌধায়ন খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ দত্ত মহাশয়ও এই মত অবলম্বন করিয়াছেন। আমরা এ সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিতে অক্ষম। ইয়োরোপীয় পণ্ডিত গণের কাল নির্ণয় সিদ্ধান্ত প্রায়শঃ ভ্রমাত্মক।

মহর্ষি বৌধায়ন সম্ভবতঃ মহর্ষি গৌতমের পরবর্ত্তী এবং মহর্ষি আপস্তম্বের পূর্ব্ববর্ত্তী।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় "ধর্ম্মশাস্ত্র প্রযোজকাঃ" বলিয়া বিংশতি মহর্ষির নাম দৃষ্ট হয়। যথা :—

মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্বসংবর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী ॥
পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগৌতমৌ ॥
শাতাতপোবশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ ॥

মিতাক্ষরকার লিখিয়াছেন :—

নেয়ং পরিসংখ্যা কিন্তু প্রদর্শনার্থমেতৎ।
অতো বৌধায়নাদেরপি ধর্ম্মশাস্ত্রত্বমবিরুদ্ধং ॥

শব্দস্তোমমহানিধিতে তর্কবাচস্পতি মহাশয় লিখিয়াছেন :—

প্রযোজক—কার্য্যাদৌ ভৃত্যাদীন্ প্রযক্তো। অতএব 'প্রযোজক' শব্দদ্বারা এই সমস্ত মহর্ষিগণ সংহিতা রচিতা বলিয়া অনুমান হয় না।

বাস্তবিক যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাতে যে বিংশতি মহর্ষি—ধর্ম্মশাস্ত্র প্রযোজক বলিয়া লিখিত আছে, তাহা ব্যতীত অন্যান্য বহু মহর্ষি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রযোজক ছিলেন।

মহর্ষি বৌধায়নের গ্রন্থে আর্য্যাবর্ত্তের সীমা বর্ণিত হইয়াছে, যথাঃ—

প্রাগাদর্শাৎ প্রত্যক্ কালকবনাৎ দক্ষিণেন হিমবন্তম্ উত্তরেণ পারিযাত্রম্।

আদর্শের পূর্ব্ব; কালকবনের পশ্চিম; হিমালয়ের দক্ষিণ এবং পারিযাত্রের উত্তর;— এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন স্থান আর্য্যাবর্ত্ত। যে স্থানে সরস্বতীনদী অন্তর্হিতা

হইয়াছে তাহার নাম আদর্শ এবং পারিযাত্রদ্বারা বিন্ধ্যাচল বুঝিতে হইবে। মহর্ষি পাতঞ্জল মহাভাষ্যে এই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মহর্ষি বৌধায়ন কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় সূত্রকারক ছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ দক্ষিণাপথ নিবাসী ছিলেন।

মহর্ষি বৌধায়ন বলেন :—

"পঞ্চধা বিপ্রতিপত্তির্দক্ষিণতঃ অনুপনীতেন ভার্য্যয়া সহ পর্য্যুষিত ভোজনং মাতুল দুহিতৃপিতৃস্বসৃদুহিতৃপরিণয়নমিতি তথোত্তরতঃ উর্ণাবিক্রয়সীধুপানমুভয়তো দদ্‌ভির্ব্যবহারঃ সায়ুধীয়কং সমুদ্রযানমিতি।"

পাঁচটী বিষয়ে মতভেদ আছে :—

দক্ষিণে অনুপনীত বালকের সহিত একত্রাহার, ভার্য্যা সহিত একত্রাহার পর্য্যুষিত অন্ন ভক্ষণ, মাতুল কন্যা পরিণয়, পিসির কন্যা পরিণয় প্র চলিত আছে উত্তরে পশম বিক্রয়, মদ্যপান, উভয়তঃ দন্ত বিশিষ্ট পশু বিক্রয়, আয়ুধ সহ ভ্রমণ, এবং সমুদ্র যাত্রা প্রচলিত আছে।

ইহাদ্বারা তৎকালে আর্য্যাবর্ত্তে সমুদ্রযাত্রা প্রচলিত থাকা দৃষ্ট হয়। দাক্ষিণাত্যে অদ্যাপি মাতুল কন্যা এবং পিসতাত ভগিনী পরিণয় প্রচলিত আছে।

মহর্ষি বৃহস্পতি বলেন উদ্বহ্যতে দক্ষিণাত্যৈ র্মাতুলস্য সুতাদ্বিজৈঃ।

এই বচন দ্বারাও দাক্ষিণাত্যে মাতুল কন্যা পরিণয় প্রচলিত থাকা দৃষ্ট হয়।

শ্রীরেবতীমোহন গুহ।

বিনতি।

মোরে যদি ভালবাস দেবতা আমার!
মিছা ছলনায় তবে বৃথা-কাল আর
করো না হরণ প্রভো! তুমি-তো নিঠুর
নহ কভু, দীন-সখা, করুণা-নিধান!
পাগল পরাণ মোর বিরহ-বিধুর
করিতেছে নিশিদিন তোমারি ধেয়ান!
তুমি-তো মরম-ব্যথা পার হে বুঝিতে
প্রিয়তম, কিবা আর নিবেদিব আমি;—

জান তুমি কত অশ্রু পাষাণ মহীতে
নীরবে শুকায় ঝরি' হে জীবন-স্বামী!
না করি বিষাদ কিন্তু, আমি শুধু চাই
তোমারে—তোমারে নাথ! আজি তব পাশ
লহ গো আমারে ডাকি, দাও পদে ঠাঁই—
পলকে সফল হোক্ আজন্মের আশ!!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

মাধবাচার্য্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পরবর্ত্তী গ্রন্থকার নরহরি সরকার ঠাকুরও ভক্তিরত্নাকরের দ্বাদশ তরঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভুর সপ্তগ্রাম ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, তাহাতেও মাধবের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। ইত্যাদি কারণে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, তখনকার সময়ে সপ্তগ্রামে মাধবাচার্য্য নামে কোন ব্যক্তি মহাপ্রভুর পার্ষদ মহান্ত ছিলেন না। সপ্তগ্রামের মাধব তাহার অনেক পরবর্ত্তী লোক।

পুরুষোত্তম মিশ্র সিদ্ধান্তবাগীশ প্রণীত মাধববংশতত্ত্ব নামক গ্রন্থের পরিশেষাধ্যায়ে লিখিত আছে,—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গ্রন্থ প্রণেতা পার্ষদ মহান্ত মাধবাচার্য্য প্রভুর জ্যেষ্ঠ পৌত্র শ্রীকৃষ্ণচরণ গোস্বামী পাদ মালদহের রোকনপুর পরগণার কাজিগলি নামক স্থানে মুরলীধর বিগ্রহ স্থাপন করিয়া এক অভূতপূর্ব্ব উৎসব করিয়াছিলেন। তৎকালে গৌড় ও উৎকলে যে সকল বৈষ্ণব বিদ্যমান ছিলেন, নিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈত প্রভু ও পার্ষদ মহান্ত বংশে যাহারা উদ্ভূত হইয়াছিলেন এবং তদানীন্তন সময়ে তাঁহাদিগের শিষ্য উপশিষ্যগণ মধ্যে যাহারা গৌড়মতানুবর্ত্তী ছিলেন, সেই সেই গোস্বামী, ঠক্কুর, অধিকারী মহান্ত ও বৈরাগী মহোদয়গণ এই উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

নিত্যানন্দ প্রভুর পৌত্র শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী, অদ্বৈত প্রভুর পৌত্র, শ্রীদোলগোবিন্দ গোস্বামী, বংশীবদনানন্দ গোস্বামীর প্রপৌত্র বাঘাপাড়া নিবাসী রাজবল্লভ গোস্বামী, নিত্যানন্দ-দুহিতা গঙ্গাদেবীর পৌত্র জিরেট নিবাসী রামকানাই গোস্বামী, এই চারিজন গোস্বামী পাদ এই মহোৎসবের সমাধান ও অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন।

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণচরণ প্রভু মহা সমারোহে মুরলীধর বিগ্রহ স্থাপন করিয়া ঠাকুরের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিলেন ও তাঁহার সেবাকার্য্যে মনঃপ্রাণ ঢালিয়াছিলেন। গৌড়রাজধানী মালদহের রোকনপুরে যখন শ্রীকৃষ্ণচরণ গোস্বামী প্রাণ ব্যয়করপ্রীতিতে ঠাকুরের সেবাকার্য্যে নিরত ছিলেন, সেই সময় চণ্ডী গীতের গায়ক ও চণ্ডীকাব্য প্রণেতা সপ্তগ্রামবাসী মাধবাচার্য্য গীত গাহিবার জন্য আপনার দল লইয়া গৌড়ে আগমন করেন। তখন অবসর মতে কখনও কখনও তিনি শ্রীকৃষ্ণচরণ গোস্বামী পাদ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণ দর্শন করিতেন ও সৎ কথার আলোচনা করিতেন। মাধব এইরূপে সঙ্গগুণাকৃষ্ট ও অনুরক্তচিত্ত হইয়া, গোস্বামী পাদের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব আলোচনা করিতে লাগিলেন।

মাধব এইরূপে নবানুরাগে প্রমত্ত হইয়া গৌড় প্রভুকে পাইবার নিমিত্ত অনন্যচিত্তে গোস্বামীপাদের পাদপদ্ম আশ্রয় করিলেন। তিনি কীর্ত্তনের দল ভাঙ্গিয়া দিলেন, দলের সকলের নিকট আত্মদোষ কীর্ত্তন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং সকলকে বিদায় দিলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণচরণ প্রভুর শ্রীচরণে আত্মসমর্পন করিলেন। তাঁহার নিকট দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিলেন, তাঁহার কৃপাকণা লাভ করিয়া প্রেম ভক্তির অদ্বিতীয় অধিকারী হইলেন। শ্রীকৃষ্ণচরণ গোস্বামী মাধবকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তাঁহার কৃষ্ণদাস নাম রাখিলেন, মাধব তদবধি কৃষ্ণদাস নামেই বিখ্যাত হইলেন। মাধব শ্রীভগবানে আত্মচিত্ত সমর্পণ করিয়া উদাসীন পন্থা অবলম্বনে শ্রীগুরুর চরণ সন্নিধানেই থাকিয়া একাগ্রচিত্তে গুরুপাদপদ্ম সেবা করিতে লাগিলেন।

মাধব সন্ন্যাসাবলম্বন করায় তাঁহার বংশ প্রবাহ রহিত হইল, সুতরাং বংশধর না থাকায় আমরা তাঁহার বংশাবলী সংগ্রহ করিতে অক্ষম হইলাম।

নির্জ্জন ভজনাকাঙ্ক্ষী শ্রীকৃষ্ণচরণ প্রভু শেষ দশায় যখন নির্জ্জনদেশে গমনেচ্ছু হইয়া গৌড়ের রূপসাগর তীরস্থ রামকেলী গ্রামের নির্জ্জন বনভূমিতে কুটীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অনন্যচিত্তে সাধন ভজনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, সেই সময় প্রাণ হইতেও গরীয়ান্ মুরলীধর বিগ্রহ ও তাঁহার সেবার ভার ভক্তবর মাধবের করেই সমর্পণ করিয়াছিলেন, তদবধি মাধবই মুরলীধর বিগ্রহের সেবাধিকারী হইলেন। যথা,—

ততস্ত চণ্ডিকাভক্তঃ সপ্তগ্রাম নিবাসকৃৎ।
গীতজীবীকুল শ্রেষ্ঠো মাধবাচার্য্য গায়নঃ॥

পর্য্যটয়ন্ বহু স্থানং কদা গৌড়ে সমাগতঃ।
স্বকৃতং চণ্ডীকা গীতমুদগায় বহু যত্নতঃ॥
তদারুক্মপুর স্থায়ী শ্রীকৃষ্ণচরণ প্রভুঃ।
অনৈষী দীদৃশাকালং সং সেব্য মুরলীধরং॥
কচিৎ কচিৎ সমাগত্য মাধবস্তস্থ সন্নিধিং।
প্রণম্য তৎ পদাম্ভোজং বভাষে প্রায়শোপিসঃ॥
ততঃ সঙ্গগুণাকৃষ্টঃ ক্রমানুরক্ত মানসঃ।
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভোস্তত্বমালোচয়তি সর্ব্বতঃ॥
ঈদৃশেনৈব ভাবেন শ্রীগোস্বামী প্রসাদতঃ।
তস্থ মহাত্মনশ্চিত্বং ক্রমান্নির্ম্মলতাং যযৌ॥
পরাৎপরস্থ গৌরস্থ জগতামীশ্বরস্যচ।
বিশ্বাসাভাস এবাসীৎ পূর্ব্বস্মিন্ সমলাত্মনি॥
ইদানীং নির্ম্মলিভূতে বিশ্বাস স্তস্থচাত্মনি।
সংস্থাপিতো ভবত্যেব পাষাণাঙ্কবদ্দৃঢ়ঃ॥
তদনুরক্তচিত্তে হি স্নিগ্ধকৃদ্ভক্তি নির্ঝরং।
ক্ষিপ্রং প্রবাহয়ামাস শ্রীকৃষ্ণচরণ প্রভুঃ॥
তস্মিন্ প্রবাহমানস্থ তদ্ভক্তিস্রোতসোবলৈঃ।
অলুণ্ঠিত্তৎ পদাম্ভোজে নেত্রাম্বু সিঞ্চিতে মুহুঃ॥
নবানুরাগ সংমত্তঃ সর্ব্বতোহনন্থ চিত্তকং।
প্রাপ্তুং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্থভেজে গোস্বামিনঞ্চসঃ॥
আত্মসমর্পণং কুর্ব্বন্ নির্ম্মলীভূত মাধবঃ।
কৃষ্ণদীক্ষাঃততো লেভে প্রেমভক্তিঞ্চ শাশ্বতীং॥
শ্রীকৃষ্ণদাস ইত্যাখ্যাং তস্মৈদদৌ প্রসন্নতঃ।
তন্নাখ্যয়া স বিখ্যাতো বভূব জগতীতলে॥
উদাসীনস্থ পন্থানমবলম্ব্যানুরাগতঃ।
সিসেবিষুঃ পদাম্ভোজংতস্থৌ শ্রীগুরু সন্নিধৌ॥
নির্জ্জনভজনাকাঙ্ক্ষী শ্রীকৃষ্ণ চরণঃ প্রভুঃ।
ঐচ্ছৎততঃপরং গন্তুং পূতং বিরিক্তিদেশকং॥
রামকেলীপুরে চাসীদ্বর্ন ভূমিঃ সুশোভনা।
রূপসাগরতীরস্থামগমত্তাং ভুবং প্রভুঃ।

প্রাণভ্যোপি গরীয়াং সং মুরলীধর বিগ্রহং।
তৎসেবামর্পয়িত্বাচ ভক্তং শ্রীমাধবং প্রতি॥

মাধববংশতত্ত্ব।

শ্রদ্ধেয় দীনেশ বাবু এই চণ্ডীকাব্য প্রণেতা মাধবাচার্য্যের বিশেষ বিবরণ অবগত না থাকাতেই যে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

মাধবাচার্য্য (শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল প্রণেতা) শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর যে পার্ষদ মহান্ত ছিলেন তাহার প্রমাণার্থ এ স্থলে আরও কয়েকটীপ্রমাণ বৈষ্ণব গ্রন্থাদি হইতে এ স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। বিশেষতঃ মহোৎসবে যে মহাপ্রভুর পার্ষদ মহান্তগণের আসন নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাতেও মাধবাচার্য্য প্রভুর নাম দেখা যাইতেছে। এই মহোৎসবের আসন "ভোগমালা" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে। যথা,—

যুথেশ্বরী বিশাখায়া বিগ্রহঃ প্রেমিকোত্তমঃ।
রায় বংশ সমুদ্ভুতো রামানন্দঃ সতাংবরঃ॥
তস্য পংক্তি প্রকর্ত্তব্যা বৈষ্ণবৈরতিযত্নতঃ॥
মাধবাচার্য্য সংসক্ত মহান্তাষ্ট সমন্বিতা॥
ব্রজে যা মাধবী সখী বিশাখা যুথ বল্লভা।
সৈবাত্র মাধবাচার্য্যো বন্দ্যোবংশো মহত্তমঃ॥

ভোগমালা।

এই সকল প্রমাণানুসারে নিঃসন্দিগ্ধরূপে স্থিরীকৃত হইতেছে যে মাধবাচার্য্য প্রভু চৈতন্য মহাপ্রভুর ঠিক এক সময়ের লোক; তাহা না হইলে পার্ষদ মহান্তগণের মধ্যে কখনই তাঁহার নাম থাকিত না। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল প্রণেতা মাধবাচার্য্য বন্দ্যবংশাবতংস ময়মনসিংহ জিলান্তর্গত জয়নসাহী পরগণার অন্তর্ভুক্ত নবীনপুর বা ন্যানপুর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পিতা মাতাকে নবদ্বীপে গঙ্গাবাস করাইতে ছিলেন, নবদ্বীপে অবস্থান কালে "শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল" লিখিত হয় তখন শ্রীচৈতন্য দেব গৃহাশ্রম ত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসাবলম্বন করেন ও নীলাচলে গমন করেন। ইহার কিছুকাল পর মাধবাচার্য্য নীলাচলে যাইয়া গৌরাঙ্গ প্রভুর সন্নিধানে কিছুকাল অবস্থান করেন এবং "প্রেমরত্নাকর" নামক আর একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ সেই সময় প্রণয়ন করিয়াছিলেন। যথা,—

কদানীলাচলে গত্বা ভক্ত্যাহি পরয়ামুদা।
জগন্নাথঞ্চ গৌরঞ্চ সেবয়া মাস সর্ব্বতঃ॥

প্রেমরত্নাকরো গ্রন্থো রত্নানামেবমাকরঃ।
অলেখি যত্নতস্তেন ধার্য্যস্তা গৌরপদযুক্তং॥

মাধববংশতত্ত্ব।

উপরের লিখিত প্রমাণানুসারে দেখা যাইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল প্রণেতা মাধবাচার্য্য প্রভু শ্রীচৈতন্য দেবের নবদ্বীপ লীলার সময় অর্থাৎ ১৪০৭ শক হইতে ১৪৫৫ শক পর্য্যন্ত কোন এক সময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করতঃ মহাপ্রভুর অপ্রকট হওয়া পর্য্যন্ত তৎসন্নিধানে থাকিয়া প্রেমভক্তির রসাস্বাদন করিতেন এবং সময় সময় প্রচারকার্য্যে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেন।

আর চণ্ডীকাব্য প্রণেতা মাধবের জন্মস্থান সপ্তগ্রাম অথচ তাঁহার পিতা মাতা সপ্তগ্রামে গঙ্গাবাস করিতে ছিলেন, ১৫০১ শকে চণ্ডীকাব্য লিখেন বিশেষতঃ মহাপ্রভুর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হইয়াছে এমন কোন কথাই চণ্ডীকাব্যে লিখিত নাই। এই সকল কারণে চণ্ডীকাব্য প্রণেতা মাধব ও শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল প্রণেতা মাধব যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ের লোক এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানবাসী তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

উপসংহারে মাধবাচার্য্যের পূর্ব্বপুরুষদের এ দেশ আগমন সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিব। মাধবাচার্য্য প্রভুর পিতামহ ধরণীধর বিশারদের তিন পুত্র, জ্যেষ্ঠ অরবিন্দ মধ্যম জগদানন্দ ও কনিষ্ঠ পরাশর।

ধরণীধর প্রথমতঃ স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র পরাশর মিশ্র সমভিব্যাহারে নৌকাযোগে এ দেশে আগমন করেন। আসিবার সময় নানাস্থান অতিক্রম করিয়া যখন মেঘনা নদী বাহিয়া যাইতে ছিলেন, তখন প্রবল ঘূর্ণিবায়ুতে তাঁহার নৌকা মেঘনায় জলমগ্ন হয়।

ধরণীধর নিত্য হোম করিতেন, তাঁহার গার্হপত্য নামক অগ্নি সঞ্চিত ছিল, নৌকাডুবির সময় সেই হোমাগ্নি ও হোমদ্রব্য লইয়া তিনি নৌকা হইতে ঝাপ দিয়া পড়িলেন। পড়িয়া দেখিলেন, তাঁহারা যে স্থানে নামিয়াছেন সেটী একটী চড়াভূমি তাহাতে জল নাই অর্থাৎ নবোৎপন্ন সৈকত-ভূমি। তখন স্নানাহ্নিকের সময় হইয়াছে দেখিয়া ধরণীধর সেই সৈকত ভূমিতেই স্নানাহ্নিক ও হোমাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

যখন শিলাবৃষ্টি ও প্রবল ঝঞ্চাবাত থামিল, তখন দূরবর্ত্তী গ্রামের লোক সকল দেখিতে পাইলেন, যে অতলস্পর্শ মেঘনা নদীর গর্ভে একটী নূতন চড়া

উৎপন্ন হইয়াছে আর তাহাতে একজন মহাপুরুষ পূজা ও হোমাদি ক্রিয়া করিতেছেন। ইহা দেখিয়া সকলেই অতীব আশ্চর্য্যান্বিত ও বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া তৎক্ষণাৎ নৌকাযোগে সেইখানে উপনীত হইলেন এবং আবশ্যকীয় সামগ্রী সম্ভার অর্পণ করিয়া সেই মহাপুরুষের আহারের উদ্যোগ করিয়া দিয়া গ্রামে লইয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন।

ধরণীধর সে অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। অবশেষে ভগবদিচ্ছায় প্রেরণায় ও গ্রামিকগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে সেই নবীন সিকতাময় ভূমিতে অবস্থান করিতে স্বীকৃত হইলেন। তখন গ্রামীজন কর্ত্তৃক একটী মনোরম পর্ণশালা নির্ম্মিত হইল, ধরণীধর আপন কনিষ্ঠ পুত্র পরাশরের সহিত নির্জ্জনে, মেঘনা তীরে নবীন সৈকত ভূমিতে, সেই নবনির্ম্মিত পর্ণশালায় বসবাস করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই সেই নবোৎপন্ন সৈকত বিস্তীর্ণতা লাভ করিয়া মনুষ্যাবাসের উপযোগী হইয়া উঠিল। তখন নানা দিগদেশ হইতে সাধুসজ্জনগণ আসিয়া গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ধরণীধরের চরণ সন্নিধানে বাস্তব্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সেই নবোৎপন্ন সৈকত ভূমি একটী গ্রামে পরিণত হইয়া উঠিল। এই গ্রামটী নূতন উৎপত্তি হওয়ায় সকলে ইহার নাম রাখিলেন নবীনপুর। (ক্রমশঃ)

শ্রীরাধারমণ গোস্বামী।

ছায়া-দর্শন।

আমি পেন্সন প্রাপ্ত হইয়া গারো-পাহাড়ের একটী নির্জ্জন উপত্যকায় একটী "বাঙ্গলো" নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে বাস করিতেছিলাম। নিকটে পাহাড়ের শ্যামল সমতলক্ষেত্রে কয়েকখানা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গৃহ একটী ক্ষুদ্র গারো-পল্লীর অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছিল। যে উপত্যকার উপর আমার "বাঙ্গলো"টা স্থাপিত, তাহার উত্তর-পশ্চিম অংশে "রাঙ্গাছড়া" নামক একটী গিরি-নির্ঝরিণী বিচিত্র বনশোভার সহিত মৃদু সঙ্গীত মিশাইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। পর্ব্বতশ্রেণী শ্যামল হইতে নীল, নীল হইতে ধূসর হইয়া ক্রমশঃ যেন এক অস্পষ্ট ছায়ালোকে ম্লান হইয়া গিয়াছে। আমার পুস্তক-সজ্জিত ওয়াটনট, কাচের সাসিযুক্ত দরজা, ক্রোটন ও নানাজাতি রঙ্গিন ফুলের টব শোভিত বারান্দা, ফিকা গোলাপী রঙ্গের পর্দ্দা প্রভৃতি তৈজসপত্র সম্বলিত "বাঙ্গলো"টা এই অযত্ন বর্দ্ধিত বন-ভূমির মধ্যে যেন উৎকট উপহাসের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি,

সে সময় আমি প্রেতযোনি সম্বন্ধীয় সাহিত্য চর্চ্চায় নিরত ছিলাম। আমি বিপত্নীক এবং আমার সংসারের বন্ধন—সন্তান সন্ততিও অকালে লোকান্তরিত হইয়াছে। সেই জন্যই জীবনমৃত্যুর বিভিন্ন রাজপথ কোথায় গিয়া মিলিত হইয়াছে, দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলাম। লোকান্তরের প্রেতভূমির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতেছিলাম আমার মাতা-পত্নী-দুহিতা, জীবজগতের জীর্ণবাস পরিহার করিয়া কিরূপে জীবন যাপন করিতেছেন। সুতরাং পাঠক, অবশ্যই অনুমান করিতে পারিতেছেন যে জীবিত হইয়াও আমি জীবজগতের সীমার বাহিরে বিচিত্র সংশয়-সমাকুল, জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থল নিহিত অপূর্ব্ব প্রেত-ভূমিতেই বিচরণ করিতেছিলাম।

একদিন হেমন্তের শিশিরজাল জড়িত অপরাহ্নে আমি আমার "বাঙ্গলোর" বারান্দায় বসিয়া নবকিশলয়ের মধ্য দিয়া সূর্য্যাস্তশোভা দেখিতেছিলাম। কুয়াসা কুণ্ডলী করিয়া ধীরে ধীরে পাহাড়ের উপর বিস্তৃত হইতেছিল। নিকটে 'রাঙ্গাছড়া' বনমালতীর ফুলরাশি ভাসাইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। আমি প্রকৃতির এই পুরাতন অথচ চির নূতন মাধুর্য্যের মধ্যে আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলাম। এমন সময় হঠাৎ একটী বিলাতী কুকুর কোথা হইতে চীৎকার করিতে করিতে আসিয়া আমার পদপ্রান্তে বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। কুকুরটী 'ফক্স-টেরিয়র' জাতীয়। গলায় একটী চামড়ার গলাবন্ধ; তাহার উপরে একটী ঝকঝকে বকলস্; তাহারই নীচে "R. T. S." এই তিনটী ইংরেজী অক্ষর লেখা! কুকুরটী যে কোনও পথভ্রান্ত ইংরাজ শিকারীর সে সম্বন্ধে আমার আর কোনও সন্দেহ রহিল না। কুকুরটী আমার দিকে তাকাইয়া একপ্রকার কাতর শব্দ করিয়া আমার করুণা উদ্রেক করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; উহার কাতর দৃষ্টির মধ্য দিয়া যেন একটী কৃপা-ভিক্ষার সকরুণ প্রয়াস ফুটিয়া উঠিতেছিল।

আমি আর প্রতীক্ষা না করিয়া অত্যধিক কৌতূহল বশতঃ অশ্বারোহণে কুকুরটীর অনুগামী হইলাম। কুকুরটী তাহার জান্তব ভাষায় যতদূর সম্ভব আমাকে বুঝাইয়া দিল যেন সে তাহাই চায়। সে মাঝে মাঝে শব্দ করিতে করিতে এক একবার কান খাড়া করিয়া আমার দিকে ফিরিয়া চাহিতে লাগিল এবং আমি তাহার অনুগমন করিতেছি দেখিয়া প্রফুল্লচিত্তে লেজ দুলাইয়া আমার অগ্রে অগ্রে ছুটিতে লাগিল।

বন-জঙ্গলপূর্ণ উপত্যকা অধিত্যকা অতিক্রম করিয়া প্রায় দুই মাইল দূরে আসিয়া দেখিতে পাইলাম একটী শালবৃক্ষের নীচে একজন সাহেব পড়িয়া

রহিয়াছেন। তিনি আমাকে দেখিতে পাইয়া আহ্লাদ প্রকাশ পূর্ব্বক অভিবাদন করিলেন। বনভূমিতে নিঃসহায় ব্যক্তির মনুষ্য-সঙ্গলাভ যে কিরূপ আনন্দদায়ক, তাহা বিশেষভাবে অনুভব করিয়াই যেন তিনি আমাকে অপূর্ব্ব আনন্দের সহিত আহ্বান করিলেন। তাঁহার নিকটস্থ হইয়া দেখিলাম গিরি-লঙ্ঘন করিতে যাইয়া তিনি উরুদেশে গুরুতর আহত হইয়াছেন। এবং তাঁহার উত্থানশক্তি প্রায় তিরোহিত। আমি বহুকষ্টে তাঁহাকে আমার অশ্বারোহণ করাইয়া "বাঙ্গলো"র দিকে ফিরিলাম। কুকুরটী এতক্ষণে তাহার কর্ত্তব্য অনেকটা শেষ হইয়াছে মনে করিয়া নিঃশব্দে আমাদের অনুসরণ করিল। তখন রাত্রি ৮টা হইয়া গিয়াছে। শীত-রজনীর কুজ্ঝটিকা-আবৃত গিরিপথে বহুকষ্টে গৃহে পঁহুছিলাম।

সাহেবের সহিত ইতিমধ্যে আমার আলাপ পরিচয় হইয়া গেল। তাঁহার নাম রবার্ট টমসন ষ্টীল্। তিনি সুরমা ভেলির "গোল্ডেন ক্রাউন" নামক এক বিখ্যাত চা-বাগানের ম্যানেজার ছিলেন। কোনও ভয়ঙ্কর পারিবারিক দুর্ঘটনার পর, তিনি সংসার ত্যাগ করিয়াছেন; এই কয়েক মাস হইল তিনি পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। পারিবারিক দুর্ঘটনার সেই ভয়ঙ্কর স্মৃতি আর এই কুকুরটী ব্যতীত সংসারের সহিত তাঁহার আর কোনও বন্ধন ছিল না। তিনি বাধা বিঘ্নহীন, মুক্ত প্রতিধ্বনির ন্যায় কন্দরে কন্দরে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন।

তিনদিন মনুষ্য-সহবাসে যখন পুনরায় মনুষ্যসমাজের সহিত নূতন করিয়া আমার সম্পর্ক স্থাপিত হইতেছিল, তখন ষ্টীল সাহেব আমার নিকট হঠাৎ বিদায় চাহিলেন। আমি সংসারের স্নেহ-পাশ-মুক্ত হইয়া মনে মনে যে একটী উদ্ধত-বিজয়-গর্ব্ব উপভোগ করিতাম, সহসা তাহাতে একটী কঠোর আঘাত পাইলাম। যে সংসারের ঐহিক সম্বন্ধ সমুদয় ত্যাগ করিয়া আসিতে পারিয়াছে, আজ তিনদিনের পরিচিত অভ্যাগতকে বিদায় দিবারকালে তাঁহার মন বড় কেমন করিয়া উঠিল! ষ্টীল্ সাহেবের আর কথাবার্ত্তা নাই। সেই মুখ হইতে তাঁহার যাওয়ার কথাটী প্রকাশিত হইল, অমনি তিনি তাঁহার পুরাতন ব্যাগ হাতে এবং মলিন হ্যাটটী মাথায় দিয়া স্মিতমুখে আমার সম্মুখে বিদায়প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার এই আকস্মিক ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া আমি বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া সাহেব বলিলেন —

"মহাশয়, আপনার সময়োচিত আতিথ্যে আমার জীবন বাঁচিয়াছে। দেখিতেছি, আপনিও মৃত্যুর পরবর্ত্তী জীবনে আস্থা রাখেন। মৃত্যুর পরেও আপনার এ উদারতার কথা মনে রাখিব। হাঁ, আর একবার আপনার সঙ্গে আমার দেখা হইবে।"

সাহেব যখন প্রথম আমাকে এই কথা বলিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহার মুখমণ্ডলের উপর একখানি লঘু হাস্য খেলা করিতেছিল। কিন্তু শেষের কথাটী যখন বলিলেন, তখন তাঁহার বদনমণ্ডলে একটী অনৈসর্গিক আলোক দেখিতে পাইলাম। তখন তাঁহার হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে কৃতজ্ঞতার দুইটী অশ্রুবিন্দু নয়নপ্রান্তে দেখা দিল। আমিও আমার নেত্র-পল্লবের উপরে একটা আর্দ্রতা অনুভব করিলাম। সাহেব ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আপনি আমার বিদায়ের সময় দুঃখিত হইয়া ভুল করিতেছেন; যে সূত্র ছিন্ন করিয়াছেন, ইচ্ছা করিয়া তাহাতে আর গ্রন্থি দিবেন না।" আমি নীরবে একটু হাসিলাম। এবার সাহেব উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন :——

"নমস্কার! আর আমার দেরী করিবার সময় নাই। আমার হাতের আংটীর সবুজ পাথরটী দেখিয়া রাখুন। ভবিষ্যতে ইহা দিয়াই আমাকে চিনিতে হইবে।" সাহেব এই বলিয়া আমার "বাঙ্গলো" পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। আমি সাহেবের কথাবার্ত্তা ও ব্যবহারে এতই আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে বিদায়ের মুহূর্ত্তে তাঁহাকে প্রতি-নমস্কার পর্য্যন্ত করিতে ভুলিয়া গেলাম। সাহেব চলিয়া গেলেন, সংসারের বিপুল জনসমাজের সহিত আমরা ক্ষণিকের সূক্ষ্ম সংযোগ-সূত্রটী আবার ছিন্ন হইয়া গেল। আমি তখন "মেয়ারের" নব-প্রকাশিত প্রেতযোনি সম্বন্ধীয় পুস্তকখানি লইয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম।

যে ঘটনার কথা বলিয়াছি, তাহার পর দুইটী বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। আমি তখনও সেই জনমানব শূন্য গৃহে,—সেই আলোকান্ধকারময় প্রেত-ভূমিতে। জীবনের তৈল-হীন দীপ কালসাগরের পানে ক্ষীণ শিখাবিস্তার করিয়া আমাকে অনন্তের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছিল যেন তাহার নীরব ভাষায় বলিতেছিল "তোমারও জীর্ণবাস পরিত্যাগ করিয়া তোমারই প্রিয় প্রেত-ভূমিতে যাওয়ার সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল।"

২২শে মার্চ্চ রাত্রি ২টা বাজিয়া গিয়াছে; আমি গৃহের সাসি বন্ধ করিয়া দিয়া আমার শয়নকক্ষে ইতস্ততঃ পাদচারণা করিতেছিলাম। সংসারের সমুদয় মায়া কাটাইয়াছি তথাপি দেহ-কোষ হইতে আত্মার বিদায়ের কথা ভাবিতে ভাবিতে আমার মন কাতর হইল! হাঁ, সত্যই কাতর হইল! সে যে বহুকালের মায়া-বন্ধন! মিথ্যা হউক, মায়া হউক, বন্ধন সাময়িক, তবুও ত বন্ধন! সকল বন্ধন অপেক্ষা কঠিন বন্ধনও ত বটে!

যখন আমার স্বপ্নজড়িত কল্পিত প্রেত-লোকের উপর সন্নিহিত বিদায়ের ছায়া পড়িয়া উহাকে সকরুণ করিয়া তুলিতেছিল, এমন সময় আমার রুদ্ধ দ্বারে একটী শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। চৈত্র মাস। বনভূমি বসন্তের ফুল্ল জ্যোৎস্না বিধৌত। "রাঙ্গা-ছড়ার" সহিত যেন তরল জ্যোৎস্না-স্রোত নিঃশব্দ হাসিয়া ছুটিয়াছে। আমি জান্‌লা খুলিয়া দেখিলাম,—কোথাও কিছু নাই গাছের পাতাটীও নড়িতেছে না। মুক্ত বনশোভা একখানি চিত্রপটের ন্যায় নীরব! নিথর! আমার পর্ব্বতগৃহে মাঝে মাঝে নেকড়ে কিম্বা চিতাবাঘ হইয়া আমার দ্বারদেশে সাক্ষাৎ দিতেন। এমনি একটা কিছু হইবে মনে করিয়া আমার ভুটানী ভৃত্যটীকে বন্দুক আনিতে বলিব বলিব মনে করিতেছি, এমন সময় সহসা কুকুরের শব্দের ন্যায় একটী কাতর আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলাম। এতদিনে আমি দুইবৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী মিঃ ষ্টীল্‌ ও তাঁহার কুকুরের সাক্ষাৎকারের কথাটী প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু এই গভীর নিশীথে কুকুরের আর্ত্তনাদে ষ্টীল সাহেব ও তাহার কুকুরের কথা তড়িৎগতিতে আমার মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিল; তাঁহার গমনোন্মুখ প্রতিশ্রুতির কথাটী আমার স্মরণপথে উদিত হইল। বুঝি দুইবৎসর পর তাঁহার প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য ষ্টীল পুনরায় তাঁহার কুকুর-দূত প্রেরণ করিয়া আমাকে স্মরণ করিয়াছেন। এই মনে করিয়া আমি বেশভূষা করিয়া গৃহ হইতে যেই বাহির হইয়াছি, অমনি আর সংশয় নাই—দেখিলাম মিঃ ষ্টীল্‌এর সেই পুরাতন অনুরক্ত ভৃত্য কুকুরটী আমার চরণতলে ঠিক পূর্ব্বের মতন লুটাইয়া পড়িল।

আমি অশ্বারোহণ করিয়া চলিয়াছি পথপ্রদর্শক কুকুরটী আমার অগ্রে অগ্রে চলিয়াছে। কুসুমিত বনরাজির গায় শ্যামলতার উপর স্বচ্ছ চন্দ্রালোক ফুটিয়া রহিয়াছে। চলিতে চলিতে আমার স্বপ্নজড়িত চক্ষের উপর ধীরে ধীরে যেন পার্ব্বতীয় বনশোভা জীবন্ত হইয়া উঠিতেছিল।

উপত্যকার মধ্যস্থিত উপল সমাকুল শীর্ণ গিরিপথ, বিকশিত পুষ্পশোভিত তরুলতা শ্রেণী, নভঃনীলিমায় বিচরণশীল চন্দ্রকলা, সমস্ত যেন আমার নিকট এক অভিনব পরিণামের ইঙ্গিতের ন্যায় বোধ হইতেছিল। অতীতের কত সুখদুঃখময়ী স্মৃতি আমার হৃদয়-চিত্র-পটে ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল!

হঠাৎ একটী তৃণপুঞ্জের নিকট আসিয়া আমার অশ্ব থমকিয়া দাড়াইল। সে যেন কি এক অতি প্রাকৃত বিষয়ের সন্ধান পাইয়াছে, এমনিভাবে সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল এবং তাহার অগ্রসর হইবার' অনিচ্ছা তাহার পশুভাষায় যতদূর সম্ভব আমার নিকট ব্যক্ত করিল। এতক্ষণ পরে হঠাৎ আমিও অশ্বটীর এভাব লক্ষ্য

করিয়া :বিস্ময় সহকারে আমার পথ প্রদর্শকটীর দিকে চাহিলাম ; দেখিলাম "ষ্টীল্" সাহেবের কুকুরটী তখনও আমার সম্মুখে কিন্তু এবার দেখিলাম কুকুরটী কি ভয়ঙ্কর শীর্ণ! যেন তাহার কঙ্কালময় দেহটী একখানি চর্ম্মাবরণে আবৃত। ঐ রাত্রিতেই যখন তাহাকে আমার বাঙ্গলোর সান্নিধ্যে প্রথম দেখিয়াছিলাম, তখন সে বেশ পরিপুষ্ট ছিল, একথা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি। কুকুরটী আমার প্রতি তাহার স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইল, আমি দেখিতে লাগিলাম প্রতিমুহূর্ত্তে, প্রতি পলকে সে যেন আরও ভয়ঙ্কর শীর্ণ হইয়া উঠিতেছে। কেবল তাহার চক্ষে একপ্রকার অসাধারণ দীপ্তি তাহার শরীরের শীর্ণতার সহিত ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল। কুকুরটী যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, তাহার অতি নিকটে একটী গিরিগুহা। কুকুরটী বারংবার আমাকে সেই গিরিগুহার অভিমুখে আকর্ষণ করিল! হাঁ "আকর্ষণ" করিল। কারণ আমি যাহা দেখিতেছিলাম, তাহাতে আমার ঐ গিরিগুহার রহস্যের অভিমুখী হইবার আকাঙ্ক্ষা ছিল না। মনে হইতেছিল, এখন এস্থান ত্যাগ করিলেই শান্তি। কিন্তু আমার মনের এই অনিচ্ছা উপলব্ধি করিয়াও আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় গুহাভ্যন্তরে কুকুরটীর অনুসরণ করিলাম। কুকুরটীর চক্ষের মধ্যে যেন কি এক অদ্ভুত চুম্বকশক্তি নিহিত ছিল! অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম তাহা স্মরণ করিতে এখনও আমার বিস্ময়াবেশ হইতেছে। দেখিলাম, গুহা মধ্যস্থ প্রত্যেক বস্তু হইতে একপ্রকার তৃণ-জ্যোতিঃ নির্গত হইয়া গুহাটী একপ্রকার ভৌতিক আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছে। আমি কুকুরটীর চক্ষে যে প্রকার অনৈসর্গিক আলোক লক্ষ্য করিয়াছিলাম, এ তৃণ-জ্যোতিঃও ঠিক সেই প্রকার। আর দেখিলাম সেই মলিন ব্যাগটী পাশে রাখিয়া সেই মলিন হ্যাটটীর উপর বামহস্ত রাখিয়া সেই বেশভূষা পরিহিত মিঃ ষ্টীল্! কিন্তু এবার তিনি আর ঠিক সেই রক্তমাংস দেহধারী মিঃ ষ্টীল্ নহেন; তিনি কঙ্কালময়। কেবল তাহার চক্ষু দুইটী অনৈসর্গিক আলোক জ্বলিতেছে। তাঁহার কঙ্কালময় :অঙ্গুলিতে সেই অঙ্গুরীয়টীর সবুজ পাথর ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। তাঁহার সম্মুখে তাঁহার সেই পুরাতন অনুরক্ত কুকুরটীর কঙ্কালাবশেষ——সে দীপ্তিযুক্ত নয়নে প্রভুর পলকবিহীন দীপ্তিযুক্ত নয়নের দিকে চাহিয়া আছে। R. T. S. লিখিত সেই গলবন্ধটী তখনও তাহার গলায় বাঁধা! আমি এই প্রেত-বাসরে কতক্ষণ ছিলাম তাহা ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু যখন আমার সম্পূর্ণ জ্ঞান-জাগ্রত অবস্থা ফিরিয়া আসিল, তখন বিহঙ্গ-কলরব প্রভাত সূচনা করিল, একটী মৃদুশীতল প্রভাত-বায়ুর

ঝাপটা আমার উত্তপ্ত স্বেদসঞ্চিত কপালের উপর দিয়া বহিয়া গেল এবং একটী আলোক-রশ্মি জাগরণের বার্ত্তা লইয়া সেই নিভৃত গুহায় প্রবেশ করিল।

আমি নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখি কোথাও কিছু নাই কেবল আমি একাকী গিরিগুহায় বসিয়া আছি। গুহার বাহিরে আমার অশ্বটী চর্ম্মরজ্জুতে একটী বৃক্ষশাখার সহিত সংবদ্ধ।

যে ঘটনার কথা বলিয়াছি তাহার পর তিনমাস কাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। আমি এই ঘটনার পর এই ব্যাপারটীর তত্ত্বালোচনায় বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিলাম। আমি আসামের বড় বড় প্লাণ্টার সাহেবদিগের সহিত পত্রালাপ করিয়াও মিঃ ষ্টীলের কোনও সন্ধান পাইলাম না। একদিন প্রাতঃকালে আমি নিদ্রা হইতে উঠিয়া দেখি তুড়া হইতে ডাক-পিয়ন আমার জন্য একতাড়া চিঠিপত্র রাখিয়া গিয়াছে। তুড়া সহরের ডাক হরকরা মাসান্তে আমাকে একবার দর্শন দিয়া থাকেন। ডাকে সেদিন আমার নামে "Spiritual notes & novelties" নামক একখানি কাগজ আমার হস্তগত হইল। আমি এই কাগজ খানির গ্রাহক।

কাগজখানি খুলিয়া পড়িতে পড়িতে বিশেষ সংবাদদাতার স্তম্ভে একটী সংবাদ প্রাপ্ত হইলাম। সংবাদটীর যথাযথ বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :——

"মিঃ রবার্ট, টমসন ষ্টীলের আশ্চর্য্য মৃত্যু ও তাঁহার পত্র।" মিঃ ষ্টীল ১৮৬২ খৃঃঅব্দে স্কট্‌লণ্ডের অন্তর্গত বিলিংস্‌টন নামক কাউন্‌টী টাউনে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯২ খৃঃঅব্দে তিনি ভারতবর্ষের আসাম প্রদেশস্থিত সুরমাভেলী নামক স্থানের এক চা বাগানের ম্যানেজার নিযুক্ত হন্। পাঠক বোধ হয় গোল্ড ক্রাউন বাগানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট চা পান করিয়া থাকেন। গোল্ড ক্রাউম চা বাগানই মিঃ ষ্টীলের কীর্ত্তিস্থান। ১৮৯৬ খৃঃ কোনও অপ্রিয় পারিবারিক ঘটনার পর, তাহার স্ত্রী আত্মহত্যা করিলে, তিনি চা বাগানের সংস্রব ত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়া ভারতীয় সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৯৯ খৃঃ অব্দের প্রথমভাগে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি দাক্ষিণাত্যের বিন্ধ্যাচল নামক এক পর্ব্বতে উপনীত হন। এপ্রিল মাসের শেষভাগে ঐ পর্ব্বতের একটী নির্জ্জন গুহায় ইংরেজের বেশভূষা পরিহিত একটী কঙ্কালময় মনুষ্য দেহ এবং একটী কঙ্কাল দেহ বিশিষ্ট কুকুর আবিষ্কৃত হইয়াছে মনুষ্য কঙ্কালটীর অঙ্গে যে কোট ছিল তাহার পকেটে একখণ্ড কাগজ পাওয়া গিয়াছে, তাহার মর্ম্ম "২৩শে মার্চ্চ মৃত্যুর সম্ভাবনা" ("expect dissolution 23rd March") এবং কুকুরটীর গলবন্ধে "R. T. S."

অক্ষর লিখিত। সুতরাং ইনিই রবার্ট টমসন ষ্টীল বলিয়া আমাদের সম্পূর্ণ ধারণা হইতেছে; কিন্তু তাহার মৃত্যুর কোনও কারণ আজও স্থির হয় নাই। বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট তাহার অনুসন্ধানে তৎপর আছেন।"

সংবাদটী পড়িয়াই আমি বুঝিতে পারিলাম যে মিঃ ষ্টীল্ মৃত্যুরদিনে তাঁহার প্রেতদেহে আমাকে দেখা দিয়া তাহার প্রতিশ্রুতি পালন করিয়াছেন। জীবিতকালে ও মৃত্যুর পর আত্মার ক্রিয়া যে অক্ষুণ্ণ থাকে, যেন ইহা স্পষ্টতঃ আমাকে বুঝাইয়া দিবার জন্যই বিন্ধ্যাচলের গুহা দৃশ্য, দেশ ও কালের বাধা অতিক্রম করিয়া আমার গারো পর্ব্বতের গুহায় প্রতিফলিত হইয়াছিল।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

আদর্শ সংস্কারক দয়ানন্দ—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। এই খানি আর্য্য-সমাজ প্রতিষ্ঠাতা সুপ্রসিদ্ধ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী মহাশয়ের কর্ম্মজীবনের সূক্ষ্ম সমালোচনা পূর্ণ পুস্তক। আমরা এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। দেবেন্দ্রবাবু ঔপন্যাসিক হইবার প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া যে মহাপুরুষের জীবনচরিত প্রণয়নে সময়ের ও শক্তির সদ্ব্যবহার করিয়াছেন সেজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। এই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর আদর্শচরিত্র পাঠ করিলে হৃদয় উন্নত, চিত্ত বিশুদ্ধ এবং ধর্ম্মবুদ্ধি প্রবুদ্ধ হইবে।

স্বামিজীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালী জ্ঞানে ও ধর্ম্মে, পুণ্য ও প্রেমে মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া ধন্য হউক। আমরা সকলকেই এই গ্রন্থখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি। ইহাতে অমূল্য রত্নরাজি সঞ্চিত রহিয়াছে।

☞ দ্রষ্টব্য—স্থানাভাবে অনেক প্রবন্ধ এবং প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা এই সংখ্যায় মুদ্রিত হইল না। লেখকগণ এবং গ্রন্থকারগণ আমাদের ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

আরতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

৮ম বর্ষ। | ময়মনসিংহ, চৈত্র, ১৩১৫। | ৪র্থ সংখ্যা।

আরবদেশে জ্যোতিষশাস্ত্র।

প্রাচীন ভারতবর্ষ ও গ্রীস্ দেশে জ্যোতিষ শাস্ত্রের মূল তত্ত্ব গুলির আবিষ্কার হইয়াছিল। ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিরা মানসিক শক্তির তীক্ষ্ণতা বলে প্রধান প্রধান তত্ত্বের আবিষ্কার করিতে যাইয়া তাহাদের বিস্তার লক্ষ্য করিবার অবসর পান নাই। গণিত ও জ্যামিতি শাস্ত্রে ও তাঁহাদের মনের এই গতি পরিষ্কার পরিলক্ষিত হয়। এজন্য অনেক স্থলেই আমরা তাহাদের কৃত সিদ্ধান্তগুলি পাই কিন্তু কি উপায়ে তাঁহারা এ সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন তাহা পাওয়া যায় না।

হজরত মহম্মদের সময় হইতে আরব দেশের লোকেরা ধর্ম্মের জ্যোতি লাভ করিয়া নানা বিষয়ে উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। একদিকে গ্রীস্ অপর দিকে ভারতবর্ষ এই দুইটী দেশের মধ্যে আরবদেশ অবস্থিত। আরবদেশীয় পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষ ও গ্রীস্ উভয় দেশ হইতেই সভ্যতার মূল উপকরণগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রের মৌলিক তত্ত্বগুলি তাঁহারা উভয়দেশ হইতে লইয়া তাহাদের সম্যক বিস্তার লক্ষ্য করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। জ্যোতিষ গণনায় আরব পণ্ডিতগণ যে কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা সামান্য নহে। ধর্ম্ম পিপাসার সঙ্গে আরবদিগের জ্ঞানপিপাসাও বৃদ্ধি হইয়াছিল। যেমন তাঁহারা স্পেন হইতে চীন পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন তেমনই অধিকৃত ও অনধিকৃত দেশের জ্ঞান রাজ্যও লুণ্ঠন করিতে ক্ষান্ত হন নাই। একদিকে অসভ্য জাতির মধ্যে ধর্ম্ম ও সভ্যতার বিস্তার, অপর দিকে অভিনব তত্ত্বের বিস্তার দ্বারা পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া তাঁহারা চিরকালের জন্য সভ্যজগতের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়া গিয়াছেন।

সেরাসেন নরপতিগণ তাঁহাদের রাজধানী বগ্দাদে ভারতবর্ষ হইতে পণ্ডিতগণকে আমন্ত্রণ করিয়া শিক্ষা বিস্তার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে হরনল রসিদ্ ও খালিফ আলমানস্থরের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ব্রহ্মগুপ্তের ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া খালিফ আলমনসুরের সময়ে সিন্দহিন্দ লিখা হইয়াছিল। সিন্দহিন্দ হিন্দু ত্রিকোনমিতির একটী অংশ মাত্র। ইহা খৃঃ অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে লিখিত হইয়াছিল।

এই সময় হিন্দুদিগের সংখ্যা-লিখন পদ্ধতি আরবদেশে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ৭৭২ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষীয় সিদ্ধান্ত আরবিতে অনুবাদিত হইয়াছিল। একাদশ শতাব্দীতে আরব পণ্ডিত এলবিরুনি জীবনের অনেক সময় ভারতবর্ষে কর্ত্তন করিয়াছিলেন।

অপরদিকে নবম শতাব্দীতে খালিফ অলমুমিনের সময়ে গ্রীস্‌দেশের জ্যামিতি ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের অধিকাংশ গ্রন্থ আরবিতে অনুবাদিত হইয়াছিল। ইহাদিগের মধ্যে হোসেন বিন ইসাহাক ও তদীয় পুত্র ইসাহাক বিন হোসেনের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাবিতবেন কোরা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীগণের সমস্ত ভ্রম প্রমাদ নিরাকরণ করিয়া আরবি জ্যামিতি লিখিয়াছিলেন। আরবদিগের উন্নতি এত দ্রুত অগ্রসর হইয়াছিল যে এক শতাব্দী মধ্যে আরব পণ্ডিতগণ গ্রীক বিজ্ঞানের সমস্ত বিষয় অধিকার করিয়া ফেলিয়াছিলেন। মুসলমান সভ্যতার পক্ষে ইহা সামান্য শ্লাঘার বিষয় নহে। আরবগণ নবম শতাব্দীতে বাহির হইতে জ্ঞান সংগ্রহ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, দশম শতাব্দীতে আরব পণ্ডিতগণের মধ্যে মৌলিকতা পরিচয় পাওয়া যায়। আরবগণ অন্যান্য শাস্ত্র অপেক্ষা জ্যোতিষ শাস্ত্রে সর্ব্বাপেক্ষা মনোযোগ দিয়াছিলেন। আরবগণ নবম শতাব্দীতে জ্যোতিষশাস্ত্রে কতকটা মৌলিকতার পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

হিন্দু ধর্ম্ম ও মুসলমান ধর্ম্মের সহিত জ্যোতিষ শাস্ত্রের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ! হিন্দুর যেমন মুসলমানেরও যেন সর্ব্বদা তিথির সহিত পরিচয় রাখা আবশ্যক। আরবগণ নানা স্থানে মানমন্দির স্থাপন ও নানাবিধ মানযন্ত্রের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন।

আরব জ্যোতিষশাস্ত্রকারদিগের মধ্যে আল বেতানি একজন প্রধান ইনি গ্রিক জ্যোতিষ শাস্ত্র অপেক্ষা হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্রের অধিক সমাদর করিয়া গিয়াছেন।

বগ্দাদে পারস্য আমিরগণের সময়ে জ্যোতিষ শাস্ত্রালোচনা হ্রাস প্রাপ্ত হয়

নাই, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আমির আদিউদ্দৌলা স্বয়ং জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র সরাফুদ্দৌলা রাজ-প্রাসাদে একটী মানমন্দির নির্ম্মান করিয়ছিলেন। তিনি আবুল ওয়েফা, আল্‌কুহি, আল্লু সেগানি প্রভৃতি পণ্ডিতগণকে সভসাদ্‌রূপে বরণ করিয়াছিলেন।

আবুওয়েকা দশম শতাব্দীতে খোরাসানের অন্তর্গত বাজসান নগরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি ত্রিকোনমিতি ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে কয়েকটী অভিনব তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। দশম শতাব্দীতে আরবগণ উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হন। একাদশ শতাব্দীতে ক্রুসেড্ যুদ্ধের সময় হইতে আরব দিগের মানসিক অবনতি লক্ষ্য করা যায়। খৃষ্টানদিগের সংস্পর্শে আরবগণ তাঁহাদের নিকট হইতে কোন ও বিষয়েই শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই অপর পক্ষে আরব দিগের সংস্পর্শে আসিয়া খৃষ্টানগণ সকল বিষয়ে লাভবান হইয়াছিলেন। একদিকে সভ্য খৃষ্টানদিগের ও অপরদিকে অসভ্যদিকের নিপীড়ণে আরবদেশে জ্ঞানের জ্যোতি ক্রমে নিষ্প্রভ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সময়ে যে আরবদেশে জ্ঞানের জ্যোতি একবারে নিভিয়া যায় নাই ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে হুলাগুর রাজত্ব সময়ে নসিরেদ্দিন মেরাসাতে মানমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাইমুরলেনের প্রপৌত্র উরলগবেগ স্বয়ং একজন জ্যোতিষ বেত্তা ছিলেন।

আরবগণ ইজিপ্ত হইতে স্পেন পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ইজিপ্ত দেশীয় জ্যোতিষবেত্তাদিগের মধ্যে ইবন এল হাতিম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ইনি একাদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আবুল হাসান আলি মরক্কো দেশের একটি উজ্জল রত্ন।

একাদশ শতাব্দীতে স্পেনদেশে গাবির বিম এফ্লা, সেভিল্লা নগরে জ্যোতি-বিদ্যা সম্বন্ধে নয় খানা গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি ত্রিকোনমিতিতে অনেক মৌলিক তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

ভারতবর্ষের ন্যায় আরব দেশের নরপতিগণ অনেকেই জ্ঞান চর্চ্চায় সমাদর করিয়া গিয়াছেন; এজন্য উভয় দেশেই জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির সবিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। বিক্রমাদিত্যের সভার ন্যায় খালিফ দিগের সভাও "রত্নে" অলঙ্কৃত ছিল। আরব পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষ ও গ্রীক দেশ হইতে জ্ঞানের আলো প্রাপ্ত হইয়া তাহা নিষ্প্রভ হইতে দেন নাই। এজন্য সভ্যজগৎ চিরদিন আরব পণ্ডিতগণের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মজুমদার।

কবিস্মৃতি।

কবিবর!

জীবনের পরপারে হেরিয়া তোমায়, বহে আজি
তপ্ত অশ্রুজল,
গুমরিয়া সকরুণ বিলাপ রাগিণী উঠে বাজি
ভেদি মর্ম্মস্থল।
কণ্ঠে কণ্ঠে উচ্ছ্বসিত তব চির বিচ্ছেদের গীতি,
হে স্বর্গীয় কবি!
উদ্ভাসিত হৃদয়ের প্রতি স্তরে তব পুণ্যস্মৃতি,—
সমুজ্জ্বল ছবি।

ভারতী-চরণতলে চিরপূত কাব্য কুঞ্জবনে
বসি অনুক্ষণ,
রচিতে অমিয় গাথা ছন্দোবন্দে, দিতে সযতনে
অর্ঘ্য অতুলন;
হতাশের হৃদিমাঝে দীপ্ত মন্ত্র বলে দিতে ঢালি
সঞ্জীবনী আশা,
সজ্জিত করিতে নিত্য, আহরিয়া কত রত্নডালি,
দেবী বঙ্গভাষা।

ত্যজিয়া সে কবিকুঞ্জ অকস্মাৎ কোন্ অভিমানে
করিলে প্রয়াণ,
চিরতরে সন্তাপিত করি তীব্র শোক হুতাশনে
জননীর প্রাণ?
নীরব হইল তব বীণার ঝঙ্কার, গেল থামি
সুললিত গাথা,
অবশ বিকল আজ বঙ্গপিকদল, এল নামি
বিরহের ব্যথা!

হে বরেণ্য, হে তাপস, ভারতীর প্রিয়পুত্র, আজ
গেছ তুমি চলে,
সমর্পিলে আপনায় মহানন্দে—সমাপিয়া কাজ,
অনন্তের কোলে;
কিন্তু যেই রত্নরাজি রেখে গেছ করি আহরণ
বাণীর ভাণ্ডারে,
অমর করিয়া রাখিবে তোমায়, জিনিয়া মরণ,
এ বিশ্ব মাঝারে।

রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাসের বক্ষে প্রকাশিলে
আদর্শ মহান্,
পলাশী-কাননে আর রঙ্গমতী ভূমে মাতাইলে
দেশপ্রেমে প্রাণ;
পুণ্যকীর্ত্তি অমিতাভ শুদ্ধ-আত্মা প্রেমের দেবতা—
অনুপম ছবি,——
অঙ্কিত করিয়া তাহে প্রচারিলে নির্ব্বাণ-বারতা,
ওহে ভক্তকবি!

অপেক্ষিছে হে যাত্রিক, হের ওই নন্দন দুয়ারে
যত দেববালা,
আবাহন তরে তোমা, সাজাইয়ে বিমল সম্ভারে
সুমঙ্গল ডালা।
অমৃত আনন্দরাজ্যে চলিয়াছ, ফেলিব না আর
অশ্রু অমঙ্গল,——
আজি লভ অক্ষয় ত্রিদিব-শান্তি লভ বিধাতার
পদ্ম শতদল। *

শ্রীশীতাংশুভূষণ সেনগুপ্ত।

---

* কবিবর নবীনচন্দ্রের পরলোক গমনোপলক্ষে লিখিত।

মাধবাচার্য্য

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অপিচ এই স্থানের উৎপত্তি মাত্রে ইহাতে ধরণীধর হোম করিয়া ছিলেন এইজন্য কেহ কেহ ইহাকে হোমক্ষেত্র বা হোমাইপুর নামেও অভিহিত করিলেন। কালক্রমে জনসাধারণ কর্ত্তৃক নবীনপুরের দুইটী অপভ্রংশ নামের সৃষ্টি হইল। একটী নন্যাপুর অপরটী নৈনপুর। ধরণীধর কিয়ৎকাল নবীনপুরে বসবাস করিলে পরই দেশের অধিকাংশ সাধুসজ্জন তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া শিষ্য হইলেন। অবশেষে শিষ্যগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে এখানেই উপনিবেশ স্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন। পরাশর মিশ্রের বিবাহ উপযোগী বয়স হইলে, কাঞ্জিলাল কুলোদ্ভবা রূপগুণান্বিতা লক্ষ্মীদেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ কার্য্য সম্পাদিত হইল।

লক্ষ্মীদেবীর গর্ভে পরাশরের ক্রমে একাদশটী পুত্র জন্মে। * ইহার মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র মাধবাচার্য্য শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ এবং যশোদলের গোস্বামীবংশের আদিপুরুষ। দ্বিতীয় পুত্র শ্রীনিবাসাচার্য্য যশোদলের ভট্টাচার্য্য বংশের আদি-পুরুষ।

অতএব মাধবাচার্য্য প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দেহ ত্যাগের পর এ জেলায় আগমন করিয়াছিলেন এ কথাটি নিতান্তই ভ্রমাত্মক এবং অযৌক্তিক।

যখন চৈতন্য মহাপ্রভু, নিত্যানন্দপ্রভু ও অদ্বৈত প্রভুর তিরোভাব হইয়াছিল, এবং মহান্তগণের মধ্যেও অনেকে তিরোহিত হইয়াছিলেন' তখন অবশিষ্ট মহান্তেরা শোকে দুঃখে বড়ই মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন; সেই সময় প্রিয়ম্বদ-বিরহ-তাপদগ্ধ শোকার্ত্ত ভগ্নহৃদয় মহান্তগণের কেহ কেহ, শান্তি-সুখপ্রাপ্তি ও চিত্ততাপ নিবৃত্তি জন্য নির্জ্জন প্রদেশে বসবাস করিয়াছিলেন; কেহ বা শান্তিময় নবদ্বীপ খড়দহাদিধামে যাইয়া বাস্তব্য করিয়াছিলেন। এই সময় শ্রীযুক্ত মাধবাচার্য্য গোস্বামী ব্রজধামে অবস্থান করিতেছিলেন। প্রভুদিগের

* ততঃ পরাশরোমিশ্রঃ কাঞ্জিলাল কুলোদ্ভবাং।
রূপগুণান্বিতাং কন্যাং লক্ষ্মীমুদ্বহতেস্মহ॥
শ্রীনবীনপুরে ধাম্নি লক্ষ্মী দেব্যাঃ পরাশরাৎ।
আবিরাসন্মহাত্মান একাদশ সুতাঃক্রমাৎ।
মাধববংশতত্ত্ব।

অদর্শনে, ও রূপসনাতনাদি মহান্তগণের বিয়োগ-শোকানলে, তাঁহার হৃদয় একেবারে দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। বিয়োগ-শোক-প্রদগ্ধচেতা মাধবাচার্য্য শোকে অধীর হইয়া বৃন্দাবনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন, কোনস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারিতেন না; আজ এখানে দুই দিন, কাল ওখানে দুই দিন এইরূপে বৃন্দাবনের সর্ব্বস্থানে অবস্থান করিতেন ও সর্ব্বত্র গমন করিতেন।

তৎকালে শ্রীবাসপণ্ডিত, গোবিন্দ ঘোষ, মুকুন্দ দত্ত, গদাধর পণ্ডিত, শ্রীধর পণ্ডিত, বাসুদেব ঘোষ, স্বরূপ দামোদর গোস্বামী, সারঙ্গ ঠাকুর, ও মুরারী গুপ্ত, এবং ভক্ত প্রধান মাধব ঘোষ প্রভৃতি মহান্তগণের ও প্রভুত্রয়ের অদর্শন জনিত উদ্বেলিত শোক-প্রবাহে মাধবাচার্য্য বড়ই বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। খড়দহে শ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামী প্রভুর সন্নিধানে কিছুকাল থাকিলে মনঃক্লেশ কতক নিবারণ হইবে ভাবিয়া তিনি কিছুকাল খড়দহে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সকল মহান্তগণ ও প্রভুদিগের বিরহে তাৎকালীন ভক্তগণ কিরূপে শোকাকুল হইয়াছিলেন, তাহা ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে।

মাধবাচার্য্য প্রভু যখন খড়দহে অবস্থান করিতে ছিলেন, তখন একদা কার্ত্তিক মাসে কণ্টক নগর বা কাঁটোয়াতে গদাধর দাসের তিরোভাব হয়, এবং অগ্রহায়ণ মাসে, শ্রীখণ্ডে নরহরি সরকার ঠাকুরের অদর্শন হয়। এই দুই মহান্তের তিথিকৃত মহোৎসব অতি সমারোহে সম্পাদিত হইয়াছিল। তৎকালাবস্থিত সমস্ত বৈষ্ণব সমাজ এই দুই মহোৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। নিমন্ত্রিত বৈষ্ণবগণ প্রথমত কাঁটোয়াতে উপস্থিত হইয়া তথাকার মহোৎসব সমাপনান্তে, খণ্ডে নরহরি সরকারের মহোৎসবে আগমন করিয়াছিলেন। তথাকার উৎসব সাঙ্গ হইলে স্বস্ব বাসস্থলে তাঁহারা প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহারও বিস্তারিত বিবরণ ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের নবম তরঙ্গে বর্ণিত আছে। মাধবাচার্য্য এই দুই মহোৎসবে সমস্ত মহান্ত বৈষ্ণবের সংসর্গ লাভ করিয়া তাপদগ্ধ চিত্তকে কতক পরিতৃপ্ত করিতে পারিয়াছিলেন।

ইহারা কিছুকাল পরে গড়ের হাটে খেতরিতে নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় গৌরাঙ্গ বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা কালে, মহতী সমারোহে মহোৎসব সম্পাদিত হইয়াছিল। সেই মহোৎসবে তৎকালাবস্থিত সমস্ত বৈষ্ণবগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। মাধবাচার্য্য গোস্বামী তখন খড়দহেই ছিলেন। খড়দহ হইতে নিত্যানন্দপত্নী জাহ্নবা ঠাকুরাণী খেতরীতে গিয়া-

ছিলেন। ঠাকুরাণীর সঙ্গে মাধবাচার্য্য, মাধব পণ্ডিত, কমলাকর পীপ্পলী ও রঘুপতি উপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক মহান্ত গিয়াছিলেন।

ইহারা সকলে খেতরীধামে উপস্থিত হইয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শনে পরম সুখ লাভ করিয়া ছিলেন। সমস্ত বৈষ্ণব সমাজ একত্র সমবেত হইয়া হরিগুণামুবাদে নিজেও প্রীত হইয়া ছিলেন; এবং অন্যকেও প্রীত করিয়াছিলেন। প্রেম-প্রবাহে ভাসিয়া মহাকীর্ত্তনে মাতোয়ারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। এইরূপে মহোৎসবে মাতিয়া, শ্রীখেতরীধামে শ্রীনরোত্তম ও শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভৃতিকে চরিতার্থ করিয়া ছিলেন। মাধবাচার্য্য প্রভৃতি মহান্তগণ শ্রীযুক্তা জাহ্নবী ঈশ্বরী ভবন অঙ্গনে ভোজন করিয়াছিলেন।

মাধবাচার্য্য প্রভু এই সময় হইতে ব্রজভাবে সাতিশয় বিভোর হইয়া পড়িলেন। তিনি মানস ভজনে আপনাকে বিশাখানুগতা মাধবীসখী মনে করিয়া গোপীভাবে ভজন করিতেন, কিন্তু এই হইতে সর্ব্বদা গোপীভাবে অভিভূত থাকিতেন। প্রায়ই হা! কৃষ্ণচন্দ্র হা! ব্রজেন্দ্রনন্দন! এই বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেন আর বিক্ষোপিত হইতেন, কথনও কথনও বিভ্রান্ত চিত্ত উন্মত্তেরন্যায় ছুটিতেন।

খেতরী হইতে খড়দহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কিছুকাল পরেই নৈনপুরে নিজ ভবনে আগমন করিয়াছিলেন। নৈনপুরের তলদেশ-প্রবাহী বিশালহৃদয়া মেঘনা নদীর তরঙ্গ সংক্ষোভিত সুনীল সলিলরাশি অবলোকন করিয়া একেবারে প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন; এবং মেঘনাকে যমুনাজ্ঞানে উদ্ভ্রান্ত ও প্রেমার্ত্ত চিত্তে ব্রজেশ্বরের অনুসন্ধানে বারংবার ধাবিত হইতেন। তাঁহার যখন এইরূপ অবস্থা তখন তিনি ভজনানুকুল নির্জ্জন বনপ্রদেশে তপোবন নামক স্থানে ভজনাগার নির্ম্মাণ করিয়া তথায় অবস্থান করিলেন।

তপোবনে অবস্থিত হইয়া, একাগ্রচিত্তে আপনার প্রাণনাথকে ডাকিতে লাগিলেন, ও আত্মসমর্পণ করিয়া প্রেমে তন্ময় হইয়া অনন্যচিত্তে গোপীভাবে গোপীজনবল্লভের ভজনা আরম্ভ করিলেন।

সেই নির্জ্জন বন প্রদেশকে বৃন্দাবন জ্ঞান করিয়া স্বহস্তে সেইরূপ তরুগুল্ম ও লতাদি রোপণ করিয়া আপন প্রাণনাথের প্রিয় বনরাজি প্রস্তুত করিলেন ও কুঞ্জ সমূহ রচনা করিলেন। এইরূপ করিয়া মাধবাচার্য্য বড়ই ব্যাকুলিত হইলেন, পতি-বিরহ-বিধুরা পতিগতপ্রাণা নারী-হৃদয়ে বিদেশগামী পতির জন্য যেরূপ ব্যাকুলতা জন্মে, সেইরূপ ব্যাকুলিত হইয়া তিনি তপোবনের বনে বনে

কুঞ্জে কুঞ্জে গোপীজনবল্লভের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ভগবান চিরদিনই ভক্তবৎসল, তিনি নিজ জনের মনোবাঞ্ছা পূরণ না করিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। অচিরকাল মধ্যেই সেই গোপী-প্রেমবদ্ধ গোপীনাথ গোপীগণ সমভিব্যাহারে, সেই স্থানে উদিত হইলেন। এইরূপে প্রতিদিন ভগবান সেইখানে উপনীত হইয়া গোপকামিনীসহ প্রেমবিহ্বলা মাধবীকে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। অদ্যাপি মাধবাচার্য্য প্রভুর সেই পরম রমণীয় ভজন স্থানে ব্রজভাব সাক্ষাৎ বিরাজিত আছেন। তাহা দর্শন করিলে ভক্তচিত্তে স্বতঃই ব্রজক্রীড়া অনুভূত হইয়া থাকে।

যথা মাধববংশ তন্ত্রে।

আত্মানং মাধবীং মত্বা বিশাখায়ু গতাং সদা।
গোপীভাব প্রবুদ্ধঃ স আচরতি চ তাদৃশং॥
নির্ম্মায় ভজনাগারং পূর্ণময়ং মনোহরং।
তাদৃশ ভজনার্থঞ্চ যযৌ তপোবনং পুরা॥
সর্ব্বথা গোপীকাভাবৈঃ শ্রীগোপীজনবল্লভং।
প্রাণনাথমপিজ্ঞাত্বা ভজয়ামাস নির্জ্জনে॥
শ্রীবৃন্দাবন ভাবাঞ্চ তত্রভূমৌ প্রকাশয়ন।
বৃন্দাবনেশ্বরং ভেজেকুর্ব্বন্নাত্ম সমর্পণং॥
শ্রীমদ্বৃন্দাবনারোপং তত্রভূমৌ প্রভাবতঃ।
সর্ব্বথা কারয়ামাস কুঞ্জনি চ বনানি চ॥
গোপীবদন শুভ্রাংশু সুধালুব্ধ চ কোরকঃ।
তস্য প্রেম বশীভূতো বাঞ্ছাং পূরয়তি ক্রতং॥
হিন্দোলাদিরহঃ ক্রীড়া ক্রীড়িতা তস্যবাঞ্ছয়া।
আভীর যুবতী সার্দ্ধমভীষ্টং তত্রগোপনে॥
অতস্তদ্ভজন স্থানং পবিত্রং প্রেম ভক্তিদং।
বৃন্দাবনসমং রম্যং ভক্তজনস্য কাঙ্খিতং॥
শ্রীবৃন্দাবন লীলাস্মিন্ গোপনে ক্রিয়তেযতঃ।
গুপ্তবৃন্দাবনশ্চেতি নাম্না তদ্বিতংভুবি॥
বৃন্দাবন শোভাঢ্যং পুণ্যক্ষেত্রমভীপ্সিতং।
গুপ্তবৃন্দাবনং নিত্য দর্শনীয়ং মহত্তমৈঃ॥

অদ্যাপি দর্শনে তস্য ব্রজভাবো বিরাজতে।
ভক্তাচত্তে ব্রজক্রীড়া সমনুভূয়তে সদা॥

সেই বৃন্দাবন শোভাঢ্য অভিপ্সিত পুণ্যক্ষেত্র বাস্তবিকই ভক্তজনের দর্শনের বস্তু। মাধবাচার্য্য প্রভুর সেই নির্জ্জন ভজনস্থান, বৃন্দাবন সম রমণীয়, ভক্তজনের আকাঙ্ক্ষিত পবিত্র ও প্রেমভক্তিপ্রদ। বর্ত্তমান সময়ে সেই পবিত্র স্থান "গুপ্তবৃন্দাবন" নামে বিখ্যাত আছে। গোপনে ভগবান এই ভূমিতে বৃন্দাবনলীলা করিয়াছিলেন, এইজন্য ইহার নাম গুপ্তবৃন্দাবন হইয়াছে।

এই গুপ্তবৃন্দাবনে মাধবাচার্য্য প্রভুর পুত্র জয়রামচন্দ্র গোস্বামীও ভজন করিতেন। জয়রামচন্দ্র গোস্বামীপাদ এই স্থানেই মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী দিনে নিত্যধাম গমন করেন, এইজন্য প্রতিবর্ষে মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী দিনে নানা দিগ্‌দেশ হইতে ভক্তগণ বহু পরিশ্রমে এই জঙ্গলাকীর্ণ গুপ্তবৃন্দাবনে সমবেত হন। এবং অষ্টাহ ব্যাপিয়া উৎসব করেন।

এই গুপ্তবৃন্দাবন স্থানটী ময়মনসিংহ জিলার সদরের এলাকায় জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত আছে। ভক্ত ও সাধু মহাজন ব্যতীত অন্য লোকে হয়ত ইহার খোঁজই রাখেন না।

মাধবাচার্য্যপ্রভু এই গুপ্তবৃন্দাবনে সাধন ভজন করিয়া শেষ সময় একবার শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন, এবং মার্গশীর্ষের শুভ অমাবস্যা দিনে শ্রীধামে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণপদ্ম চিন্তা করিতে করিতে অন্তর্দ্ধান করিয়াছিলেন।

শ্রীরাধারমণ গোস্বামী।

নক্ষত্র-জগৎ।

অন্ধকার রজনীতে নির্ম্মল আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে অসংখ্য নক্ষত্র-রাজি দেখিতে পাওয়া যায়। আকাশে কত নক্ষত্র তাহা কে গণনা করিতে পারে? খালি চক্ষে যত নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায় দূরবীক্ষণ দ্বারা দেখিলে তদপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের যতই উন্নতি হইতেছে ততই বিধাতার রাজ্যের বিশালতা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। আবার যখন মনে হয় প্রদীপের ন্যায় ক্ষীণ-রশ্মি-নক্ষত্র সমূহ অতিশয় বৃহৎ। কোন কোন নক্ষত্র আমাদের সূর্য্য হইতেও বৃহত্তর তখন ভক্তি ও বিস্ময়ে হৃদয় অভিভূত হইয়া যায়।

আমরা আমাদের পৃথিবীকে "অসীম" "অনন্ত" ইত্যাদি বিশেষণ প্রদান করিয়া থাকি কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় পৃথিবী কত ক্ষুদ্র, কত সামান্য! বিশাল মহাসাগর, সুবিস্তীর্ণ মহাদেশ ও বিরাট পর্ব্বত-মালা শোভিত পৃথিবী অতি প্রকাণ্ড সন্দেহ নাই, কিন্তু উহা হইতে সূর্য্য তের লক্ষ গুণ বড়। এখন অনুমান কর সূর্য্য কত প্রকাণ্ড! আবার অনন্ত আকাশে আমাদের সূর্য্যের ন্যায় বৃহৎ কোটি কোটি সূর্য্য বিরাজমান! আমাদের সমগ্র সৌর-জগত ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র অংশ মাত্র। হিমালয়ের তুলনায় একটী ধূলি কণা যেমন ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় পৃথিবী তদধিক ক্ষুদ্র। বিধাতার অসীম রাজ্যের বিশালতা হৃদয়ঙ্গম করা ও মানবের অসাধ্য।

আমাদের সূর্য্যও একটী নক্ষত্র। নক্ষত্রের নিজের আলোক আছে। সূর্য্যের আলোকে যেমন গ্রহ উপগ্রহ সকল দীপ্ত হয় বোধ হয় অনন্ত আকাশে পরিদৃশ্যমান নক্ষত্ররাজি এক এক সৌর-জগতের মধ্যস্থলে থাকিয়া চতুস্পার্শবর্ত্তী গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতিকে আলোকিত করিতেছে। অনন্ত আকাশে কত সৌর-জগৎ তাহা নিরূপণ করিবার কাহারও সাধ্য নাই।

রাত্রিকালে আকাশে যে দক্ষিণ-উত্তর ব্যাপিনী শুভ্র রেখা দৃষ্টিগোচর হয় উহাকে ছায়াপথ বলে। ঐ ছায়াপথ কেবল নক্ষত্রে পরিপূর্ণ; অত্যন্ত দূরে অবস্থিত বলিয়া ঐ সকল নক্ষত্রের ক্ষীণ জ্যোতিঃ পাতলা মেঘের ন্যায় দেখা যায়। ছায়া পথে কোটি কোটি সূর্য্য বিরাজমান। ছায়া-পথের বিস্ময়জনক বিবরণ অন্য প্রবন্ধে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

নক্ষত্রের দূরত্ব—

পূর্ব্বে বলিয়াছি এক একটী নক্ষত্র এক একটী সূর্য্য। অনেক নক্ষত্র সূর্য্য অপেক্ষা বৃহত্তর ও উজ্জ্বলতর। লুব্ধক নামক একটী নক্ষত্র সূর্য্যাপেক্ষা ৩৬ গুণ উজ্জ্বল; নক্ষত্র সমূহের দূরত্বের কথা কল্পনা করাও অসাধ্য। জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ নানাবিধ যন্ত্রদ্বারা বহু চেষ্টা করিয়া ও বহু দূরবর্ত্তী নক্ষত্র সমূহের দূরত্ব নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে কোন নক্ষত্রই ১৮০ নিথর্ব্ব মাইল অপেক্ষা অল্প দূরে অবস্থিত নহে।

অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী কয়েকটী নক্ষত্রের দূরত্ব অনেক কৌশলে নির্দ্ধারিত হইয়াছে; তাহা অঙ্কদ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় বটে কিন্তু মনে সম্যক্ ধারণ করা অসাধ্য।

পৃথিবী যে বৃত্তাকার পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে উহাকে কক্ষ বলে।

পৃথিবীর কক্ষের ব্যাস ৯১০০০০০০ নয় কোটি দশ লক্ষ মাইল। সুতরাং সূর্য্য-প্রদক্ষিণ কালে পৃথিবী নক্ষত্রদিগের নয় কোটি দশ লক্ষ মাইল নিকটবর্ত্তী হয় আবার সেই পরিমাণ দূরে সরিয়া যায়, কিন্তু তাহাতে নক্ষত্রদিগের আকারের এক বিন্দুও হ্রাস বৃদ্ধি প্রতীয়মান হয় না। একজন পণ্ডিত (Huyghen) লুব্ধক নক্ষত্রকে সূর্য্যের সমান কল্পনা করিয়া উভয়ের আলোকের তুলনাদ্বারা অনুমান করিয়াছেন যে সূর্য্য পৃথিবী হইতে যত দূরে লুব্ধক তদপেক্ষা ২৭৬৬৪ গুণ অধিক দূরে অবস্থিত।

লুব্ধক নক্ষত্র ন্যূনাধিক ১৮০,০০০০০০০০০০ এক শত আশি নিখর্ব্ব ক্রোশ এবং ধ্রুবতারা ন্যূনাধিক ৮০০,০০০০০০০০০০ আট শত নিখর্ব্ব ক্রোশ দূরে অবস্থিত রহিয়াছে। সপ্তর্ষি মণ্ডলের একটী নক্ষত্র অন্যূন ৫৯৫,০০০০০০০০০০ পাঁচ শত পঁচানব্বই নিখর্ব্ব ক্রোশ দূরে এবং অভিজিৎ নামক নক্ষত্র মণ্ডলের অন্তর্গত একটী নক্ষত্র প্রায় ৫৭৫,০০০০০০০০০০ পাঁচ শত সত্তর ক্রোশ দূরে অবস্থিত রহিয়াছে। যে কয়েকটী নক্ষত্রের কথা বলিলাম উহারা সকলই অপেক্ষা-কৃত অল্পাধিক নিকটবর্ত্তী—কিন্তু ইহাদেরই দূরত্বের কথা ভাবিয়া আমরা বিস্ময়ে আত্মহারা হই। যে আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল সেই আলোক ঐ সকল নক্ষত্র হইতে পৃথিবীতে পৌঁছিতে প্রায় বিশ বৎসর সময় লাগিয়া থাকে। সূর্য্য পৃথিবী হইতে নয় কোটি দশ লক্ষ মাইল দূরবর্ত্তী; সূর্য্য হইতে পৃথিবীতে আলোক আসিতে মাত্র আট মিনিট সময় লাগে। অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী নক্ষত্রের দূরত্ব সূর্য্যের দূরত্বের আট দশ লক্ষ গুণ অধিক হইবে। এখন যে সকল নক্ষত্র রাজি বাষ্পরাশিবৎ প্রতীয়মান হয় অথবা যাহাদিগকে যন্ত্র সাহায্য ব্যতিরেকে দেখিতে পাওয়া যায় না তাহারা যে কত দূরে অবস্থিত তাহা চিন্তা করিতেও সাহস হয় না। পণ্ডিতেরা বলেন আকাশে এমন নক্ষত্র অনেক আছে যাহাদের আলোক দশ লক্ষ বৎসরের কমে পৃথিবীতে আসিতে পারে না। লক্ষ লক্ষ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে অনেক নক্ষত্রের আলোক আজ পর্য্যন্তও পৃথিবীতে আসিয়া পৌঁছে নাই। এখন অনুমান করিতে পার কি বিধাতার রাজ্য কত বৃহৎ? আমরা অনন্ত অসীম ব্রহ্মাণ্ডের কথা চিন্তা করিতেও পারি না—

নক্ষত্রের বৈচিত্র্য

নক্ষত্র রাজ্যের দূরত্বের অতি ক্ষীণ আভাস মাত্র প্রদান করিয়াছি এখন উহাদের বৈচিত্র্যের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করিব। সাধারণ লোকেরা সকল

নক্ষত্ররাজিকেই একরূপ বিবেচনা করিয়া থাকে। বাস্তবিক তাহা নয়। বৈচিত্র্যই প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, পরিবর্ত্তনই প্রকৃতির নিয়ম। কত পুরাতন নক্ষত্র অন্তর্হিত হইয়াছে, কত নূতন নক্ষত্র আকাশে আবির্ভূত হইয়াছে, কত নক্ষত্রের জ্যোতি ম্লান হইয়াছে; এই সকল মহত্বপূর্ণ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলে তাঁহার মহীয়সী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

কতগুলি নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধির ন্যায় কয়েকটী নক্ষত্রের হ্রাস বৃদ্ধির সময় ও পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কত গুলি অস্থায়ী নক্ষত্র (Tamporary stars) মাঝে মাঝে আকাশে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। উহারা অতিথির ন্যায় হঠাৎ গগনমণ্ডলে দেখা দিয়া চির দিনের জন্য অদৃশ্য হইয়া যায়। টাইকোব্রাহী নামক সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত একটী অস্থায়ী নক্ষত্রের কথা লিখিয়া গিয়াছেন উহার বর্ণনা পড়িলে বিস্মিত হইতে হয়। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে শুক্র গ্রহ হইতে অধিকতর উজ্জ্বল একটী নক্ষত্র আবির্ভূত হইয়াছিল সে নক্ষত্রটী নাকি এমন উজ্জ্বল হইয়াছিল যে দিনের বেলায়ই উহা খালি চক্ষে দেখা যাইত। ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে এই নক্ষটী অদৃশ্য হইয়া যায়। যখন উহা অদৃশ্য হইতে থাকে তখন ইহার বর্ণ প্রথমতঃ শুভ্র, তৎপর পীতবর্ণ হয়। ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে উহা লালবর্ণ ধারণ করে এবং তৎপর ধূসরবর্ণ হয়, ইহার কিছুকাল পরে উহা তিরোহিত হইয়া যায়। এই নক্ষত্রটী আর দেখা দেয় নাই। তখন যদি বর্ণবীক্ষণ যন্ত্র (Spectroscope) থাকিত তাহা হইলে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইত। ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে টাইকো-নক্ষত্রের ন্যায় আর একটী নক্ষত্র আকাশে দেখা দিয়া কয়েক মাস পর অন্তর্হিত হইয়া যায়। আর কতগুলি নক্ষত্র আছে উহাদিগকে "যুগলনক্ষত্র" বলে;—দুইটী নক্ষত্র পরস্পর পরস্পরের আকর্ষণ গুণে আকৃষ্ট হইয়া উভয়েই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী এক নির্দ্দিষ্ট স্থানের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে। বহুসংখ্যক "যুগল-নক্ষত্র" আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ সকল ঘূর্ণায়মান "যুগলনক্ষত্র-রাজির" বর্ণ-বৈচিত্র্য আরও মনোহর ও বিস্ময়জনক। শ্বেত, পীত, নীল, লোহিতাদি বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট অসংখ্য নক্ষত্র আকাশে পরিভ্রমণ করিতেছে।

নক্ষত্রের গতি—

গ্রহ উপগ্রহ ও ধূমকেতুর সহিত তুলনা করিয়া প্রাচীনকালের জ্যোতির্ব্বিদেরা নক্ষত্রগণকে নিশ্চল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা ঠিক নয়। নক্ষত্র দিগকে নিশ্চল বোধ হয় বটে ,বাস্তবিক উহাদের গতি আছে। অনেক নক্ষত্র স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছে। গ্রীসদেশীয় পণ্ডিতগণ আকাশের যে যে স্থানে যে যে

নক্ষত্র দৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহাদের একটীও এখন পূর্ব্বস্থানে অবস্থিত নাই।

আমাদের সূর্য্য গ্রহ উপগ্রহ, ধূমকেতু প্রভৃতি সৌরজগতের যাবতীয় বস্তু সমভিব্যাহারে লইয়া হারকিউলিস নামক নক্ষত্রমণ্ডলের দিকে প্রচণ্ড বেগে অগ্রসর হইতেছে।

হিউএনথসঙ্গ।

সুবিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউএনথ্সঙ্গ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিবরণ ভাষার প্রাঞ্জলতা বর্ণনার সূক্ষ্মতা এবং ভূয়োদর্শিতা বশতঃ পৃথিবীর ইতিহাসে অতি উচ্চ আসন লাভ করিবার যোগ্য। হিউএনথ্সঙ্গের ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রকাশিত হওয়াতে ভারতীয় ইতিহাসের অনেক তমসাচ্ছন্ন অংশ আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে।

হিউএনথসঙ্গের জন্মকাল ৬০৩ খৃঃ। তিনি শৈশব কালে দারুচিনি অথবা ভেনিলা লতার ন্যায় সৌরভপূর্ণ ছিলেন। হিউএনথসঙ্গ কৈশোরে পদার্পণ করিয়া সবিশেষ পরিশ্রম সহকারে চীন দেশের পৌরাণিক বিবরণ অধ্যয়ন করেন এবং ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে বৌদ্ধ-যতি শ্রেণীভুক্ত হয়েন। অতঃপর তিনি বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ করিয়া প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হন এবং পৃথিবীর ভোগ বিলাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্জ্জন কুটিরে, গৃহত্যাগী তপস্বীর ন্যায় জীবন যাপন করিতে সংকল্প করেন। তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চাঙ্গথ্সি বৌদ্ধশাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। লোকে তাঁহাকে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অন্যতম স্তম্ভরূপে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিত। তাঁহার হৃদয় ভ্রাতৃস্নেহে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি ভ্রাতা হিউএনথ্সঙ্গের মানসিক বিকাশ সাধন জন্য সর্ব্বদা যত্নশীল ছিলেন। হিউএনথসঙ্গ তাঁহার সহায়তায় চীন দেশের বিশিষ্ট তত্ত্ববিদ্ এবং অধ্যাপকগণের উপদেশ লাভ জন্য নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেন। ফলতঃ তিনি কঠোর সাধনা বলে নবীন বয়সেই শাস্ত্রজ্ঞানে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন এবং বৌদ্ধ-পৌরহিত্যের পদ লাভ করেন। এই সময় তাঁহার বয়স মাত্র ২০ বৎসর হইয়াছিল। তৎকালে মহাযান ও হীনযান সম্প্রদায়ের শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহ নানা তর্ক বিতর্কপূর্ণ ছিল। অধিকাংশ তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতই পল্লবগ্রাহী মাত্র ছিলেন। শাস্ত্র সমূহের মূলার্থ অনবগত বিতরণ করিতেন। হিউএনথসঙ্গ চৈনিক ভাষায় ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহের অনুবাদ পাঠ করিতেন। কিন্তু

তিনি ঐ সকল অনুবাদ পাঠ করিয়া সাম্প্রদায়িক তর্ক বিতর্কের মীমাংসায় অসমর্থ হইয়া ছিলেন, তদুপরি তাঁহার জ্ঞানলাভ স্পৃহাও অতৃপ্ত থাকিত। এই কারণে তিনি ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া মূল গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন পূর্ব্বক সমস্ত তর্কের মীমাংসা এবং আপনার জ্ঞানলাভ স্পৃহা পরিতৃপ্ত করিতে সংকল্প করেন এবং ৬২৯ খৃষ্টাব্দে ছাব্বিশ বৎসর বয়সে বুদ্ধের পুণ্য নাম স্মরণ করিয়া ভারতবর্ষাভিমুখে বহির্গত হইলেন।

হিউএনথ্সঙ্গ অপরিচিত পথে একাকী গমন করিতে লাগিলেন। সুবিস্তীর্ণ মরুভূমি, দুরারোহ পর্ব্বতমালা এবং খরস্রোতা নদী,—এই সমস্ত বাধাবিঘ্ন তিনি তুচ্ছ করিয়া অবিচলিত চিত্তে মধ্য এশিয়া অতিক্রম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি পথিমধ্যগত দেশ সমূহের ভাষা শিক্ষা করিয়া তদ্দেশ সমুদয়ের রীতিনীতি আচার ব্যবহার সম্পর্কীয় সমস্ত তথ্য অবগত হইয়া ছিলেন। এই কারণ তাঁহার গ্রন্থে আমরা মধ্য এশিয়ারও একখানি চিত্র দেখিতে পাই। তৎকালে "মধ্য এসিয়া বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। লোকে স্বর্ণময়, রৌপ্যময় ও তাম্রময় মুদ্রা ব্যবহার করিত। স্থানে স্থানে বৌদ্ধমঠ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সকল মঠে বৌদ্ধধর্ম্ম-পুস্তক সমূহের অধ্যাপনা হইত। কৃষিকার্য্যের অবস্থা ভাল ছিল। ধান্য, যব, আঙ্গুর প্রভৃতি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইত। অধিবাসিগণ রেশম পশমের পরিচ্ছদ পরিধান করিত। প্রধান প্রধান নগরে সঙ্গীত ব্যবসায়ীরা গান বাদ্যে আসক্ত থাকিত। এই জনপদে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল; স্থানে স্থানে অগ্নির উপাসনাও হইত। প্রাচীন সময়ে গ্রীশদেশের রাজধানী এথেন্স নগর যেমন বিদ্যা ও সভ্যতার প্রধান স্থান বলিয়া সমগ্র ইউরোপে সম্মানিত হইত, উক্ত সময়ে মধ্য এসিয়ার সমরখণ্ড নগরেরও সেইরূপ প্রতিপত্তি ছিল। পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের অধিবাসিগণ সমরখন্দবাসীদের আচার ব্যবহারে অনুকরণ করিত।" (১) হিউএনথ্সঙ্গ মধ্য এশিয়ায় ফারগণা, সমরখন্দ, বোখারা এবং বক্ষ অতিক্রম করিয়া হিন্দুকুশ পর্ব্বতের পাদদেশে বর্ত্তমান কোহিস্থান নামক প্রদেশে কাপাসিয়া রাজ্যে উপনীত হন।

হিউএনথ্সঙ্গ কাপাসিয়া রাজ্য সম্বন্ধে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে আমাদের প্রতীতি জন্মে যে, তৎকালে তদ্দেশীয়েরা অর্দ্ধসভ্য ছিল। এই অর্দ্ধসভ্য জনপদ ধন-ধান্য-পূর্ণ ছিল; পৃথিবীর নানা স্থান হইতে

(১) ৺রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত প্রবন্ধমঞ্জুরী।

পণ্য দ্রব্য সকল তথায় আনীত হইত। কাপাসিয়ার অধিপতি ক্ষত্রিয় বংশ সম্ভূত ছিলেন; এই নরপতি পরাক্রমশালী ছিলেন; পার্শ্ববর্ত্তী দশটি প্রদেশ তাঁহার শাসনাধীন ছিল। তিনি সর্ব্বদা প্রজারঞ্জনে নিরত থাকিতেন। কাপাসিয়ার অধিপতি বৎসরান্তে বুদ্ধদেবের সুদীর্ঘ রৌপ্যময় মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতেন; তৎকালে তাঁহার আহ্বানে মোক্ষ মহা পরিষদ্ সম্মিলিত হইত; এই সময়ে রাজা শোকাতুর এবং বিধবাদিগকে ধন বিতরণ করিতেন। কাপাসিয়া রাজ্যে এক শত বৌদ্ধমঠ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সকল মঠে ছয় হাজার পুরোহিত বাস করিতেন।

সিন্ধু নদের পশ্চিম তীরে হিউএন্থসঙ্গ ভারতবর্ষের সীমাভুক্ত কতিপয় রাজ্য অতিক্রম করিয়া ছিলেন। আমরা এই সকল রাজ্যের নাম উল্লেখ করিতেছি লমঘান, নগরহার, গান্ধার, উদ্যান এবং তক্ষশীলা। এই সকল রাজ্য তৎকালে কাপাসিয়ার শাসনাধীন ছিল। লমঘান প্রভৃতি রাজ্য তৎকালে উর্ব্বর এবং ফল-শস্য-পূর্ণ ছিল; কেবল উদ্যান রাজ্যে শস্যাভাব দেখিতে পাওয়া যাইত। লমঘান রাজ্যের অধিবাসীদের চরিত্র বিশ্বাসঘাতকতা এবং চৌর্য্যাপবাদে কলঙ্কিত রহিয়াছে। কিন্তু অন্যান্য রাজ্যের অধিবাসীরা নম্র স্বভাব, মধুর ভাষী, সৎসাহসী এবং সাধু প্রকৃতি ছিল, তাহারা জ্ঞানালোচনায় অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিত। এতদ্দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব বিদ্যমান ছিল; প্রকৃতিপুঞ্জ মহাযান সম্প্রদায় সুলভ বৌদ্ধ মতে বিশ্বাস করিত। সর্ব্বত্র বৌদ্ধ মঠ এবং স্তূপ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তৎকালে তাহাদের যে প্রকার ভগ্নদশা ঘটিয়া ছিল বলিয়া জানিতে পারাযায়, তাহাতে অনুমিত হয় যে, প্রকৃতিপুঞ্জ ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্ম্মে আস্থাহীন হইতে ছিল। বস্তুতঃ অনেকে হিন্দু ধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিল; এবং বৌদ্ধ মঠ ও স্তূপের পার্শ্বেই উচ্চচূড় দেবালয় সমূহ পরিদৃষ্ট হইত। গান্ধার রাজ্যের অন্তর্গত পলুশ নগরের পার্শ্বে এক উচ্চ শৃঙ্গ পর্ব্বতগাত্রে ভীমা দেবীর মূর্ত্তি খোদিত ছিল। এই স্থানে নানা দিগ্দেশ হইতে জনগণ সমবেত হইয়া দেবীর পূজা অর্চ্চনা পূর্ব্বক কৃতার্থ হইত। পর্ব্বতের নিম্নদেশে মহাদেব মহেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। মহাদেব মহেশ্বরের মন্দিরের অদূরে সনাতুর নামক পল্লীতে ব্যাকরণশাস্ত্রবেত্তা পাণিনি জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ছিলেন।

হিউএন্থসঙ্গ এই সকল রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিন্ধু নদ উত্তীর্ণ হইয়া পঞ্চনদ বিধৌত দেশে প্রবেশ করিলেন; তাহার পর বহু জনপদ,—বহু রাজ্য অতিক্রম করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের পুণ্যক্ষেত্রে মগধ রাজ্যে উপনীত হইলেন।

অতঃপর তিনি কপিলা বস্তু, কুশীনগর, শ্রাবস্তি, বারাণসী, বুদ্ধগয়া এবং রাজগৃহ প্রভৃতি বৌদ্ধতীর্থ দর্শন করিলেন এবং বিশিষ্ট শ্রমণমণ্ডলীর সহবাসে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া বহুসংখ্য সংস্কৃত গ্রন্থ এবং বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ করিয়া আপনার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ হইলেন। হিউ এন্থ্সঙ্গ স্বীয় অভীষ্ট জ্ঞানলাভ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার দেশ পরিভ্রমণে বহির্গত হইলেন এবং মধ্য ভারত, বঙ্গদেশ ও দক্ষিণাপথ প্রভৃতি বিচিত্র দেশ দর্শন করিলেন। তিনি দক্ষিণাপথ হইতে করমণ্ডল উপকূলের পথে মালবার দেশে উপনীত হইলেন এবং তারপর গুর্জ্জরভূমি উত্তীর্ণ হইয়া সিন্ধুদেশে গমন করিলেন। হিউ এন্থ্সঙ্গ এই স্থানে ভারত-ভ্রমণ পরিসমাপ্ত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন এবং ৬৪৫ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাবুলী স্থানের পথে স্বদেশে গমন করিলেন। ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার বিমল যশোরাশি চীনের সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল; একারণ জনসাধারণ তাঁহার নামে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, চীনের সম্রাট এই ধর্ম্মবীরকে মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন এবং তাঁহাকে বিশিষ্ট রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু হিউ এন্থ্সঙ্গ বিনম্র বচনে বৈষয়িক কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অতঃপর তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম ও শাস্ত্রের পর্য্যালোচনায় জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইলেন। সম্রাট হিউ এন্থ্সঙ্গের তাদৃশ সংকল্পের বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে বাসের জন্য একটি মঠ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। তিনি অচিরে স্বীয় ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিলেন। তারপর বহুসংখ্যক সহযোগীর সাহায্যে বৌদ্ধশাস্ত্রের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন এবং দীর্ঘকাল ব্যাপি-সাধনায় ব্যাপৃত থাকিয়া ক্রমে ক্রমে ৭৪০ খানা গ্রন্থের অনুবাদ প্রচার করিলেন। এই ভাবে লোক-হিতকল্পে জীবন যাপন করিয়া হিউ এন্থ্সঙ্গ ৬৬৪ খৃষ্টাব্দে পরলোক গত হইলেন। শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

উৎকল প্রসঙ্গ।

(২)

সংক্রান্তি শব্দের অর্থ কি? উত্তরপ্রত্যাশী গুরুমহাশয়ের উদ্যত বেত্রের আস্ফালন-ত্রাসে শৈশবের সতীর্থ যখন বাষ্পাকুলকণ্ঠে বলিয়াছিলেন "যে দিন ঘরে বেশী পিটে পায়েস তয়ের হয়" তখন হাসির হো-হো শব্দে সমস্ত পাঠশালা

মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সুদূর শৈশব-স্মৃতি পৌষ সংক্রান্তির সুমিষ্ট-পিষ্টক অপেক্ষাও অধিকতর মধুর বোধ হইতেছে। বঙ্গদেশে মাসের শেষ দিন সংক্রান্তি। কিন্তু ওড়িশাদেশে সংক্রান্তি শব্দের এই 'সদর্থ' করিলে সকলেই হাসিবে। সেখানে সংক্রান্তির সঞ্চার হইতে মাসের প্রথম দিন গণনা হয়। সুতরাং বঙ্গদেশে যে দিন ১লা বৈশাখ উৎকলে সে দিন ২রা বৈশাখ। এক দিনের অগ্র পশ্চাৎ। সে দেশে (এবং মেদিনীপুরে) 'বিলায়তী' সন প্রচলিত। উহা সৌরমানে ব্যবহৃত। আশ্বিন হইতে বর্ষ আরম্ভ হয়। জনসাধারণ মধ্যে 'অঙ্ক' নামক আর একটী সন প্রচলিত আছে। খড়দার নৃপতিগণ ওড়িশার সর্ব্বোচ্চ সম্মানের পাত্র। ইঁহারা মারাঠাদের পূর্ব্বে উৎকলে একছত্র নরপতি ছিলেন। তাঁহাদের বংশধরগণ এখনও রাজ-পূজা পাইয়া থাকেন। সে সিংহাসন নাই, কিন্তু 'গদি' আছে। প্রত্যেক রাজার গদি আরোহণ হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত এক একটী সন গণিত হয়। ইহাকে 'অঙ্ক' বলে। বঙ্গের ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ন্যায় উৎকলে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এক দারুণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। সেই ভীষণ বৎসর তদানীন্তন "৯ অঙ্ক্" স্মরণ করিয়া উৎকলের বৃদ্ধগণ এখনও আতঙ্কে নয়ন নিমীলন করিয়া ক্ষণকাল নির্ব্বাক থাকেন। এ স্থলে বলা আবশ্যক, অকারান্ত উচ্চারণ-প্রিয় উৎকলবাসীগণ অজ্ঞাত কারণে অঙ্ক শব্দের হসন্ত উচ্চারণ করিয়া থাকেন।

আমাদের দেশে নিরক্ষর লোকদের কল্যাণে 'বকলম' দস্তখতের প্রচলন আছে। এখন বৃদ্ধাঙ্গুলি-ছাপের সৃষ্টি হইয়া কলম স্পর্শ প্রথার সঙ্কোচ হইতেছে। যে কারণেই হউক, অধুনা সবরেজিষ্ট্রার সাহেব ও 'কোর্ট-বাবু' হইতে আরম্ভ করিয়া মণিঅর্ডারের পিয়ন পর্য্যন্ত অনেকেই বৃদ্ধাঙ্গুলির প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এই নূতন সমাদর দেখিয়া পূর্ব্ববঙ্গে (বিশেষতঃ পশ্চিম-ঢাকা অঞ্চলে) পরিজ্ঞাত পঞ্চাঙ্গুলির দ্বন্দ্বের ছড়া স্বতঃই মনে উদিত হইতেছে। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও সম্পাদক মহাশয় ও পাঠকবর্গের করুণা যাচ্ঞা করিয়া উহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"কনিষ্ঠা কহেন, আমি সকলের বড়।
কেমনে তুমি বড় ?
নাপিত আসুক, নাগেনি আসুক, আমারে আগে ধর।
এইটির (নাম নাই, অর্থাৎ অনামিকা) বলেন, আমি হলাম বড়।
কেমনে তুমি বড় ?

জপ কর তপ কর আমারে আগে ধর।
মধ্যমা উঠিয়া কন, আমি উচা-মাথা বড়।
আর কিসে বড় ?
দাঁতন কর মাজন কর আমারেই ধর!
শুনিয়া তর্জ্জনী কন, বড় বড়াই কর!
তুমি কিসে বড় ?
চন্দনের ফোঁটা, সিন্দুরের ফোঁটা, শুদ্ধ কাজে বড়!
বুড়াটী হাসিয়া কন বয়সে আমি বড়।
আর কিসে বড় ?
বিবাদ কর, ঝগড়া কর, এমুন এমুন (তথাকরণ) কর।*

সে যাহা হউক, বর্ত্তমান বৃদ্ধাঙ্গুলির তামসিক আমলে সাত্বিক কলম-স্পর্শ প্রথার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা কতকাল টিকিবে তাহা ভাবিবার বিষয়। পূর্ব্ববঙ্গে নিশান সহি, পশ্চিম-বঙ্গে ঢেরার অনুকরণে ঢেরা সহি এবং ওড়িশায় "সন্তক" সহি স্মৃতির অতীতকাল হইতেই প্রচলিত। সন্তক শব্দের অর্থ বোধ হয় সাঙ্কেতিক চিহ্ন। প্রত্যেক জাতির ধর্ম্ম বা ব্যবসায় সূচক সন্তক আছে। নিরক্ষর ব্রাহ্মণ-সন্তানগণ পবিত্র কুশ-তৃণ নির্ম্মিত অঙ্গুরির প্রতিকৃতি অঙ্কিত করেন, অপরে তৎপার্শ্বে তাঁহার নাম লিখিয়া দেয়। ইহার নাম "কুশবটু" সন্তক। লেখা-পড়া-জীবী করণ কায়স্থজাতির কলম বা "লেখনী" সন্তক তাহা বলাই বাহুল্য। তালপত্রে লিখিবার উপযোগী লোহার কলমের নাম "লেখনী"। তালপত্রে "শ্রীশ্রী" শব্দে করে বলিয়া লেখনীর অভিধানিক অপর নাম শ্রীকরণ। এই শ্রীকরণ লাঞ্ছন হইতে "করণ" নামের উৎপত্তি হইয়াছে কি না তাহা সুধীগণ বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন। রহস্যের বিষয় এই, যে কলম-বিহীন, ক-অক্ষর যাহার হারাম তাহাকেই কলমের শপথ লইয়া নিশান-সহি করিতে হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাভূমি উৎকলে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচলিত। আনুষ্ঠানিক বৈষ্ণবদের জপ-মালা সন্তক। উহা ক্ষুদ্র জিলিপির আকারে অঙ্কিত হয়। ইহার নাম "করমালা"। আমাদের দেশে অনেক লোক আছেন যাঁহাদের পুস্তকের সঙ্গে বিশেষ সদ্ভাব নাই, বরং চিরকাল মনোমালিন্যই চলিতেছে। তবু তাঁহারা ফটো তুলিবার সময় হাতে একখানি বড় বই তুলিয়া লইয়া উহার ভিতর তর্জ্জনী প্রবেশ করিয়া রাখেন। আমার বোধ হয়, এমত স্থলে নিরক্ষরদের হস্তে জপ-মালাই সর্ব্বাপেক্ষা শোভনীয়।

শ্রমজীবী খণ্ডাইতদের কটারি (দা) বা খন্তা, 'ভাণ্ডারী' বা নাপিতদের নরুণ, ছুতোর মিস্ত্রীদের হাতুর বা মুগুর, বাণিয়া বা স্বর্ণকারের নিক্তি, দরজীর কাঁচি, ভূমিজদের তীর, ধোপাদের কুড়াল (পূর্ব্ব প্রবন্ধ দেখুন) এবং মৎস্যজীবী তিয়রদের মাছ ধরিবার যন্ত্রবিশেষের অনুকরণে 'সন্তক' অঙ্কিত হইয়া থাকে। যে জাতির হাতে যে হাতিয়ার তাহাই সে জাতির সন্তক, ব্রাহ্মণই হউন আর করণই হউন। সর্ব্বশ্রেণীর স্ত্রীলোকগণ তাঁহাদের হস্তের অঙ্গুরির ক্ষুদ্র বৃত্তাকার প্রতিকৃতি অঙ্কন করেন। নিরক্ষর মুসলমান পুরুষেরা সকলেই কটারি বা দা এবং মুসলমান স্ত্রীগণ কঙ্কণ বা বালা-রূপী সন্তক ব্যবহার করেন।

অনার্য্য ধর্ম্মের প্রভাব ভারতের সর্ব্বত্রই আছে। পূর্ব্ববঙ্গের ইতর সমাজে পৌষসংক্রান্তি দিন শূকর বলি ও 'বুড়াবুড়ি' পূজার প্রথা ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। ওড়িশায় এই অনার্য্য আধিপত্য বিশেষ বদ্ধমূল। উৎকলে প্রত্যেক গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আছেন। তাঁহার সাধারণ নাম "গ্রামদেবতী" বা "ঠাকুরাণী"; বৃক্ষতলে সিন্দুর লিপ্ত প্রস্তর খণ্ডের উপর ইহার অধিষ্ঠান কল্পনা করা হয়। চতুর্দ্দিকে ছোট ছোট আরও কতকগুলি প্রস্তরের স্তূপ থাকে, ঐ গুলি দেবীর পুত্র কন্যা ও পরিজন। 'গ্রামদেবতী' পূজার পুরোহিত ব্রাহ্মণ নহেন; ভাণ্ডারী (নাপিত), মালী প্রভৃতি অন্ত্য জাতি হইতে পূজক নিরূপিত হয়। প্রতি 'গুরুবারে' পূজা হয়। আমাদের যেমন ছোটখাট দৈবকর্ম্মে সোম শনি বা মঙ্গলবারের প্রতি পক্ষপাতিতা দৃষ্ট হয়, ওড়িশায় তেমনি বৃহস্পতিবারের বিশেষ 'গুরু'ত্ব। প্রস্তরগুলিতে ঘি ও হলুদ মাখিয়া জল ঢালিতে হয়, ইহার নাম দেবীর স্নান বা "মার্জ্জনা"। স্নানান্তে সিন্দুর লেপন ও কিঞ্চিৎ বাতাসা বা ফল প্রদানের সঙ্গেই পূজা শেষ হয়। পূজা নির্ব্বাহের নিমিত্ত প্রত্যেক গ্রামে নিষ্কর জমি নিরূপিত আছে। গ্রামের প্রত্যেক বিবাহে বর বা কন্যার অধিবাস-স্নানের পূর্ব্বে "ঠাকুরাণী"র স্নান বা মার্জ্জনা সমাপন করিয়া ভাবী শুভকার্য্যে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতে হয়।

ঠাকুরাণী স্বগ্রামের হিতাকাঙ্ক্ষিনী। সুতরাং গ্রামে ওলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইলে পার্শ্ববর্ত্তী অন্য গ্রামের ঠাকুরাণীর প্রতি সন্দেহ আরোপিত হয়। তখন স্বগ্রামের দেবীর সাহায্য আবশ্যক; এজন্য বিশেষ ভাবে পূজার আয়োজন হইয়া থাকে। নৈবেদ্যের ফল ও মিষ্টান্ন হাঁড়িতে করিয়া গ্রামের বাহিরে তেমাথা রাস্তায় রাখিয়া দেওয়া হয়! সেই ফল ও মিষ্টান্নের লোভে বাহকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া পীড়ার ভূত গ্রাম পরিত্যাগ করে!

এত করিয়াও যদি সংক্রামক পীড়ার তিরোভাব না হয়, তবে ঠাকুরাণীর নিকট ধন্না দিতে হয়। ধন্না-দায়ক ব্যক্তির নাম কালসি। নিমীলিত-নেত্র 'কালসি' মুহুর্মুহুঃ সবেগে শিরসঞ্চালন করিয়াই বোধ হয় মস্তিষ্ক হইতে বাহ্যজ্ঞান নিক্ষেপ করিয়া ফেলে। তখন তাহার প্রতি দেবীর ভর হয়, এবং সে মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে সমবেত উৎকর্ণ লোকদের নিকট দেবীর আদেশ জ্ঞাপন করে। এই সময় উহার কাছে একটী কুক্কুট ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পরিশ্রান্ত কালসি কুক্কুটের কণ্ঠ ছিন্ন করিয়া উত্তপ্ত শোণিত পান পূর্ব্বক পিপাসা নিবৃত্তি করিয়া থাকে।

সচরাচর বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় ঠাকুরাণীর অধিষ্ঠান। কোন কোন গ্রামে তাঁহাকে উন্মুক্ত ক্ষেত্রে বাস করিতে হয়। তখন তাঁহার নাম 'খরা-খাই' ঠাকুরাণী। উৎকলে খরা শব্দের অর্থ গ্রীষ্ম বা গরম। ঠাকুরাণী স্বয়ং প্রখর রৌদ্রের তেজ ভক্ষণ করিয়া শস্য রক্ষা করিয়া থাকেন আবার কোন স্থলে অবস্থাপন্ন গ্রামবাসিগণ চাঁদা তুলিয়া ঠাকুরাণীর জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এই গৃহের চারিদিক অনাবৃত, প্রাচীর নাই। গৃহের দারুস্তম্ভে বিরাজমান (শ্রীক্ষেত্রের মন্দির গাত্রের ন্যায়) কল্পনাতীত অশ্লীলমূর্ত্তি গ্রাম্য শিশুর নৈতিক শিক্ষার পথে কণ্টক রোপণ করিয়া থাকে।

শ্রদ্ধেয় সুহৃদ শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন দাস মহাশয় বহুকাল উৎকলে যাপন করিয়াছেন। এসিয়াটিক সোসাইটীর জার্ণালে প্রকাশিত তাঁহার রচিত "উড়িষ্যার গ্রাম্য দেবতা" নামক প্রবন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে।

বিবাহের পর প্রথমরাত্রে চাঁদসদাগরের পুত্র লখিন্দরের সর্পদংশনে মৃত্যু হয়। উক্ত রজনী বঙ্গদেশে কালরাত্রি বলিয়া অভিহিত। তৎপর যামিনীযোগে নব দম্পতির শুভ সম্মিলন হয়। সেই "শুভ রাত্রির" প্রথম সম্ভাষণ কাহার না মনে আছে? ওড়িশায় উক্ত কালরাত্রি নাই। কিন্তু অষ্টমঙ্গলের পর নবম ও দশম রাত্রি সর্ব্বথা পরিহার্য্য, উহা "বিষরাত্রি"। অন্ত্যজ জাতিদের মধ্যে নব দম্পতিকে গাভীর লেজ স্পর্শ করিয়া শয্যায় যাইতে হয়।

ওড়িশায় বাল্য বিবাহ নাই। কিন্তু গড়জাত রাজ্য কিয়ঁঝড়ে এক অদ্ভুত প্রথার কথা শুনিয়াছি। সেখানে গোয়ালাদের মধ্যে রজোদর্শনের পূর্ব্বে কন্যা সম্প্রদান করিতে না পারিলে সে কন্যাকে বনবাস দেওয়াই সামাজিক শাসন বিধি। পিতা রজস্বলা অপরিণীতা কন্যাকে বনের ভিতর এক বৃক্ষের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়া আইসে। পরিত্যক্তা বালিকাকে যে কেহ প্রথম দেখিতে

পাইবে, গঙ্গা পূজার নৈবেদ্যের ন্যায়, বালিকা তাহারই "প্রাইজ"। বলা বাহুল্য এমত স্থলে ত্বরা-নির্ব্বাচিত যেমন-তেমন একটী বরের সঙ্গে পূর্ব্ব হইতে বন্দোবস্ত থাকে। কন্যার পিতা নয়নের অন্তরাল হইলেই উক্ত বরপ্রবর কনের পাণি-গ্রহণ ও আকর্ষণ করিয়া সানন্দ চিত্তে নিজ গৃহে লইয়া যায়।

উৎকলবাসী বাঙ্গালীদের বংশধরগণ "কেরা-বাঙ্গালী" বলিয়া অভিহিত। অনেক পুরুষ যাবৎ ওড়িয়াদের সংশ্রবে আসিয়া ইহারা খাটী বাঙ্গালা কহিতে পারেন না। খেয়ে, গিয়ে প্রভৃতি অসমাপিকা ক্রিয়ার স্থলে ইহারা খাই-ক'রে, যাই-ক'রে প্রভৃতি "করে" শব্দ-বহুল বাক্য ব্যবহার করেন। এইজন্য কেবল বাক্য-ব্যয়ে, বিনা খরচে, ইহারা "কেরা" উপাধি অর্জ্জন করিয়াছেন।

কলিকাতা হইতে যে গ্রেট ট্রাঙ্ক রোড নামক রাজবর্ত্ম পুরীর নিকটবর্ত্তী হইয়া মাদ্রাজ অভিমুখে গিয়াছে, উহার স্থানীয় নাম জগন্নাথ সড়ক। রেলের পূর্ব্বে উহাই শ্রীক্ষেত্র-যাত্রার একমাত্র পন্থা ছিল। কার্য্যবশতঃ এই পুণ্যমার্গ উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইতে হইলে, এখনও উৎকল বৃদ্ধগণ মিলিত-করযুগলের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা ললাটস্পর্শ পূর্ব্বক জগন্নাথদেবের উদ্দেশে প্রণতি জ্ঞাপনের সঙ্গে মাথায় রজঃ তুলিয়া লইয়া তবে রাস্তার এক পার্শ্ব হইতে অপর দিক সসম্ভ্রমে পদন্যাস করিয়া থাকেন।

পূর্ব্ব-বঙ্গে মর্কট অতি বিরল। ওড়িশায় বৃক্ষে ও ক্ষেত্রে দলে দলে হনুমান বিরাজমান। ইহারা গাছের ফল ও শস্যের স্বত্ব সম্বন্ধে গৃহস্থের সঙ্গে সতত বিরোধ উত্থাপন করিয়া থাকে। কাশীর দুর্গাবাড়ীর ন্যায় শ্রীক্ষেত্রে বানরের উৎপাত মিউনিসিপালিটীর অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ছোটলাট বেকার বাহাদুর সে দিন কমিশনরদের সহিষ্ণুতার উপদেশ প্রদান করিয়া ধর্ম্ম-প্রাণ হিন্দুদের কৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উৎকলে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচলিত। হিংসা নাই। সুতরাং প্রবাসী বাঙ্গালী শাক্তের আহারে অরুচি হইলে তাঁহাকে চামারদের শরণাপন্ন হইতে হইবে। আর কেহ পাঁটা কাটিবে না।

শ্রীপরমেশপ্রসন্ন রায়।

সখি-বিয়োগ।

(১)

সত্যই কি সখি তথা গিয়াছ চলিয়া?

যেখানে মরে না লোক

যেখানে রহে না শোক

যেখানে কুসুম রহে চির-বিকশিয়া।

(২)

সত্যই কি সখি তথা গিয়াছ চলিয়া?

যে স্থানে বসন্ত কাল

বাস করে চির কাল

বায়ু বাঁচাইয়া রাখে পরমায়ু দিয়া।

(৩)

সত্যই কি সখি তথা গিয়াছ চলিয়া?

যে স্থানে ফুলের কোলে

আনন্দে ভ্রমর খেলে

পুষ্পিতা লতিকা নাচে পাতা দুলাইয়া।

(৪)

সত্যই কি সখি তথা গিয়াছ চলিয়া?

যে স্থানে নীহার-নীর

খেতে দেয় সুধা-ক্ষীর

খোয়াইয়া দেয় দিক মধু ছিটাইয়া।

(৫)

সত্যই কি সখি তুমি গিয়েছ চলিয়া ?
যে দেশে চন্দ্রমা তারা
বরষয়ে সুধা-ধারা
আঁধার রয়েছে দূরে মরমে মরিয়া।

(৬)

সত্যই কি সখি তথা গিয়াছ চলিয়া ?
যথা মন্দাকিনী স্রোত
বহিতেছে অবিরত
কল্ কল্ স্বরে গান আনন্দে গাহিয়া।

(৭)

সত্যই কি প্রিয় সখি গিয়াছ স্বরগে ?
জরা মৃত্যু, রাখি হেথা
জীবন্ত আনন্দ যথা
কাটাইতে পূত-প্রাণ শান্তি উপভোগে।

(৮)

সত্যই কি প্রিয় সখি গিয়াছ ত্রিদিবে ?
ত্যাগ করি প্রিয়তমে
সত্যই কি মনোরমে
আর আসিবে না ভূমে, স্বর্গেই রহিবে ?

(৯)

সত্যই কি দয়াময়ী* আনন্দ-দায়িনী
কুসুম-রূপিনী-নারী
মুখে হাসি চখে বারি
যৌবনে পড়েছে ঝরে জীবন তোষিণী !

(১০)

সত্যই কি ঘুমাইছ, ভাঙ্গিবে না ঘুম ?
কোন স্থানে গেছ ভাই
জগতে কি আর নাই
সেই প্রীতি প্রদায়িনী প্রফুল্ল-কুসুম।

---

* স্বর্গগতার নাম।

(১১)

সখি কি গিয়াছ তুমি আপন ইচ্ছায়
প্রাণধন নারায়ণ *
অঙ্গে করি সমর্পণ
অথবা নিয়েছে কেড়ে, নিঠুর বিধাতায়।

(১২)

কোন পথ দিয়া তুমি গেছ অমরায় ?
সেই হাসি ভরা মুখ
আর কি দিবে না সুখ
শোক বিনে এ-হৃদয়ে ? মরি হায় হায় !

(১৩)

অমরা তোমারি যোগ্য, ডাকিছে তোমায়
দেবীরা আদর করে
বসাইছে সমাদরে,
সুরভি মন্দার পুষ্পে সাজাইছে কায়।

(১৫)

লভিবে ত্রিদিবে কত অপার্থিব ধন
অন্তরে পাইবে শান্তি,
দূর হবে ভুল ভ্রান্তি,
লভিবে সতীত্ব বলে স্বামী নারায়ণ।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা।

নগ্ন-সৌন্দর্য্য।

তব চঞ্চল নীল চিকণ অঞ্চল
খুলে ফেলে দেও দূরে,
তব কুন্তল দাম নভঃতল-শ্যাম
দেও গো শিথিল করে ;

* স্বামীর নাম।

দেও বসন্ত পবন করিতে চুম্বন
সুরভি মাধবী বক্ষ,
ওগো, ত্বরা দেও খুলে বকুলের তলে
তোমার বিজন কক্ষ;
দেও আনিতে পবনে মুখরিত বনে
বাঁশীর মধুর মন্দ্র,
দেও ভাসায়ে লজ্জা, বিমল শয্যা
ধুয়ে দিক্ চারুচন্দ্র;
আজ আন বন হ'তে তুলি নিজ হাতে
গোলাপ রজনীগন্ধা,
জ্বলে দীপ মণিময়, ওগো এ সময়
আসিয়াছে নব সন্ধ্যা;
গাঁথ কুসুম স্তবক, ছড়াও চম্পক,
ঘর হোক বাস ভরা,
রাখ কিন্-কিনি দূরে, রাখ মল ছেড়ে,
পর কুসুমের চূড়া,
এবে তব বীণা খানি, সযতনে আনি
ধরহ পূরবী তান্,
আজি সাজায়ে প্রকৃতি সুহাসে যুবতি!
মাতোয়ারা কর প্রাণ।

শ্রীকুমুদকিশোর আচার্য্য চৌধুরী।

অতিথি।

যে দিন প্রথম তুমি অতিথির বেশে
আসিলে গৃহেতে মোর অজানা অচেনা,
লজ্জানত আঁখি, ধীরে মৃদু হেসে হেসে
কি জানি কি করি সমস্ত হৃদয় খানি
মোর অধিকার করি বসিলে আসিয়া।

কি মধু ঝঙ্কারে দিলে বাজাইয়া মোর
সমস্ত হৃদয় তন্ত্রী। আমি সে অবধি
শুধু তব ধ্যানে আছি রত, তোমারি
মাঝারে রয়েছি মগ্ন হয়ে আত্মহারা,
বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কিছু নাহি জাগে মনে।
সমস্ত জগৎ যেন সম্মুখ হইতে
গিয়াছে সরিয়া, সেথা তুমি অয়ি
মোর প্রেমরাণি, আছ একাকিনী বসি,
রাজ-রাজেশ্বরী হয়ে ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া।
অপূর্ণ ছিলাম আমি, পূর্ণ করি তুমি
দিলে মোরে এত কাল পরে। কিন্তু যদি
তিথি না ফুরাতে দেবি, ফেলে যাও মোরে
নির্ম্মম নিষ্ঠুর হয়ে, বিচূর্ণ, বিদীর্ণ
করি ক্ষুদ্র হৃদি খানি মোর, তবু আমি
রহিব দাঁড়ায়ে নিশ্চল নির্ভিক চিত্তে
তোমারে করিয়া ধ্যান। যে মূর্ত্তি হৃদয়ে
রেখেছি অঙ্কিত করি—রয়েছে যে স্মৃতি
সদা জাগি অন্তরের গূঢ়তম স্থানে—
কার হেন সাধ্য আছে কেড়ে লয়ে যায়
সেই সুখ স্বপ্নময় স্মৃতি টুকু মোর?
যত দিন এ জীবন করিব বহন
সেধে যাব যত কিছু কর্ত্তব্য আমার;
শেষে কর্ম্মক্লান্ত-শ্রান্ত-তনু খানি ছাড়ি
মিলিব তোমার সনে অনন্ত মিলনে।

শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী।

বিদায়ের ক্ষণে।

আবার গেলাম ফিরে,
ভাঙ্গিয়া কহিব তারে
আমি ভালবাসি!

তার মুখে ছিল গো সে
দীঘির ঘাটেতে বসে
উজলি হরষী।

তাহারি এলান চুলে,
তরুটী পড়েছে হেলে
যেন স্নিগ্ধ ছায়ে,
সোণালি মেঘের তটে
তারাটী উঠেছে ফুটে,
তারি মুখ চেয়ে!
বলিতে গেলাম পাশে,
আধ লাজে আধ হেসে
তারে ভালবাসি,
কি কথা! বলিব কাকে!
চাহি সে অমিয়া মুখে,—
সব গেল ভাসি!

সে কথা হ'লো না বলা,—
অবসান হল বেলা
সাঁঝের আঁধারে,
কাঁপায়ে কুন্তল তার,
বহে কাল হাহাকার
অসীমের পারে!!
জীবনের মরুপারে
দগ্ধ রবি খেলা করে
অসহ্য পীড়নে,
একটুকু ভালবাসা
গোপনে বেঁধেছে বাসা
মরমের কোণে,—
সেই বিদায়ের ক্ষণে!

শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ।

শর-শয্যা। *

(কাব্য)

বহুদিন পর আমরা একখানি সুপাঠ্য কাব্য সমালোচনার জন্য উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। এই শর-শয্যা কাব্যে কুরুক্ষেত্র মহাসমরে ভীষ্মের অলৌকিক বীরত্ব-কাহিনী এবং তাঁহার মহিমাময় মহাপ্রস্থান চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। আজ-কাল সাধারণ পাঠকেরা হাল্কা কথায় হাল্কা ভাবই পছন্দ করিয়া থাকে। গ্রন্থকারগণ Political Economy র মূলসূত্র শিরোধার্য্য করিয়া Demand অনুসারে Supply এর ব্যবস্থা করিতেছেন। এইরূপ দোকানদারীতে কাহারো কাহারো পয়সা হইতেছে বটে, কিন্তু সাহিত্যের পবিত্র কানন আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। দুর্ব্বোধ্য ছড়া-হেঁয়ালীর দিনে হেম বাবু সেকালের ভীষ্মের শর-শয্যা গীতি গাহিবার জন্য স্বীয় কবিতা দেবীকে প্রবুদ্ধ করিয়া অসামান্য সৎসাহসের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন সন্দেহ নাই।

* শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ বি-এল প্রণীত, ভারত-মিহির যন্ত্রে মুদ্রিত।

যিনি ধৈর্য্য সহকারে এই সুদীর্ঘ কাব্য খানি পাঠ করিবেন তিনি গ্রন্থকারের অসামান্য কবিত্ব, সুললিত শব্দ-বিন্যাস-নৈপুণ্য এবং ভাবের গভীরতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া মোহিত হইবেন। কবির চারু তুলিকার সুকোমল স্পর্শে ভীষ্মের গৌরব উজ্জ্বল সমুন্নত চরিত্র অতি সুন্দর পরিস্ফুট হইয়াছে। কুরুক্ষেত্রের ভীষণ উত্তাল তরঙ্গান্দোলিত রণ-পয়োধির মধ্যস্থলে অটল হিমাদ্রির ন্যায় দণ্ডায়মান মহাবীর ভীষ্মের বীরত্ব, তদধিক গাম্ভীর্য্য ও উদারতা কি মহান্! মহর্ষি ব্যাসের এই অতুলনীয় চরিত্র শর-শয্যা কাব্যে ম্লান বা শ্রীহীন হয় নাই। গ্রন্থকার অতি কৌশলে সেই বিরাট পুরুষের শৌর্য্য ও মহত্ত্ব পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। কবির ভাষা অতিশয় শ্রুতিমধুর কিন্তু তিনি অকারণ সুললিত শব্দ প্রয়োগ করিয়া ভাবের গাম্ভীর্য্য ক্ষুণ্ণ করেন নাই।

সুবিস্তৃত কুরু-ক্ষেত্র প্রাঙ্গণে যুযুৎসু বীরেন্দ্রবৃন্দ সমবেত হইয়াছেন, সহস্র সহস্র বস্ত্র-বাস স্থাপিত হইয়াছে; অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের প্রবল কোলাহলে দিঙ্মণ্ডল প্রকম্পিত হইতেছে! কুরু-পক্ষে ভীষ্ম সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ! "উর্ম্মিমালাময় ক্ষীরোদ অর্ণবমাঝে" "বিশাল মৈনাক গিরির" ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া তিনি "জলদ নিস্বনে" আপন সৈনিকদিগকে উৎসাহিত করিতেছেন। তাঁহার কণ্ঠ হইতে উত্তপ্ত গৈরিক নিস্রবের ন্যায় উদ্দীপনা-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে :—

* * * ইচ্ছে কোন জন
জীবনে পুরীষময় নরক ভুগিতে ?
জীবের বাঞ্ছিত স্বর্গ বিস্তৃত সম্মুখে
মৃত্যু রূপ দ্বার ওই—প্রবেশের পথ;
* * * * *
অযুত বৎসর ব্যাপী নিরীহ জীবনে
জীবন বলিয়া ভীষ্ম নাহি গণে কভু!
যে দণ্ডে উজ্জ্বল হয় ক্ষত্রিয়ের নাম,
ধরম আহবে পশি যেই দণ্ডে মরি
করিয়া সমর-সুধা পান মহাসুখে
লভে তৃপ্তি, মিটে তৃষ্ণা, এক দণ্ড সেই
ভায়রেব আয়ুষ্কাল, অমূল্য ত্রিলোকে!
এ ভীম জীমূত যবে বিজলীর হাসে

ত্যজিবে নির্ঘোষে দীপ্ত দম্ভোলী ভীষণ
গিরি শৃঙ্গ সম শত্রু যাবে রসাতলে।"

প্রথমেই ভীষ্মের সহিত বিরাটাত্মজ শ্বেতের ভীষণ সংগ্রাম। অধিকাংশ সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা কাব্যের যুদ্ধ-কাহিনী পাঠ করিয়া যাত্রার দলের অভিনয়ের কথা মনে হয়। ভয়াবহ যুদ্ধ বর্ণনায় আমাদের দেশের কোন কবিই বড় কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। অনেকস্থলে প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধাদিগের বীররসাশ্রিত আত্ম-শ্লাঘার বিচিত্র উচ্ছ্বাস পাঠ করিয়া হাস্য সম্বরণ করা যায় না। এই শর-শয্যা কাব্যে ও সেই দোষ আছে।

শ্বেতপত্নী কোমল হৃদয়া শৈলবালার চরিত্রটী বড়ই মধুর হইয়াছে। ভীষ্মের সহিত শ্বেতকেতু প্রবল সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করিলে শ্বেতপত্নী শৈলবালা অতিশয় শোকে অধীর হইলেন এবং স্বামীর সঙ্গে চিতারোহণের জন্য প্রস্তুত হইলেন। পতিশোকে অভিভূতা হইলাও শৈল ভাবিলেন যদি এই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় তাহা হইলে তাহার মত কত রমণী পতি পুত্র হারা হইবেন। তাই তাঁহার হৃদয় পর দুঃখ মোচনের জন্য ব্যাকুল হইল। দয়াবতী রমণী মহাসমর ক্ষেত্রে ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন—

পুত্র হীন কুরুবীর! বুঝিবে কি তুমি
কত সুত, কত পিতা করিছে রোদন?
মৃত প্রাণে কত মাতা লুটাইছে ভুমে!
হৃদয় দহিছে সদা চিতার দহন;
দারাহীন বুঝিবে কি পবিত্র প্রণয়,
সতীর হৃদয় কত তুষানলে দয়।
নিবাও এ যুদ্ধানল শান্তিবারি দানে
দহিও না শত শত মাতার হৃদয়।
ঢালিও না হলাহল সতীর পরাণে।

পর দুঃখ কাতরা রমণীর তীব্র-ভর্ৎসনা শুনিয়া ভীষ্ম লজ্জিত হইয়া বলিলেন—

দারা-কন্যা-পুত্রহীন সংসারে উদাস
সত্য মাতঃ! সেব-ব্রত, কিন্তু এ হৃদয়
ভীষণ শ্মশান নহে প্রেতের আবাস—
কহিয়াছি দেবি! সাদরে ডাকিয়া

কত দিন কত বার কৌরব-পামরে,
হিংসা দ্বেষ দুষ্ট বুদ্ধি ক্রূরতা ত্যজিয়া
সৌভ্রাত্র স্থাপন কর জগতের তরে
বিদুর কহিলা কত না শুনিল কানে
ঔষধ কি মানে ব্যাধি আয়ু অবসানে ?

অতঃপর ভীষ্ম সহমরণ-উদ্যতা শৈলকে বুঝাইয়া বলিলেন—

স্বামী হিতোদ্দেশে যিনি ঈশ্বরের ধ্যানে
ব্রহ্মচর্য্য ব্রত করি যাপেন জীবন,
অধিক মহত্ব তাঁর।

কিন্তু শৈল তাহা শুনিলেন না——

——স্বাভাবিক কায়া সহ ছায়ায় গমন
নিত্য ধর্ম্ম——

তাই পতির চিতায় শৈল জীবনাহুতি দিলেন। কবি অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া ষষ্ঠসর্গ সমাপ্ত করিলেন।

সপ্তম সর্গে দুর্য্যোধন পত্নী ভানুমতীর চরিত্রটি কবি বেশ সুন্দর ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—মন্দোদরী যেমন রাজ্য ও পতির মঙ্গল কামনা করিয়া রাবণকে সীতা ফিরাইয়া দিতে বার বার মিনতি করিয়াছিলেন ভানুমতীও তেমনি দুর্য্যোধনের চরণ তলে পতিত হইয়া বলিলেন—

নিবাও এ অগ্নি, রক্ষ ভারতবাসীরে
অধীর আমার প্রাণ কর তাহে শান্তিদান
ভ্রাতাগণ সহ নাথ! করহ মিলন
ভারতে শান্তির রাজ্য হউক স্থাপন।

কিন্তু পাপমত্ত দুর্য্যোধন তাঁহার অনুরোধ গ্রাহ্য করিলেন না। "বৃত্র-সংহার" কাব্য জয়ন্তপত্নী 'ইন্দুবালার' ন্যায়শক্রুর জন্যও ভানুমতীর হৃদয় ব্যথিত, নয়ন সলিল-সিক্ত—

জননীর হাহাকার, পত্নীর রোদন আর
না পারি শুনিতে, দহে হৃদয় আমার।

শরশয্যায় কবির একটী বিশেষত্ব এই তিনি যথনই পূর্ব্ব পুরুষের গৌরব গাথা কীর্ত্তন করিয়া তন্ময় হইয়াছেন তথনই তিনি জন্মভূমির শোচনীয় অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন। অনেক স্থানেই তাঁহার উচ্ছ্বসিত স্বদেশ প্রেমের পরিচয় পাইয়াছি। অষ্টমসর্গে একস্থানে আছে ভীষ্ম-জননী স্বপ্নে।

অবতীর্ণা হইয়া পুত্রকে পাপপূর্ণ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত স্বর্গে যাইতে আগ্রহ করিতেছেন; তখন ভীষ্ম বলিলেন—

তোমার অধিক পূজ্যা জননী ভারত
ইঁহার প্রদত্ত ভক্ষ্য পানীয় আস্বাদে
ধরিয়াছি এই প্রাণ * * *
অতুল স্বর্গের সুখ চাহে না গাঙ্গেয়,
ভুঞ্জিব নরক এই সহস্র বৎসর
তথাপিও ত্যজিব না বিপদে মাতায়।
এই প্রাণ, এই কায় দেহের শোণিত
জননী ভারত তরে করিব অর্পণ।

নবম হইতে ষোড়শ সর্গ পর্য্যন্ত কেবল কঠোর ধর্ম্মতত্ত্ব-ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ। সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি, উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব, বেদান্তের মায়াবাদ, বিশুদ্বৈত বাদ, অদ্বৈত বাদ ইত্যাদি জটিল দার্শনিক বিষয়ের আলোচনায় কাব্যের সহজ সরল পথ দুর্গম ও কণ্টকাকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কবিতা-দেবী যুক্তি-তর্কের লৌহ-শৃঙ্খল দর্শন করিয়া ভয়চকিতা হরিণীর ন্যায় ব্যাকুল প্রাণে প্রস্থান করিয়াছেন। গ্রন্থকার কবির আসন পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মোপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিতে গেলেন কেন বুঝিতে পারিলাম না। ধর্ম্মপ্রচারক উপদেশ দিয়া এবং দার্শনিকগণ যুক্তি দ্বারা শত বৎসরের যে সত্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন না, কবি আদর্শ চরিত্র অঙ্কিত করিয়া একমুহূর্ত্তে সেই সত্যের দিকে সমগ্র মানব জাতিকে আকৃষ্ট করিয়া লইতে সমর্থ হন। কবির শক্তি অসামান্য।

ভীষ্মের শরশয্যা চিত্রটী বেশ হইয়াছে। কিন্তু কুরুক্ষেত্রে রণশায়ী ভীষ্ম যে দৈবশক্তি বলে ভারতবর্ষের বিংশ শতাব্দীর দুঃখ দারিদ্র্যের কথা ভাবিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ যে পূর্ব্বাকাশে ঊষার অরুণ রেখা প্রদর্শন করিয়া ভারত জননীকে সান্ত্বনা করিয়াছেন তাহা নিতান্তই জোর করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পরিশিষ্টে প্রদত্ত অকৃত্রিম স্বদেশ প্রেমের উচ্ছ্বাস যদি কৃষ্ণের না হইয়া গ্রন্থকারের নিজের হইত তাহা হইলে এমন অস্বাভাবিক বোধ হইত না। এই কয়েকটী অতি সামান্য দোষ। শরশয্যা কাব্যখানি অতি উপাদেয় হইয়াছে। হেম বাবুর কবি-যশ উজ্জ্বলতর হইয়াছে।

আরতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

৮ম বর্ষ। } ময়মনসিংহ, বৈশাখ, ১৩১৫। { ৫ম সংখ্যা।

যুগল-নক্ষত্র।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে যুগল-নক্ষত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছি। আজ যুগল-নক্ষত্র সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিব। আকাশে যে নক্ষত্র সকল এক একটী দীপ শিখার মত মিট্‌ মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছে উহারা অতি প্রকাণ্ড এবং উহাদের আলোকও খুব প্রখর। কিন্তু ঐ সকল নক্ষত্র এত দূরে অবস্থিত যে খালি চক্ষে তো উহাদের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করা অসাধ্যই, সাধারণ দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলেও উহাদের আয়তনের কোন ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় না। এইজন্য নক্ষত্র জগতের অসামান্য বৈচিত্র্য বহুদিন পর্য্যন্ত জ্যোতিষীদিগের নিকট অজ্ঞাত ছিল। উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ ও বর্ণবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হইলে পর নক্ষত্রদিগের সম্বন্ধে অনেক তথ্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আকাশে যে সকল নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে উহাদের মধ্যে কোন কোন নক্ষত্র "যুগল" এই বিষয় পূর্ব্বে কাহারও ধারণা হয় নাই।

যুগল-নক্ষত্র যখন প্রথম আবিষ্কৃত হইল তখন কেহ কেহ বলিলেন ঐ সকল নক্ষত্র বাস্তবিক যুগল নয়। যুগল বোধ হইবার কারণ এই যে দুইটী দূরবর্ত্তী নক্ষত্র পরস্পর হইতে খুব ব্যবধান থাকিলেও সমসূত্রে দৃষ্টিগোচর হইয়া উহাদিগকে একত্র বোধ হইয়া থাকে। খুব দূর হইতে শ্রেণীবদ্ধ [illegible] মালাকে সমসূত্রে দেখিলে একত্র বলিয়া ভ্রম জন্মে। ঐরূপ দৃষ্টি—[illegible] কতগুলি নক্ষত্রকে "যুগল" দেখায় ইহাই প্রথমে অনেকের বি[illegible]

এখন যুগল-নক্ষত্রের অস্তিত্ব অভ্রান্তরূপে প্রমাণিত [illegible] (Cassini) নামক একজন জ্যোতির্ব্বিৎ ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম যুগল-নক্ষ[illegible] আবিষ্কার করেন। ঐ সময় হইতে জ্যোতিষীগণ যুগল-নক্ষত্র সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৮০টী যুগল-নক্ষত্রের সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। পরে যখন সুবিখ্যাত পণ্ডিত হর্শেলের দৃষ্টি উহাদের উপর

পতিত হইল তখন বহুসংখ্যক নূতন নক্ষত্র আবিষ্কৃত হইল। হর্শেল ২৪০০ শত যুগল-নক্ষত্র তাঁহার তালিখা ভুক্ত করিয়াছিলেন। ষ্ট্রুভের (Struve) তালিখায় ৩০৬৩টী যুগল-নক্ষত্র স্থান পাইয়াছে। এখন প্রায় ১২০০০ হাজার যুগল-নক্ষত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ৬০০ শত যুগল-নক্ষত্রের ভ্রমণ পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হর্শেল কেবল বহুসংখ্যক যুগল নক্ষত্র আবিষ্কার করিয়াই নিশ্চেষ্ট হইলেন না, তিনি কঠোর পরিশ্রম ও পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা ঐ সকল নক্ষত্র সম্বন্ধে অনেক অভিনব ও অত্যাশ্চর্য্য তথ্য আবিষ্কার করেন।

প্রথমতঃ হর্শেল যুগল-নক্ষত্রগুলির দুইটী তারার পরস্পরের দূরত্ব নির্ণয় করেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যুগল-নক্ষত্রের তারকা দুইটীর ব্যবধান অত্যন্ত অল্প বলিয়া উহাদিগকে এই নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সে জন্য কেহ মনে করিবেন না উহাদের পরস্পরের দূরত্ব দশ কি পণর হাজার মাইলের অধিক নয়। ঐরূপ একটী যুগল-নক্ষত্রের অন্তর্গত দুইটী নক্ষত্র পরস্পর হইতে ৮০,০০০০০০০০০০ আশি খর্ব্ব মাইল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সিগ্নি ৬১ নামক যুগল-নক্ষত্রের দুইটী তারকা পরস্পর হইতে ৫৬৫৮০০০০০০ মাইল দূরবর্ত্তী।

গতি ও পরিবর্ত্তন যেমন সৌর জগতের ধর্ম্ম তেমনি সকল নক্ষত্র মণ্ডলে ঐ ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে বলিয়াছি নক্ষত্ররাজি একবারে অচল নহে, উহারা স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছে। যুগল-নক্ষত্র সমূহও ঐ নিয়মের অধীন। তদ্ভিন্ন কতকগুলি যুগল-নক্ষত্রের অন্যপ্রকার গতি আছে। উহাদের অন্তর্গত দুইটী নক্ষত্র উভয়ের মধ্যবর্ত্তী একনির্দ্দিষ্ট স্থানের চারিদিকে অনবরত ঘুরিতেছে।

লায়ার (Lyre) নামক নক্ষত্র মণ্ডলের অন্তর্গত একটী যুগল-নক্ষত্র আছে উহাকে খালি চক্ষে একটী বলিয়া বোধ হয় এবং উহার আলোকও তত উজ্জ্বল নয়। অতি সাধারণ দূরবীক্ষণ দ্বারা দেখিলেও উহার দুইটী নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়। খুব উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে লায়ারে দুইটী যুগল-নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ যুগল-নক্ষত্রের দুইটী নক্ষত্রও আবার যুগল। এইজন্য ইংরেজীতে এই নক্ষত্রটীকে double-double star বা যুগল-যুগল নক্ষত্র বলে। এইখানে আমরা দুই যোড়া সূর্য্য একত্র দেখিতেছি। প্রত্যেক যোড়ায় দুইটী সূর্য্য এবং উহারা উভয়ের মধ্যে একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। আবার একটী যুগল-নক্ষত্র আর একটী যুগল-নক্ষত্রকে ঐরূপ প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন পূর্ব্বোক্ত যুগল-নক্ষত্র দুইটীর একবার পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করিতে প্রায় ১০ লক্ষ বৎসর সময় লাগে!

সপ্তর্ষি মণ্ডলের লেজের তিনটী নক্ষত্রের মধ্যের নক্ষত্রটী যুগল। ইহার একটী নক্ষত্র অপর নক্ষত্র হইতে আয়তনে দ্বিগুণ বড়। ঐ যুগল নক্ষত্রের বড় নক্ষত্রটীও আবার যুগল। বোধ হয় কালে অনেক যুগল-যুগল নক্ষত্র আবিষ্কৃত হইবে।

লুব্ধক (Sirius) নক্ষত্রটী অনেকেরই পরিচিত। এই নক্ষত্রটী দেখিতে খুব উজ্জ্বল। উহা প্রাচীন কালেই জ্যোতিষীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ছিল। গ্রীক্ জ্যোতিষীগণ উহার বর্ণ লাল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু আমরা উহাকে কিছু নীলাভাযুক্ত দেখিয়া থাকি। বোধ হয় লুব্ধক নক্ষত্রের রঙ্ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। লুব্ধক আমাদের সূর্য্য হইতে আয়তনে বৃহত্তর এবং উজ্জ্বলতায়ও শ্রেষ্ঠতর। এই নক্ষত্রটী যুগল। উহার একটী হীনপ্রভ সহচর আছে। লুব্ধক উহা হইতে পাঁচহাজার গুণ অধিক উজ্জ্বল কিন্তু দুইগুণ অধিক ভারী। এই পার্শ্বচর নক্ষত্রটী সূর্য্য অপেক্ষা ওজনে অধিকতর ভারী কিন্তু ঐরূপ একশত নক্ষত্র একত্র করিলেও সূর্য্যের সমান উজ্জ্বল হইবে না। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন অনেক আলোক হীন নক্ষত্র আকাশে বিরাজিত রহিয়াছে আমরা উহাদিগকে দূরবীক্ষণ দিয়াও প্রত্যক্ষ করিতে পারি না।

হর্শেলই প্রথম আবিষ্কার করেন যে যুগল-নক্ষত্রের অন্তর্গত দুইটী নক্ষত্র পরস্পর পরস্পরের আকর্ষণগুণে বৃত্তাভাস পথে পরিভ্রমণ করিতেছে। এই তথ্যটী জ্যোতিষ শাস্ত্রের মূলভিত্তিকে অসীম ব্রহ্মাণ্ডে বিস্তৃত করিয়াছে। মাধ্যাকর্ষণ বলে সৌরজগতের গ্রহ উপগ্রহ ইত্যাদি জ্যোতিষ্করাজি শূন্যে অবস্থান করিয়া বৃত্তাভাস পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে ইহা পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের জ্যোতিষ্ক সমূহ সর্ব্বত্র এই নিয়মে পরিচালিত হইতেছে কি না তাহা জ্যোতির্ব্বিদগণ অবগত ছিলেন না। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় সমগ্র সৌরজগতও অতি ক্ষুদ্র ; সমুদ্রের সহিত তুলনায় যেমন এক বিন্দু জল কণা। সুতরাং ক্ষুদ্র সৌরজগতের অনুশাসন অনুসারে বিশাল বিশ্বের শৃঙ্খলা রক্ষিত হইতেছে এরূপ অনুমান নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কিন্তু হর্শেল কর্ত্তৃক যুগল-নক্ষত্রের পরিভ্রমণ বৃত্তান্ত আবিষ্কৃত হইলে জানা গেল নক্ষত্র সমূহও মাধ্যাকর্ষণের অধীন। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড একই নিয়মে শাসিত। ভগবানের বিশাল সম্রাজ্যে কোথাও নিয়মের বৈষম্য বা বিশৃঙ্খলা নাই।

অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে অপরাপর নক্ষত্রের ন্যায় যুগল-নক্ষত্র

আলোক কেবল শুভ্র নহে। অবশ্য কয়েকটী পরিচিত নক্ষত্র আছে উহারা যদিও যুগল নয় তথাপি উহাদের নানা রঙএর আলোক আছে। কিন্তু যুগল-নক্ষত্রের আলোক বৈচিত্র্য অতি মনোরম, উহাদের বর্ণ মাধুর্য্য বড়ই চিত্তাকর্ষক। কতগুলি যুগল-নক্ষত্র আছে উহাদের দুইটীর রঙ্ই এক প্রকার যেমন দুইটীই শাদা অথবা লাল। আর কতগুলি আছে উহাদের দুইটী নক্ষত্রই ভিন্ন রঙএর যেমন একটা সবুজ একটা শাদা, একটা লাল একটা শাদা, একটা কমলা একটা বর্ণ। আর কতগুলি যুগল-নক্ষত্রের বর্ণ পার্থক্য তত বেশী নয় যেমন একটা গোলাপী আর একটা পদ্ম, একটা সোনালী আর একটা হল্‌দে ইত্যাদি। এখানেই যুগল-নক্ষত্রের বর্ণ বৈচিত্র্য শেষ হইল না। পূর্ব্বোক্ত বর্ণের নক্ষত্র ব্যতীত ধূসর, পাটল বাদামী রংএর বহুসংখ্যক নক্ষত্র আকাশে শোভা পাইতেছে। উহাদের অধিকাংশ নক্ষত্রই আয়তনে ক্ষুদ্র। কিন্তু ক্ষুদ্র বলিয়া নিতান্ত নগণ্য নহে। অতি ক্ষুদ্র নক্ষত্রটীও সৌরজগতের সমগ্র গ্রহ গুলির সমষ্টি হইতে বড়।

ঐ সকল বিচিত্র—সুন্দর বর্ণ বিশিষ্ট সূর্য্য সকলের যদি আমাদের পৃথিবীর ন্যায় জনপ্রাণী পূর্ণ গ্রহ থাকে তাহা হইলে ঐ সকল গ্রহের অধিবাসীরা প্রতিদিন নয়নের তৃপ্তিকর কত সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করে! বৃক্ষ লতাদি নানা বর্ণে রঞ্জিত হইয়া প্রকৃতি কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে! এক সময়ে আকাশে নানা বর্ণের সূর্য্য উদিত হয় অথবা এক রঙ্এর সূর্য্য অস্তমিত হইতেই অন্য বর্ণের সূর্য্য দেখা দিয়া থাকে! সেই সকল রাজ্যের অত্যাশ্চর্য্য মাধুর্য্য কল্পনা করিতেও আমরা অক্ষম। *

জ্যোতির্ব্বিদগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন সূর্য্যরশ্মির ন্যায় যুগল-নক্ষত্রেরও আলোক শুভ্র! সূর্য্যের উত্তাপে বিবিধ ধাতু দ্রব হইয়া বাষ্পাকারে যেমন সূর্য্যের চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুমণ্ডলীতে (atmosphere) মিশিয়া রহিয়াছে তেমনি নানাপ্রকার ধাতুর বাষ্প যুগল-নক্ষত্র পরিবেষ্টিত বায়ুমণ্ডলীতেও মিশ্রিত আছে। সকল নক্ষত্রের বায়ুমণ্ডলীতে একজাতীয় বাষ্প মিশ্রিত নহে। কতকগুলি নক্ষত্রের বায়ু মণ্ডলীতে এক জাতীয় বাষ্প বিভিন্ন পরিমাণে রহিয়াছে আর কতগুলির

* Imagination fails to concieve, the charming controsts and grateful vicissitudes of red and green day alternating with white light or with darkness, in the planctory systems belonging to these suns !!

Sir John Harchel.

বায়ুমণ্ডলীতে স্বতন্ত্র বাষ্প বিদ্যমান। ত্রিপল বিশিষ্ট কাচের উপর সূর্য্য রশ্মি পতিত হইলে উহা বিশ্লেষিত হইয়া রামধনুরন্যায় সাতটী বিচিত্র বর্ণ বিকাশ পায়। ঐ সপ্তবর্ণের মাঝে মাঝে কাল রেখা পাত দৃষ্টি গোচর হয়। নক্ষত্র রশ্মি বিশ্লেষিত হইলেও ঠিক ঐরূপ হইয়া থাকে। বায়ুমণ্ডলস্থিত ধাতব বাষ্পই ঐ কৃষ্ণ রেখার কারণ। কৃষ্ণ রেখার আকার ও আয়তন বাষ্পের পরিমাণ ও প্রকৃতি অনুসারে ছোট বড় হইয়া থাকে। নক্ষত্র রশ্মি যখন বাষ্প পরিপূর্ণ বায়ু মণ্ডল ভেদ করিয়া আসে তখন ঐ রশ্মি বিশ্লেষিত হইয়া রামধনুর আকার ধারণ করে। এবং ঐ রামধনুর উপর কাল রেখা পতিত হয়। কাল রেখা যখন খুব বিস্তৃত হয় তখন সপ্ত বর্ণের একটী কি দুইটী বর্ণ ঢাকিয়া যায়। কাল রেখা যখন লাল বর্ণের অংশটী ঢাকিয়া ফেলে তখন পীত সবুজ ও নীল বর্ণ উজ্জ্বল হয় এবং ঐ নক্ষত্রের আলোক সবুজ বর্ণ দেখায়। যখন পীত বর্ণ ঢাকা পড়ে তখন রক্ত বর্ণ উজ্জ্বল হয় আর যখন সবুজ অংশ ঢাকিয়া যায় তখন নক্ষত্রের আলোক কমলা রং ধারণ করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে নক্ষত্র পরিবেষ্টিত বাষ্পরাশিই যুগল নক্ষত্রের আলোক বৈচিত্র্যের কারণ। এক এক নক্ষত্রের বায়ুমণ্ডলস্থ বাষ্প কেন এক এক রকম হয় তাহার কারণ এ পর্য্যন্ত কেহ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই।

পল্লী-কুটীরে।

ওগো তোরা কাহারে চাহিস্ উচ্চ আসনে
বসাতে দেবীর আকারে,
তোরা কার পদধূলি শিরে নিস্ তুলি,
কা'রে দিস্ রাজ পূজারে!
ছি ছি সরমেতে মরি আপনা নেহারি,
এ দীন মলিন মূরতি
হেথা কি আছে গৌরব? নাহিক সৌরভ
নহে দুরলভ ও প্রকৃতি।
ওগো তোরা সবাই যেমন আমিও তেমন
তাই, ভালবেসে আমারে,
যদি দিতে চাস দান, দিস্ তবে স্থান
তোদেরই কুঁড়ের মাঝারে।

হোথা, কোণে জড়ধুলি আছে কতগুলি
থাক্ না,—তাহাতে ক্ষতি কি ?
আছে কালো বাস আলানায় ঝুলি
দ্বারে বাঁধা নাই রজকী।
হোথা, সিন্দুকের গায় সিন্দূরের দাগ,
পান সাজা চূনে মাখানো,
আছে সযতনে কাঠ ঘুঁটেগুলি
মাচার উপরে সাজানো,
হোথা, ডাবরের মাঝে আছে সাজা পান
কলসে শীতল জলটুক্
আসিয়া হেথায় অতিথি স্বজন
পায় বল স্বীয় গৃহ সুখ।
হোথা আছে উঠানেতে তুলসীর গাছ
রোপিত চারু বেদিকায়,
দ্বারের দু'পাশে দু'টী সেফালিকা
সারাদিন ঝরে ফুল তার,
হোথা আছে ছিন্ন সেজে সযতনে পাতা
আদর ত পায় অতিথি।
আছে মধু মাখা হাসিটি সরল
স্বভাব সুন্দর প্রকৃতি।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

O ওং।

অখণ্ডমণ্ডলাকারে আকাশ আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে। নক্ষত্রগুলি একটী অপরটী হইতে এবং সকলগুলিই আমাদিগ হইতে বহুদূর অবস্থিত থাকিলেও আমরা উহাদিগকে আকাশের গায় সংলগ্ন দেখিতে পাই। সুবৃহৎ এক একটী নক্ষত্র দূরত্ব হেতু আমাদিগের নিকট বিন্দুর ন্যায় প্রতিভাত হয়। দূরবীক্ষণ যন্ত্রে লেন্সের উপর লেন্স বসাইয়াও আমাদের দৃষ্টির সমক্ষে কোনও নক্ষত্রের আয়তন বৃদ্ধি করা যায় না। আমাদের দৃষ্টির একটা সীমা

রেখা আছে। সমান্তরাল দুইটী রেখা আমাদের অগ্রভাগে ও পশ্চাতে মিলিত হইতে দেখা যায়। সুনিপুণ চিত্রকর মানুষের দৃষ্টির এই সীমাবদ্ধতা অবলম্বন করিয়া প্রাকৃতিক চিত্র প্রদর্শন করিয়া থাকেন। দুইটী সমান্তরাল রেখার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া দৃষ্টিপাত করিলে দূরে দূরে যতদূর দৃষ্টি রেখা চলে তারপর দুইধারের সমস্ত জিনিস এক বিন্দুতে অন্তর্ধ্যান হইতে দেখা যায়। ইহা মানুষের আপেক্ষিক জ্ঞানের স্পষ্টই দৃষ্টান্তস্থল।

বিন্দুর আয়তন নাই। বিন্দুর দৈর্ঘ্যও নাই প্রস্থও নাই, শুধু অবস্থান আছে। এক একটী নক্ষত্র আমাদের নিকট এক একটি বিন্দু। আমাদের শক্তি জ্ঞান ও সামর্থ্যের নিকট নক্ষত্রের আয়তন নাই, অবস্থান আছে। আমাদের নিকটে নক্ষত্রের অবস্থান আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিজ্ঞান এখানে পরাস্ত। নক্ষত্র বিন্দুর দৈর্ঘ্যের ঘরে ও প্রস্থের ঘরে শূন্য; যাহা নাই তাহাকে দ্বিগুণ ত্রিগুণ চতুর্গুণ করিবার উপায় নাই।

কতকগুলি গ্রহ আছে যাহা আকাশের গায় নক্ষত্রের ন্যায় বিন্দু আকারে দেখা যায়। নক্ষত্রের তুলনায় এই গুলি আমাদের অনেকটা নিকটে। সামান্য দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে যে কোনও গ্রহকে বর্দ্ধিতাকারে দেখা যায়। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিলে গ্রহগুলিকে অধিকতর বর্দ্ধিতায়তনে দেখা যাইতে পারে। আমাদের বিজ্ঞান চক্ষুর নিকটে এইগুলির দৈর্ঘ্য প্রস্থ আছে। যাহার আয়তনের ঘরে ০ নহে ১,২,৩··· আছে তাহার আয়তন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র সাহায্যে বৃদ্ধি করা যায়। অতি ক্ষুদ্র জিনিস হইতেও আয়তন থাকিলে সুবৃহৎ ছায়াপাত করা যায়। দৃষ্টির অতীত অতি ক্ষুদ্র বস্তুও অণুবীক্ষণের সম্মুখে বৃহদাকার ধারণ করে।

আমাদের দৃষ্টি গোচরে আয়তন বিশিষ্ট বস্তুর অভাব নাই। কোনও বস্তুকে যত খণ্ডেই বিভক্ত কর না কেন আরও বিভক্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। একদিকে যেমন নক্ষত্র বিন্দুর আয়তন নাই। অপর দিকে কোনও বস্তুকে খণ্ড খণ্ড করিলেও বিভাগের শেষ সীমায় উপনীত হওয়া যায় না। ইহা সৃষ্টির এক নিগূঢ় রহস্য। শূন্যদ্বারা একের ভাগফল অনন্ত। $\frac{1}{0}$ = অনন্ত সংখ্যা। সসীম ও অসীম আপেক্ষিক জ্ঞান মাত্র।

গীতাকার লিখিয়াছেন যাহা আছে তাহার অভাব নাই এবং যাহা নাই তাহার সম্ভাব অসম্ভব। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রকৃতি বৈচিত্র্যের মধ্যে ০ ও ১ এর অনুসন্ধানে বহুকাল কাটাইয়াছেন। বৈশেষিক ও সাংখ্য দর্শনকার

অণু পরমাণু চিন্তা করিয়া শেষ সীমায় উপনীত হইতে পারে নাই। বর্ত্তমান সময়ে শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও ION "আয়ন" পর্য্যন্ত পৌছিয়া অবাঙ্‌মনস গোচর পরমা প্রকৃতির নিকট হার মানিয়াছেন।

কোনও দূরত্বের ধারণা করিতে হইলে তাহাকে কোনও দূরত্বের অংশ স্বরূপে অথবা কোনও দূরত্বকে তাহার অংশ স্বরূপে দেখিতে হইবে; সহজ বাঙ্গালায় বলিতে গেলে তাহাকে কোনও মাপকাঠিদ্বারা তাহার পরিমাণ করিতে হইবে। মাপ কাঠিটী তাহা হইতে বড়ও হইতে পারে ছোটও হইতে পারে। প্রকৃতির অসীম বৈচিত্র্যের মধ্যে আমাদের জ্ঞানগোচর সকল দূরত্ব, সকল বস্তু মাপিতে হইলে একদিকে মাপ কাঠিটী অতি বৃহৎ হইতেও বৃহৎ অথবা ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র হওয়া চাই। মহৎ হইতে মহিয়ান, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম রূপে যিনি বর্ত্তমান তিনি এক না দুই? তিনি আকার সম্পন্ন না নিরাকার? প্রকৃতি বৈচিত্র্যের অন্তরালে নির্গুণ নিরাকার, আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের নিকট আয়তন শূন্য, বিন্দু স্বরূপে কেহ আছেন কি? এই প্রশ্ন অনেক সময়ে অনেক দেশে নানা আকারে উপস্থিত হইয়াছে। আপ্তজ্ঞান বলে মীমাংসাস্থলে আর্য্য ঋষি "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন।

যুগযুগান্তর ভরিয়া দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক এই একের অনুসন্ধানে আত্মহারা হইয়াছেন।

অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈশ্রীগুরবেনমঃ।

অসীম মণ্ডলাকারে ও অসীম মণ্ডলাকারের অসীম খণ্ড স্বরূপে সরল রেখার ন্যায় যিনি চরাচরে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, তিনি এক ভিন্ন দুই নহেন। বিন্দুর ন্যায় তিনি সর্ব্বত্র আছেন; উজ্জ্বল নক্ষত্র বিন্দুর ন্যায় তিনি জ্যোতির্ম্ময়; বেদান্তের ঋষি তাঁহাকে বিশ্বশরীর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যদি কেহ কখনও এই একের স্বরূপ ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি বাক্যে তাহা প্রকাশ করিতে পারেন নাই। "ততো বাচা নিবর্ত্তন্তে" "অপ্রাপ্য মনসাসহ।" বেদে তিনি ওঁ বাইবেলে "I am that I am" প্রাচীন ঋষিগণ তাঁহাকে ধ্যান ধারণা করিবার পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। যাঁহার শ্রদ্ধা ওঅনুরাগ আছে তিনি অগ্রসর হইবেন। ঋষিদিগের আশীর্ব্বাদে তিনি সিদ্ধিলাভ করিবেন।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মজুমদার।

পল্লী-সমাজ ।*

বন্ধুগণ! এই জিলা সমিতিতে আমি "ইম্পিরিয়াল পলিটিক্‌সের" আলোচনা করিয়া আপনাদের আর অধিক সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না। ইহাতে আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ভিন্ন অন্য কোন ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। জাতীয় মহাসমিতিতে ও প্রাদেশিক সমিতিতে বড় বড় বিষয়ের আলোচনা হইয়া থাকে কিন্তু জেলা সমিতিতে স্থানীয় অভাব অভিযোগের আলোচনা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। জেলাবাসীর অভাব পূরণের যদি কিয়ৎপরিমাণেও বন্দোবস্ত করিতে আমরা সমর্থ হই তাহা হইলে জেলা সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য সফল হইবে।

জেলা-সমিতিকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে হইলে আমাদিগকে একবারে গোড়ায় যাইতে হইবে। পল্লীতে আমাদের কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। সভা সমিতি করিয়া যে আমরা ফল পাইতেছি না তাহার কারণ আমরা কেবল অনবরত আন্দোলনের ঢেউ তুলিতেছি কিন্তু সেই সঙ্গে কাজ করিবার উপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লইতেছি না। বাতাসে বীজ ছড়াইয়া দিয়া ফল প্রত্যাশা করা বাতুলতা মাত্র।

সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে পল্লী-সমাজ গঠন করিয়া লইতে হইবে। দেশে সর্ব্বত্র সুনিয়ন্ত্রিত কেন্দ্র না থাকায় আমাদের উদ্যম ও কর্ম্মপ্রবণতা সময় সময় অসংযত হইয়া আমাদিগকে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে দিতেছে না। তারপর পল্লী-সমাজকে যদি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইতে পারি তাহা হইলে ঐ সকল কেন্দ্র হইতে সহস্র পথে শোণিত সঞ্চালিত হইয়া মহাসমিতিরূপ জাতীয় হৃদপিণ্ডকে সবল ও কার্য্যক্ষম করিয়া তুলিতে সমর্থ হইবে। জাতীয় মহাসমিতির সহিত সুদূরবর্ত্তী স্থান সমূহের সম্বন্ধ না থাকায় উহা কার্য্যকরী হইয়া উঠিতেছে না।

ভারতবর্ষে বহু প্রাচীনকাল হইতে পল্লী-সমাজ আপন গণ্ডীর মধ্যে জন সাধারণের অভাব মোচন ও সুখ শান্তি বিধান করিয়া স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছিল। দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে গ্রীক্ ভ্রমণকারিগণ এদেশের পল্লী সমাজের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা ও কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। সেই সময়ে প্রধানগণ পল্লী-সমাজের অধ্যক্ষ ছিলেন, ভূমি মাপ, গ্রামের লোকের মধ্যে বিচার, কৃষিক্ষেত্রে উপযুক্ত জল সেচন, কর সংগ্রহ ও বাণিজ্যের সুবিধা ক

* ময়মনসিংহ জেলা সমিতির তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি শ্যামাচরণ রায় মহাশয়ের বক্তৃতা হইতে গৃহীত।

পথের সংস্কার করা এবং সীমা স্থির করা ইত্যাদি কার্য্য প্রধানদিগের হাতে ছিল। হিন্দুর পর মুসলমান, মুসলমানের পর ইংরেজ ভারতবর্ষের রাজ্য ভার গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু ঐ সকল রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনেও পল্লী-সমাজ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ভীষণ বিপ্লবে এক একবার ভারতবর্ষ আন্দোলিত হইয়াছে কিন্তু সেই তরঙ্গ পল্লী-সমাজের সুদৃঢ় মূল উৎপাটিত করিতে সমর্থ হয় নাই। আমার মত যাহারা বৃদ্ধ তাঁহারা বাল্যকালে কিয়ৎপরিমাণে পল্লী-সমাজের কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। আমরা সেই সময়ে দেখিয়াছি গ্রামের "মাতব্বর" ব্যক্তিরা সমবেত হইয়া সমাজের সর্ব্ববিধ অভাব-অভিযোগ-নিরাকরণের উপায় নির্দ্ধারণ করিতেন।

বন্ধুগণ, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের কীর্ত্তি সেই পল্লী-সমাজ আবার প্রতিষ্ঠা করুন ইহাদ্বারা দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের আন্দোলন চলিতে থাকুক তাহাতে আমার আপত্তি নাই কিন্তু আমাদের পল্লীতে যে স্বনিয়ন্ত্রিত সমাজ ছিল, যেখানে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার পূর্ণ মাত্রায় অনুভব করিতেন তাহার পুনঃ প্রতিষ্ঠার এই সুবর্ণ সুযোগ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নয়। আন্দোলনের দিন চলিয়া গিয়াছে, এখন শক্তিকে সংযত করিয়া সমভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার সময় উপস্থিত।

কতকগুলি গ্রাম লইয়া এক একটী কেন্দ্র গঠন করিতে হইবে। ঐ কেন্দ্রে বিচ্ছিন্ন শক্তিকে একত্র করিয়া কেন্দ্রকে নিজের সর্ব্বপ্রকার অভাব মোচনের উপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে। গ্রামের লোকেরা যদি নিজের অভাব নিজে মোচন করিতে যথাসম্ভব সক্ষম হন তাহা হইলে সর্ব্বত্র স্বায়ত্ত শাসন-চর্চ্চা সফল হইবে। প্রত্যেক কেন্দ্রে একটী কর্ম্মি সভা গঠিত হইবে। এই কর্ম্মি-সভায় গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রতিনিধি স্বরূপ কার্য্য করিবেন। কর্ম্মি-সভা পল্লী সমাজের সর্ব্ববিধ অভাব মোচনের উপায় নির্দ্ধারণ করিবেন।

দেশের কোন লোক-হিতকর সার্ব্বজনীন অনুষ্ঠান ব্যক্তি বিশেষের চেষ্টায় সফল হইতে পারে না। ম্যালেরিয়া নিবারণই বলুন, জলকষ্ট নিবারণই বলুন আর শিক্ষা বিস্তারই বলুন সকল কার্য্যই সকলের সমবেত চেষ্টা ও শক্তির উপর নির্ভর করে।

সালিশী বিচার।

প্রথমতঃ আমাদিগকে আত্মরক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। গ্রামের [illegible]রা মোকদ্দমা করিয়া একবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যাইতেছে। অকারণে

অথবা সামান্য কারণে কত লোক প্রতিদিন অজস্র অর্থ ব্যয় করিতেছে। দিন দিনই লোকের মোকদ্দমার নিশা বাড়িতেছে। আমরা শৈশবে দেখিয়াছি গ্রামের "মাতব্বরগণ" Executive এবং Judicial উভয় ক্ষমতাই পরিচালনা করিতেন। এখন যে সকল মোকদ্দমা হাইকোর্ট পর্য্যন্ত গিয়া থাকে তখন তাহা গ্রামিকগণ সালিশী বিচারে নিষ্পত্তি করিয়াছেন। এখন লোক মোকদ্দমায় জয়ী হইয়াও স্বর্ব্বস্বান্ত হইতেছে আর পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা-তো বৃদ্ধি হইতেছেই। বর্ত্তমান সরকারী বিচারালয়ে দুই টাকার জন্য দুইলক্ষ টাকাও ব্যয় করিতে পারা যায়। সালিশী নিষ্পত্তির সুবিধা এই ইহাতে ব্যয় নাই আর মোকদ্দমা মীমাংসা হইলে দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ না বাড়িয়া সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রে কেন্দ্রে এইরূপ সালিশী বিচার প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত। প্রতি বৎসর কোন কেন্দ্রে কতগুলি মোকদ্দমা সালিশী বিচারে নিষ্পত্তি হইল তাহা জেলা সমিতিতে প্রকাশ করিলে ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে বেশ প্রতিযোগিতা জন্মিতে পারে।

জলকষ্ট।

বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্রই জলের অভাব। এই সভায় উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ সকলেই পল্লীর অবস্থা জ্ঞাত আছেন। শীতকাল অতীত হইতে না হইতেই গ্রামে গ্রামে "দে জল, দে জল" চীৎকার উত্থিত হয়। অনন্যোপায় পল্লীবাসী অবিশুদ্ধ জল পান করিয়া ব্যাধিগ্রস্ত হইতেছে। প্রতি বৎসর গ্রামে গ্রামে ওলাউঠা দেখা দেয়; ম্যালেরিয়া তো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছে। সেকালের শান্তিপূর্ণ স্নিগ্ধ-মধুর পল্লীগ্রাম এখন ভীষণ শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। ধনীরা তাঁহাদের দীন প্রতিবেশীদিগকে অভাব ও ব্যাধির হস্তে সমর্পণ করিয়া সহরের আশ্রয় লইয়াছেন। যাঁহারা ইচ্ছা করিলে গ্রামের উন্নতি করিতে পারিতেন তাঁহারা পল্লীবাস পরিত্যাগ করিয়াছেন।

এ জেলায় জমিদারের অভাব নাই কিন্তু অতি অল্প সংখ্যক ভূম্যধিকারীই প্রজার জলকষ্ট নিবারণের জন্য অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ জলকষ্ট নিবারণের জন্য প্রতি বৎসর দীঘি প্রতিষ্ঠা করিয়া অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিতেন, তাঁহাদেরই বংশধরগণ আজ প্রজার হাহাকারে কর্ণপাত করিতেছেন না। জল-দানের মত হিন্দুর পুণ্যকার্য্য আর কি আছে? ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড জলকষ্ট নিবারণের জন্য কতক পরিমাণে সাহায্য করিতেছেন বটে, কিন্তু কেবল ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। গ্রামের নেতৃবর্গ ধনীদিগের

দৃষ্টি আকর্ষণ করুন; ভূম্যধিকারিগণের সাহায্যপ্রার্থী হউন। গবর্ণমেণ্ট জলকষ্ট নিবারণকল্পে বিশেষ কিছু করিতেছেন না বলিয়া আমাদের নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নয়। সকলের সমবেত চেষ্টায় দুই একটী পুরাতন পুকুরের সংস্কার করিতে পারিলেও জলকষ্ট কিয়ৎ পরিমাণে নিবারিত হইতে পারে।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে পথকর স্থাপিত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরোধী বলিয়া বঙ্গীয় জমিদার ও প্রজাপক্ষ হইতে তখন উহার প্রতিবাদ হইয়াছিল কিন্তু ভারতসচিব ডিউক অব আর্গাইল কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া বঙ্গে পথকর প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি তখন বঙ্গবাসীদিগকে এই বলিয়া আশ্বাস দেন যে, এই কর কেবল পল্লীগ্রামের পথ ঘাট নির্ম্মাণে ও জলাশয়াদি খননের কার্য্যেই ব্যয়িত হইবে। বলা বাহুল্য এই প্রতিশ্রুতি গবর্ণমেণ্ট পালন করেন নাই। সেই অর্থ এখন অন্য কার্য্যে ব্যয়িত হইতেছে। পথকরের দায়ে পল্লীবাসীদিগের ঘটী বাটী নীলামে চড়িতেছে বটে কিন্তু জলের জন্য তাহাদিগকে এখনও তৃষিত চাতকের ন্যায় আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হইতেছে।

এ পর্য্যন্ত ১২ কোটি টাকার উপর পথকর স্বরূপে আদায় হইয়াছে। যদি ঐ টাকা কেবল পল্লীগ্রামের রাস্তা নির্ম্মাণ ও জলাশয় প্রতিষ্ঠায় গবর্ণমেণ্ট ব্যয় করিতেন, তাহা হইলে পল্লীগ্রাম আজ শ্মশানে পরিণত হইত না। পল্লীগ্রামের অসহায় দরিদ্র ও অশিক্ষিত অধিবাসিগণের রক্ত-শোষণ করিয়া অন্যবিধ কার্য্যে ব্যয় করা নিতান্তই গর্হিত। গবর্ণমেণ্ট যদি স্বীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়া পল্লীবাসী লোকের জলকষ্ট নিবারণকল্পে এখনও ঔদাস্য প্রদর্শন করেন তবে কয়েক বৎসরের মধ্যেই বাঙ্গালার পল্লীসমূহ জন-শূন্য হইবে।

কৃষি।

বন্ধুগণ! এ দেশের শতকরা ৮৫ জন লোক কৃষিজীবী সুতরাং কৃষির উন্নতির জন্য জেলা-সমিতির বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ভারতের প্রজা নিতান্ত নিঃস্ব; কঠোর পরিশ্রম করিয়াও দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। কৃষির উন্নতি করিবে কিরূপে? অধিকাংশ কৃষকই আকণ্ঠ ঋণে নিমজ্জিত। গো-জাতির উন্নতি, ক্ষেত্রে সার প্রদান, জলসেচন ইত্যাদি কার্য্যে অর্থ ব্যয় করিবার ইহাদের শক্তি কোথায়? অনেকের ঘরে বীজ পর্য্যন্ত থাকে না। গবর্ণমেণ্ট যে কৃষি-ব্যাঙ্ক খুলিয়া প্রজাদিগকে সাহায্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহা সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তিত হইলে প্রজার অবস্থার কিছু উন্নতি হইবে। কিন্তু কৃষিকার্য্য

কেবল অশিক্ষিত দরিদ্র প্রজাদিগের হস্তে ন্যস্ত করিয়া রাখিলে ইহার উন্নতি হইবার আশা নাই। পাশ্চাত্য দেশে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কৃষিকার্য্য করিতেছেন, তাহাতে যেমন ধনাগম হইতেছে তেমনি কৃষিরও উন্নতি হইতেছে।

গত বৎসর এই নেত্রকোণার অধিবাসী শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণ নিজ হস্তে হল চালনা ও কৃষিক্ষেত্র স্থাপনের উদ্যোগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের চেষ্টা কতদূর ফলবতী হইয়াছে জানি না কিন্তু দেশের দূরদর্শী ব্যক্তি মাত্রই এই সংকল্পের প্রশংসা করিয়াছেন। বাঙ্গালার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্র লোকদিগের অবস্থা দিন দিনই অতিশয় শোচনীয় হইতেছে। তাঁহারা যদি চাকুরীর আশা পরিত্যাগ করিয়া কৃষি-শিল্প ও বাণিজ্যদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় না করেন তাহা হইলে তাঁহাদের দুরবস্থার সীমা থাকিবে না। জীবন-সংগ্রামে আজ মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই অধিক বিপদ উপস্থিত।

সুসঙ্গের মহারাজা ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের বহু জমি পতিত রহিয়াছে। শিক্ষিত যুবকগণ যদি উক্ত ভূম্যধিকারীদিগের নিকট হইতে অল্প জমায় জমি গ্রহণ করিয়া স্বাধীনভাবে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করেন তাহা হইলে চাকুরীর জন্য আর তাঁহাদিগকে প্রাণ-পাত করিতে হইবে না। আমাদের জেলার জমিদারগণ নিশ্চয়ই এইরূপ অনুষ্ঠানের জন্য সাহায্য করিতে ত্রুটি করিবেন না। শিক্ষিত লোক কৃষিক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা করিলে বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়া তাঁহারা কৃষিকার্য্যের প্রভূত কল্যাণ বিধান করিতে সক্ষম হইবেন।

আমি আমাদের জেলার জমিদার মহোদয়গণকে অনুরোধ করি প্রত্যেকেই স্বীয় স্বীয় অধিকারে অন্যূন একটী আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়া অশিক্ষিত প্রজা-দিগকে কৃষি বিষয় শিক্ষা প্রদান করুন।

শিক্ষার ব্যবস্থা।

পল্লীগ্রামে শিক্ষা বিস্তারের জন্য গ্রামের অধিবাসিগণের বিশেষ যত্ন ও চেষ্টার আবশ্যক। কোন কোন গ্রামে শিক্ষিত লোকও অলস ভাবে খেলাইয়া বেড়াইয়া দিন কর্ত্তন করিয়া থাকেন। তাঁহারা যদি আলস্য ত্যাগ করিয়া প্রত্যহ দুইঘণ্টা কাল বিনা বেতনে গ্রাম্য স্কুলে পড়াইতে স্বীকৃত হন তাহা হইলে পল্লীতে অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। গ্রামে একটী পাঠাগার স্থাপন করিলে শিক্ষা বিস্তারের অনেক সাহায্য হইবে। ঐ পাঠাগারে সপ্তাহে অন্তত-

পক্ষে একদিন যদি গ্রামের সকল লোক একত্র হইয়া গ্রামের ও দেশের অবস্থার কথা আলোচনা করেন, সংবাদ পত্রিকা পাঠ করেন অথবা প্রাচীন কালের ন্যায় রামায়ণ-মহাভারত অধ্যয়ন অথবা কথকতা ও পুরাণ-পাঠ শ্রবণ করেন তাহা হইলে সমাজে ধর্ম্ম-প্রভাব বৃদ্ধি পাইবে, হিংসা, দ্বেষ ও আত্মকলহ তিরোহিত হইয়া যাইবে।

পল্লীগ্রামে বালিকাদিগের জন্যও পাঠশালা স্থাপন করিতে হইবে। রমণীগণ শিক্ষিতা না হইলে দেশের সম্যক উন্নতি সাধিত হইবে না। জননীরাই জাতীয় চরিত্র গঠন করিয়া থাকেন। জননীর প্রভাব জাতীয় জীবনে সর্ব্বত্র লক্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে আমাদের ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলে চলিবে না।

স্বাস্থ্যোন্নতির উপায়।

আমি পল্লীগ্রামের লোকের দারিদ্র্যের কথা, ব্যাধি ও জলকষ্টের কথা অবগত আছি কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আমরা মনোযোগ ও যত্ন করিলে পল্লী-স্বাস্থ্যের অনেকটা উন্নতি বিধান করিতে পারি। স্বাস্থ্যরক্ষার মূল নিয়মগুলি না জানা থাকায় অনেক সময় কেবল অসাবধানতা বশতঃ লোক ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া থাকে। জল বিশুদ্ধ রাখিবার উপায়, বাড়ীঘর সর্ব্বদা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার আবশ্যকতা সংক্রামক ব্যাধি উপস্থিত হইলে কিরূপে শুশ্রূষা করিতে হইবে এবং গ্রাম-বাসীর আত্মরক্ষার জন্য কি কি উপায় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, ইত্যাদি বিষয় শিক্ষিত লোক যদি অশিক্ষিতকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন তাহা হইলে পল্লী স্বাস্থ্যের অপেক্ষাকৃত উন্নতি সাধিত হইবে। এই সকল বিষয়ে কাহারো মতভেদ হইবার কারণ নাই। যেহেতু সকলেরই সমান স্বার্থ রহিয়াছে। সুতরাং, সকলেরই সাহায্য সহানুভূতি পাওয়া যাইবে। আমি দৃঢ়ভাবে বলিতে পারি সাধু-ইচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে আপনারা সমাজের অভাব বহুল পরিমাণ মোচন করিতে সমর্থ হইবেন।

বন্ধুগণ, আমি আর আঁপনাদের সময় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না। উপসংহারে আর একটী মাত্র কথা বলিয়া শেষ করিব। এখন আমাদিগের অতিশয় ধীরতার সহিত সংযতভাবে দেশের কার্য্য করিবার সময় আসিয়াছে। যেমন সৎসাহস ও অধ্যবসায় আমাদের অবলম্বনীয় হইবে তেমনি ধর্ম্ম ও সাধুতা যেন আমাদের কর্ম্মপথের সহায় হয়। হিতানুষ্ঠানের গুরু দায়িত্ব মস্তকে গ্রহণ করিয়া

যেন আমরা চাপল্য প্রকাশ না করি। অধৈর্য্য অথবা অজ্ঞানতা বশতঃ আমরা যেন পুণ্যের মাহাত্ম্য বিস্মৃত হইয়া সঙ্কটের পথে ধাবিত না হই। বাহিরের অনেক কঠোর আঘাত আমাদের হৃদয়কে উত্তেজিত করিতে চাহিবে কিন্তু দেশের গুরু দায়িত্ব যেন আমাদের সংযমের বাঁধ দৃঢ় করিয়া দেয়।

বন্ধুগণ, আপনারা নিরাশ হইবেন না। এই দেশের উপর দিয়া অনেক বিপ্লব প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে. অনেক উত্থান পতনের অভিনয় ভারতবাসী প্রত্যক্ষ করিয়াছে। বিধাতা কঠোর পরীক্ষার ভিতর দিয়া এই পুণ্য ভূমিকে এক মহোদ্দেশ্য সাধনের জন্য লক্ষপথে লইয়া চলিয়াছেন। জ্ঞান ও প্রেমে, ধর্ম্মে ও কর্ম্মে আবার এই আর্য্য ভূমি জগতের শীর্ষ স্থান গ্রহণ করিবে। শান্তির মহামন্ত্র জগতে প্রচার করিবার জন্য আবার এই পবিত্র ভারতে ঋষিদিগের আবির্ভাব হইবে। যুগ যুগান্তর ব্যাপী পরিশ্রম ও দেহ বিসর্জ্জন করিয়া যেমন ক্ষুদ্র কীট সমূহ গভীর সাগরে দ্বীপ নির্ম্মাণ করে, আমরা তেমনি যুগ যুগান্তর ব্যাপিয়া পরিশ্রম ও স্বার্থ বিসর্জ্জন করিয়া জননী-জন্মভূমির গৌরবের সিংহাসন গড়িয়া তুলিব। আশু ফল লাভের জন্য অধীর হইবেন না। জাতীয়-জীবন-প্রতিষ্ঠা এক দিনের কার্য্য নয়। ফলাফলের প্রত্যাশা না করিয়া কাজ ক'রতে হইবে। যে দিন আমরা উপযুক্ত হইব সে দিন ফলদাতা ভগবান আমাদিগকে অভীষ্ট ফল প্রদান করিবেন। বন্দে মাতরম্।

তীর্থ-যাত্রা

এবার পূজার বন্ধে করিলাম মনে
যাইব বন্ধুর সাথে তীর্থ পর্য্যটনে।
শুধু সংসারের চিন্তা, সহরের গোল
করিয়াছে ঝালাপালা, লভি শান্তি কোল
জুড়াই দু দশ দিন, শুভ দিন দেখে
বাহিরিয়া বাসা হ'তে কাশী অভিমুখে
নামিলাম গুস্করায়, বন্ধুগৃহ হয়ে
যেতে হবে, যাব সাথে তাহারে যে লয়ে।
বেলা অপরাহ্ণ! এক গ্রাম প্রান্তে আসি
জানিনু এ সেই গ্রাম, পথিকে জিজ্ঞাসি।

করিতে বন্ধুর নাম, জনেক আসিয়া
সযত্নে সে গৃহ মোরে দিল দেখাইয়া।
প্রবেশি ভবনে এ কি! যে দিকেতে
কেবল উঠান জোরা ধানের " মরাই
প্রকাণ্ড খড়ের পল, পুষ্ট গাভীদল
রয়েছে গোয়ালে বাঁধা! বলদ সকল
সারি দিয়া বাঁধা আছে! দূরে জন দুই
মজুর আপন মনে পাকায় বাবুই।
আঙিনায় নাহি-গাছ আছে পাশে খালি
করবী দু'ঝারে আর একটী সেফালি।
সুন্দর নিকানো তলা তুলসীর গাছে
গৃহস্থের যত্নটুক সব পড়িয়াছে।
দেখিলাম বন্ধু মোর ঘাস লয়ে হাতে
বাছুর গুলিরে নিজে দিতেছেন খেতে।
দেখিয়া আমার হাসি জোরে হাত-টানি
লয়ে গেল, মার কাছে বসাইল আনি।
তখন বন্ধুর মাতা, জাপাহ্নিক সারি
উঠিছেন, দেখি মোরে আসি তাড়াতাড়ি।
বলিলেন বস বাবা ভাল আছ বেশ,
বেলা পড়ে গেছে, কত হইয়াছে ক্লেশ।
কুশল সুধাইয়ে মোরে, হরিষ অন্তরে
গেলেন তখনি মাতা রন্ধনের ঘরে।
আহার করাতে মোরে! অর্দ্ধঘণ্টা পর
ডাকিলেন স্নেহস্বরে জননী তৎপর।
কি রন্ধন সে যেন গো দেবের প্রসাদ
খেয়েছি যে কত দিন আজো খেতে সাধ।
[illegible]সিনু বাহিরে যবে, দাসীরে ডাকিয়া
[illegible]লেন বেলি, 'বিধু গেছেত খাইয়া
[illegible]ড়ার 'মতি'-আর 'শ্যামারা' দুবোন
গিয়াছে ভাত? হা ঘরে কজন।

ছিল যারে দে'ছ ভিক্ষা ? অম্বিকের মেয়ে
পড়েছিল এত দিন আহা ! জ্বর হয়ে।
আজিকে পাইবে পথ্য সরু চালগুলি
দিতে ত তাহারে তুমি যাও নাই ভুলি।
রুষিয়া বলিল দাসী "আসিয়াছি দিয়ে
কতবার বলে আর, খেলে যে জালিয়ে।'
কেউ নাই উপবাসী খেয়েছে সবাই
ইচ্ছে হয় খাও তুমি, এ এক বালাই !
গ্রামের লোকের কাছে শুনিলাম পরে
তখনো ছিলেন মাতা আহা অনাহারে।
গ্রামের দরিদ্র দুখী খেলে পরে তিনি
বেলা শেষে আতপান্ন গ্রহেণ আপনি।
সুধালে বলেন হাসি অন্ন যার রয়
সবারে খাওয়ায়ে পরে নিজে খেতে হয়।
কেহ যদি করি মানা কেহ যদি রাগে
বলেন বিকালে অন্ন বড় ভাল লাগে।
শুনিয়া বিস্মিত আমি ভাবিলাম মনে
দূরে কেন যাব আর দেবী দরশনে।
সাক্ষাৎ মা অন্নপূর্ণা হেরিলাম আসি
ভকতি ব্যাকুল হৃদে তিন দিন বসি ;
জীবন্ত দেবীর সেই মূর্ত্তিখানি হেরি।
তীর্থ ভ্রমণের কথা বন্ধুরে না বলি
লভি তীর্থফল গৃহে আসিলাম চলি।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ভুতের বাড়ী।

(গল্প)

যৌবনে আমি অতিশয় শিকার-প্রিয় ছিলাম। তখন অধিকাংশ সময়ই আমি দুর্গম অরণ্যে অতিবাহিত করিয়াছি। রাজপুতনায় এমন অরণ্য নাই যে স্থানে আমি পদার্পণ করি নাই। ভোগ-বিলাস পূর্ণ প্রাসাদ অপেক্ষা জন-বিহীন জঙ্গলে অল্পাহারে বা অনাহারে রজনী যাপন করিয়া আমি অধিকতর আনন্দ লাভ করিয়াছি। আমার দূর-দর্শী আত্মীয় স্বজনেরা বিষয়কর্ম্মে আমার ঔদাসীন্য দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইতেন; আমিও জানিতাম তত্ত্বাবধানের অভাবে আমার বিপুল সম্পত্তির ক্ষতি হইতেছিল। কিন্তু শিকারের এমনি মোহিনী শক্তি যে সাংসারিক লাভ ক্ষতির কথা আমার মনেও হইত না। শিকারী-মহলে আমি যে যশঃ ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলাম তাহার তুলনায় আর্থিক ক্ষতিকে আমি অতি অকিঞ্চিৎকর মনে করিতাম।

আমার শিকার-কাহিনী বিবৃত করিবার জন্য এই গল্পের সূচনা করি নাই। শিকারে বাহির হইয়া এক রজনীতে যে অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম তাহারই রহস্যপূর্ণ ইতিবৃত্ত পাঠকদিগের নিকট বিবৃত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

যোধপুরের কুমার আমার শিকারানুরাগের কথা শুনিয়া একবার আমাকে নিমন্ত্রণ করেন। শত বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও শিকারের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা আমার স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। যে দিন আমার নিকট সংবাদ আসিল আমি তার পর দিনই শিকারের অত্যাবশ্যকীয় সরঞ্জাম লইয়া যোধপুর যাত্রা করিলাম।

কুমারের গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম আমার মত আরও কয়েকজন শিকারী নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করিয়াছেন। আমি সকলের সহিত পরিচিত হইলাম। ইহার মধ্যে একজন লোকের সহিত আমার বিশেষ সৌহার্দ্দ্য জন্মিল। ইনি কুমারের শিক্ষক। শিক্ষক মহাশয় একজন অসামান্য জ্ঞানী লোক; প্রায় সকল শাস্ত্রেই তাঁহার অল্পাধিক অধিকার আছে। ইনি যেমন নিরভিমান তেমনি অমায়িক। অল্প সময়ের মধ্যেই আমি তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া গেলাম।

আমরা পর দিবস প্রত্যুষে বিপুল আয়োজনের সহিত শিকারে বাহির হইলাম। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমাদের শিকার-বাহিনী আরবলী পর্ব্বতের পাদ

দেশে আসিয়া উপনীত হইল। তথায় যোধপুর রাজের একটী বাংলো ছিল; আমরা ঐ বাংলোতে আশ্রয় লইলাম।

পর দিবস সকালে তাড়াতাড়ি আহারাদি সম্পন্ন করিয়া আমরা অশ্বারোহণে শিকারে বাহির হইলাম। কতকদূর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া শিকারী দল বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। কিন্তু আমি যথাসাধ্য শিক্ষক মহাশয়কে অনুসরণ করিতে লাগিলাম। ঐ দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে আমি আর পূর্ব্বে কখনও শিকার করিতে গমন করি নাই; সুতরাং পথভ্রান্ত হইবার আমার খুবই আশঙ্কা ছিল।

যাঁহারা শিকারী তাঁহারা জানেন শিকার পাইলে আর কাহারও কোন কথা স্মরণ থাকে না। আমি একটা হরিণের অনুসরণ করিয়া আমার সহযাত্রী হইতে অনেক দূরে চলিয়া গেলাম। আমি এমনই আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলাম যে আর কোন চিন্তা আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিল না। আমি দ্রুতগতিতে অশ্ব চালাইয়া কেবলই হরিণের দিকে ছুটিলাম কিন্তু কিছুতেই ইহাকে বিদ্ধ করিবার সুযোগ হইতে ছিল না।

তখন প্রকৃতি গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছে। আকাশ ঘন ঘটাচ্ছন্ন হইয়াছে। কিন্তু সে দিকে আমার লক্ষ্য ছিল না। সৌভাগ্য ক্রমে সেই সময় আকাশে ভীষণ মেঘগর্জ্জন হইল। সেই বজ্র নিনাদে পার্ব্বত্য বন-ভূমি প্রকম্পিত হইল এবং আমারও চৈতন্যোদয় হইল। আমি তখন একটা বিস্তৃত উপত্যকায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। সম্মুখে তিন দিকেই সমুন্নত প্রাচীরের ন্যায় দুরারুহ পর্ব্বত শ্রেণী দণ্ডায়মান। একটী সমীপবর্ত্তী গিরি-শিখরে এক পুরাতন ভগ্ন অট্টালিকা দেখা যাইতে ছিল। আমি অশ্বসংযত করিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিলাম কোনদিকে যাই? আসিবার সময় পথে আশ্রয় লইবার কোন স্থান দেখি নাই, আর বাংলোতে ফিরিয়া যাওয়া-তো অসম্ভব। তখন ঝটিকা বহিতেছে। প্রবল বাতাস সোঁ সোঁ শব্দে ছুটিয়াছে। মুহুর্ম্মুহুঃ মেঘ-গর্জ্জন হইতেছে। আমি আর কাল বিলম্ব না করিয়া সেই পরিদৃশ্যমান জীর্ণ অট্টালিকার দিকে অশ্ব চালাইলাম।

উপত্যকা অতিক্রম করিয়া যখন পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী হইলাম তখন পথের ক্ষীণ রেখাটীও অদৃশ্য হইয়া গেল। সম্মুখে কেবল বিস্তীর্ণ কাশ-বন। বহু অনুসন্ধান করিয়া পথের চিহ্ন মাত্রও দেখিতে পাইলাম না। তখন ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতেছে। উর্দ্ধে চাহিয়া দেখিলাম আকাশ গাঢ়তর অন্ধকার-আবৃত। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিতেছে। তখন আমার ভয় হইল; বুঝি এইবার জনহীন

অরণ্যে আমার মানব-জীবন-লীলা অবসান হইবে! প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া আমি ঐ জীর্ণ অট্টালিকা লক্ষ্যঃ করিয়া অশ্ব ছাড়িলাম। কাশ-বনে আমি আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিলাম, আমার অশ্ব অতি কষ্টে অগ্রসর হইতেছিল। সীমা-শূন্য-অনন্ত-সমুদ্র-বক্ষে দিগ্দর্শন-বিহীন-নাবিক যেমন ধ্রুব-তারা লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হয় তেমনি আমি জীর্ণ অট্টালিকার উপর নির্ণিমেষ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া অশ্ব চালাইতে লাগিলাম। আমার চির-সঙ্গী বিশ্বস্ত কুকুর "ফিডো" কেবল গন্ধঘ্রাণে আমার অনুসরণ করিতে লাগিল।

অতি কষ্টে কাশ-বন অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতের সানুদেশে উপনীত হইলাম। সেই স্থান হইতে পুরাতন অট্টালিকা দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। তথায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষরাজি ঘন শাখা সমূহ বিস্তার করিয়া বন-ভূমিকে অন্ধকার সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু তল-দেশ জঙ্গলাবৃত না থাকায় আমার পথ চলিবার কোন অসুবিধা হইল না। বৃক্ষ সকল এমন শৃঙ্খলার সহিত শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বিরাজিত যে দেখিয়াই মনে হইল বহু বৎসর পূর্ব্বে কেহ যত্ন করিয়া ঐ সকল মহীরুহ রোপণ করিয়া থাকিবে। এখন সজ্জিত বাগান ভীষণ অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। আমি অশ্ব-রশ্মি শ্লথ করিয়া দিয়া সেই বৃক্ষসারির মধ্যে দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমি যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম পথ-চিহ্ন ততই স্পষ্টতর হইতে লাগিল। আমার হৃদয়ে তখন আশা হইল নিশ্চয়ই অচিরে মনুষ্য-বাস দেখিতে পাইব। আমার অনুমান সত্য হইল। কিছু দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই পথপার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র পাকা বাড়ী ও স্তূপাকার ইষ্টকরাশি দৃষ্টিগোচর হইল। কিন্তু অনেকক্ষণ অনুসন্ধান করিয়াও ঐ গৃহে মনুষ্যবাসের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। বাহ্যলক্ষণ দ্বারা অনুমিত হইল গৃহটী বহুদিন যাবত পরিত্যক্ত হইয়াছে। ঐ গৃহে আশ্রয় লইলে প্রবল ঝড়ের প্রকোপ হইতে কোন রকমে আত্মরক্ষা করিতে পারিতাম বটে কিন্তু সারাদিন পরিশ্রম করিয়া আমি এমনই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে কেবল বিরামের স্থান লাভ করিয়া আমি পরিতৃপ্ত হইলাম না। ধন্য কুহকিনী আশা! তুমিই মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রী! বিশাল সংসারের কর্ম্ম-চক্র তুমিই পরিচালনা করিতেছ!

আমি সেই শূন্য-ভগ্ন গৃহ অতিক্রম করিয়া চলিলাম; আর মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম ভগবান যখন এ পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়াছেন তখন এই রাত্রে নির্জ্জন অরণ্যের মধ্যেও আমার আশ্রয়ের স্থান প্রদান করিবেন। আমি এইরূপ ভাবিতেছি এমন সময় সম্মুখে চাহিয়া দেখিলাম এক উচ্চ প্রাচীর আমার পথ রুদ্ধ

করিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। আমার তখন আশার সঞ্চার হইল। মনে হইল এ প্রাচীর নিশ্চয়ই কোন ধনী ব্যক্তির বাটীর সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত; হয়-তো ইহা বাটী সংলগ্ন বাগানের প্রাচীর হইবে। ব্যাকুল আগ্রহ ও অনিবার্য্য কৌতূহলে আমি অধীর হইয়া উঠিলাম। কিন্তু বহু অনুসন্ধান করিয়াও প্রাচীরের ভিতরে প্রবেশ করিবার দ্বার খুজিয়া পাইলাম না। এক স্থানে দেখিলাম প্রাচীরের কতকটা অংশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ঐ ভগ্ন স্থান দিয়া কোন রকমে আমার ভিতরে প্রবেশের সুবিধা হইতে পারে বটে কিন্তু ঘোড়াটা বাহিরে রাখিয়া যাইতে হয়।

তখনও প্রবলবেগে বাতাস বহিতেছে, সন্ধ্যার আঁধার ধীরে ধীরে বন-রাজ্যে স্বীয় অধিকার বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছে, বৃক্ষপত্রে বিন্দু বিন্দু বারিপাত শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে। আমি আর নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিলাম না। অশ্বের সাজ খুলিয়া উহাকে ছাড়িয়া দিলাম। মনে করিলাম নিরাপদে রজনী প্রভাত হইলে দিনের বেলায় ঘোড়াটা সহজেই খুজিয়া লওয়া যাইবে! আমি আর কাল বিলম্ব না করিয়া কোন রকমে ভগ্নস্থান দিয়া প্রাচীরে আরোহণ করিলাম এবং এক লম্ফে বাগানের ভিতর পড়িলাম। "ফিডো" আমার অনুসরণ করিল।

বাগানে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম বাগানটী এককালে অতিশয় সুন্দর ছিল। উদ্যানস্বামীর মার্জ্জিত রুচি ও সৌন্দর্য্য প্রিয়তার চিহ্ন এখনও স্থানে স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে। বাগানের মধ্যস্থলে একটী বিস্তৃত দীর্ঘিকা, দীর্ঘিকার চারিধারে তমাল, বকুল প্রভৃতি নানাজাতি বৃক্ষরাজী বিরাজমান। কিন্তু বিধ্বংসীকালের প্রভাবে সকলই শ্রীহীন। কোন বৃক্ষ শাখাহীন, কোন বৃক্ষ ঝটিকায় উন্মুলিত। বাগানের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের আমার সময় ছিল না, আমি ব্যাকুল হইয়া লোকালয়ের সন্ধানে ছুটিলাম। অনুমান একশত গজ অগ্রসর হইয়াছি এমন সময় ঘন বিন্যস্ত বৃক্ষান্তরাল দিয়া একটী ক্ষীণ আলোকরশ্মি যেন আমার নয়নাগোচর হইল।

আমি সহসা চমকিয়া উঠিলাম। কিন্তু বিশেষ চিন্তা না করিয়া ঐ আলোক রেখার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অল্প সময়ের মধ্যেই আমি বাগান অতিক্রম করিয়া একটী সমতল-ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কিন্তু তখন আলোক অদৃশ্য হইয়া গেল! আমার মনে প্রশ্ন হইতে লাগিল তবে কি আমার ভ্রম হইয়াছে? আশায় উচ্ছ্বসিত হইয়া অনেকটা পথ দৌড়িয়া আসিয়াছিলাম, অবসন্ন দেহে মাটিতে বসিয়া পড়িলাম। বিস্ময়ে ও আতঙ্কে প্রাণ অভিভূত

হইয়া গেল। এমন সময় সহসা মেঘ নির্ম্মুক্ত চন্দ্রালোকে বনস্থল উদ্ভাসিত হইল। জ্যোৎস্নালোকে দুরবর্ত্তী পদার্থ সকল আমার স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। আমি দেখিলাম আমার সম্মুখবর্ত্তী সমতল ভূমির মধ্যস্থলে একটী পুরাতন অট্টালিকা দণ্ডায়মান। এই অট্টালিকাই পূর্ব্বে উপত্যকা হইতে আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম।

অট্টালিকা পুরাতন; ইহার নির্ম্মাণ প্রণালীই প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছিল। সমগ্র অট্টালিকায় তিনটী মাত্র বাতায়ন। একটী জানালার কপাট খসিয়া পাখীর ভগ্ন ডানার মত ঝুলিতেছে। কোন কক্ষে আলোকের দৃষ্টিগোচর হইল না। সুতরাং ইহার ভিতরে কোন লোক আছে কি না বুঝিতে সক্ষম হইলাম না।

বাড়ীতে লোক থাকুক আর নাই থাকুক এই গৃহেই আমার রজনী যাপন করিতে হইবে। তখনও শীতল বাতাস বাহিতেছিল; বায়ুভরে আকাশে কৃষ্ণমেঘ মালা ঘনীভূত হইতেছিল। সুতরাং রাত্রে ঝড় বৃষ্টি হইবার খুবই আশঙ্কা ছিল। আমি সহজেই সেই বাড়ীতে প্রবেশের ফটক খুজিয়া পাইলাম। ফটকের কপাট হুড়্কা বা তালা দ্বারা আবদ্ধ ছিল না। সামান্য ধাক্কায়ই দরজা খুলিয়া গেল। ভিতরের আঙ্গিনায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম আঙ্গিনাটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কোথাও আবর্জ্জনা বা আগাছা নাই। দেখিয়া বোধ হইল যেন এ বাড়ীতে মানুষ বাস করে। আমি আগ্রহের সহিত কক্ষগুলি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। একটী কক্ষে স্পষ্টই আলোক-রশ্মি দেখিতে পাইলাম। তখন আমি দ্রুত ছুটিয়া গিয়া সেই কক্ষের দরজায় সজোরে ধাক্কা দিলাম। সেই ধাক্কায় পেরেক্ সহিত হুড়্কা খুলিয়া সশব্দে ভূতলে পতিত হইল। দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল। আমি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম একটী স্ত্রীলোক ও একটী পুরুষ বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে দরজার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। গৃহের এককোণে একটী প্রদীপ মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। আমাকে দেখিয়া উভয়েই চমকিয়া উঠিল। স্ত্রীলোকটী চীৎকার দিয়া পুরুষটীকে জড়াইয়া ধরিল। উভয়েই ভয়ে কাঁপিতেছিল আর ভয়-চকিত নয়নে আমার আপাদ মস্তক অবলোকন করিতেছিল।

স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই বার্দ্ধক্যে উপনীত। বন্দুক স্কন্ধে ঐরূপ ভীষণ রাত্রে অকস্মাৎ অপরিচিত ব্যক্তিকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিলে বীরের হৃদয়ও কম্পিত হওয়া স্বাভাবিক। আমি অপ্রস্তুত হইলাম। তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিলাম—আপনারা ভীত হইবেন না; আমি শিকারে বাহির

হইয়াছিলাম, নিবিড় অরণ্যে পথ হারাইয়া ঝড়ে বড়ই কষ্ট পাইয়াছি। উপায়ান্তর না দেখিয়া আপনাদের গৃহে আশ্রয় লইতে আসিয়াছি। আমি অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত ও পরিশ্রান্ত।

বৃদ্ধ—মহাশয়, এই বাড়ী এমন নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত যে সচরাচর লোক এখানে আসে না। এইজন্য রাত্রিকালে আপনাকে বন্দুক হস্তে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আমরা এরূপ ভীত হইয়াছিলাম।

আমি বুঝিলাম বৃদ্ধ আমার কথা অবিশ্বাস করেন নাই। আমি আরও বিনীত-ভাবে বলিলাম—মহাশয়! অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। আমি অনুমতি না লইয়াই গৃহে প্রবেশ করিয়াছি।

বৃদ্ধ—না মহাশয়। সেজন্য আমরা কিছুই মনে করিতেছি না। আপনি পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত সুতরাং এ গৃহে আপনার প্রবেশ করিবার অধিকার আছে।

বৃদ্ধের কথা শুনিয়া আমি কিছু বিস্মিত হইলাম, ইহারা এই অরণ্যে বাস করিয়াও আতিথ্য-ধর্ম্মের গৌরব অবগত আছেন।

স্ত্রীলোকটী তখনও ভয়ে কাঁপিতেছিলেন। বৃদ্ধ অনুচ্চস্বরে তাঁহার কানে কানে কি বলিলেন। তিনি আমার সম্বন্ধেই কোন কথা বলিয়া তাঁহার ভয় অপনোদন করিয়া থাকিবেন। তৎপর বৃদ্ধ আমাকে বলিলেন—মহাশয়, আপনি এই বিছানায় শুইয়া কিয়ৎকাল বিশ্রাম করুন আমরা আপনার আহারের যথাসাধ্য আয়োজন করিতেছি।

এই বলিয়া স্ত্রী পুরুষ উভয়েই কক্ষান্তরে গমন করিলেন। কৌতূহলাক্রান্তচিত্তে আমি তথায় বসিয়া সেই ঘরের জিনিস পত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। ঘরের দক্ষিণদিকে একখানি খাট তাহার উপর বিছানা পাতা রহিয়াছে। খাটখানি মূল্যবান এবং শয্যার উপকরণও ধনী গৃহের উপযোগী। অন্যান্য আসবাব [illegible] দেখিলাম সকলই মহার্ঘ। অরণ্য পরিবৃত বিভগ্ন অট্টালিকার অধিবাসী গৃহে বহুমূল্য সামগ্রী দেখিয়া আমার যারপর নাই বিস্ময় জন্মিল। সে অবসন্ন দেহ-ভার শয্যার উপর স্থাপন করিয়া নিমীলিত লোচনে আ[illegible] স্বামীর কথাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। এমন সময় তিনি আসিতেছি। আহারের জন্য আহ্বান করিলেন। আমি ভোজন করিতে বসির অনিষ্ট উহারা এই অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর আয়োজন করিয়াছে[illegible] বিস্ময়ের বিষয় এই যে আমাকে যে পান ও ভোজন [illegible] হইয়াছিল উহা সকলই রৌপ্য নির্ম্মিত। আমার তথ[illegible]

গৃহ-স্বামীর পূর্ব্বপুরুষেরা বোধ হয় অতুল ধনৈশ্বর্য্যের অধিকারী ছিলেন ভাগ্য-নেমির আবর্ত্তনে বর্ত্তমানে ইহারা এরূপ শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছেন। কমলার কৃপা কাহারও উপর দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না।

কিরূপে ইহাদের অদৃষ্টের এইরূপ শোচনীয় পরিবর্ত্তন হইল জানিবার জন্য আমার বড়ই কৌতূহল জন্মিল। আহারান্তে যখন সেই পূর্ব্বোল্লিখিত ঘরে গিয়া আমরা বসিলাম তখন আমি কথা প্রসঙ্গে বৃদ্ধ লোকটীকে তাহাদের ভাগ্য বিপর্য্যয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি আমাকে অতিশয় বিস্ময়ের সহিত বলিলেন "মহাশয়, আপনি আমাকে গৃহস্বামী মনে করিয়াছেন। আমি গৃহস্বামী নই তাঁহার একজন কর্ম্মচারী মাত্র; আর এই স্ত্রীলোকটী আমার পত্নী। আমরা ১০।১২ বৎসর যাবৎ এই বাড়ীতে বাস করিতেছি।"

আমি তখন অধিকতর আগ্রহের সহিত গৃহস্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম।

বৃদ্ধ বলিলেন — এই বাড়ী "বেওয়ারের রাজা বিজয় সিংহের "আরাম ভবন" ছিল। তিনি মাঝে মাঝে আসিয়া এই বাড়ীতে বাস করিতেন। রাজার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র কুমার সিংহ রাজা হন; প্রায় ১০।১২ বৎসর হইল কুমার সিংহ লোকান্তরিত হইয়াছেন। এখন তাঁহার একমাত্র পুত্র কিরণ সিংহ পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন। কোনও পারিবারিক দুর্ঘটনার পর মনোহর "আরাম-ভবন" শ্রীহীন শ্মশানে পরিণত হইয়াছে।"

এই বলিয়া বক্তা তাহার গল্পের উপসংহার করিলেন। আমি যাহা জানিতে ব্যাকুল হইয়াছিলাম বৃদ্ধ তাহাই গোপন করিলেন। হায়! যে দুর্ঘটনায় আরাম ভবনের এরূপ শোচনীয় অবস্থা, না জানি উহা কত ভীষণ! কিন্তু আমি আমার উদ্দাম কৌতূহলকে সংযত করিতে বাধ্য হইলাম।

তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে; আমি অতিশয় নিদ্রাতুর হইয়াছিলাম। কোথায় আমার ঘুমাইবার স্থান নির্দ্দেশ হইয়াছে বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলাম। আমার কথায় যেন বৃদ্ধ কিছু বিচলিত হইলেন। তিনি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—"আপনি এই শয্যায় শয়ন করিবেন।"

আমি—আপনাদের নিজের বিছানা আমাকে ছাড়িয়া দিতেছেন দেখিতেছি।

বৃদ্ধ—ইহা ছাড়া থাকিবার উপযুক্ত ঘর আর এ বাড়ীতে নাই।

আমি—তবে আপনারা কোথায় থাকিবেন?

বৃদ্ধ—আমরা রান্নাঘরে কোন রকমে রাত্রি যাপন করিব।

আমি—মহাশয়; তাহা হইবে না। আমিই রান্নাঘরে থাকিব।

১০ম বাকি

জীবনে বৃক্ষতলেও আমি অনেকবার রাত্রি যাপন করিয়াছি।

বৃদ্ধ—সে কি হয়! আপনি হইলেন আমাদের অতিথি। নীচের তালার চারটী ঘরের মধ্যে এই ঘরটীই বাসোপযোগী আর তিনটী ঘর অব্যবহার্য্য; দু'তালায় আর একটী ব্যবহারোপযোগী ঘর আছে বটে কিন্তু তাহাতে কিছুতেই আপনাকে থাকিতে দিতে পারি না।

বাড়ী খানি যে দ্বিতল তাহা পূর্ব্বে আমি বুঝিতে পারি নাই; আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আচ্ছা উপরের ঘরে থাকিতে আপত্তি কি?

আমার প্রশ্ন শুনিয়া বৃদ্ধ অতিশয় বিচলিত হইলেন। তিনি আমার মুখের উপর স্থির দৃষ্টি স্থাপন করিয়া চাহিয়া রহিলেন; কোনই উত্তর দিলেন না।

আমি তাঁহার ভাবান্তরের কোনই কারণ খুজিয়া পাইলাম না আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"উপরের ঘরে থাকিতে আপনাদের আপত্তি কি?" বৃদ্ধ গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন—ঐ ঘরে কেহ থাকিতে পারে না।

"কেন থাকিতে পারে না শুনিতে পারিব কি?"

বৃদ্ধ তখন তাহার স্ত্রীর দিকে সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিলেন, যেন কোন গুপ্ত-রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য নীরবে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

প্রৌঢ়া ঈষদ্ মস্তকান্দোলিত করিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তখন বৃদ্ধ অতিশয় ব্যস্ততার সহিত বলিলেন—ঐ ঘরে ভূত আছে!

আমি—মহাশয়, আমি বহুকাল যাবত ভূত দেখিবার জন্য কত চেষ্টা করিতেছি কিন্তু আজ পর্য্যন্তও ভূত দেখা হইল না। ভূতের গল্প পড়িয়া এবং শুনিয়া ভূত দেখিবার জন্য আমার বড়ই কৌতূহল জন্মিয়াছে।

বৃদ্ধ—মহাশয় বলেন কি ভূত দেখিবার জন্য আবার কৌতূহল হয়?

আমি—ভূতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার সন্দেহ দূর করিবার জন্য আজ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, আপনি আমাকে নিরাশ করিবেন না।

বৃদ্ধ—আপনি এরূপ জেদ্ করিবেন না; ঐ ঘরে কেহ থাকিতে সাহস পায় না।

আমি—আমার জেদ্ করিবার অধিকার নাই; আমি প্রার্থনা করিতেছি। ভূত আছে কি না জানি না, যদি থাকে তাহা হইলে উহারা আমার অনিষ্ট করিবে কেন? আমি-তো কোন পাপ করি নাই।

আমার আগ্রহ দেখিয়া বৃদ্ধ দম্পতি অতিশয় বিস্মিত হইলেন

বৃদ্ধ পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি করিব?

পত্নী—ইনি যখন কিছুতেই আমাদের অনুরোধ রাখিবেন না তখন আর উহাকে বসাইয়া রাখিয়া ফল কি ; উহার কষ্ট হইতেছে। বৃদ্ধ তাঁহার পত্নীকে বলিলেন—"উপরের ঘরে-তো বিছানা পাতিয়া দিতে হইবে।

পত্নী—আমি কিছুতেই একা সে ঘরে যাইব না।

বৃদ্ধ—চল, আমি আলো লইয়া সঙ্গে যাইতেছি।

স্বামী স্ত্রী উভয়েই এক একটী প্রদীপরূপ দিব্যাস্ত্র লইয়া ভূতের ঘরে গমন করিলেন।

আমি সেই ঘরেই বসিয়া রহিলাম। কিয়ৎক্ষণ পর দম্পতি প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বৃদ্ধ আমাকে বলিলেন—চলুন আপনার শুইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে।

তিনি আলো হস্তে অগ্রে চলিলেন আমি তাহার অনুসরণ করিলাম। 'ফিডো' এতক্ষণ ঘুমাইতেছিল সেও উঠিয়া আমার সঙ্গে চলিল। আমরা সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া উঠিতে লাগিলাম। সিঁড়ি প্রস্তর নির্ম্মিত এবং বেশ প্রশস্ত। কক্ষে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধ আমাকে শয্যা দেখাইয়া দিলেন এবং সারা রাত্রি আলো প্রজ্জ্বলিত রাখিতে উপদেশ দিয়া প্রস্থান করিলেন। আমি দ্বারে অর্গল প্রদান করিলাম।

কক্ষটী অতি বিস্তৃত। কক্ষের মধ্যস্থলে একটী সুবৃহৎ ঝাড় ; ঝাড়ের দুইটী আলোক মাত্র প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। সেই আলোকে আমি গৃহের সকল জিনিসই দেখিতে পাইতে ছিলাম।কক্ষের এক পার্শ্বে অতি সুন্দর কারুকার্য্য খচিত খাট। খাটে আমার জন্য বিছানা প্রস্তুত হইয়াছে। উপরে সুচারু চন্দ্রাতপ, তাহার নীচে বহুমূল্য মশারি, বালিসগুলি মখমলের নির্ম্মিত ; এক কথায় শয্যার উপকরণ সমূহ অতিশয় মূল্যবান, কেবল সময়ের প্রভাবে ঐ সকল জিনিস মলিন ও জীর্ণ হইয়াছে।

আমি কক্ষের প্রতি জিনিস বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। যখন কক্ষের জিনিস পত্র সকলই দেখা শেষ হইল তখন শয্যায় আসিয়া উপবেশন করিলাম। তখন কত কথাই আমার মনে হইতে লাগিল। বাড়ীর অধিস্বামীর কথা, বৃদ্ধ দম্পতির কথা, সেই ভীষণ পারিবারিক দুর্ঘটনার কথা তারপর ভূতের কথা। ভূতের অস্তিত্বে আমার কোন কালেই বিশ্বাস নাই। যাহারা আমার নিকট ভূতের গল্প করিয়াছে আমি তাহাদিগকেই কত বিদ্রূপ করিয়াছি।

নানাকথা ভাবিতে ভাবিতে যেন আমার মানসিক অবস্থার কিরূপ পরিবর্ত্তন হইল। সে ভাব আমি প্রকাশ করিয়া বলিতে অক্ষম। উহা

ভয় নয়, দুশ্চিন্তাও নয়। কৌতূহল বিমিশ্রিত একটা উৎকণ্ঠা যেন আমাকে অধীর করিয়া তুলিয়াছিল। সে রাত্রে একটা কিছু অলৌকিক ব্যাপার ঘটিবে এইরূপ ধারণা আমার হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধমূল হইতে লাগিল। চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলাম কোনও কিছু নাই; গৃহশূন্য! আমার চিন্তা-স্রোত বিশৃঙ্খলভাব ধারণ করিতে লাগিল। এমন সময় সহসা একটা পেঁচক বাহির হইতে কর্কশ স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া জানালা উন্মুক্ত করিলাম। দেখিলাম আকাশ নির্ম্মল, চন্দ্র হাসিতেছে। শশধরের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় বনভূমি প্লাবিত। সকলই নীরব কেবল ঐ পেঁচকের ধ্বনি প্রকৃতির ধ্যান ভগ্ন করিতেছে। আমি জানালা বন্ধ করিয়া শয্যায় আসিয়া শয়ন করিলাম। আমার বন্দুকটী পার্শ্বে রাখিলাম, 'ফিডো' খাটের কাছে শুইল।

বহুক্ষণ শয্যায় পড়িয়া রহিলাম কিন্তু নিদ্রা আসিল না। এক এক বার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তন্দ্রা মগ্ন হই আবার সভয়ে জাগিয়া উঠি; ব্যাকুল হৃদয়ে কক্ষের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করি আবার আপনি ভারাক্রান্ত চক্ষু নিমীলিত হইয়া আসে। এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইল। তারপর কখন অজ্ঞাতে নিদ্রামগ্ন হইয়া পড়িলাম বলিতে পারি না। হঠাৎ 'ফিডোর' চীৎকার শুনিয়া জাগিয়া উঠিলাম। 'ফিডো' অনবরত চীৎকার করিতেছে, যেন সে ভয় পাইয়াছে। আমি 'ফিডো'কে ডাকিলাম, 'ফিডো' সম্মুখের দুই পা খাটের উপর রাখিয়া দাঁড়াইল, আমি তাহার গায় হাত বুলাইয়া দিলাম। 'ফিডো' শান্ত হইয়া আবার তাহার জায়গায় শয়ন করিল। গৃহে মিট্ মিট্ করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছিল, আমি ভাল করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম কোথাও কিছু নাই। আবার উপাধানে মস্তক রাখিয়া নয়ন পল্লব মুদ্রিত করিলাম। কতক্ষণ নিদ্রিত ছিলাম বলিতে পারি না। কিরূপ একটা অজানা উদ্বেগ অনুভব করিয়া অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিলাম। জাগিয়া দেখিলাম কক্ষ অন্ধকার রজত রেখার ন্যায় একটী মাত্র চন্দ্র-কিরণ-রশ্মি বাতায়নের ছিদ্র পথে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু সেই অস্পষ্টালোকে কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। সেই সময়ই 'ফিডো' ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিল। আমি তাহাকে ডাকিয়া শান্ত করিতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু আমার কণ্ঠ হইতে বাক্য নিঃসৃত হইল না। আমার জিহ্বা যেন অসার হইয়া গিয়াছে। 'ফিডো' ভয়ে খাটের নীচে প্রবেশ করিল।

সেই সময়ে একটা শব্দ আমার কর্ণগোচর হইল। দ্বার উন্মুক্ত করিলে যেমন শব্দ হয় উহা ঠিক তদনুরূপ শব্দ যে দিকে শব্দ হইয়াছিল আমি সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম—প্রাচীর যেন বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে! গৃহে চন্দ্রালোক ধারা প্রবেশ করিতেছে! সেই ক্ষীণালোকে প্রত্যক্ষ করিলাম—একটী বিশুভ্র দিব্য জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে! মূর্ত্তি ব্যোমচারিণী! শূন্যে ভাসিতে ভাসিতে সেই মূর্ত্তি আমার শয্যার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বাতান্দোলিত বৃক্ষপত্রের ন্যায় আমার আপাদমস্তক কাঁপিতে লাগিল; ললাটে স্বেদ নির্গম হইল, আমি যেন একেবারে অসার জড়বৎ হইয়া গেলাম! সেই মূর্ত্তি ধীরে ধীরে শয্যার নিকটবর্ত্তী হইল, ধীরে ধীরে খাটের উপর উঠিল এবং এক দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকাইল তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"ওঃ সে নয়!"

তাহার কথা আমি স্পষ্টই শুনিলাম এবং তাহার উত্তপ্ত নিশ্বাসও আমার মুখে লাগিল। মূর্ত্তি আবার ধীরে ধীরে খাট হইতে নামিল, ধীরে ধীরে প্রাচীরের নিকট গমন করিল এবং উন্মুক্ত পথে অদৃশ্য হইল! তখন দ্বার আবার সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল।

এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করিয়া আমি ভয়ে মৃতকল্প হইলাম। আমার সর্ব্বশরীর অবশ হইয়া গেল, চক্ষু দিয়া যেন আগুন বাহির হইতে লাগিল হৃদ্‌পিণ্ডের শব্দ স্পষ্ট শ্রবণগোচর হইতেছিল। একবার মনে হইল আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি;—তখন গায় চিম্‌টি কাটিয়া দেখিলাম বেদনা অনুভূত হইতেছে। তবে যাহা দেখিয়াছি তাহা স্বপ্ন নয়, মতিভ্রমও নয়, উহা প্রকৃত!

আর আমার উপাধানে মস্তক রাখিতে সাহস হইল না। অবশিষ্ট রাত্রি শয্যায় বসিয়া অতিবাহিত করিলাম। যখন ভোরের পাখী ডাকিল তখনই উঠিয়া আমার পোষাক পরিধান করিলাম বন্দুকটী স্কন্ধে লইলাম এবং "ফিডো"কে লইয়া তাড়াতাড়ি ভূতের ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। সিঁড়ি হইতে নামিয়া দেখিলাম বৃদ্ধ লোকটী উদ্বিগ্নচিত্তে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আমাকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন—আপনার জন্য আমরা বড়ই চিন্তিত ছিলাম; রাত্রে সুনিদ্রা হইয়াছিল-তো?

আমি—নিশ্চয়।

বৃদ্ধ কিছু বিস্মিত হইয়া বলিলেন—কিছুতেই আপনার ঘুমের ব্যাঘাত জন্মায় নাই?

আমি—না।

বৃদ্ধ আমার কথা বিশ্বাস করিলেন না তাহার মুখের ভাব দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম। তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন—আপনি কখন যাইতে ইচ্ছা করেন?

আমি—এখনই চলিয়াছি।

দয়ার্দ্রচিত্ত বৃদ্ধ অযাচিতভাবে যোধপুরের পথ পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। প্রাচীরের বাহিরে আসিয়া আমার ঘোড়া খুঁজিয়া লইতে অধিক বিলম্ব হইল না। বৃদ্ধ আমাকে অরণ্যের ভিতর দিয়া পথ দেখাইয়া চলিলেন। কতকদূর আসিয়া তিনি আমাকে বলিলেন "এই পথে সোজা চলিয়া যান একবারে যোধপুরে পৌছিবেন।" আমি তাহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া বিদায় হইলাম।

বেলা দুইপ্রহরের সময় আসিয়া আমি বাংলোয় পৌছিলাম। তখন শিকারীরা সকলেই বাহির হইয়া গিয়াছেন। আমি ক্ষুৎপিপাসা দূর করিয়া বাংলোয় বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার সময় একে একে শিকারীর দল আসিয়া বাংলোয় পৌছিলেন। সকলেই আমাকে দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন।

আমি বন্ধুদিগের নিকট আমার বিপদের কথা সকলই বলিলাম কেবল ভূত-দর্শন ব্যাপারটা গোপন করিলাম। কারণ সে অলৌকিক কাহিনী কেহ বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু সারাদিন আমি কেবল সেই অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপারের কথাই চিন্তা করিয়াছি এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহা ভুলিতে পারি নাই।

রাত্রে আমি ও শিক্ষক মহাশয় এক কক্ষে শয়ন করিলাম। তিনি আমাকে কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি "আরাম-ভবনে" ছিলেন বলিয়াছেন; কোন্ কক্ষে ছিলেন?

তাঁহার প্রশ্নে আমি কিছু বিস্মিত হইলাম যাহারা "আরাম ভবনের" রহস্য না জানে তাহারা এরূপ প্রশ্ন করিবেন কেন?

আমি বলিলাম—দ্বিতলে কিরণ সিংহের শয়ন কক্ষে ছিলাম।

কিরণ সিংহ কোথায় ছিলেন?

তিনি কয়েক দিনের জন্য স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন।

আচ্ছা, আপনি সেই কক্ষে কোন আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কি?

আমি বুঝিলাম শিক্ষক সেই ভৌতিক ব্যাপারের কথা নিশ্চয়ই অবগত আছেন। তাঁহার নিকট কিছুই গোপন করা উচিত নয়। হয়তো তিনি এই

রহস্যের ইতিবৃত্ত সকলই অবগত আছেন।

আমি বলিলাম—আমি ভূত দেখিয়াছি!

শিক্ষক মহাশয় আমার প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিলেন—হাঁ! আপনি রাণী অমলা দেবীর প্রেত-মূর্ত্তি দেখিয়াছেন!

আমি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম রাণী অমলা দেবী কে?

তিনি—সে অতি ভয়ানক রহস্যপূর্ণ কাহিনী। আপনি যদি আরাম ভবনের শয়ন কক্ষে রাত্রি যাপন না করিতেন তাহা হইলে এই কল্পনাতীত আশ্চর্য্য ব্যাপারের কথা বিশ্বাস করিতেন না।

আমি বলিলাম আমার আর অবিশ্বাস করিবার কিছুই নাই। এই ভৌতিক ব্যাপারের বিবরণ শুনিবার জন্য আমার বড়ই কৌতূহল হইয়াছে। আপনি ইহার ইতিবৃত্ত জানিলে আমার নিকট বিবৃত করুন।

শিক্ষক মহাশয় বলিলেন "আমি আরাম ভবনের লোমহর্ষণ কাহিনী সংগ্রহ করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছি; আপনাকে আমার বইখানি পড়িয়া শুনাইতেছি।"

এই বলিয়া তাঁহার গ্রন্থ পরিপূর্ণ ব্যাগ হইতে তিনি এক খানি বহি বাছিয়া বাহির করিলেন। বলা বাহুল্য শিক্ষক মহাশয় শিকারে বাহির হইয়াও অবসর-মত সাহিত্য-চর্চ্চা করিতে বিরত থাকিতেন না।

আমি আমার শিকারী বন্ধুদিগকে গল্পের কথা বলিলাম তাহারাও আগ্রহের সহিত আমাদের কক্ষে সম্মিলিত হইলেন। কুমার অনেকবার এই ভৌতিক গল্প শুনিয়াছেন তিনি তবু আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"এই বিষাদ পূর্ণ গল্প কতবার শুনিয়াছি তবুও শুনিবার আকাঙ্ক্ষা হয়।

লক্ষ্মীদেবী।

মুসলমান নরপতিগণের সময়ে ভারতবর্ষে কতিপয় বিদুষী রমণী জন্মগ্রহণ করেন। আমরা এই প্রবন্ধে তাঁহাদের দুইজনের বৃত্তান্ত প্রদান করিতেছি। উভয়েরই নাম লক্ষ্মীদেবী এবং উভয়ই ধর্ম্মশাস্ত্রের নিবন্ধকার।

ইহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন লক্ষ্মীদেবী মিথিলা প্রদেশের রাজ্ঞী ছিলেন। তিনি বিবাদচন্দ্র নামক নিবন্ধ রচনা করেন।

বিবাদচন্দ্র হইতে আমরা এই বৃত্তান্ত পাইতেছি। মিথিলা প্রদেশে ভবেশ

নামে একজন অতি পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তাঁহার সুনোসার নামে এক পুত্র ছিলেন। সুনোসার কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় পরাক্রান্ত ছিলেন। সুনোসারের পুত্র রাজা হরসিংহ। হরসিংহের পুত্র রাজা দর্পনারায়ণ। রাজা দর্পনারায়ণের পুত্র রাজা চন্দ্রসিংহ। চন্দ্রসিংহের মাতা হীরাদেবী। লক্ষ্মীদেবী রাজা চন্দ্রসিংহের পত্নী।

লক্ষ্মীদেবী পতির নামানুসারে স্বরচিত নিবন্ধ বিবাদচন্দ্র নামে প্রকাশ করিয়াছেন। মিথিলা প্রদেশে এই নিবন্ধ প্রচলিত আছে। মিশরু মিশ্র দ্বারা এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

অভূদ ভূত প্রতি মল্ল গন্ধো
রাজা ভবেশঃ কিল সার্ব্বভৌমঃ।
অত্যাজয়ং যো বহুভর্তৃকত্বং
দোষং ভুবোপি প্রভুরত্র্য ধামা॥
তস্মাদনূনোজনি সুনোসারো
ধীমানুমাসূনুঃ সমানসারঃ।
রাজোপজীব্যো হরসিংহনামা
ততোম্বোতো দর্পনারায়ণোভূৎ॥
দর্পনারায়ণনৃপতেঃ শ্রীমদ্ধীরা মহাদেবী।
অলভত সুনয়ং তনয়ং নরপতি—
গুণরাশি-পূরিতং শূরং॥
শ্রীমল্লচিমাদেবী তস্য চ নৃপতে দয়িতস্য।
মিশরুমিশ্রদ্বারা রচয়তি বিবাদচন্দ্রাভিরামং॥

লক্ষ্মীদেবীর পতির পিতামহ রাজা হরসিংহদেব তোগলক বংশীয় দিল্লীশ্বরগণের সময়ে মিথিলা প্রদেশে রাজত্ব করেন। সুবিখ্যাত চণ্ডেশ্বর রাজা হরসিংহদেবের মন্ত্রী ছিলেন। চণ্ডেশ্বর বিবাদ রত্নাকর রচয়িতা।

বিবাদ রত্নাকর হইতে অবগত হওয়া যায় রাজা হরসিংহ দেব "রস-গুণ ভুজ চন্দ্রেঃ সম্মিতে শাকবর্ষে" জীবিত ছিলেন; অর্থাৎ ১২৩৬ শকাব্দে তিনি জীবিত ছিলেন। অতএব তাঁহার পৌত্র সম্ভবত শকাব্দের ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।*

অপরা লক্ষ্মীদেবী মিতাক্ষরার এক টীকা রচনা করেন। এই টীকা বালাম

* এসিয়াটিক সোসাইটির বিবাদ রত্নাকর কাব্য।

ভট্ট প্রণীত টীকা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই লক্ষ্মীদেবী শকাব্দের ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

দায় বিভাগ সম্বন্ধে লক্ষ্মীদেবী সাধারণতঃ স্ত্রীগণের পক্ষাবলম্বী। অন্যান্য টীকাকারগণ কি নিবন্ধকারগণ যেস্থলে স্ত্রীলোকের দায়াধিকার অস্বীকার করিয়াছেন লক্ষ্মীদেবী শাস্ত্রের ব্যাখ্যাদ্বারা সে স্থলে স্ত্রীলোকের দায়াধিকার সমর্থন করিয়াছেন।

শ্রীরেবতীমোহন গুহ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

মৈত্রী। মাসিক পত্রিকা। গত বৈশাখ মাস হইতে প্রথম বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। হবিগঞ্জ মৈত্রী প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা। পত্রিকার নামেই পরিচালকগণের মহোদ্দেশ্য পরিব্যক্ত হইয়াছে। বৈশাখের সংখ্যায় এই কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে;—১। সূচনা; ২। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা—Victor Hugoর একটী কবিতার অনুবাদ ৩। উপনিষদের অনুবাদ, ৪। রুষদেশীয় সর্ব্বপ্রধান লেখক মহাত্মা 'টলষ্টয়ের আত্ম-কাহিনী' ৫। চন্দ্রালোকে দেখুন; ৬। "ঈশ্বর সত্য দেখেন কিন্তু দণ্ড পুরস্কার করিতে বিলম্ব করেন"—ইহা টলষ্টয়ের একটী গল্পের অনুবাদ। ৭। রুষ ও আধুনিক শিক্ষা-নীতি। প্রবন্ধগুলি বেশ সুন্দর হইয়াছে। সকলগুলি প্রবন্ধের উদ্দেশ্যই এক—জাতীয় জীবনের উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠা। দুইটী প্রবন্ধে পশ্চিম বঙ্গের প্রচলিত কথিত ভাষার বাহুল্য দেখিয়া বড়ই দুঃখ হইল। আশা করি মৈত্রী যে মহোদ্দেশ্য লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছেন তাহা সফল হইবে।

স্বদেশ কুসুম। শ্রীসুধাকৃষ্ণ বাগচী প্রণীত। মূল্য ৵০ দুই আনা। এইখানি স্বদেশী ছড়ার বহি। কোমলমতি বালক বালিকাদিগের হৃদয়ে স্বদেশ প্রেম উদ্দীপ্ত করিবার জন্য এই ছড়াগুলি লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার জননীদিগকে অনুরোধ করিয়া বলিয়াছেন—

"শিশুর কোমল চিতে স্তন্যের সহিত
ঢালিবে স্বদেশপ্রীতি অনুরাগামৃত।"

এই ছড়াগুলির ভাব অতিশয় উচ্চ, প্রতি পংক্তিতে স্বদেশ-প্রেমের উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। কিন্তু ছন্দ মিল সম্বন্ধে দোষের অভাব নাই।

আরতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

৮ম বর্ষ } ময়মনসিংহ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম।

প্রেমাবতার মহাপ্রভু শ্রীশ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের জীবনচরিত, সংক্ষিপ্ত বা বিস্তৃত ভাবে, অনেকে অবগত আছেন; কিন্তু তাঁহার সমস্ত জীবনের প্রত্যেক দিনের লীলার সম্পূর্ণ ইতিহাস বা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিবরণ কেহই অবগত নহেন; এরূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ হওয়াও অসম্ভব, কারণ সসীম মানব অসীম পরমেশ্বরের লীলা কবে সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে বা বুঝাইতে পারিয়াছে? চৈতন্য প্রভুর সম্পূর্ণ লীলা আমরা-তো পাই নাই, ইহা সত্য, কিন্তু তাঁহার সমসাময়িক অনেক ভক্ত ও মহাপুরুষের জীবনী এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই। মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পরে বৈষ্ণবাকাশে যে সকল অত্যুজ্জ্বল তারা উদিত হইয়া জীবের অজ্ঞানতিমির নাশ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের কি পূর্ণ বিবরণ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি? না—তাহা পাই নাই। তথাপি গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্র ও সাহিত্য বিশাল হইতে বিশালতর। কিন্তু ইহাকে আরও বিশাল করা যাইতে পারে। ভরসা করি ভবিষ্যতে ভক্তগণের অনুগ্রহে বৈষ্ণবশাস্ত্র মহাবিপুল বপু ধারণ করিয়া জগতের ধর্ম্মপিপাসুগণ সমীপে বৈষ্ণব ধর্ম্মের গৌরব ও সৌরভ অধিকতররূপে বিস্তার পূর্ব্বক ইহাকে আপামর সাধারণের একমাত্র গ্রহণীয় ও পালনীয় ধর্ম্ম বলিয়া প্রমাণ করিয়া দিবেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ভগবান গৌরাঙ্গদেবের জীবন চরিত্র বর্ণন করা উদ্দেশ্য নহে; তাঁহার ভক্ত, শিষ্য বা পারিষদবর্গের লীলাবলী বিবৃত করিতে আকাঙ্ক্ষা করি না; মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের কিছু পূর্ব্ব হইতে একাল পর্য্যন্ত বৈষ্ণব ধর্ম্ম কোথায় কি প্রকারে প্রসারিত ও প্রতিপালিত হইয়াছে এবং কাহারদ্বারা ইহা প্রচারিত ও সংরক্ষিত হইয়াছিল, সংক্ষেপে তাহারই একটু বিবরণ লিপিবদ্ধ করা আমার উদ্দেশ্য। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের আদিকাল, মধ্যকাল ও বর্ত্তমান কালের কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে এবং কোন্ কোন্ মহাপুরুষ কোথায় কি প্রকারে ভগবান চৈতন্য-

দেবের প্রকাশিত প্রেমধর্ম্মের সংরক্ষণ করিয়াছিলেন তাহাও অবগত হইতে সক্ষম হওয়া যায়।

ইহা বোধ হয় বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষীয় হিন্দুদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোক বৈষ্ণবমতাবলম্বী। ইহারা সকলেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব নহে, ইহাদের নিয়ম, রীতি-নীতি ও সম্প্রদায়ের নানা নাম ও প্রকার দেখা যায়, তন্মধ্যে যাঁহারা নবদ্বীপের প্রেমাবতার চৈতন্যচন্দ্রের ভক্ত, শিষ্য, মতাবলম্বী বা উপাসক তাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব নামে অভিহিত। মুরারী গুপ্ত ও দামোদর প্রমুখ বৃন্দাবন দাস বিরচিত "চৈতন্য চরিত্র" শাস্ত্রে, মহাপ্রভুর গার্হস্থ্য জীবন, আদিলীলা, যাত্রা, সন্ন্যাস, মধ্যলীলা, অন্তলীলা প্রভৃতি অনেক বিষয় সুন্দররূপে বিবৃত আছে, এই গ্রন্থে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনেক অবশ্য প্রয়োজনীয় কথা পাঠ করিতে পাওয়া যায়। ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে বিরচিত মহাত্মা কৃষ্ণদাস কবিরাজের "চৈতন্য চরিতামৃত" নামক অত্যন্ত উপাদেয় গ্রন্থে মহাপ্রভুর অতি সুন্দর জীবন চরিত্র বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত, কিন্তু ইহাতে বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মসংহিতা, শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবৎগীতা প্রভৃতি বহু সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে শ্লোক উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মতত্ত্ব অতীব পরিষ্কাররূপে বিশ্লেষিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের অনেক স্থান এমন তর্ক, যুক্তি, বিচার ও মীমাংসায় পরিপূর্ণ যে ইহাকে প্রাণ্ড্ ফিলসফি কহা যাইতে পারে, এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তক অত্যন্ত মনোহর।

মহাপ্রভু, বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা, দক্ষিণাবর্ত্ত, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি প্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া শেষ অবস্থায় অদ্বৈতাচার্য্য ও নিত্যানন্দকে বৈষ্ণবগণের শিরোমণি স্বরূপে সমুদয় কার্য্যের তত্ত্বাবধানের ভার প্রদান করেন। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামী ব্রজধামে গিয়া তথাকার মন্দিরের তত্ত্বাবধান করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। স্বরূপ ও রামানন্দ এই দুই মহাত্মা স্থানে স্থানে ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার জন্য গমন করিতেন। অদ্বৈতাচার্য্য (বা অদ্বৈতানন্দ) শ্রীহট্ট জেলান্তর্গত লাউড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন; জন্ দি বাপ্টিস্ত যেমন যিশুখৃষ্টের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে আগমন করিয়া যিশুর আবির্ভাব ও দেবত্ব ঘোষণা করিয়াছিলেন অদ্বৈতপ্রভুও তেমনি চৈতন্যচন্দ্রের অবতাররূপে আবির্ভাব, জীবের উদ্ধার প্রভৃতি পূর্ব্ব হইতে ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন। অদ্বৈত প্রভুর বংশধরগণ শান্তিপুরে বাস করেন। নিত্যানন্দ রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, তাঁহার বংশাবলী খড়দহে ও বলাগড়ে অবস্থিত। সমুদয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্বরূপ বিপুল প্রাসাদের অদ্বৈতাচার্য্য ও নিত্যানন্দ দুইটি প্রকাণ্ড অক্ষয়স্তম্ভ। এইজন্য অদ্বৈতাচার্য্য

ও নিত্যানন্দ অতি আদিকাল হইতে "প্রভু" উপাধিতে সম্মানিত ও সুপরিচিত। ইঁহাদের অব্যবহিত পরেই গোস্বামী মহাত্মাদিগের স্থান; গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ছয়জন গোস্বামীকে "আদি গোঁসাই" বলিয়া অতিশয় শ্রদ্ধা করেন; তাঁহাদের নাম——রূপ, সনাতন, জীব, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস এবং গোপাল ভট্ট। বৃন্দাবনের সুপ্রসিদ্ধ "মদনমোহন" ও "গোবিন্দজী" মন্দির, রূপসনাতনের প্রতিষ্ঠিত। মানসিংহদেব নামক রাজার শাসনকালে সম্বৎ ১৬৪৭ বর্ষে এই মন্দিরদ্বয়ের প্রতিষ্ঠাক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছিল। মন্দির প্রতিষ্ঠার পরে (১৫২৫ খৃষ্টাব্দে) শ্রীরূপ গোস্বামী মহোদয় "বিদগ্ধ মাধব" গ্রন্থ বিরচন করিয়াছিলেন। রূপ ও সনাতন যেমন ভক্তাধিক ভক্ত তেমনি পণ্ডিতাধিক পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহাদের প্রণীত বহু উৎকৃষ্ট গ্রন্থ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। আচার্য্য উইলসন সাহেব লিখিয়াছেন "রূপ ও সনাতন ভ্রাতাদ্বয়ের প্রতিষ্ঠিত বৃন্দাবনস্থ মন্দির উত্তর ভারত মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। হিন্দুধর্ম্মের ইহা মূল্যবান অলঙ্কার স্বরূপ। এরূপ সম্ভ্রান্ত ও সুন্দর দেবালয়, ভারতে খুব কম দেখা যায়। পুরাতন মন্দিরদ্বয়ের অধিকাংশ লুপ্ত হইয়াছে।" * মন্দিরের মনোহারিত্ব সম্বন্ধে সাহেবেরাও এমন মুগ্ধ যে অনেক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারাও লিখিয়া গিয়াছেন—The interior of the temple is far superior to any of the religious structures to be met with along the Ganges and Jumna rivers, and may almost be considered exquisitely handsome. The exterior of the temple of Madan Mohan is remarkable for its being built something after the plan of the pyramidical temples of Tanjore in South India; or rather its exterior corresponds with that of the temples at Bhubaneswar in Orissa. †

জীব গোস্বামী, সনাতন গোস্বামীর কনিষ্ঠ সহোদরের সন্তান। ইনিও সুপণ্ডিত এবং বৃন্দাবনের রাধাদামোদর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। গোপাল ভট্ট, বৃন্দাবনের রাধারমণ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উপরিউক্ত দুই প্রভু এবং এই ছয় গোস্বামী, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের আদিকালের প্রবর্ত্তক, প্রচারক, উপদেষ্টা ও সংরক্ষক। এতদ্ভিন্ন শ্রীনিবাস, গদাধর পণ্ডিত, শ্রীস্বরূপ, রামানন্দ, হরিদাস, কবিরাজোপাধিক অষ্ট সংখ্যক সুবিদ্বান, চৌষট্টি মোহান্ত

---

* "Religious Sects of the Hindoos" By Professor H. H. Wilson. Vol. I. Page 158 (Ed. 1861.)

† Asiatic Researches, Vol. XV. (See Plate).

এবং বহু ভক্ত ও শিষ্য কর্ত্তৃক বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রসারিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। চৈতন্যদেব পঞ্চজন পাঠানকে (মুসলমানকে) বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে দস্যু বিজ্‌লী খাঁ সর্ব্বপ্রথম; মহাপ্রভু ইহাকে, দীক্ষার পরে, রামদাস নাম দিয়াছিলেন। শিষ্যদের সময়ে এরূপ দীক্ষা বিরল ছিল বটে কিন্তু মহাপ্রভুর মূল নীতির পরিবর্ত্তন হয় নাই। উপরিউক্ত মহাপুরুষদিগের গ্রন্থাবলী, পাণ্ডিত্য, বিমল চরিত্র, বিচার শক্তি, ঐকান্তিকী ভক্তি, উপদেশ, ব্যাখ্যা প্রভৃতি দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম সতেজ হইয়া উঠিয়াছিল এবং এখনও তাঁহাদের প্রভাব বঙ্গসাহিত্যে, বঙ্গসমাজে, বাঙ্গালী চরিত্রে প্রবলরূপে বর্ত্তমান দেখা যায়। বঙ্গ, উড়িষ্যা, আসাম, মধ্যপ্রদেশ ও রাজপুতনায় ইঁহাদের জীবনের, কর্ম্মের, বাক্যের ও চিন্তার প্রভাব এখনও অত্যন্ত প্রবল।

মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পরে, ভক্ত ও শিষ্যগণ—বিশেষতঃ উপদেষ্টা ও প্রচারক এবং কথকগণ—পঞ্চরসের ব্যাখ্যা করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মকে সরল করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং ঐ পঞ্চরসকে আধ্যাত্মিক ভক্তির পথ বা সোপান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাহা এই—শান্তি, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য্য। এই পাঁচটি রসের ব্যাখ্যায় পাঁচখানি বিরাট গ্রন্থ লিখিত হইতে পারে অথবা বহু দিবস ব্যাপিয়া উপদেশ প্রদত্ত হইতে পরে। প্রকৃত কথা এই, বৈষ্ণবের উপাসনা প্রধানতঃ এই পঞ্চরসের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই পঞ্চরসের অনুবর্ত্তন, বৈষ্ণব ধর্ম্মের রক্ষক, সাধক ও প্রতিপালক। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই পাঁচ রসের ব্যাখ্যা করিবার আকাঙ্ক্ষা নাই, কারণ তাহা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ভগবানকে প্রভুভাবে আরাধনা করার নাম দাস্যরস; আমরা তাঁহার দাস, তিনি আমাদের প্রভু; আমরা তাঁহার অনুমতি পালনে বাধ্য। ইহার দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে অনেক আছে। সম্পূর্ণ প্রীতির নাম শান্তরস; শণক প্রভৃতি সাধক ও যোগীন্দ্রগণ ইহার উপভোক্তার দৃষ্টান্ত। ভগবানকে প্রাণের সখা ভাবিয়া লওয়া সখ্যরতির ক্রিয়া, যেমন ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতি উপভোক্তা। ঈশ্বরকে পিতৃভাবে আরাধনা এবং পুত্রভাবে তাঁহার প্রীতিবর্দ্ধন করা ও প্রিয় ভাবে অনুজ্ঞা প্রতিপালন করা বাৎসল্য রসের ক্রিয়া। ভক্তির চরম ভাবের নাম মাধুর্য্য রস। গোপিনী ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মধুর ভাবের চরম দৃষ্টান্ত মাধুর্য্য রস। অতি মধুর সঙ্কীর্ত্তন প্রথা, বাঙ্গালী বৈষ্ণবের পক্ষে সাত রাজার ধন এক মাণিক। এই প্রথা গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সম্পূর্ণ নিজস্ব (একেবারে [illegible]), এই নাম সঙ্কীর্ত্তনের মোহিনী শক্তি বলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও তাহার

প্রভুত্ব সুদৃঢ় হইয়া চিরদিন বর্ত্তমান থাকিবে। ইহার ঐন্দ্রজালিক সামর্থ্য জগতকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে এবং হরিনাম রূপ মহামন্ত্র চিরকাল আধ্যাত্মিকভাবে মৃত মানবকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবে সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালা বৈষ্ণব সাহিত্য যেমন প্রকাণ্ড তেমনি প্রয়োজনীয়। সংস্কৃত ভাষাতেও অনেক বৈষ্ণব গ্রন্থ বিরচিত হইয়া গিয়াছে. এই সকল গ্রন্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার ও পালন পক্ষে অভূতপূর্ব্ব সহায়তা সম্পাদন করিয়াছে। এক একজন বাঙ্গালী বৈষ্ণব একশতাধিক গ্রন্থ বিরচন করিয়া গিয়াছেন, কেহ কেহ এক লক্ষাধিক শ্লোক রচনা করিয়া পাণ্ডিত্য ও অধ্যবসায়ের চরম সীমা প্রদর্শন করিতে ত্রুটী করেন নাই। কতকগুলি প্রধান পুস্তকের নাম এস্থলে উল্লিখিত হইল। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রণীত—বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, উজ্জ্বল নীলমণি, দানকেলী কৌমুদী, বহুস্তবাবলী, অষ্টাদশ লীলাখণ্ড, পদ্মাবলী, গোবিন্দ বিরদাবলী, মথুরা মাহাত্ম্য, নাটক লক্ষণ, লঘুভাগবত, ব্রজবিলাস বর্ণনম্, প্রভৃতি। সনাতন গোস্বামী কৃত—হরি ভক্তি বিলাস, রসামৃত সিন্ধু, ভাগবতামৃত, সিদ্ধান্তসার, ইত্যাদি। শ্রীজীব গোস্বামী বিরচিত —ভাগবত সন্দর্ভ, ভক্তি সিদ্ধান্ত, গোপালচম্পু, উপদেশামৃত। রঘুনাথ দাস কৃত—মানসশিক্ষা ও গুণালেশ সুখদা। এইগুলি সংস্কৃত। বাঙ্গালা ভাষার গ্রন্থ মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান। রূপ গোস্বামী কৃত রাসময়কোণ, সনাতন গোস্বামী কৃত রসময়কলিকা, কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত চৈতন্যচরিতামৃত, দেবকী নন্দন কৃত বৈষ্ণব বর্দ্ধন, রাধামাধব প্রণীত পাষণ্ডদলন, ঠাকুর গোঁসাই বিরচিত প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা, লালদাস বিরচিত উপাসনা চন্দ্রামৃত, লোচন দাস কৃত চৈতন্যমঙ্গল এবং গৌরগণোদ্দেশদীপিকা। তদ্ভিন্ন চৈতন্যচন্দ্রোদয়, স্তবমালা, স্তবামৃতলহরী, ভজনামৃত, শ্রীস্মরণদর্পণ, গোপীপ্রেমামৃত, কৃষ্ণকর্ণামৃত, কৃষ্ণকীর্ত্তণ প্রভৃতি ভক্তিরস প্রধান গ্রন্থগুলি অতীব উৎকৃষ্ট ও প্রয়োজনীয়। বঙ্গদেশে নদীয়া, অম্বিকা, কালনা, কাটোয়া, অগ্রদ্বীপ প্রভৃতি বহুস্থানে বৈষ্ণবের প্রধান প্রধান মন্দির, আখ্ড়া ও আড্ডা আছে। আদি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় হইতে কর্ত্তাভজা, পন্থদায়ক, সখীভাবী, কৌপীন ধারী, বাউল, রাধারমণী, রাধাপালী, বিহারী, গোবিন্দজী, যুগলভক্ত প্রভৃতি কতকগুলি নবীন সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইয়াছে। মতের সহিত স্থানে স্থানে বা সময়ে সময়ে অনৈক্য হইতে পারে, কিন্তু ইহারা সকলেই বৈষ্ণব এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মের পালক ও রক্ষক। অনেক সম্প্রদায়ের চেষ্টায় বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র, উড়িষ্যা, মধ্য প্রদেশ, আসাম, মণিপুর,

পশ্চিমোত্তর প্রদেশ, রাজপুতনা, গুজরাট, পঞ্জাব, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি বহুপ্রদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রসারিত, পালিত ও সম্মানিত হইয়াছে।

প্রকৃত কথা এই, কোন ধর্ম্মের সামর্থ্য, আকর্ষণী শক্তি ও মাধুর্য্য সংরক্ষণ করিতে হইলে কেবল বক্তৃতা, প্রবন্ধ, পুস্তক বা গীতাদিদ্বারা সম্পূর্ণরূপে উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। সম্প্রদায় ভুক্ত লোক সমূহের চরিত্রের বল আবশ্যক। চরিত্রবল না থাকিলে কোন ধর্ম্মের গৌরব বা সৌরভ থাকিতে পারে না। বৈষ্ণব ধর্ম্ম যদি কোথাও হীনপ্রভ হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহা বৈষ্ণবদিগেরই দোষে হইয়াছে, ধর্ম্মের দোষে হয় নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে আদৌ কোন দোষ নাই একথা আমি কহি না, কিন্তু ইহা স্বীকার্য্য যে অনেক দোষ সত্বেও ইহা অদ্যাপি সামর্থ্যশালী আছে। প্রকৃত সাত্বিকতা ও ত্যাগস্বীকারের নাম বৈষ্ণব ধর্ম্ম, জীবে দয়া ভগবৎ নামে রুচি ও বিমলচরিত্রবল ইহার গৌরব, সৌরভ ও সামর্থ্য।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

পাপিয়ার প্রতি।

কি যেন বিঁধিছে বুকে,—চেতনায় ধীরে
নেমে আসে ব্যথাভার জড়তার ঘোরে;
হৃদয়ের রক্ত সনে মিশেছে কি আসি
বিষাক্ত ঔষধি রস?—অথবা নিঃশেষি
পিয়েছি কি তীব্র সুরা?—প্রতি পলে পলে,
ডুবায় চেতনা মোর বিস্মৃতির জলে॥
এ নহে বেদনা ভার ঈর্ষা-কষায়িত
তোমার অধীর গানে;—আজি মোর চিত,
সে আনন্দ পান করি, অন্তর বাহির
বসন্তের পিক সম প্রফুল্ল মদির—
দুঃখ হেন বাজে বুকে, সুখ মত্ততার!
কানন রঙ্গিনি তুমি, হে মোর অপ্সরা,
বসি গন্ধ-উথলিত বকুলের ডালে,
যেথা ছায়ঙ্কিত জ্যোৎস্না শাখাপত্র ফুলে
ঘুমিয়া রয়েছে জাগি, সেথায় বিরলে
প্রণয় রাগিনী গাহি, মধুর হিল্লোলে

দিতেছ ঝঙ্কার তুমি বনস্থল পুরি—
নন্দন অমিয় ঝরে কণ্ঠ সিক্ত করি !

(২)

আন সে মদিরা রস ! তরল নিক্কণে
বহাবে প্রেমের গঙ্গা হৃদয় পুলিনে।
উঠিবে হৃদয় ভরি, ফুলের সুবাসে,
শ্যামল পল্লীর ছবি কোমল আভাসে।
কোথা গো পান-পাত্র, সুরা সুবিমল,—
সলজ্জ অরুণ শোভা মিশ্রণ উজল ?
নাচিবে স্ফটিকাধারে প্রমত্ত আবিল
সুরভি বুদ্‌বুদ শত আরক্ত ফেনিল !
সে মদিরা পান করি—অদৃশ্য হইয়া,
শ্যাম বনস্থলী পরে যাই গো মরিয়া !

(৩)

এসো এসো হে মরণ হিম আলিঙ্গনে,
জুড়াইয়া দাও মোর অশান্ত জীবনে ;
হেথা শুধু জ্বলে ঘোর চিন্তা বহ্নি শিখা
মর্ম্মের বাসনা ঘেরি ;—শুধু ভস্মলেখা
অদৃষ্ট লেপিয়া ! ছায়া তার নাহি আসি পড়ে
শুধু সে আনন্দ ভরা তব পত্র নীড়ে !
হের অই কাঁপে বৃদ্ধ সমাধি সোপানে,
নীরব যৌবন স্বপ্ন মিলায় মরণে।
ম্লানমুখী, নত-আঁখি, হৃত রত্নভূষা,
দ্বারে দ্বারে কেঁদে ফিরে ভিখারিণী আশা !
রূপসীর চারুহাসি মেঘ আসি ঢাকে,
না ফুটিতে প্রেম-ফুল মিলায় কোরকে !

(৪)

হে পাপিয়া লহ মোরে অনন্তের পথে !
চাহি না পুষ্পক রথে ফুলধনু সাথে

মায়া মরিচীকা দেশ—অদৃশ্য কল্পনা!
চির বসন্তের দেশে উড়াও চেতনা।
চির বসন্তের দেশ! কি মধুর রাতি!
নীরবে উৎসবে হাসে নক্ষত্রের পাঁতি
বেড়ি নীল সিংহাসন; রাজ রাজেশ্বরী
হাসে তার পদে বসি, সচন্দ্র শর্ব্বরী।
নাহি তব পত্র-কুঞ্জে সে দীপ উৎসব.
চৌদিকে নিখিল-ব্যাপ্ত শান্তি সুনীরব।
শুধু ক্ষীণ রশ্মি পশে অতি ধীরে ধীরে
পত্র পল্লবের ঘন সুগন্ধি আঁধারে!

(৫)

মোর পাদ প্রান্তে আজি ফুটেছে কি ফুল!
কি গন্ধ দুলায় মৃদু শাখার অঞ্চল!
আমি স্নিগ্ধ অন্ধকারে শুধু ভাবি মনে
প্রকৃতিরে ঋতুরাজ সাজাল কেমনে!
শ্যাম শষ্প, লতা গৃহ, ফুল্ল বনস্পতি,
কনক চম্পক চারু সন্ধ্যার মালতী
পেলব শিরীষ কলি আধপত্র ঢাকা,
বসন্তের শ্যাম ক্রোড়ে প্রথম বালিকা!
গোলাপ রক্তিম বঁধু, শ্যাম বৃন্তে বাঁকা;
বসন্তের লজ্জাশীলা কিশোরী নায়িকা!

(৬)

গাহেপাখী, আঁখি মুদে আমি যাই শুনে—
আমি চির-প্রেম-মুগ্ধ মরণের সনে।
কত প্রিয় সম্বোধন রচি কবিতায়,
কত দিন সাধিয়াছি বরিতে আমায়!
এ হেন মধুর গানে, এ সুন্দর রাতে,
সুন্দর মরণ যদি আসিত বরিতে!
বেদনা বিহীন মৃত্যু পুলক নিশিতে—
তুমিত পাপিয়া তবু থাকিবে গাহিতে!

কাণ ত রহিবে মোর—শুনিব না তবু,
তুমি গান গেয়ে যাবে. থামিবে না কভু।
তোমারি গীতের মৃদু মূর্চ্ছনার সনে,
নয়ন পল্লব মোর মুদিবে মরণে !

(৭)

মরণের কভু তুমি নহ ত পাপিয়া !
সৃজনের ধ্বংশ স্রোত নিবে না ভাসিয়া
তোমার সঙ্গীত সুধা অতীতের কূলে !
উথলে যে গীতি আজি মোর শ্রুতিমূলে,
আনন্দে শুনেছে রাজা, দুখী অশ্রু ধারে,
কত বর্ষ বর্ষান্তরে—যুগ যুগান্তরে !
তোমারি কি গীত শুনি কেঁদেছিল বালা
রাজদ্বারে উপেক্ষিতা মুগ্ধা শকুন্তলা ?
নিশিথে খুলিয়া রক্ষঃ-প্রাসাদের দ্বার,
নিরখি সাগরে নীল তরঙ্গ সঞ্চার,
শুনে কি কাঁদিয়াছিল মান মর্ম্মাহতা
রাঘব হৃদয়-ছিন্না অভাগিনী সীতা ?

(৮)

বাস্তবের শঙ্খ ঘণ্টা সহসা আমার
ভেঙ্গে দিল স্বপ্ন হাট স্বর্ণ সিংহদ্বার !
পারিলে না হে কল্পনে, মোহের মায়ায়
আমা হতে স্বপ্নচ্ছলে ভুলাতে আমায় !
ক্ষীণ হয়ে আসে গীত,—ক্ষীণ নিরবধি,
পার হল বনস্থলী, পার হল নদী,
পার হয়ে গিরি অই আকাশের তলে
লভিয়াছে নিঃশব্দ সমাধি ! একি মায়াজালে
ভ্রান্তির রাগিনী গাঁথি দেব নিরঞ্জন
শুনালেন স্বপ্ন গাথা—কবির স্বপন ! *

শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ।

* এই কবিতাটী কবিবর কীট্‌সের Ode to Nightingale এর অনুকরণে লিখিত

ছায়াপথ।

নির্ম্মল অন্ধকার রজনীতে আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সাদা পাতলা মেঘের ন্যায় একটী ক্ষীণ আলোকরেখা দেখিতে পাওয়া যায়। উহা আকাশের উত্তর দক্ষিণে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই আলোক-রেখাকে ছায়াপথ বলে।

কল্পনা-কৌতুকী কবিগণ ইহাকে দেববর্ত্ম, দুগ্ধবর্ত্ম, আকাশগঙ্গা, স্বর্ণদী প্রভৃতি বহু নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই সকল নাম এবং তৎসম্বন্ধীয় বিচিত্র কাহিনী সমুহ পাঠ করিলে সহজেই অনুমান হয় যে অতি প্রাচীনকালেই নানা দেশের অধিবাসিগণ অনন্ত আকাশে এই আলোকরেখা দেখিয়া অতীব বিস্মিত হইয়াছিলেন, এবং এই অদ্ভুত পদার্থের বিষয় জানিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তখন বিজ্ঞানের উন্নতি হয় নাই। দূরবীক্ষণের কথা কেহ কল্পনায়ও আনিতে পারিত না। সুতরাং কেবল অনুমান মাত্র লইয়াই তখন সকলকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইত।

ধর্ম্মপ্রিয় হিন্দুগণ কল্পনা করিয়াছেন যে, এই বিমানপথে শচীদেবী প্রতিরাত্রে দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। আবার এরূপও কেহ বলিয়াছেন যে, মৃত্যুর পর লোকে এই পথে যমালয় গমন করিয়া থাকে। সে সময় লোকেরা যমকে ধর্ম্মরাজ বলিত, তিনিই পুণ্যাত্মাদিগকে সংসারের সকল শোক দুঃখ হইতে মুক্ত করিয়া স্বর্গে লইয়া যান। যমরাজের দর্শনলাভের জন্য পুরাকালে সকল লোকই ব্যাকুল হইতেন।

প্রাচীন গ্রীক্‌গণ ছায়াপথকে 'গেলাক্‌সি' (Galaxy) বা দুগ্ধবর্ত্ম (Milky Way) বলিত। কথিত আছে জুপিটার হারকিউলিসকে জুনো দেবীর ক্রোড়ে স্থাপন করিলে জুনোদেবী তাহাকে 'মার' (Marr) পুত্র জানিয়া ত্যাগ করেন। তখন জুনোদেবীর স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইয়া আকাশে ছড়াইয়া পড়ে। তাহাতেই দুগ্ধবর্ত্ম (Milky Way) হইয়াছে।

পূর্ব্বোল্লিখিত প্রচলিত কাহিনী সকল যে ভিত্তিহীন এই কথা আর এখন কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। কিন্তু নানা জাতির প্রাচীন সাহিত্য-বর্ণিত গল্পগুলিতে কোন সত্য না থাকিলেও ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে পুরাকালে অতি ক্ষীণ আলোক বিশিষ্ট ছায়াপথ তৎকালের অধিবাসিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

বিজ্ঞান ছায়াপথের স্বপ্নময় প্রহেলিকা আবরণ উন্মুক্ত করিয়াছে। দূরবীক্ষণের আবিষ্কারের অব্যবহিত পরেই ছায়াপথের প্রকৃত তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু এ কথা কেহ মনে করিবেন না যে প্রাচীন অতিরঞ্জিত অলৌকিক পৌরাণিক কাহিনী অপেক্ষা বৈজ্ঞানিক তথ্য কোন অংশে কম বিস্ময়জনক। বিজ্ঞান ছায়াপথের যে রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছে তাহা বরং কবিকল্পনা হইতে অধিক আশ্চর্য্য ও কৌতূহলোদ্দীপক। বাস্তবিক এইখানেই **Truth is stranger than fiction**. সত্য কল্পনাকে অতিক্রম করিয়াছে।

গেলিলিও ছায়াপথ সম্বন্ধে যথার্থ তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বেও দুই একটী পণ্ডিত উহার অতি ক্ষীণ আভাস প্রদান করিয়াছিলেন।

আরিষ্টটল্ (Aristotle) ছায়াপথকে উজ্জ্বল বাষ্পরাশি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। ডিমোক্রিটাস্ (Democritus) প্রকৃত তথ্যের অনেকটা নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন ইহা (ছায়াপথ) দূরস্থিত তারকা-পুঞ্জ মাত্র। অতিশয় দূরে আছে বলিয়া তারকাগুলি পৃথক পৃথক দৃষ্টিগোচর না হইয়া কেবল ধূম্রবৎ শুভ্র দেখায়। কিন্তু ডিমোক্রিটাসের কথা তখন পরীক্ষা করিয়া দেখিবার কোনই উপায় ছিল না।

গেলিলিও দূরবীক্ষণের সাহায্যে বহু শতাব্দীর ঘনীভূত অন্ধকার দূরীভূত করিয়া প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই গেলিলিওর নিকট জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ অপরিশোধনীয় ঋণপাশে সম্বদ্ধ আছেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম দৌরবীক্ষণিক পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণিত করেন যে, এই বহু দূরস্থিত নক্ষত্রপুঞ্জের ক্ষীণ আলোকরেখাই ছায়াপথের সৃষ্টি করিয়াছে। গেলিলিও তাঁহার সেকেলে অতি নিকৃষ্ট দূরবীক্ষণদ্বারাই ছায়াপথে অগণিত নক্ষত্রপুঞ্জ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ছায়াপথটা সাদা মেঘের ন্যায় দেখায় এবং উহা আকাশের উত্তর হইতে দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন ছায়াপথের নক্ষত্রগুলি নিতান্ত ক্ষুদ্র তাই উহাদের আলোক এত হীনপ্রভ। ছায়াপথটী যে ক্ষীণালোক বিশিষ্ট তদ্বিষয়ে কোন সংশয়ই নাই। চন্দ্র-কিরণোদ্ভাসিত রজনীতে চন্দ্রের উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় ছায়াপথটী একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়। কৃষ্ণপক্ষেই ছায়াপথটী পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হয়। ছায়াপথের মৃদু আলোকে তৎপ্রদেশের দূরত্বই সূচিত হইতেছে। কিন্তু নক্ষত্রগুলিকে ক্ষুদ্র বলিয়া অনুমান করিবার কোনই কারণ নাই।

সূক্ষ্ম পরীক্ষাদ্বারা জানাগিয়াছে যে আমাদের সূর্য্যের ন্যায় বহু সংখ্যক বিরাট সূর্য্য ঐ ছায়াপথে বিরাজিত। সৌরজগতের মধ্যেই আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। সৌরজগতের বাহিরে অনন্ত আকাশের দূরবর্ত্তী নক্ষত্র সম্বন্ধে যে সামান্য আভাস পাওয়া গিয়াছে তাহাই আরব্য-উপন্যাসের গল্প হইতে অধিকতর বিস্ময়জনক এবং কৌতূহলোদ্দীপক। আমরা জানিতে পারি যে সুনীল আকাশে পরিদৃশ্যমান সাদা মেঘের ন্যায় পদার্থটী কোটি কোটি সুবৃহৎ নক্ষত্রনির্ম্মিত, এবং ঐ সকল নক্ষত্ররাজি আমাদের সূর্য্যের ন্যায় বিশাল এবং উজ্জ্বল।

আমাদের সৌর জগতের অন্তর্বর্ত্তী গ্রহ, উপগ্রহ, উল্কা, ধূমকেতু প্রভৃতির বিশালত্ব, দূরত্ব, গতি, প্রকৃতি, সুশৃঙ্খলা, এবং ঐক্য দর্শন করিলে বিস্ময়ে পুলকিত হইতে হয়। উপরোক্ত জ্যোতিষ্ক সমূহের অনেক তথ্য আজও অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে। কিন্তু আমাদের সৌর জগত যদিও বহু সংখ্যক সুবিশাল গ্রহ সম্বলিত হইয়া বিরাজিত রহিয়াছে তথাপি উহা অনন্ত আকাশের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র, অতি সামান্য। লক্ষ লক্ষ সৌর জগতের মধ্যে আমাদের সৌর জগত একটী অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। ছায়াপথের বিবরণে সৃষ্টির বিশালত্বের ক্ষীণ আভাস পাওয়া যাইবে।

ছায়াপথ একটী বৃত্তের ন্যায় পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া অনন্ত আকাশে বিরাজিত রহিয়াছে। আকাশে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা ছায়াপথের অর্দ্ধাংশ মাত্র দেখিতে পাই। ঠিক একটী বৃত্তের আধ খানা যেন আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে গিয়া মিলিয়াছে। পৃথিবী যদি কাচের ন্যায় স্বচ্ছ হইত তাহা হইলে পৃথিবীর ভিতর দিয়া আকাশের গায় ছায়াপথের অপরার্দ্ধও দেখিতে পাওয়া যাইত। দিনের বেলায়ও ছায়াপথ আমাদের মাথার উপর আসে কিন্তু প্রদীপ্ত সূর্য্যালোকে ক্ষীণজ্যোতিঃ ছায়াপথটী অদৃশ্য হইয়া থাকে।

আশ্বিন মাসের রাত্রে আটটা নয়টার সময়ই ছায়াপথ মাথার উপরে আসে। কিন্তু কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে রাত্রে ৭।৮ টার সময়ই ছায়াপথ মাথার উপর দেখিতে পাওয়া যায়। তারপর সন্ধ্যার সময়ই ছায়াপথ পশ্চিম দিকে হেলিয়া পড়ে। তখন শেষ রাত্রে উঠিয়া দেখিলে ছায়াপথের অপরার্দ্ধ পূর্ব্বাকাশে দৃষ্টি গোচর হয়। সুতরাং সহজেই বুঝা যাইতেছে যে ছায়াপথ পৃথিবীকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া আছে।

এখন যদি মনে করা যায় আমাদের সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল এবং বৃহৎ সূর্য্য দ্বারা

ছায়াপথটী নির্ম্মিত, তাহা হইলে সমগ্র ছায়াপথে কত সূর্য্য বিরাজমান! সম্ভবতঃ সেই সকল সূর্য্যের চারিদিকে বহু সংখ্যক গ্রহ ও প্রদক্ষিণ করিতেছে।

ছায়াপথের আমরা অতি ক্ষীণ আলোক রশ্মি মাত্র দেখিতে পাই। না জানি ছায়াপথের নক্ষত্রগুলি কত দূরে অবস্থিত। আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল ভ্রমণ করে। পণ্ডিতেরা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন এরূপ দ্রুতগামী আলোক ও সিগ্‌নি (Cygni 61) নামক নক্ষত্র হইতে পৃথিবীতে আসিতে দশবৎসরের অধিক সময় লাগে। এখন অনুমান করুন সিগ্‌নি কতদূরে অবস্থিত। কিন্তু এই সিগ্‌নি নক্ষত্র ও অপরাপর নক্ষত্রের তুলনায় অতি সন্নিকটে। সিগ্‌নি অপেক্ষা ৮।১০ গুণ দূরবর্ত্তী নক্ষত্রের সংখ্যা অনেক। ছায়াপথ উহাদের অপেক্ষাও বহু দূরে আছে।

ছায়াপথের নক্ষত্রগুলি আবার বহু স্তরে সন্নিবিষ্ট। সুতরাং সকল নক্ষত্র আমাদের পৃথিবী হইতে সমদূরবর্ত্তী নহে। একটী নক্ষত্রস্তরের পশ্চাতে আর একটী, তারপর আর একটী। এরূপ সহস্র সহস্র সূর্য্যের কত স্তর অনন্ত আকাশে লোকচক্ষুর অন্তরালে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই।

অসাধারণ মনীষা সম্পন্ন জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত হর্শেলের নাম সকলেই শুনিয়া থাকিবেন। হর্শেল একবার সংকল্প করিলেন, ছায়াপথটী ভেদ করিয়া দেখিবেন তাহার পরপারে কি আছে। উহার পশ্চাতে কি কেবল সীমাশূন্য আকাশ না সেখানেও নক্ষত্ররাজি বিরাজিত। অসাধারণ অধ্যবসায়শীল পণ্ডিত পার্শিয়ুস (Persius) নামক নক্ষত্রপুঞ্জের নিকটবর্ত্তী অতি অস্পষ্ট, সাদা মেঘের ন্যায় পরিদৃশ্যমান একটী নিহারিকার (Nebula) দিকে তাঁহার বিরাট দূরবীক্ষণ নির্দ্দেশ করিলেন। যে স্থানটী পূর্ব্বে সাদা মেঘের ন্যায় বোধ হইয়াছিল সেই স্থানে উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের ন্যায় অগণিত নক্ষত্ররাজি ফুটিয়া উঠিল। কি অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য! নক্ষত্রের পর নক্ষত্র, তারপর আবার নক্ষত্র।

সাধারণ দূরবীক্ষণদ্বারা পরীক্ষা করিলে সম্মুখের নক্ষত্রগুলি দৃষ্টিগোচর হয় উহার পশ্চাতে আবার সাদা মেঘ দেখা যায়। তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ দ্বারা প্রত্যক্ষ করিলে সেই সাদা মেঘখণ্ড অদৃশ্য হইয়া পড়ে এবং তৎস্থানে অসংখ্য নক্ষত্র বিরাজিত দেখিতে পাওয়া যায়। তখন আবার তাহার পশ্চাতে নূতন নিহারিকা দৃষ্ট হয়। এইরূপ নক্ষত্রের স্তরের পর নক্ষত্রের স্তর, তারপর আবার নক্ষত্রস্তর। এক স্তর হইতে অন্য স্তরের ব্যবধান কোটি কোটি মাইল।

হর্শেলের দৌরবীক্ষণিক দৃষ্টি (Telescopic vision) ছায়াপথের সমগ্র স্তর-ভেদ করিয়া গিয়াছিল। তিনি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন পশ্চাতে আর অস্পষ্ট সাদা মেঘবৎ কোন পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। নক্ষত্রসমূহের পশ্চাতে কেবল সীমাশূন্য অনন্ত বিস্তৃত সুনীল নভোমণ্ডল দেখা যাইতেছিল। হর্শেল তখন মনে করিলেন তাঁহার দৃষ্টি নক্ষত্ররাজ্য অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

"There was no haze behind ; the telescopic ray had shot entirely through the mighty distance and the clear deep heavens formed the back ground of the brilliant picture."

—The Orbs of Heaven.

এখন কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন হর্শেল যেখানে নক্ষত্ররাজ্যের সীমা-প্রদেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন উহার পশ্চাতে কি নক্ষত্ররাজ্য থাকিতে পারে না? হর্শেলের দূরবীক্ষণ হইতে আরও উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ নির্ম্মিত হইলে নূতন নক্ষত্ররাজ্য আবিষ্কৃত হওয়া কি অসম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সুকঠিন ব্যাপার। গেলিলিও প্রথম আবিষ্কার করেন যে ছায়াপথটী আর কিছুই নহে ইহা কেবল দূরস্থিত অদৃশ্য নক্ষত্ররাজির ক্ষীণ আলোকরেখা মাত্র। তিনি তাঁহার দূরবীক্ষণ সাহায্যে কেবল সন্নিকটবর্ত্তী নক্ষত্রগুলিই দর্শন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য গেলিলিও যে যন্ত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা অতি সাধারণ ছিল। তারপর যখন ভাল দূরবীক্ষণ নির্ম্মিত হইতে লাগিল তখন ছায়াপথে নক্ষত্রস্তরের পর নক্ষত্রস্তর আবিষ্কৃত হইল। ভবিষ্যতে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আরও উন্নতি হইলে হর্শেলের সীমান্ত প্রদেশের পশ্চাতে নূতন ছায়াপথ দৃষ্টিগোচর হওয়া বিচিত্র নহে।

হর্শেল যে পর্য্যন্ত ছায়াপথের সীমা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন সেই পর্য্যন্ত ছায়াপথের গভীরতা কত? অর্থাৎ কতটা নক্ষত্রস্তর ছায়াপথে অবস্থিত? এই প্রশ্নের উত্তরে হর্শেল বলিয়াছেন, ছায়াপথের কোন কোন স্থানে পাঁচ শত সূর্য্যেরও অধিক স্তরে স্তরে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। একটা বিরাট সূর্য্যের পর আর একটা, তারপর আর একটা, এইরূপে পাঁচ শত সূর্য্য কোটি কোটি মাইল দূরে দূরে সাজাইতে হইলে কত স্থানের আবশ্যক তাহা কল্পনা করাও অসাধ্য।

এখন সূর্য্যের সমীপবর্ত্তী নক্ষত্রটীর আনুমানিক দূরত্ব নির্দ্ধারণ করা যাক। তাহা হইলে ছায়াপথের গভীরতার ক্ষীণ আভাস পাওয়া যাইবে। যে সূর্য্য আমাদের পৃথিবী হইতে এক কোটি নব্বই লক্ষ মাইল দূরে, সেই সূর্য্য হইতে

পৃথিবীতে আলোক আসিতে মাত্র ৮ আট মিনিট সময় লাগে। কিন্তু স্নেই সন্নিহিত নক্ষত্র হইতে পৃথিবীতে আলোক আসিতে ১০ বৎসরের অধিক সময় লাগে! দূরত্বটা অঙ্কে প্রকাশ করা সহজ বটে কিন্তু হৃদয়ঙ্গম করিবার কাহারও সাধ্য নাই। এতটা ব্যবধান মাঝে রাখিয়া পাঁচ শত সূর্য্য পর পর সাজাইলে ছায়াপথের গভীরতা নির্ণিত হইবে। *

আমরা যদি অদ্য রাত্রে উড়িয়া গিয়া অতি সন্নিকটবর্ত্তী নক্ষত্রগুলির কোন একটায় পৌছিতে পারিতাম তাহা হইলে অনেক অলৌকিক দৃশ্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হইত। আমাদের গতি প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী মাইলের ন্যূন হইলে পথেই পরমায়ু শেষ হইয়া যাইবে। সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী মাইল গতিতে ছুটিলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের মঙ্গল, শুক্র, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহ একটীর পর একটী করিয়া ক্রমে সকলগুলি অদৃশ্য হইয়া যাইবে। সূর্য্যদেব ক্রমে ক্ষুদ্র হইয়া অতি সামান্য নক্ষত্রে পরিণত হইবেন। আবার আমাদের সম্মুখে নূতন গ্রহ, উপগ্রহ, সূর্য্য দৃষ্টিগোচর হইবে। সেই স্থান হইতে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিলে চির পরিচিত কালপুরুষ, বৃষ, সিরিয়াস প্রভৃতি নক্ষত্রপুঞ্জকে তেমনি ক্ষুদ্র দেখিতে পাওয়া যাইবে। উহাদের আয়তন কিম্বা ঔজ্জ্বল্য একটুকও বৃদ্ধি পাইবে না। অথচ আমরা ২০ লক্ষ কোটি মাইল নিকটবর্ত্তী হইয়াছি। ঐ সকল নক্ষত্রপুঞ্জের দূরত্বের তুলনায় ২০ লক্ষ কোটি মাইল হাজার অংশের এক অংশ হইতেও কম; তাই উহাদের আকার কিম্বা উজ্জ্বলতার কোন পার্থক্য হয় না।

কিন্তু এখানেই বিধাতার সৃষ্টিরহস্যের পরিসমাপ্তি হইল না। ছায়াপথই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের শেষসীমা নহে। ব্রহ্মাণ্ডের সীমা কোথায় তাহা বলিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণের আবিষ্কারের সহিত ভগবানের সাম্রাজ্য দিন দিন বিস্তৃত হইতেছে। নূতন নূতন অদৃশ্যজগত দৃষ্টিগোচর হইতেছে। জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ বলেন যে, আমরা যদি ছায়াপথ অতিক্রম করিয়া যাই, এবং সেই স্থান হইতে সম্মুখে দৃষ্টিপাত করি তাহা হইলে কেবল

---

* The depth of the milky way was such that no less than five hundred stars were ranged one behind the other in a line each separated from the other by a distance equal to that which divides our Sun from the nearest fixed stars.

—The Orbs of Heaven.

অন্ধকার, সূচীভেদ্য গভীর অন্ধকার আমাদের দৃষ্টিগোচর হইবে। দূরবীক্ষণ সাহায্যে যদি সেই অন্ধকারের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তাহা হইলে আবার আর একটী ছায়াপথ প্রত্যক্ষ হইবে। * সেই স্থান হইতে কোটি কোটি মাইল সম্মুখে অগ্রসর হইয়া যদি আবার দূরবীক্ষণের সাহায্যে দৃষ্টিপাত করা যায় তাহা হইলে এক অভিনব আশ্চর্য্য জ্যোতির্ম্ময় বিশাল বিশ্ব প্রকাশ পাইবে। বামে চাও অগণিত সূর্য্য, দক্ষিণে চাও সূর্য্য, ঊর্দ্ধে নিম্নে যে দিকে চাও সেই দিকেই কেবল বিরাট জ্যোতিষ্কপুঞ্জ! সীমা নাই, অন্ত নাই—সূর্য্যের পর সূর্য্য, সৌরজগতের পর সৌরজগত। †

হর্শেল বলিয়াছিলেন, যে নক্ষত্রপুঞ্জ হইতে আলোক আসিতে ৩৫০০০০ তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বৎসর লাগে সেই নক্ষত্র পুঞ্জ ও তাঁহার দূরবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্টি হয়। আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ একলক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল গমন করে। একুনে হিসাব করিয়া দেখুন হর্শেলের দূরবীক্ষণের দৃষ্টি কত দূর যায়? কিন্তু লর্ড রসের (Lord Rosse) দূরবীক্ষণের তুলনায় হর্শেলের দূরবীক্ষণও অতি সাধারণ। লর্ড রসের দূরবীক্ষণের ক্ষমতা হর্শেলের দূরবীক্ষণের দশ গুণ! সেই সুপ্রসিদ্ধ দূরবীক্ষণ দ্বারা দৃষ্টিপাত করিলে সুদূর আকাশে কতগুলি শুভ্র মেঘ দেখিতে পাওয়া যায়। সেইটীও বোধ হয় আর একটী ছায়াপথ! তাহার মধ্যে হয় তো কোটি কোটি সূর্য্য বিরাজিত। বিশ্বকর্ত্তার বিরাট সাম্রাজ্যে কত নিগূঢ় রহস্য অনুদ্ঘাটিত রহিয়াছে তাহার অন্ত নাই। বিজ্ঞান দিন দিন বিশ্বনিয়ন্তার অপার মহিমা জগত সম্মুখে প্রচার করিতেছে।

---

* We are thus brought into the presence of star-clouds as mysterious to ourselves as the star-clouds of the galaxy were to the astronomers of the old. —The Expanse of the Heaven.
Proctor

† "Insufferable is the glory of God. Let me lie down in the grave and hide me from the persecution of the infinite, for End, I see there is none!"

চতুরঙ্গ ক্রীড়া।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ হইতে বহু উপাখ্যান দেশান্তরে প্রচলিত হইয়াছে; পরে পুনঃ তাহার কোন কোন উপাখ্যান নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন সহ বৈদেশিক উপাখ্যান বলিয়া এদেশে নববেশে উপস্থিত হইয়াছে। অনেকে কাজির বিচারের উপাখ্যান অবগত আছেন। কথিত আছে, একদা একজন কাজির সমীপে দুইজন স্ত্রীলোক উপস্থিত হয়; তাহারা প্রত্যেকেই একটি শিশুর জননী বলিয়া কাজির নিকট ঐ শিশুকে পাইবার দাবি করে। ইহাদের মধ্যে কে উক্ত শিশুর জননী, কাজি তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ পান্ নাই। এ অবস্থায় কাজি আদেশ করিলেন যে একখানা অসি দ্বারা শিশুকে দুইভাগ করিয়া প্রত্যেক স্ত্রীলোককে শিশুর অর্দ্ধাংশ দিতে হইবে। উক্ত স্ত্রীলোকদ্বয় মধ্যে যে শিশুর প্রকৃত জননী, সে কাজির আদেশ শ্রবণ মাত্র রোদন করিতে আরম্ভ করিল এবং বলিল যে আমি শিশুর অর্দ্ধাংশ চাই না, শিশুকে দ্বিভাগ করার প্রয়োজন নাই; শিশুটীকে অপর স্ত্রীলোককে দেওয়া হউক। শিশুর জননীকে এই সত্য নির্ণয় করার জন্য কাজি প্রথমোক্ত আদেশ করেন বাস্তবিক শিশুকে দ্বিভাগ করা কাজির প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল না। এই ঘটনার পরে কাজি আদেশ করিলেন যে, যে রোদনকারী স্ত্রীলোক শিশুর প্রকৃত জননী এবং সেই শিশুকে পাইবে।

মুসলমান নরপতিগণের সময়ে এদেশে এই কাজির বিচারের উপাখ্যান প্রচলিত হয়। বাস্তবিক বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থে এই উপাখ্যানের মূল দৃষ্ট হয়।* বৌদ্ধজাতক গ্রন্থ বহু উপাখ্যানে পরিপূর্ণ। বৌদ্ধগণের নিকট হইতে য়িহুদিগণ কিঞ্চিৎ নববেশ প্রদান করিয়া এই উপাখ্যান গ্রহণ করেন। য়িহুদিগণের গ্রন্থে এই উপাখ্যান দৃষ্ট হয়। বাইবেলে য়িহুদিরাজ সোলেমানের এইরূপ বিচার লিখিত আছে। † য়িহুদিগণ হইতে আরবগণ এই উপাখ্যান গ্রহণ করেন। আরবগণ ইহা মুসলমান সমাজে প্রচলিত করেন পরে তাহা পুনঃ নববেশে ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছে।

এইরূপ ভারতবর্ষীয় বহুক্রীড়াও দেশান্তরে প্রচলিত হয়। পরে তাহা পুনঃ নববেশে আগমন করিয়াছে। চতুরঙ্গ ক্রীড়ার উৎপত্তি ভারতবর্ষে। এদেশ হইতে তাহা দেশান্তরে গমন করিয়া পুনঃ নববেশে ইহা এদেশে আগমন করিয়াছে।

---

* India what can it teach us দেখ।

† I Kings IV 16–21.

লঙ্কেশ্বর রাবণ অতিশয় সমর প্রিয় ছিলেন। সর্ব্বদা সমরে নিযুক্ত থাকা সুকঠিন এজন্য তদীয় রাজ্ঞী মন্দোদরী সমরাভিলাষ পূরণ করার জন্য সমরক্রীড়া প্রচলন করেন। * এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে।

ভারতবর্ষীয় প্রাচীন শাস্ত্রানুসারে সৈন্যের চারি অঙ্গ যথাঃ—'হস্ত্যশ্বরথপদাতি' হস্তী, অশ্ব, রথ এবং পদাতি। অর্থাৎ হস্ত্যারোহী সৈন্য, অশ্বারোহী সৈন্য, রথারোহী সৈন্য এবং পদাতি সৈন্য। এই ক্রীড়াতে প্রাচীনকালে হস্তী, অশ্ব, রথ এবং পদাতি সৈন্য এবং রাজা ছিলেন, এজন্য ইহা চতুরঙ্গ ক্রীড়া নামে খ্যাত হয়। পরে রথের স্থানে ভারতবর্ষেই নৌকা প্রচলিত হয়। ভবিষ্য পুরাণে ব্যাস যুধিষ্ঠির সংবাদে এই ক্রীড়ার বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। বঙ্গ দেশীয় প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রণীত স্মৃতিতত্ত্বে ভবিষ্য পুরাণের এই অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। † ভবিষ্য পুরাণের বৃত্তান্তে রথ স্থলে তরি দৃষ্ট হয়। ভবিষ্য পুরাণ লঙ্কেশ্বর রাবণের পরবর্ত্তী গ্রন্থ ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কারণ সমস্ত পুরাণ যদি মহর্ষি বেদব্যাস রচিত বলিয়া স্বীকার করা যায় তথাপি মহর্ষি বেদব্যাস রাবণের বহুকাল পরবর্ত্তী এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। অতএব ভবিষ্য পুরাণ প্রকৃত প্রস্তাবে মহর্ষি রচিত কি না এ প্রশ্ন এখানে উপস্থিত হয় না।

পারস্য দেশে ফার্দ্দুসি নামে ভুবনবিখ্যাত একজন কবি ছিলেন। তিনি "সাহানামা" নামক মহা-কাব্য রচনা করেন। সাহানামাতে প্রাচীন সাময়িক পারসিক নরপতি কইখসরু (Cysces) এবং তাহার বংশধরগণের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। ফার্দ্দুসি গজনীর অধিপতি সুলতান মামুদের সমকালবর্ত্তী।

সাহানামাতে লিখিত আছে পারসিক সম্রাট নর্শিবানের রাজত্ব সময়ে এই ক্রীড়া ভারতবর্ষ হইতে পারস্য দেশে প্রচলিত হয়। সম্রাট নর্শিবান অতি ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তিনি সাধারণতঃ অতি ন্যায়পরায়ণ নর্শিবান (Nourshivan the Just) বলিয়া কথিত হন। তাঁহার রাজত্ব সময়ে আরব দেশে হজরত মহম্মদ জন্মগ্রহণ করেন।

কান্যকুব্জ প্রদেশ হইতে একজন আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিত নর্শিবানের রাজধানীতে গমন করেন। তিনি নর্শিবানের সভাসদ্ ছিলেন। পারসিকগণ অথবা আরবগণের কোন চিকিৎসা শাস্ত্র প্রণয়ন করা অবগত হওয়া যায় না। অদ্যাপি

---

* Asiatic Resareaches Vol II 122.

† (৩) তিথিতত্ত্ব বেপজাগর কৃত্যম্।

মুসলমানগণ য়ুনানী চিকিৎসকগণের মতানুসারে চিকিৎসা করেন। এ জন্য অতি প্রাচীনকাল হইতে পারসিক এবং আরবীয় নরপতিগণ বিদেশ হইতে চিকিৎসক আনয়ন করিতেন। পারসিক সম্রাট আর্টজারক্সিশের সভায় য়ুনানী পণ্ডিত টিসিয়স্ চিকিৎসক ছিলেন। তিনি পারস্য দেশ হইতে ভারতের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ভারতবৃত্তান্ত সম্বন্ধে ইণ্ডিকা নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। সম্রাট নর্শিবানের সভায় ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ জনৈক পণ্ডিত সভাসদ্ ছিলেন। সম্রাট হারুণলরসীদের সভায় দুই জন ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। সম্রাট হারুণলরসীদ মুসলমানদিগের 'বিক্রমাদিত্য'।

সম্রাট নর্শিবানের সভাসদ্ ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিত পারস্য দেশে চতুরঙ্গ ক্রীড়া প্রচলন করেন। তথায় এই ক্রীড়া চৎরঙ্গ ক্রীড়া বলিয়া কথিত হইত। আরবগণ পারস্যদেশ অধিকার করার পরে তাঁহারা এই ক্রীড়া শিক্ষা করেন। আরবগণের বর্ণমালাতে সংস্কৃত বর্ণমালার অনুরূপ কোন কোন অক্ষর নাই। এজন্য আরবগণ চতুরঙ্গকে সৎরঙ্গ ক্রীড়া বলিয়া অভিহিত করেন। আরবগণ ইহা ইয়োরোপে প্রচার করেন। কালক্রমে বৃটনদ্বীপে এই ক্রীড়া প্রচলিত হয় তথায় বহু ভাষান্তর হইয়া চতুরঙ্গ Chess নামে অভিহিত হইয়াছে। পরে পুনঃ নববেশে এই ক্রীড়া ভারতে দাবাখেলা বলিয়া প্রবেশ করিয়াছে। বাস্তবিক ইদানীং প্রচলিত দাবাখেলা চতুরঙ্গ ক্রীড়ার রূপান্তর।

আমরা এইক্ষণ ভবিষ্যপুরাণ হইতে এই ক্রীড়ার বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেছি।

ভবিষ্য পুরাণে ব্যাস যুধিষ্ঠির সংবাদে।

যুধিষ্ঠির উবাচঃ—

অষ্টকোষ্ঠ্যাঞ্চ যাক্রীড়া তাংমেব্রূহি তপোধন।

হে তপোধন! অষ্টকোষ্ঠ ক্রীড়ার বৃত্তান্ত আমাকে বলুন।

ব্যাস উবাচঃ—

অষ্টৌ কোষ্ঠান্ সমালিখ্য প্রদক্ষিণ ক্রমেন তু।
অরুণং পূর্ব্বতঃকৃত্বা দক্ষিণে হরিতং বলং
পার্থ পশ্চিমতঃ পীতমুত্তরে শ্যামলং বলং।
রাজ্ঞোবামে গজংকুর্য্যাৎ তস্মাদশ্বং ততস্তরিং॥
কুর্য্যাৎ কোষ্ঠেষু পুরতোযুদ্ধেপত্তিচতুষ্টয়ং।
কোণে নৌকা দ্বিতীয়েহশ্বঃ তৃতীয়ে চ গজোবসেৎ॥
তুরীয়েচবসেদ্রাজা বটিকা পুরতঃ স্থিতাঃ।

*　*　*　*　*

কোষ্ঠমেকংবিলঙ্ঘ্যাথ সর্ব্বতো যাতি ভূপতিঃ।
অগ্রএব বটী যাতি বলংহন্ত্যগ্র কোণগম্॥
যথেষ্টং কুঞ্জরো যাতি চতুর্দ্দিক্ষু মহীপতে।
তির্য্যক্‌তুরঙ্গমো যাতি লঙ্ঘয়িত্বা ত্রিকোষ্ঠকাম্।
কোণ কোষ্ঠদ্বয়ংলঙ্ঘ্য ব্রজেন্নৌকা যুধিষ্ঠির।

হে কৌন্তেয়! চতুর্দ্দিকে অষ্ট কোষ্ঠ অঙ্কিত করিয়া তাহার পূর্ব্বভাগে অরুণ বর্ণ বল, দক্ষিণ ভাগে হরিত বর্ণ বল, পশ্চিম ভাগে পীত বর্ণ বল, এবং উত্তর ভাগে শ্যামল বর্ণ বল স্থাপন করিতে হইবে। রাজার বামে গজ, তাহার বামে অশ্ব, এবং তাহার বামে তরি স্থাপন করিবে। হে কৌন্তেয়! ইহাদিগের প্রত্যেকের অগ্রে এক এক বটিকা স্থাপন করিবে। অর্থাৎ প্রথমতঃ কোণে নৌকা দ্বিতীয়ে অশ্ব, তৃতীয়ে গজ, চতুর্থে রাজা স্থাপন করিবে এবং ইহাদের অগ্রে চারিটি বটীকা স্থাপন করিবে।

রাজা সর্ব্বদিকে এক এক কোষ্ঠ অতিক্রম করিয়া গমন করেন। বটীকা অগ্রে এক কোষ্ঠ গমন করে; কিন্তু বল হনন করিতে অগ্রভাগে কোণদিকে গমন করে। গজ চতুর্দ্দিকে যথেষ্ট গমন করে। অশ্ব তির্য্যগ্‌ভাবে তিন কোষ্ঠ গমন করে। নৌকা কোণ কোষ্ঠদ্বয় লঙ্ঘন করিয়া গমন করে।

ইদানীন্তর দাবা খেলাতে মন্ত্রী প্রাচীন সাময়িক হস্তীর গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ইদানীন্তন দাবা খেলাতে পঞ্চরঙ্গ, নবরঙ্গ পিলের বিয়ে ইত্যাদি খেলা প্রচলিত আছে প্রাচীন সাময়িক দাবা খেলাতে সিংহাসন চতুরাজী ইত্যাদি খেলা প্রচলিত ছিল। এ বিষয়ে আর অধিক বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করা নিষ্প্রয়োজন। পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের তিথিতত্ত্ব পাঠ করিবেন।

শ্রীরেবতীমোহন গুহ।

ঈশ্বরজ্ঞান।

আমরা জন্ম হইতেই ক্ষুধা তৃষ্ণার ন্যায় ঈশ্বরজ্ঞান প্রাপ্ত হই নাই। ঈশ্বর জ্ঞান আমাদিগের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলির ক্রমিক বিকাশ ও পরিস্ফুটনের অবশ্যম্ভাবী ফল। সমাজ তাহার ক্ষেত্র। মানব হৃদয় তাহার কর্ষক। মানবেরদ্বারা জগতের অন্যান্য সত্য উদ্‌ঘাটনের ন্যায় ঈশ্বর-জ্ঞানও একটী আবিষ্ক্রিয়া;

তৎকারণ ইহা শিক্ষা সাপেক্ষ। শিক্ষার ভিত্তি জ্ঞান। অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের সমগ্র পদার্থের গুণ সমূহের পরস্পর সাম্য, পার্থক্য ও সমীকরণ ইত্যাদি মানসিক যাবতীয় ক্রিয়া কলাপ ও পর্য্যালোচনা জ্ঞানের কার্য্য। পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞানের ফলাকাঙ্ক্ষা বিশ্বাস। বহির্জগতের আধার স্থান; অন্তর্জগতের আধার কাল। স্থান ও কাল অসীম ও অনন্ত নিত্যবাচক সংজ্ঞা বিশেষ। তৎকারণ আমরা স্থান ও কাল বর্জ্জন করিয়া কোন প্রকার দ্রব্যের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে সক্ষম নহি। এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে যাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় না বরং যাহার পরিবর্ত্তনই এই বিশ্বজগৎ সেই নিত্য, অবিদ্ধ, সূক্ষ্ম, মৌলিক পদার্থকে আমরা পরমাণু বলি। আধ্যাত্মিক জগতে মন যাহার পরিবর্ত্তন এবং যাহার কোন হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, সেই নিত্য, শুদ্ধ, চিন্ময় পদার্থ আত্মা নামে অভিহিত। অনন্ত পরমাণু যাহাতে বিদ্যমান, তিনি শক্তিরূপিণী প্রকৃতি। অনন্ত আত্মা যাহা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পুনরায় যাহাতে কেন্দ্রীভূত তিনি সেই বিরাট মহাপুরুষ পরমাত্মা এবং এই পরমাত্মা হইতে প্রকৃতি উদ্ভূত হইয়াছে।

অবিদ্ধ হইতে বিদ্ধ, সূক্ষ্ম হইতে স্থূল, ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ ইত্যাদির ক্রমিক বিকাশ বিবর্ত্তন বাদ। কোন শক্তিতে এই বিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে তাহা মানব জ্ঞানের অগোচর। জগতের এক মাত্র ধর্ম্ম রূপান্তর। প্রকৃতির বিনাশ ও শূন্য হইতে সৃষ্টি জ্ঞান বিরুদ্ধ। সংসারে প্রতি নিয়ত কত জীব জন্ম পরিগ্রহ করিতেছে আবার কতই বা মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য মৃত্যু কি? মৃত্যু কি প্রকৃত বিনাশ? আমার ইন্দ্রিয়গণ সমক্ষে মৃত দেহের রূপান্তর গোচরীভূত হইতেছে তবে কি দেহ হইতে বিযুক্ত অপূর্ণ বাসনাময় মনের বিলয় না হইয়া তাহার রূপান্তর প্রাপ্তি কি সম্ভবপর নহে? জন্মান্তর কর্ম্মবাদের অভিনব সোপান তৎকারণ অপূর্ণ বাসনা আবার পূর্ণ হইবে; অপূর্ণ দেহ আবার পূর্ণতা লাভ করিবে।

সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থা হইতে সৌর জগতের কার্য্য ও গতি সমভাবে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া আমাদিগের ইন্দ্রিয়গণের ভ্রান্তি দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয় কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও অনন্ত সৌর জগতের প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। জড়জগৎ ও অন্তর্জ্জগতের মধ্যে ব্যবধান আমাদিগের জ্ঞানের সংকীর্ণতার পরিচায়ক। চেতন ও অচেতন পদার্থের মধ্যে পার্থক্য বাসনার সুপ্তি ও পরিস্ফুটনের ক্রমিক অবস্থান্তর; বস্তুতঃ চিন্ময় ব্রহ্ম দ্বিতীয় পদার্থ আর বিদ্যমান নাই, এই প্রকার জ্ঞান হৃদয়ে উদ্রেক হইলে উক্ত

বৈষম্যভাব দূরীভূত হয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এইক্ষণ বদ্ধমানব কি উপায়ে বিশ্ব দেবতাকে জানিতে সক্ষম হইবে? জন্ম মৃত্যুর, অপূর্ব্ব রহস্য, প্রকৃতির বিচিত্রতা, কালের অনন্তত্তা প্রভৃতি, অপূর্ণ মানব হৃদয়ে আপনার ক্ষুদ্রত্বের ভাব আনয়ন করে। সেই ক্ষুদ্রত্বের ভাব হইতে মহান্ অজ্ঞাত বিষয় জানিবার বাসনা হৃদয়ে জাগ্রত হয়। সেই বাসনা বিস্ময়ের জন্মভূমি। বিস্ময় জ্ঞানের প্রবেশদ্বার। এই বিশ্ব চরাচর কেবল মাত্র ভগবানের মহিমা বিঘোষিত করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যদি জ্ঞানের দ্বারা সৃষ্টির অলৌকিক তত্ত্বগুলি প্রকাশিত না হইত তবে সৃষ্টির এ বিরাট ব্যাপার কে জানিত? অজ্ঞান মানব শিশু ভক্তি প্রণত হৃদয়ে কোন দেবতার উদ্দেশ্যে হৃদয় মন্দিরে আপনার দীনতার ভার অহরহঃ জ্ঞাপন করিতেছে? কেহ সবিতার জীবনদায়িনী দীপ্তিতে, হুতাশনের পাবকত্বে, বায়ুর প্রচণ্ড বিক্রমে, নীরদমালার অপরূপ বর্ষণ ও নির্ঘোষে, ঊর্ম্মিমালা বিরাজিত সমুদ্রের গাম্ভীর্য্যে, তুষার ধবল পর্ব্বত রাজির বিরাট সৌন্দর্য্যে, নীলিম আকাশের নগ্ন গরিমায়, শারদী করবীর শুভ্র কমনীয় মাধুরীতে, আলোক বিকশিতাঙ্গী ঊষার প্রথম কিরণ রেখায়, সেই দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া হৃদয় অর্ঘ প্রদান করিতেছে। পৃথিবীর ধর্ম্ম স্থাপয়িতা মহাপুরুষগণ তপস্যা ও সাধনার অলৌকিক শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া যে যে প্রকার ঈশ্বর জ্ঞানের আদর্শ সকল সমাজের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন, সেই সেই আদর্শ অনুসারে জগতের অধিকাংশ নরনারী পরিচালিত হইতেছে অধিকন্তু কেহ কেহ নিজ কল্পনানুযায়ী ঈশ্বর রচনা পূর্ব্বক প্রীতমনে তদুপাসনা করিতেছে। কোন সম্প্রদায়ের নিকট অনন্ত স্বর্গরাজ্যে সমাসীন মনুষ্য ধর্ম্মী পরন্তু পাপ পুণ্যের দণ্ড ও পুরস্কারদাতা এক বিরাট মহাপুরুষ ঈশ্বররূপে পূজিত। আবার কেহবা অসীম মহাকালে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব সমগ্র গুণ রাশির সমষ্টি ১ ঈদৃশ জ্ঞানময় নিরাকার মহাশক্তিকে সেই দেবতাজ্ঞানে আরাধনায় ব্রতী হইয়াছে।

অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি পরমেশ্বরকে হৃদয়-মন্দিরে ধারণা করিতে অসমর্থ হইয়া, অনেক নরনারী তাঁহার রূপ মৃতদেহে, ঘটে, পটে, শিলাখণ্ড ও বৃক্ষ ইত্যাদিতে পরিকল্পিত করিয়া ভক্তিভাবে পূজা করিতেছে। এবম্বিধ মনুষ্যজ্ঞানের সহায়তায় ঈশ্বরকে নিরাকরণ করিতে যাইয়া এ সংসারে এত মতভেদ ও নানাপ্রকারের ঈশ্বরবাদ আবিষ্কৃত হইতেছে। অধিকন্তু এই জ্ঞানের এমত একটী অবস্থা বিদ্যমান আছে যাহার ক্রিয়া সম্পূর্ণ বিপরীত! ইহা হইতেই অবিশ্বাসের জন্ম। অবিশ্বাস হইতে নিরীশ্বরবাদ প্রচারিত হইতেছে। এ অবস্থা

মনুষ্যহৃদয়ে ব্যাধি বিশেষ। এই ব্যাধি হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত জগতের অধিকাংশ নরনারী শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষদিগকে ঈশ্বরজ্ঞানের পূজা করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করে। ঈশ্বর যদি সকলের আরাধনীয় তবে সংসারে এত ধর্ম্মভেদ কেন ?

জ্ঞান দ্বিবিধ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত। ব্যক্ত জ্ঞান অনিত্য এবং নৈমিত্তিক। পার্থিব সমুদায় জ্ঞান ব্যক্ত তৎকারণ ভ্রান্তিমূলক। দীপ শিখার সহায়তায় সহস্রাংশুর অন্বেষণ যেরূপ হাস্যাস্পদ, মানবীয় জ্ঞানের দ্বারা পরমেশ্বরকে নিরাকরণ সেইরূপ চপলতা পরিচায়ক ও অসম্ভব। পৌরষেয় জ্ঞান ব্যক্ত এবং অপৌরষেয় জ্ঞান অব্যক্ত এইক্ষণ বেদ কোন প্রকার জ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত ইহাই বিচার্য্য। বেদে ঈশ্বর, প্রকৃতি, মানব এই ত্রয়ের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণীত হইয়াছে বেদ পৃথকরূপে প্রকৃতি শক্তির উপাসনা এবং সমবেত শক্তি বিশ্বদেবতা ও দেবতা ব্রহ্মের উপাসনা এবং আত্মাই ব্রহ্ম ইত্যাদি মহা সত্যগুলি প্রকীর্ত্তিত করে। পৌরুষেয় যুক্তি এবং দর্শন ব্যক্তজ্ঞানের অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীল বহির্জগত ও অন্তর্জগতের যাবতীয় ক্রিয়া কাণ্ডের আধার সুতরাং অনিত্য। বেদ, ব্যক্তজ্ঞানের যুক্তি ও দর্শনমূলক হইলে, যুক্তি ও দর্শনের সারত্ব ও অসারত্ব অনুসারে উৎকর্ষতা ও অপকর্ষতা প্রতিনিয়ত প্রাপ্ত হইত। তাহা হইলে যুক্তি ও দর্শনের ন্যায় বেদের নিরন্তর পরিবর্ত্তন ঘটিত। নিত্য চিন্ময় পদার্থের পরিবর্ত্তন জ্ঞান বিরুদ্ধ। কেনোপনিষদে কথিত হইয়াছে যিনি বিশ্বসংসারের স্রষ্টা বলিয়া পূজিত হইতেছেন তিনিও পরিমিত বস্তু, তিনি ব্রহ্ম নহেন। ইহাতে আমরা বুঝিতে পারি, ব্রহ্ম অসামান্য মানবকল্পনাতীত। ব্যক্ত জ্ঞানেরদ্বারা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাকে নির্গুণ, অজ্ঞেয় ইত্যাদি মানব কল্পনাতীত অর্থহীন বাক্যের দ্বারা আমরা বর্ণনা করি। অনন্ত সূর্য্যপ্রভা বিনিন্দিত ভগবান আপনার দীপ্তিতে আপনি চিরপ্রকাশিত। মুমুক্ষু মানব হৃদয়ে সংযম বিশ্বাস সাধনা দীক্ষা, নিষ্ঠা ভক্তি ও জ্ঞানযোগে ভগবৎ কৃপায় সেই বিমল কিরণে আলোকিত হইয়া ব্রহ্মময় হন। বেদ যে সময় প্রচারিত হইয়াছিল তৎকালে ব্যক্ত জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা ঋষিগণ প্রাপ্ত হন নাই অথচ অব্যক্ত জ্ঞান প্রচার করিয়াছেন। ইহাতে কেবল মাত্র ঐশীমহিমা প্রকীর্ত্তিত করে। ঐশী মহাশক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া ঋষিগণ কর্ত্তৃক বেদ সত্য প্রচারিত হইয়াছে। মহর্ষি কপিল ব্যক্ত জ্ঞানে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণে অসমর্থ হইয়া বেদের অপৌরষেয়তা প্রমাণ করিয়াছেন। বেদ, অব্যক্ত জ্ঞান প্রতিপাদক আপ্ত বচন।

যাহা আপ্ত বচন তাহা সত্য। সত্য অনাদি ও নিত্য, বেদ নিত্য ও অনাদি। পুরাণে কথিত আছে যখন সমগ্র ভুবন প্রলয় পয়োধি জলে নিমগ্ন হইয়াছিল তৎকালে ভগবান ঊর্দ্ধে হস্ত প্রসারিত করিয়া কেবল মাত্র বেদ রক্ষা করিয়া কহিয়াছিলেন, সমগ্র জঙ্গমাত্মক বিশ্বসংসার সলিলাভ্যন্তরে নিমজ্জিত হউক। একমাত্র বেদ রক্ষিত হইলে সমুদায় আবার সঞ্জীবনী শক্তিতে উদ্ভূত হইবে। কারণ বেদ সত্য। সত্যে পৃথিবী স্থিত।

যখন ভারতবর্ষে বেদ প্রচারিত হইয়াছিল তখন আমরা প্রকৃতি-শক্তি অগ্নি বায়ু, মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, সবিতা অশ্বিদ্বয় ঊষা, পুষা, মাতরিশ্বা, সরস্বতী প্রভৃতি দেব দেবীর সরলতা পূর্ণ চিত্তদ্রাবী উপাসনা গীতি দেখিতে পাই। তৎপর যাঁহাকে ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ জানিতে অক্ষম হইয়াছিলেন এবং যাঁহার শক্তিতে উক্ত দেবগণ শক্তি সম্পন্ন এবং যিনি হৈমবতী উমা কর্ত্তৃক প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিলেন সেই দেবতাদি দেবতা সহস্রশীর্ষ বিরাট মহাপুরুষ একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারিত হইল। একামেবাদ্বিতীয়ং এর অর্থ সংখ্যাশাস্ত্র পরিজ্ঞাপক নহে, ইহার অর্থ পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য দ্বিতীয় পদার্থ আর বিদ্যমান নাই অর্থাৎ সকলই ব্রহ্মময়। পরমেশ্বর এক কিম্বা দুই কিম্বা ত্রিশ কোটী হইলেও তিনি ঈশ্বর তাঁহার আর ঈশ্বর নাই। তৎপর আবার সেই ব্রহ্ম সত্ব, রজ, তমঃ এই ত্রয় গুণে বিভক্ত হইয়া অসংখ্য বিভিন্ন ভাবে পুজিত হইতেছেন; এবম্বিধ উপাসনাও পৌত্তলিকতা নহে। প্রকৃত পৌত্তলিকতা অধিকাংশ পাশ্চাত্য এবং অন্যান্য অসভ্য দেশে বিদ্যমান যথায় পাপ পুণ্যের অধিপতি ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বর এবং প্রেতও মনুষ্যকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিবার একমাত্র পন্থা বর্ত্তমান আছে। ব্রহ্ম জ্ঞানের নিগূঢ় তত্ত্ব আজিও তথায় অপ্রকাশিত। ব্রহ্ম জ্ঞান হিন্দুর অপার্থিব সম্পত্তি, এই মহাজ্ঞানের কণামাত্র অধিকারী হইয়া হিন্দু জাতি আজ জগতের শীর্ষস্থানীয়। তাহাতেই জার্ম্মাণ পণ্ডিত সোপেনার বিস্ময়ের সহিত বলিয়াছিলেন যে প্রকৃতির মহাসত্যে উপনীত হইতে পাশ্চাত্য জাতি আজিও অক্ষম; সেই মহাসত্যগুলি কি প্রকারে বিংশসহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যজাতির নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল! যেমন সন্তানের নিকট স্নেহময়ী জননীর কিছুই অদেয় থাকে না, তদ্রূপ প্রকৃতি দেবী স্বেচ্ছায় প্রীতিভরে আপনার যতকিছু রহস্য ভাণ্ডার আর্য্যজাতির নিকট সমর্পণ করিয়াছিলেন, কারণ প্রকৃতি দেবী আর্য্যজাতির জননী! আমরা পাশ্চাত্য জাতি প্রকৃতি দেবীর নিকট তাহার স্নেহ ও প্রীতি প্রত্যাশা করিতে পারি না। কারণ প্রকৃতি দেবী আমাদিগের বিমাতা। প্রকৃতির মহাসত্যগুলি আবিষ্কার করিতে

আমাদিগের এত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইতেছে, কারণ আমরা নিজেদের পরিশ্রম, অধ্যবসায়, গবেষণা ও উদ্যোগের উপর কেবল মাত্র নির্ভর করিতেছি; কিন্তু অপর কোথাও হইতে কোন সাহায্য পাইতেছি না।

তৎপর দ্বৈতবাদ। জীবাত্মা সাধনার বলে প্রতিনিয়ত পরমাত্মার সমীপস্থ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে কখনও বিলীনপ্রাপ্ত হইতে পারে না। জীব জন্ম হইতেই পাপী ও ভগবান পুণ্যময়, এবং জীবের পাপ হইতে মুক্তি একমাত্র চরম লক্ষ্য, ইত্যাদি মত ইহা পরিব্যক্ত করে। কিন্তু ইহাতে পাপের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ দেখিতে পাই না। দ্বৈতবাদ জগতের অধিকাংশ ধর্ম্মের ভিত্তি।

প্রকৃতপক্ষে স্বর্গ ও নরক কল্পিত অসার কিম্বদন্তী। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া একমাত্র বিশ্বের ধর্ম্ম। ধর্ম্মগুরু স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, মনুষ্যের মধ্যে যে মহাশক্তি প্রসুপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান আছে তাহা সম্যক্‌রূপে বিকাশপ্রাপ্ত হইলে, মানুষ পূর্ণত্ব লাভ করে। অর্থাৎ সোহং জ্ঞানবলে ব্রহ্মময় হয়। সেই মহাশক্তি বিকাশের একমাত্র পন্থা ভগবানে আত্ম সমর্পণ অর্থাৎ যোগ। বেদ প্রচারিত, একমেবাদ্বিতীয়ং আত্মাই ব্রহ্ম, ও সোহং জ্ঞান জীবের নির্ব্বাণ ও মোক্ষ। কিন্তু আমরা অযাচিত ভাবে এ ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইয়াও ইহা অবলীলাক্রমে বিসর্জ্জনপূর্ব্বক মনুষ্যত্ব হারাইতেছি।

দর্পশীল পশুবল এ মহাশক্তির নিকট অকিঞ্চিৎকর ও তুচ্ছ। আবার ভারতবর্ষ হইতে সত্য ধর্ম্মের গরীয়সী মহিমা সমগ্র ভুবনে প্রচারিত হইয়া নবীন সার্ব্বজনীন ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপিত হইবে ইহাই সম্ভবতঃ যুগধর্ম্ম।

শ্রীপ্রমোদকান্ত বসু।

বন্দনা।

প্রেম, প্রীতি পুণ্য স্নেহ পূর্ণ নারায়ণ,
নিত্য প্রভু নাহি তাঁর জনম মরণ
সত্যরূপ ব্রহ্ম প্রভু অব্যয় অক্ষয়
কালরূপ মহা অস্ত্র তার হাতে রয়।
ধার্ম্মিক জনের ধর্ম্মে প্রভু সপ্রকাশ,
আদি অন্ত মাঝে হয় ঈশ্বরের বাস।

ইন্দ্রিয় নিয়ন্তা প্রভু অতীব উত্তম,
তাহাতেই হবে লয় উৎকৃষ্ট অধম।
বিঘ্ন নাশি বিষ্ণু কৃষ্ণ পাপের অজেয়,
প্রভুর অসীম শক্তি নহে পরিমেয়।
জড় ও অজড় সৃষ্টি তিনিই সংহার
ক্ষমা দম; ঈশ সর্ব্ব সৃজন তাঁহার।
নিশ্চয়াত্মা জ্ঞান স্বর্গ শান্তির কারণ
পদ্মনাভ পদ্ম অক্ষি উজ্জ্বল বরণ।
সহস্রৈক শাখাধারী বেদের স্বরূপ,
শতশীর্ষ শতবাহু ব্রহ্মাণ্ডের ভূপ।
জগতের মূল স্রষ্টা সিদ্ধ সাধ্যাশ্রয়,
তাহাতেই মহামগ্ন আছে সমুদয়।
সকলের শীর্ষ প্রভু প্রীতি পরাৎপর,
জন্ম মৃত্যু তাঁর হয় সর্ব্ব অগোচর।
নীচে উচ্চে সমভাবে সর্ব্ব অন্তর্য্যামী,
অন্তরীক্ষে জীববক্ষে আবির্ভূত স্বামী।
গিরিশিরে নদীনীরে করেন ভ্রমণ,
সহস্র চরণে পিতা করে বিচরণ।
দিবস উন্মেষ তাঁর নিমেষ রজনী,
তাঁরই সংস্কার হয় এ 'বেদ' অবনী।
পৃথিবী তাঁহার ধৈর্য্য ক্রোধ হুতাশন,
জগত অভেদ্য দেহ অপূর্ব্ব দর্শন।
ছায়াহীন কায়াহীন নিশ্বাস বর্জ্জিত
মুনি, ঋষি, যোগী, যতি সবার পূজিত।
পূজিবে কি মন ক্ষুদ্র অটবীর ফুলে
মহান্ সচিদানন্দ ভকত বৎসলে?
স্ব-অন্তর স্থিত পুণ্য প্রেম-ফুল তুলি
পূজ নিরজনে পূত অশ্রুবারি ঢালি,
তা হলে বাসিতে ভাল বাসনার ধন
বাহ্য আড়ম্বরে প্রভু ক্লিষ্ট অনুক্ষণ।

সরসীর নীর আর বনের কুসুমে
প্রীত নন,—প্রীত ভক্তি প্রীতির কুঙ্কুমে।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা।

আক্ষেপ।

এ সুন্দর ধরা মাঝে, সকলি মোহন সাজে
সুশোভিত আছে সুষমায় ;
কেন হিংসা দ্বেষ তবে হৃদয়ে পুষিছে সবে,
কেন চিত্ত ম্লান কালিমায় ?

(২)

কেন বৃথা অহঙ্কার, পরনিন্দা ব্যভিচার,
কলুষিত বিষ-বায়ু বহে,
কেন বৃথা অভিমান, বাড়াতে আপন মান
কেন জীব সদা ব্যস্ত রহে ;

(৩)

বৃথা বাক্-যুদ্ধে তা'রা, কেন হয় আত্মহারা,
স্বীয় মত রাখিতে প্রবল,
আপনি হইতে বড়, কেন বৃথা আড়ম্বর,
সরলতা কেন, গো বিরল ?

(৪)

পর ছিদ্র পরকাশে কতজন ভালবাসে,
নিজ দোষ দেখে না চাহিয়া ;
কেন নর ভ্রান্তি বশে সুজনে সুতীব্র ভাবে
গরিমায় হয়ে স্ফীত-হিয়া ?

(৫)

বৃথা গর্ব্ব অভিমানে বিষময় বাক্য বাণে,
জর্জ্জরিত করে কত জনে,
কেন ক্রোধ মোহ বশে নীচ জন উচ্চ ভাবে,
হিতাহিত না ভাবিয়া মনে ?

(৬)

দূর প্রদেশেও বসি বিদ্রূপের তীব্র হাসি
কতজন হাসে অবিরল,
গর্ব্বে উচ্ছ্বসিত প্রাণ ধরা করে তুচ্ছ জ্ঞান,
মোহ-মদে হইয়া বিহ্বল।

(৭)

দুরাশা কুহকে হায় —হইয়া উন্মত্ত প্রায়,
মতিভ্রান্ত হয় কতজন,
ভাঙ্গিলে সাধের আশা মরু-ভূমে জল-তৃষা,
থাকে প্রাণে জ্বালা অসহন!

(৮)

পরের উন্নতি দেখে কেন শেল বিঁধে বুকে,
পর-সুখে কেন মর্ম্মাহত ?
কুটিলতা কূট-জালে প্রতিদিন ধরাতলে,
শান্তি নাশ করিতেছে কত!

(৯)

প্রতারণা মিথ্যা কথা কত জনে দিয়ে ব্যথা,
নিয়ত বিশ্বাস করে নাশ,
ভ্রূকুটি কুটিলানন উপেক্ষা অবমানন,
কেন ধরাতলে করে বাস ?

(১০)

কেন দ্বেষ অহরহ মনোবাদ দুর্ব্বিসহ,
তিক্ত করে মধুর মিলন,
কেন ব্যঙ্গ পরিহাস জ্বালাময় অবিশ্বাস,
মানবেরে দহে অনুক্ষণ ?

(১১)

হ'ত বসুন্ধরা হায় শান্তি-সুখ স্বর্গ প্রায়,
হেন দোষ না থাকিত যদি ;
কত সুখ পেতো নর অবিচ্ছেদে নিরন্তর
উঠিত না দুখে প্রাণ কাঁদি।

শ্রীযতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

৮ম বর্ষ } ময়মনসিংহ, আষাঢ়, ১৩১৬। { ৭ম সংখ্যা।

আরতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

প্রার্থনা।

সন্তান মায়ের নিকট আহার চায়। সন্তান চাহিবার পূর্ব্বে মা তাহার ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিতে ব্যস্ত থাকেন। ক্ষুধায় যদি সন্তান ক্রন্দন করে মায়ের হৃদয়ে তাহা সহ্য হয় না। নিরুপায় পক্ষিশাবক মায়ের প্রতীক্ষায় কুলায় বসিয়া থাকে; মা আহার লইয়া সমীপবর্ত্তিনী হইলেই আহারের জন্য আকুল প্রার্থনা জ্ঞাপন করে। মা জীবিত থাকিতে এ প্রার্থনা কখনও নিষ্ফল হয় কি? হিংস্র ব্যাঘ্রীও নিজ সন্তানের পক্ষে পরম করুণাময়ী!

মা ও সন্তানের এই স্নেহ-বন্ধন বৃক্ষ লতাতেও স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। বীজ জন্মাইবার ও বীজটী সযত্নে রক্ষা করিবার জন্য বৃক্ষ লতার সমুদয় শক্তি নিয়োজিত হয়। তুলার বীজ তুলার অভ্যন্তরে কি প্রকারে সযত্নে রক্ষিত হয় দেখিলেই ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে: পৃথিবীর এই রহস্য ভেদ করিয়া কবিকুল চূড়ামণি "জগতঃ পিতরৌ বন্দে" বলিয়া জগতের পিতা মাতার বন্দনা করিয়াছেন। "যাদেবী সর্ব্বেভূতেষু স্নেহরূপেন সংস্থিতা" মার্কণ্ডেয় ঋষি অতি সামান্য কয়টী কথায় পরমা প্রকৃতির স্নেহ-রূপ অঙ্কিত করিয়াছেন। আমাদের হৃদয়ে এই মহাভাবের স্ফূর্ত্তির সম্ভাবনা কোথায়? এই যে আমাদের চক্ষের সমক্ষে পশু পক্ষী নরনারীর হৃদয়ে প্রতি মুহূর্ত্তে স্নেহের স্নিগ্ধ প্রস্রবণ প্রবাহিত হইতে দেখি ইহার মূলাধার কোথায়? কোন্ জলাশয় হইতে এই পূতধারা জন্মগ্রহণ করে? ইহাকে যদি মায়া ও মোহ বলা যায়, তবে জগতে যে সত্য কি আছে তাহা আমি জানি না। মায়ার বন্ধন ধ্রুব, মায়ার বন্ধন অবিনশ্বর। এজন্য পরমা প্রকৃতি মহামায়া স্বরূপে তন্ত্রে পূজিতা হইয়াছেন।

পিতা ও মাতা স্নেহ গোলকের দুইটী ভাগ। শিশু পিতা মাতা জানে না, জানে স্নেহ, প্রকৃতির অভিজ্ঞানে স্ত্রীপুরুষ ভেদ শুধু কল্পনা মাত্র। সন্তান মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করে মাতার শোণিতে পরিপুষ্ট হয়। কিন্তু পিতা হইতে সন্তান জীবনী শক্তির যে অংশটুকু লাভ করে তাহা কি সামান্য? সন্তান মাতা হইতে যেমন, পিতা হইতেও তেমন অবয়ব ও সর্ব্বপ্রকার শক্তি লাভ করে। সন্তানের কলেবর বৃদ্ধির সঙ্গে তাহা ব্যক্ত হইয়া পরে। বিশ্লেষণ বিধি অবলম্বন করিয়া জীবশরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্ত্রী পুরুষ স্থলে লীলাময়ী শক্তি ব্যতীত আর কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। এই শক্তির ইচ্ছা আমাদের হৃদয়ে কামনা স্বরূপে প্রতিভাত হয়।

যেস্থানে এই ইচ্ছা শক্তির বিকাশ হইয়াছে তাহাকেই এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র স্বরূপ মনে করা যাইতে পারে। যেখানে অনুভূতি, জগতের অস্তিত্বও সেইখানে। অনুভূতির বিনাশ হইলে জগতের অস্তিত্বও সেই অনুভূতির নিকট লুপ্ত বলা যাইতে পারে। এই কেন্দ্রের প্রসারণও অন্তর্দ্ধান জন্ম ও মৃত্যু নামে অভিহিত। সন্তান মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করে, না প্রকৃতি বক্ষে লালিত পালিত হয়? কোথা হইতে কি ভাবে সামান্য ইচ্ছা শিশুর আবির্ভাব, কি ভাবে তাহার স্থিতি ও কি প্রকারে তাহার বিনাশ, জানিবার জন্য অনেকে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু কেহ কৃতকার্য্য হইয়াছেন কি না আমরা জানি না।

ইচ্ছা শিশু কামনাময়। কামনার তৃপ্তির জন্য সে চিরদিন পরমুখাপেক্ষী এমন কেহ এ জগতে নাই যে প্রতি মুহূর্ত্তে কাহারও না কাহারও নিকট কিছু চাহিতেছে। ইচ্ছা শক্তির তৃপ্তির উপকরণ জগতে না থাকিলে তাহার জন্ম ও বৃদ্ধি হইত না। কামনার তৃপ্তি আছে বলিয়াই কামনার উত্তরোত্তর বিকাশ আমরা দেখিতে পাই। কতদূর আমাদের স্বাবলম্বন আছে এবং কতদূর আমরা পরের অধীন তাহা বুঝিতে অধিক সময়ের আবশ্যক হয় না। নিজের দুর্ব্বলতা আমরা সহজেই অনুভব করিয়া থাকি। অপর পক্ষে অন্যের উপর আমাদের কতদূর প্রভাব আছে, অন্যে আমাদের কতদূর মুখাপেক্ষী তাহাও বুঝিতে গৌণ হয় না। সন্তান মায়ের নিকট আব্দার করে; সন্তান জানে যে মার উপর তাহার প্রভাবের পরিমাণ কতটা। এই দেওয়া নেওয়ার সম্বন্ধটা দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপিত হইলে যাচ্ঞা স্বাভাবিক হইয়া পরে। মায়ের নিকট আহার চাহিতে সন্তান এক মুহূর্ত্তও ইতস্ততঃ করে না। এই যাচ্ঞার অভ্যাস এমনই ভাবে আমাদিগকে গ্রাস করে যে আমরা যাতনায় মাকে না ডাকিয়া থাকিতে পারি না।

"প্রকৃতিসিদ্ধ" ও "অভ্যাসজাত" এই দুইটী কথার মধ্যে পার্থক্য অতিসামান্য যাহা প্রকৃতিগত তাহাই প্রকৃতিসিদ্ধি; অভ্যাস তদনুরূপ ফল উৎপন্ন করে মায়ের প্রতি বিশ্বাস শিশু মাত্রেরই প্রকৃতিগত ইহা জীবজগতের অভ্যাসের ফল নয় কি? মার নিকট জীবনে যতবার উপস্থিত হইয়াছি ততবারই কামনা পূর্ণ হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শত সহস্র যুক্তিতর্ক কখনও স্থান পায় নাই। মা প্রহার করিলেও মায়ের প্রতি শিশুর অশ্রদ্ধা জন্মে না স্নেহরূপিণী পরমাপ্রকৃতি কি উজ্জ্বলরূপে আমাদের হৃদয়ের অতি নিকটে উপস্থিত। ইহা মায়া নহে, মোহ নহে, ভ্রম নহে, ধ্রুব সত্যের অনুভূতি। যে এই স্নেহরসে পরিপ্লুত হয় নাই সে সাধনার পরম পদার্থ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

স্নেহরূপিণী পরমাপ্রকৃতির স্নেহক্রোড়ে আমরা নিঃসহায় শিশুসন্তান। শিশু মা ভিন্ন আর কাহাকে ডাকিবে? অতি কঠোর হৃদয় দস্যুকেও দেখিয়াছি ভগবান ভিন্ন আর কাহাকেও ডাকে নাই। অপর দিকে পিঞ্জরাবদ্ধ দস্যুকে পুত্রস্নেহে বিগলিত হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে, পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিতে দেখিয়াছি।

সাধক বিপদকে ভয় করেন না। নিঃসহায় অবস্থায় উপনীত না হইলে মায়ের কথা স্মরণ হয় না। শিশু যখন খেলা করে তখন মাকে ভুলিয়া থাকে, কিন্তু সন্ধ্যায় মায়ের ক্রোড় না পাইলে কাঁদিয়া অস্থির হয়। যত বার বিপদ উপস্থিত হয় তত বারই মাকে ডাকিবার সুযোগ হয়। দুর্গতিনাশিণী দুর্গা নাম স্মরণ করিয়া যিনি শতবার বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন, অসার যুক্তিতর্ক তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে না।

সর্ব্বভূতে যিনি স্নেহরূপে বর্ত্তমান, তিনি সহস্র শীর্ষ হইলেও এক। একামেবা-দ্বিতীয়ং। তিনি পিতৃ মাতৃরূপে আমাদিগকে আরাধনা শিক্ষা দেন। সুতিকা গৃহে প্রর্থনার স্ত্রপাত, ও মৃত্যু-শয্যায় ওঁ নারায়ণ ব্রহ্ম নামে তাহার পরিসমাপ্তি। শ্রীঅক্ষয়কুমার মজুমদার।

ভূতের বাড়ী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শিক্ষক মহাশয় তাহার পুস্তিকা খানি উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে লাগিলেন। আমরা ব্যাকুল আবেগ ও অধীর আগ্রহের সহিত সেই অলৌকিক কাহিনী শুনিতে লাগিলাম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নির্ব্বাসন।

রাজা বিজয়সিংহ আরাম ভবনের দ্বিতল কক্ষে উপবিষ্ট, দক্ষিণ পার্শ্বে রাণী অবনত বদনে দণ্ডায়মানা, কক্ষে আর অন্য লোক নাই। রাণীর মুখমণ্ডল শ্রীহীন,—শিশিরসিক্ত কমলের ন্যায় পাণ্ডু বর্ণ, বেশভূষা বিশৃঙ্খল, কেশদাম আলুলায়িত, সুনীল আয়ত লোচন হইতে অবিরল ধারায় অশ্রু বিগলিত হইতেছে। রাজাও নীরবে বসিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছেন, তাঁহার নয়ন শুষ্ক, অশ্রু যেন হৃদয়ের মধ্যে ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে। কাহারও মুখে একটী কথা নাই। প্রবল ঝটিকা উভয়ের হৃদয়ে নীরবে বহিয়া যাইতেছে। এইরূপে কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। অতঃপর আত্মসম্বরণ করিয়া রাণী কাতর স্বরে বলিলেন—

মহারাজ! শত অপরাধ করিলেও অমর তোমার পুত্র, অমর অবোধ বালক, তাহাকে তুমি ক্ষমা কর।

রাজা—আমি যদি নগণ্য লোক হইতাম, যদি বেওয়ারের রাজকুলে জন্ম গ্রহণ না করিতাম, তাহা হইলে অমরকে ক্ষমা করা সম্ভব হইত। অমর ও তাহার নীচ বংশীয়া পত্নীকে রাজপরিবারে গ্রহণ করিলে আমার পূর্ব্ব পুরুষের গৌরব বিনষ্ট হইবে, বেওয়ারের পবিত্র কুলে কলঙ্ক স্পর্শ করিবে। আমার প্রাণ থাকিতে তাহা হইতে দিব না।

রাণী—হায়! পুরুষের হৃদয় কি কঠিন! অমর, তুই কেন রাজকুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলি?

রাজা—রাণি! আমি কঠিন নই। পুত্রশোকে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, কিন্তু কি করিব? কর্ত্তব্যের নিকট স্বার্থ উৎসর্গ করিয়া রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়াছি। ন্যায়ের নিকট রাজপুত্র ও কৃষকপুত্রে কোন পার্থক্য নাই।

রাণী—তবে আর এজীবনে অমরকে দেখিতে পাইব না? জন্মের মত তাহাকে বিদায় দিতে হইবে?

রাণী আবার অধীরা হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

রাজা অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন—জীবনের পরপারে আমাদের সহিত অমরের দেখা হইবে। সেখানে কুলমর্য্যাদা নাই, রাজসম্মান নাই,

ছোট বড় বিচার নাই, সেখানে সকলই সমান। এই কথা বলিতে বলিতে রাজার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

এমন সময় একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যুবরাজ অপেক্ষা করিতেছেন। বিজয়সিংহ যুবরাজকে আসিতে অনুমতি প্রদান করিলেন।

যুবরাজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া পিতাকে প্রণাম করিলেন এবং নীরবে ম্লানমুখে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। বিজয়সিংহ গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—কুমারসিংহ তোমার কি কিছু বক্তব্য আছে?

কুমার—মহারাজ! আমি অমরের জন্য আপনার দয়া ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। অমর ছেলে মানুষ; তাহার প্রকৃতি বড়ই কোমল; সর্ব্বদা কেবল বই পড়িয়া সে কেমন উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে। কল্পনাপ্রিয় বালক সংসারের কথা কখনও ভাবিয়া দেখে নাই। সুতরাং আত্মবিস্মৃত হওয়া তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। মহারাজ! তাহাকে ক্ষমা করুন।

রাজা—ভ্রাতার জন্য দয়া ভিক্ষা করিয়া তুমি তোমার কর্ত্তব্য কার্য্যই করিয়াছ, আর বংশমর্য্যাদা রক্ষার্থে আপন পুত্রকে নির্ব্বাসন করিয়াআমি আমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিয়াছি।

আবার কক্ষ নীরব নিস্তব্ধ হইল।

ভৃত্য এই সময়ে পুনরায় সেই নিস্তব্ধ কক্ষে প্রবেশ করিয়া সংবাদ দিল—কুমার অমরসিংহ মহারাজের নিকট বিদায় লইবার জন্য দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছেন।

রাণী এই সংবাদ শুনিয়া শোকাবেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন।

রাজা তীব্রস্বরে বলিলেন—তুমি যদি এরূপ অধীরা হও তাহা হইলে অমরকে এখানে আসিতে নিষেধ করিব।

রাণী ভীতা হইয়া বলিলেন—না, মহারাজ, আমি আর অধীরা হইব না। জন্মের মত আমি একবার বাছার চাঁদ মুখখানি দেখিয়া দিব।

রাজা অমরকে আসিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। নীরবে অবনত মস্তকে একটী তরুণ যুবক কক্ষে প্রবেশ করিলেন। যুবকের দেহ শীর্ণ, সুচারু বদন নণ্ডল গভীর বিষাদে মলিন, হৃদয়ের সরলতা তাহার বিশাল নয়ন যুগলে প্রতিভাত। যেন এই কোমল কান্তি যুবক কবিতার রাজ্যে বিচরণ করিবার জন্যই

জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সংসারের সামান্য আঘাতেই তাহার হৃদয় যেন শতধা ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

অমর পিতা ও মাতা অগ্রজকে প্রণাম করিয়া একপার্শ্বে নীরবে দণ্ডায়মান হইলেন। সেই সময়ের মর্ম্মান্তিক করুণ দৃশ্য বর্ণনা করা অসাধ্য। পলিত-কেশ বৃদ্ধ মহারাজ গম্ভীরভাবে বসিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছেন, রাণী নীরবে দাঁড়াইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন, কুমারসিংহ চির বিদায় প্রার্থী ভ্রাতার মলিন মুখ মণ্ডলের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া আছেন। কাহারও মুখে কথা নাই। কথা বলিবার কাহারও সাহস হইতেছে না।

কতক্ষণ পর রাজা অমরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—অমর, তোমার কি বলিবার আছে শুনিতে চাই।

অমর ধীর ভাবে অবিচলিত হৃদয়ে উত্তর করিলেন—মহারাজ, আমি কোন কথা গোপন করি নাই; আমি সরল ভাবে দোষ স্বীকার করিয়াছি এবং অম্লান বদনে রাজদণ্ড মস্তকে গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু আমি সর্ব্বস্বত্যাগ করিয়াও ধর্ম্মকে জয়যুক্ত করিতে পারিয়াছি ইহাই আজ আমার সুখের বিষয়।

আমি বাল্যকালে অতিশয় নির্জ্জনতা প্রিয় ছিলাম; জ্ঞান-পিপাসা আমার অত্যন্ত প্রবল ছিল। দাদা যখন শিকারে বাহির হইয়া যাইতেন তখন আমি একাকী গৃহে বসিয়া সারাদিন কাব্যালোচনা করিতাম। আমোদের জন্য আমার দূর দেশে যাইতে হইত না, এই পার্ব্বত্য প্রদেশের কানন কান্তারে বিচরণ করিয়া আমি স্বর্গ সুখ লাভ করিয়াছি। প্রতি বৃক্ষ প্রতি নির্ঝরিণীর সহিত আমার ভালবাসা জন্মিয়াছিল। যখন কবিতা ও প্রকৃতির সহিত আলাপ করিয়া আমি বাল্য-জীবন অতিবাহিত করিতেছিলাম, সেই সময়ে সর্দ্দার কিরাৎসিংহের কন্যা অহল্যার সহিত আমার একদিন সাক্ষাৎ হইল। অহল্যাকে দেখিয়া আমার মনে হইল আমার হৃদয়ের কবিতা-দেবী যেন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। কয়েক দিনের মধ্যেই অহল্যার সৌন্দর্য্যে—ততোধিক তাহার গুণে—আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম। আমি যখন বাগানে একাকী বিচরণ করিতাম তখন প্রতিদিন অহল্যার সহিত আমার আলাপ হইত। ক্রমে অহল্যার প্রতি আমার ভালবাসা জন্মিল। ভালবাসা প্রগাঢ় প্রেমে পরিণত হইল। একদিন অহল্যা প্রকাশ করিল সেও আমাকে ভালবাসে। তখন অহল্যাকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা হইল। আমাদের ভালবাসার কথা বেশী দিন গোপন রহিল না; লোকে

অকারণ অহল্যার কুৎসা করিতে লাগিল। আমি তাই অহল্যাকে বিবাহ করিয়া, তাহাকে লোকনিন্দা হইতে রক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছি।

স্নেহশীলা জননী পুত্রের হাত দুইটী স্বীয় করপল্লবদ্বয়ে প্রবল আগ্রহে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—বাবা এখনও বল তুই অহল্যাকে ত্যাগ করিবি, তাহা হইলে মহারাজা তোর অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

অমর—মা, এমন অন্যায় কথা বলিও না। জানি প্রতিদিন কত ধনীর সন্তান গরিবের ঘরের সরলা বালিকাদিগকে ভুলাইয়া কলঙ্কের স্রোতে ভাসাইয়া দিতেছে। কিন্তু মা তোমার অমর তেমন পশু নয়। আমি প্রাণ থাকিতে তাহা পারিব না। অহল্যা সরলা, অহল্যা ধর্ম্মশীলা; উচ্চ বংশে জন্ম গ্রহণ করে নাই এই তার অপরাধ। আমি নির্ব্বাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়া সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত হইয়াছি।

আবার সকলেই নীরব হইলেন।

কিছুকাল পর সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া রাজা বলিলেন—আমাদের বেওয়ার রাজবংশ দেশ বিখ্যাত। বিধাতার অনুগ্রহে সেই উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও তুমি বংশগত গৌরব বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছ। যদি তোমাকে ও তোমার পত্নীকে পরিবারে গ্রহণ করি তাহা হইলে রাজপুতনার রাজগণ আমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবে, সুতরাং আমি কর্ত্তব্যের অনুরোধে তোমার কুকার্য্যের শাস্তি প্রদান করিতে বাধ্য। নির্ম্মম দায়িত্ব আমার স্নেহ মমতার উৎস শুষ্ক করিয়াছে। ভগবান তোমার কল্যাণ করুন। লোকান্তরে তোমার সহিত আমাদের দেখা হইবে।

অমর—মহারাজ, যে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি আপনার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাই যেন বিপদে আমার একমাত্র সহায় হয়।

অমর ভূমিষ্ঠ হইয়া রাজা ও রাণীকে প্রণাম করিলেন। রাজা হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাণী মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পতিতা হইলেন।

অমর নীরবে ধীরপাদক্ষেপে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অমলাবাই।

অমলা বাই আ[illegible] মহারাজা দুর্জ্জয়সিংহের একমাত্র কন্যা। অমলা বাই জন্মদুঃখিনী। তাঁহার বয়স যখন দুই বৎসর তখন তিনি মাতৃহীনা হন

প্রিয়তমা মহিষীর অকাল বিয়োগে মহারাজা শোকে অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই সময়ে কেবল এই ক্ষুদ্র বালিকাটীকে বক্ষে ধারণ করিয়াই তিনি কিয়ৎ পরিমাণে সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন। অমলা বাই দুর্জ্জয়সিংহের চক্ষের মণি, সংসারের অবলম্বন, জীবনের ধ্রুবতারা।

অমলাকে দুর্জ্জয়সিংহ 'মায়া' বলিয়া ডাকিতেন। তিনি বলিতেন:—"অমলা আমার হৃৎপিণ্ডটা ক্ষুদ্র মুষ্টিতে ধরিয়া সংসারে অবতীর্ণ হইয়াছে। অমলা না থাকিলে কবে আমি সন্ন্যাসী হইয়া যাইতাম এই বালিকা মূর্ত্তিমতী মায়া।"

অমলাকে বুকে লইয়া দুর্জ্জয়সিংহ রাত্র দিন অতিবাহিত করিয়াছেন। মেয়ের মনে যাহাতে এক মুহূর্ত্তের জন্য মায়ের অভাব না জাগে সেই জন্য তিনি সর্ব্বদা তাহাকে কণ্ঠলগ্ন করিয়া রাখিতেন। মেয়েকে ধাত্রীর নিকট রাখিয়া তিনি তৃপ্তি পাইতেন না, প্রহরী রাখিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইতেন না। মেয়ের যত কাজ সকলি তিনি নিজে করিতেন। রাত্রেও দুর্জ্জয়সিংহ বিনিদ্র নয়নে বালিকার মুখপানে চাহিয়া রজনী অতিবাহিত করিতেন। যথার্থই অমলা মায়া।

দুর্জ্জয়সিংহ সংসারের এক নিভৃত কোণে স্নেহবারি সিঞ্চণ করিয়া এই সুকোমল আশালতিকাটী সঞ্জীবিত রাখিতেছিলেন। তিনি রাজকর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া একাধারে বালিকার পিতা মাতা ও ক্রীড়া সাথীর অভাব পূরণ করিতেছিলেন। তিনি অমলাকে খাওয়াইয়া, তাহার সঙ্গে পুতুল খেলিয়া, বাগানে ফুল তুলিয়া আর প্রজাপতির পশ্চাতে ছুটাছুটি করিয়া দিনগুলি কাটাইতেন। রাত্রে চাঁদ দেখাইয়া গল্প বলিয়া মেয়েকে ঘুম পড়াইতেন।

এইরূপে তিন চারি বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। মহারাজা তখন অমলাকে লেখা পড়া শিখাইতে মনোনিবেশ করিলেন। নানা শাস্ত্রাভিজ্ঞ একজন অধ্যাপকের হস্তে বালিকার শিক্ষার ভার ন্যস্ত হইল। অধ্যাপক অল্পকালের মধ্যেই স্বীয় ছাত্রীর বুদ্ধি ও মেধা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। কয়েক বৎসর মধ্যে অমলাবাই রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবৎ শেষ করিলেন, রাজপুতনার প্রাচীন কীর্ত্তিকাহিনীপূর্ণ চারণের পদাবলী তাঁহার কণ্ঠস্থ হইল। মহারাজা বালিকার জ্ঞানানুরাগ দেখিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন।

অমলাবাই মধুমত্ত অলির ন্যায় বাণীর পাদপদ্মে [illegible]ার করিয়া ফুল্ল মনে স্বীয় জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করিতে লাগিলেন। আমার সংসারের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ রহিল না, কিন্তু সংসার তাঁহাদিগের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য ব্যাকুল হইল। অমলাবাই বাল্য অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন। নব

বসন্তের কমনীয় মাধুর্য্য তাঁহার সুগঠিত দেহ লতিকায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। সেই সময় তাঁহার মত অসামান্যরূপলাবণ্যবতী যুবতী রাজপুতনায় অতি অল্পই ছিলেন। অমলার রূপ ও গুণের কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। এই রমণী-রত্নকে লাভ করিবার জন্য নানা দেশের রাজকুমারগণ অতিশয় ব্যাকুল হইলেন। বহুস্থান হইতে বিবাহের প্রস্তাব আসিতে লাগিল। কিন্তু দুর্জ্জয় সিংহ নীরব। তিনি মেয়ের বিবাহে সম্পূর্ণ উদাসীন। মেয়ের বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করিলেই তিনি বলিতেন "মায়া আমার সে দিনের বালিকা আজই বিবাহের কি হইয়াছে।"

মহারাজা মনে মনে ভাবিতেন "যে দিন মায়া এ গৃহ ছাড়িবে সেই দিন আমারও সংসারের মায়া ছিন্ন হইবে।"

মেয়ের বিবাহে ঔদাসীন্য হইবার আর একটা কারণ ছিল। মায়া মা-মরা মেয়ে; পরের ঘরে গিয়া সুখেই থাকে না দুঃখেই থাকে তাহা কে বলিতে পারে? যত দিন চক্ষের সম্মুখে রাখা যায় ততদিন মেয়েকে কাছ ছাড়া করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না।

কিন্তু বিধি-নির্ব্বন্ধ কে অন্যথা করিতে পারে? অমলাবাই যখন ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিলেন সেই সময় বেওয়ারের যুবরাজ কুমার সিংহ আলোয়ার রাজ্যে শিকার করিতে আগমন করিয়াছিলেন। তখন তিনি কিছু দিনের জন্য দুর্জ্জয় সিংহের গৃহে বাস করিয়াছিলেন। যুবরাজ অমলাবাইকে দেখিয়া অতিশয় মুগ্ধ হন। স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি অমলাবাইয়ের সহিত তাঁহার বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মহারাজা বিজয় সিংহ পুত্রের অভিপ্রায় অনুসারে দুর্জ্জয় সিংহের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন।

আত্মীয় স্বজনেরা সকলেই এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। দুর্জ্জয় সিংহেরও তখন চৈতন্য হইল। তিনি ভাবিলেন—"মায়া আমার গৃহে যতই যত্নে প্রতিপালিত হউক না কেন, পিতার আদর ও স্নেহ তাহার হৃদয়ের তৃপ্তির পক্ষে যথেষ্ট নাও হইতে পারে। বিবাহিত জীবনের সুখলাভের জন্য রমণী মাত্রেরই আকাঙ্ক্ষা থাকে।" যখন তাঁহার অন্তরে এই চিন্তার উদয় হইল তখন তিনি স্বীয় ঔদাস্যের জন্য অতিশয় অনুতপ্ত হইলেন।

"না জানি মায়া আমাকে কি মনে করিতেছে।" আর কাল বিলম্ব করা তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইল। বিশেষ বিবেচনা না করিয়া তিনি বেওয়ারের যুবরাজের সহিত মেয়ের বিবাহ দেওয়াই স্থির করিলেন। নির্দ্দিষ্ট

দিনে কুমার সিংহের সহিত অমলাবাইয়ের বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। যে দিন অমলাবাই দুর্জ্জয়সিংহের গৃহ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন সে দিনের দৃশ্য বর্ণনা করা অসাধ্য। পিতা মেয়েকে বুকে লইয়া বালকের ন্যায় রোদন করিলেন। বালিকা পিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কত চীৎকার করিলেন। হায়! তখন কে জানিত এই বিদায়ই চির বিদায়?

বিবাহের পর এক বৎসরের মধ্যে বিজয় সিংহ পরলোক গমন করিলেন, রাজ্য ভার কুমার সিংহের হাতে পড়িল, সেইসঙ্গে অমলাবাইএর জীবনও দুঃখময় হইয়া উঠিল। কুমারসিংহ চরিত্রহীন। যৌবনের উদ্দাম প্রবৃত্তি-স্রোতে সে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া চলিয়াছে। বিলাস-প্রিয় যুবক সর্ব্বদা ঘৃণিত আমোদে নিমগ্ন থাকে। অমলাবাই অল্পদিনের মধ্যেই স্বামী সহবাসে বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিলেন। সূর্যোদয়ে উষার লোহিত রাগের ন্যায় অমলা দেবীর জীবন আকাশ হইতে তাঁহার আশার কোমল আলোক রেখা তিরোহিত হইয়া গেল। নিদাঘ-তপ্ত কুসুম কলিকার মত উন্মেষিত যৌবনা অমলা দেবী দিন দিন শুষ্ক ও শ্রীহীন হইয়া যাইতে লাগিলেন।

আরাম ভবনে যখন অমলাবাই প্রথম পদার্পণ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার অধরে হাসি ধরিত না। তাঁহার অতুলন লাবণ্যরাশি চারু দেহে উছলিয়া পড়িত হায়! এখন আর অধরে হাসি নাই, নয়নে জ্যোতি নাই, দেহে শ্রী নাই; হৃদয়ে উদ্বেল উচ্ছ্বাস নাই। সংসার তাহার নিকট শূন্য বোধ হইতেছে।

এক এক বার তাঁহার মনে হইতেছিল "বাবার কাছে চলিয়া যাই।" আবার ভাবিলেন—"না বাবার কাছে যাইব না। বাবা আমার মলিন মুখ দেখিলে আর বাঁচিবেন না।"

দিন দুঃখীরও যায় সুখীরও যায়, অমলাবাই এরও দিন যাইতে লাগিল। কিন্তু হায়! তাঁহার হৃদয়ে যে দুর্ব্বিসহ যাতনা-ভার তাহা কেহ দেখিল না; কেহ জানিল না। স্বামী স্ত্রীর ব্যবধান দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। উভয়ে এক বাড়ীতে বাস করিতেন কিন্তু কদাচিৎ দুইজনে সাক্ষাৎ হইত। এইরূপে রাজা দুর্জ্জয়সিংহের প্রাণের পুতলি অমলা বাই পুড়িয়া ছাই হইতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ)

প্রার্থনা।

জগদীশ! আজি এই নব উষালোকে
অজ্ঞান-তামসপুঞ্জ দাও দূর করি;
তোমারি মহান্ স্তোত্র দ্যুলোকে ভূলোকে
উঠুক্ প্রণবনাদে দিক্‌দেশ ভরি।
মানবের চিত্তমাঝে তব পূতপ্রভা
হৌক চির দীপ্তিমান করি উদ্ভাসিত
জ্ঞান ধর্ম্ম পবিত্রতা; শুদ্ধশান্ত শোভা
লভুক নিখিল বিশ্ব নব উন্মেষিত।
জড়তা-শৃঙ্খল টুটি প্রদান সবায়
কঠোর কর্ত্তব্যজ্ঞান অদম্য শকতি;
জাগাও আকাঙ্ক্ষা দেব, সতত হিয়ায়,
তোমারি চরণ প্রান্তে অর্পিতে ভকতি।
ধৌত করি অন্তরের স্বার্থ মলিনতা,
দাও দীক্ষা বিশ্ব-প্রেমে, হে বিশ্বদেবতা!

শ্রীশীতাংশুভূষণ সেনগুপ্ত

কার?

শুধাইনু 'তুমি কার কহ না সজনী,
সাধ যায় শুনিতে আমার'—
মৃদু হাসি কহে প্রিয়া "দিবস রজনী
আমি সখা, কেবলি তোমার!"

শুধানু আবার তারে "বিশাল ধরায়
কহ দেখি আমি সখি কার'--
কহিল সে "জানি আমি সকল হিয়ায়
তুমি দেব, কেবলি আমার !"
শুধালাম পুনরায় 'বলগো এবার
দোঁহে মিলি আমরা কাহার'—
কহিল জীবনময়ী "বুঝিয়াছি সার
দু'জনায় মহা দেবতার !"

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

অশ্রু।

স্বরগের মধুময় ফুলের শিশির,
জুড়াইতে শোক-তপ্ত মানব হিয়ায়,
লভি স্নিগ্ধ নীরবতা মাধবী নিশির,
রয়েছ লাগিয়া বুঝি নয়নে সদায়।
ভবের বন্ধন ছিঁড়ি ত্যজিয়া ভুলোক,
গিয়াছে চলিয়া হায় আত্মীয় স্বজন ;
নিবিয়া গিয়াছে দীপ্ত আশার আলোক,
আঁধারে করিয়া লিপ্ত হৃদয় গগন।
অভাগার পানে কেহ ফিরে নাহি চায়,
কারো কাছে গেলে হায় দূরে যায় সরে ;
অগাধ হৃদয় ব্যথা জুড়াইতে হায়,
না মিলে একটু স্থান অসীম সংসারে।
নিরাশ হতাশময় এ দুঃখের দিনে,
বসিয়া আছ গো অশ্রু নয়নের কোণে।

শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য।

তুমি আছ যদি।

কেন প্রাণ শূন্য হায়!
নিরাশায় দগ্ধ প্রায়
কেন উঠে হাহাকার,
প্রাণে নিরবধি,
মাগো তুমি আছ যদি?

কেন এ জীবন তরী
কূলে কূলে বেয়ে মরি,
কেন ভয় হেরি ঘোর
বিশাল জলধি,
পিতা তুমি আছ যদি?

কেন রাখি বুকে ধরে
স্নেহের পুতলিটিরে,
কেন ছেড়ে দিতে তায়
আকুল এ হৃদি,
সখা তুমি কাছে যদি!

কত যত্নে বাঁচাইলে,
আজ যদি দুঃখ দিলে,
কেন প্রাণ দিবা নিশি
সারা হয় কাঁদি,
তুমি মোর সখা যদি?

কেন ভিখারীর বেশে
ছুটে যায় তার পাশে,
কেন নিরাশায় শেষে
কেঁদে মরে হৃদি,
পিতা তুমি রাজা যদি?

মরিয়া বাঁচিয়া যায়,
নূতন জীবন পায়
মুহূর্ত্তের মাঝে দেব
এই অপরাধী,
পিতা তুমি ক্ষম যদি!

শ্রীসুধাকৃষ্ণ বাগচি।

চাতক।

কহে চাতক জলদে
জল দে জল দে জল দে
বড় দুঃসহ পিপাসা,
তীব্র দহন এ হৃদে
বারি দে বারি দে বারি দে
কত ভুঞ্জিব নিরাশা!
ঊর্দ্ধ গগন চাহিয়া
রয়েছি নয়ন স্থাপিয়া
পি'তে সলিল মধুরে,

তুচ্ছ তড়াগ সরিতে
পারে কি শীতল করিতে
বিনা পরাণ বঁধুরে!
প্রাণে ছিল এ ভরসা
আসিবে আজি সরসা
লয়ে জলদ অম্বরে,
আজি পেয়েছি নিদয়ে
দে ধু'য়ে দে ধু'য়ে দে ধু'য়ে
তৃপ্তি জাগায়ে অন্তরে।

ওহে পুলক বৰ্দ্ধক
জ্বলিয়া গিয়াছে পালক
কণ্ঠে না সরে সুভাষ,
বক্ষে পুষিয়ে আশা রে
"আষাঢ়ে" ল'ভেছি আসারে
মোরে না করো নিরাশ।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

রমণীর জয়।

(১)

ওস্মান আজও অবিবাহিত। ওস্মান ধনীর সন্তান ; তাহার অর্থের অভাব নাই। ঢাকার বাহিরে তাহার কিছু জমি আছে আর সহরে একটী দোকান আছে। ওস্মানের পিতা দোকানের আয়ে সুখস্বচ্ছন্দে দিন কাটাইয়া যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। ওস্মান পিতার একমাত্র পুত্র, সংসারে এক বিধবা মাতা ভিন্ন তাহার অন্য আত্মীয় স্বজন কেহ নাই, তবু সে বিবাহ করিল না।

মা ছেলেকে বিবাহের জন্য কত পীড়াপিড়ি করিলেন কিন্তু ছেলে তাহাতে কর্ণপাত করিল না। ওস্মান পিতার মৃত্যুর পর কতকটা উদাসীনের মত হইয়া উঠিয়াছিল। তারপর লালবাগের এক ফকিরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সে সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া গেল।

জানি না কেন ঐ ফকিরের কামিনীর প্রতি বড়ই ঘৃণা ছিল। তিনি শিষ্য-গণকে শিক্ষা দিতেন স্ত্রীলোকই যত অনর্থের মূল, স্ত্রীলোক না থাকিলে সংসারে পাপ থাকিত না, পুরুষকে শাস্তি দিবার জন্যই স্ত্রীলোকের সৃষ্টি। কোরাণে লেখা আছে—"স্ত্রীলোক সয়তানের সহচরী, উহার চুল লম্বা কিন্তু বুদ্ধি খাট।" ওস্মান এই গুরুবাক্য যে দিন শুনিল সেই দিন হইতে সে স্ত্রীলোককে সর্পের মত ভয় করিতে লাগিল। বিবাহ করা তো দূরের কথা সে স্ত্রীলোকের নাম শুনিতে পারিত না। গুরুর আদেশের নিকট জননীর কাতর ক্রন্দন ব্যর্থ হইল। স্ত্রীলোকের প্রতি তাহার ঘৃণা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ওস্মানের

পিতার এক বন্ধু ছিলেন, তাঁহার দুই পত্নী ছিল। তাঁহার মুখে তদীয় দাম্পত্য জীবনের দুঃখময় কাহিনী শুনিয়া ওস্‌মান বুঝিতে পারিল সত্যই "স্ত্রীলোক সয়তানের সহচরী"; কোরাণের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

ওস্‌মান কোরাণ পড়ে নাই। কোরাণে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে ফকিরের কথিত উক্তি আছে কি না তাহা জানিবার জন্য তাহার বিশেষ কৌতূহলও জন্মিল না। গুরুর কথাই সে বিশ্বাস করিল এই কোরাণের উপদেশ বাক্যটী ওস্‌মানের এমনি মনোমত হইয়াছিল যে সে উহা একখানি কাষ্ঠফলকে নানা বর্ণে অঙ্কিত করাইয়া তাহার দোকানের সম্মুখে ঝুলাইয়া দিল।

যে দিন ওস্‌মান পূর্ব্বোক্ত কাষ্ঠফলক দোকানের সম্মুখে ঝুলাইল সেই দিন বাজারে একটু বেশ আন্দোলন হইল। বহুলোক ঐ কোরাণের বাক্য পড়িল এবং সকলই স্বীয় স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল। সেই সকল মন্তব্য যে ওস্‌মানের মনঃপুত হইল না তাহা বলাই বাহুল্য। ওস্‌মানের মা পুত্রের 'মটো'র কথা শুনিয়া তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ফকিরকে গালি দিলেন "ঐ বেটা নিশ্চয় গাধার গর্ভে জন্মিয়াছে স্ত্রীলোকের গর্ভে জন্মে নাই।"

ওস্‌মানের কোরাণ-বাক্যের কথা যে অনেক আন্দর মহলেও পৌঁছিয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ওস্‌মান্ এক সপ্তাহের মধ্যে অনেক অজ্ঞাতনামা মহিলার নিকট হইতে তীব্র গালি পূর্ণ চিঠি প্রাপ্ত হইল। কিন্তু সে তাহাতে বিচলিত হইল না। ঐ সকল চিঠি অগ্নিদেবকে উপহার দিয়া ওস্‌মান নিশ্চিন্ত হইল।

২

উক্ত ঘটনার কিছুদিন পর দুইটী রমণী আপাদমস্তক বস্ত্রে আবৃত করিয়া ওস্‌মানের দোকানে প্রবেশ করিল। একটী স্ত্রীলোক অতিশয় মূল্যবান বেশ ভূষায় সজ্জিত ছিলেন, তাহাকে দেখিয়া ধনী গৃহের মহিলা বলিয়া বোধ হইল। অপর স্ত্রীলোকটী তাঁহার পরিচারিকা। ওস্‌মান স্ত্রীলোক দুইটিকে দোকানের ভিতরে লইয়া গিয়া আদর করিয়া বসাইল।

পরিচারিকা তাহার কর্ত্রীর কথা মত মস্‌লিন দেখাইতে আদেশ করিল। ওস্‌মান্ তাহার দোকানের যত মূল্যবান বস্ত্র ছিল সব আনিয়া আগন্তুক দিগের সম্মুখে স্থাপন করিল। ওস্‌মান দাম বলিয়া এক এক খানি মস্‌লিন বস্ত্র পরিচারিকার সম্মুখে রাখিতে লাগিল আর সে তাহার কর্ত্রীকে দেখাইতে লাগিল। কিন্তু ঐ সুন্দরী বস্ত্র অপেক্ষা বস্ত্র বিক্রেতাকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য

করিতে ছিলেন। তাঁহার উজ্জল সুনীল বিশাল নয়ন যুগল ওস্‌মানের নয়নের সহিত প্রতিমুহূর্ত্তে মিলিত হইতেছিল। ঐ মহিলা একবার যখন অবনত হইয়া কাপড় দেখিতেছিলেন তখন সহসা তাহার রেশমী অবগুণ্ঠন খুলিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। তিনি ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি ঘুম্‌টা তুলিয়া পুনরায় পরিধান করিলেন। এক মুহূর্ত্তের জন্য ওস্‌মানের নয়ন সম্মুখে যেন বিদ্যুল্লতা চমকিয়া গেল। ওস্‌মান রমণীর সহাস্য সুন্দর বদন চন্দ্রমা দেখিয়া ক্ষণকালের জন্য আত্মবিস্মৃত হইল। তাহার শিরায় শিরায় তাড়িত প্রবাহ ছুটিল। এরূপ অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ওস্‌মান জীবনে কখনও অনুভব করে নাই।

মহিলা কোন বস্ত্র ক্রয় করিলেন না। পরিচারিকা বলিল তাহারা শীঘ্রই আর এক দিন আসিবে। ওস্‌মান ভাবিল "আজ কাপড় কিনা হয় নাই ভালই হইয়াছে। আর একদিন এই সুন্দরীর দেখা পাওয়া যাইবে।" সে অপরিচিতা রমণীদিগেকে রাস্তা পর্য্যন্ত অনুসরণ করিল এবং ঐ সুন্দরী মহিলাকে সুদীর্ঘ সেলাম করিয়া দোকানে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। ওস্‌মান তিনটী সুদীর্ঘ দিন অপেক্ষা করিয়া রহিল কিন্তু উহারা আসিল না; সে নিরাশ হইয়া পড়িল। "আর সেই পরী আসিবে না, আর তাহার দেখা পাওয়া যাইবে না।" ওস্‌মানের কিছু ভাল লাগে না।

চতুর্থ দিন উক্ত দুই স্ত্রীলোক আসিয়া ওস্‌মানের দ্বারে দেখা দিল। ওস্‌মান তাহাদিগকে দেখিয়াই চিনিল, সে অতি যত্নের সহিত তাহাদিগকে দোকানের ভিতর লইয়া গেল। মহিলা সে দিনও ওস্‌মানের উপর অনবরত মধুর কটাক্ষ বর্ষণ করিতেছিলেন, ওস্‌মান যুবতীর কৃপাদৃষ্টি লাভকরিয়া আহ্লাদে আত্মহারা হইয়া গেল।

যুবতী যখন মস্‌লিন পছন্দ করিতে ছিলেন তখন ওস্‌মান পরিচারিকাকে ডাকিয়া কক্ষান্তরে লইয়া গেল এবং হাতে একটী টাকা প্রদান করিয়া তাহার কর্ত্রীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। পরিচারিকা বলিল,—"সাহেব ক্ষমা কর; আমার কর্ত্রীর পরিচয় বলা নিষেধ, তিনি বড় ঘরের মেয়ে গোপনে ছদ্মবেশে এখানে আসিয়াছেন।" ওসমান দাসীর হাতে আর একটী টাকা গুজিয়া দিয়া অনেক মিনতি করিল, দাসীর তখন দয়া হইল। সে বলিল "এই যুবতী সৈয়দ আবদুল হোসেন সাহেবের কন্যা সাবধান এ কথা যেন ঘুণাক্ষরেও কেহ জানিতে না পারে।" ওস্‌মান খোদার নাম লইয়া শপথ করিল এবং দাসীর হাতে আরও একটী রজত মুদ্রা প্রদান করিয়া তাহাকে পরদিন আসিতে অনুরোধ করিল। দাসী স্বীকৃত

হইল। অতঃপর স্ত্রীলোকেরা একখানি মসলিন বস্ত্র ক্রয় করিয়া প্রস্থান করিল। যাইবার সময় সেই মহিলা ওসমানের প্রতি সহাস্য কটাক্ষ বর্ষণ করিয়া তাহাকে অনুগৃহীত করিতে ভুলিলেন না।

দাসী নিমকহারাম ছিল না পরদিন প্রাতে সে ওসমানের দোকানে উপস্থিত হইল। ওসমান দাসীকে দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইল সে সেই সুন্দরীর সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল। দাসী সংক্ষেপে বলিল—"সাহেব, আমি খাটি কথা বলিতেছি, আমার কর্ত্রী তোমাকে ভালবাসেন; কিন্তু তা হইলে কি হইবে? তার বাপ বড়ই খারাপ লোক, সে আবার নূতন বিবাহ করিয়াছে, এই মেয়েকে এখন আর দেখিতে পারেন না। লোকটা এমন ধূর্ত্ত যে সে নিজ স্বার্থের জন্য মেয়ের বিবাহ দেয় না। মেয়ে বহু টাকা মূল্যের সম্পত্তি পাইবে; পাছে তাহাকে বিবাহ দিলে সে উক্ত সম্পত্তি দাবী করে এই ভয়েই তার বিবাহের প্রস্তাব আসিলে আগেই বলে আমার মেয়ে কুৎসিৎ আর উহার মেজাজ বড় ভাল নয়।" পিতার মুখে মেয়ের দোষের কথা শুনিয়া কেহ এই যুবতীকে বিবাহ করিতে চায় না। তুমি যদি সত্যই উহাকে ভালবাসিয়া থাক তাহা হইলে ঐ সকল কথা শুনিও না।"

এই সকল আলাপ সালাপের পর দাসী প্রস্থান করিল ওসমানও দোকান বন্ধ করিয়া গৃহে গমন করিল।

৩

ওসমান কোরাণের উপদেশ ভুলিয়া গেল। সে সেই রূপসী-রমণী-রত্ন লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইল। বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া ওসমান মাকে তাহার বিবাহ করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। জননী ছেলের মত পরিবর্ত্তনে পরম আহ্লাদিত হইলেন কিন্তু যখন শুনিলেন ওসমান আবদুল হোসেনের মেয়েকে বিবাহ করিতে সংকল্প করিয়াছে তখন তিনি অতিশয় বিস্মিত হইলেন। মা বলিলেন—"বাবা ওসমান, সেই মেয়ে অতিশয় কুৎসিৎ আর কিছু পাওয়া টাওয়ারও আশা নাই হোসেন বড়ই কৃপণ।" ওসমান কোন কথাই গ্রাহ্য করিল না।

ওসমান একদিন স্বয়ং আবদুল হোসেন সাহেবের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া বিবাহের প্রস্তাব করিল। হোসেন ওসমানের পিতাকে চিনিতেন তাঁহার আর্থিক অবস্থাও জানিতেন। তিনি ওসমানের প্রস্তাব নিতান্ত অসঙ্গত মনে করিলেন না। হোসেন তাহাকে বলিলেন—"এ সম্বন্ধে আমার আপত্তি নাই কিন্তু আমি বাপু তোমাকে পূর্ব্বেই বলিতেছি আমার মেয়ে খাদিজা তেমন সুন্দরী নয়, আর তাহার মেজাজ কিছু উগ্র।"

ওস্‌মান বিনীত ভাবে বলিল—"সাহেব, আপনি পূর্ব্বে বলিয়া সাধুতার কাজই করিয়াছেন কিন্তু আমি সৌন্দর্য্য অপেক্ষা বংশ মর্য্যদার বিশেষ পক্ষপাতী, আমার পিতা উচ্চকুলের দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতেন। আর স্বভাবের কথা যে বলিয়াছেন তাহা বেশী দিন থাকিবে না. বয়সের সঙ্গে স্বভাবেরও পরিবর্ত্তন হয়!

হোসেন—"তা ঠিক বলিয়াছ বাবা, ধন জন গেলে আবার হয় কিন্তু কুলের গৌরব একবার নষ্ট হইলেই চিরদিনের জন্য গেল। মাথা নীচু করিতে নাই।" ওস্‌মানের বংশ গৌরব রক্ষার আগ্রহ দেখিয়া হোসেন আহ্লাদিত হইলেন। ওস্‌মান মনে ভাবিল বড়ই কৌশলে সাহেবকে আবদ্ধ করা গিয়াছে, আর তাহার মেয়ে বিবাহ অসম্মতি করিবার উপায় নাই।

হোসেন কিছুক্ষণ পর গম্ভীর ভাবে বলিলেন—বাপু আর এক কথা, তুমি যদি মনে করিয়া থাক এই বিবাহে প্রচুর অর্থ লাভ করিবে তাহা হইলে ভুল করিয়াছ। আমি যৌতুক কিছুই দিতে পারিব না।

ওস্‌মান—আমি খোদার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি আমার অর্থ লোভ নাই আমি এক কপর্দ্দকও যৌতুক গ্রহণ করিব না।

হোসেন—তবে আমি মেয়ে বিবাহ দিতে রাজি হইলাম কিন্তু বিবাহ এক সপ্তাহ মধ্যে হইবে।

ওস্‌মানও তাহাই চায়।

শুভদিনে খাদিজার সহিত ওস্‌মানের বিবাহ হইয়া গেল; বিবাহের পর ওস্‌মান যখন স্বীয় পত্নীকে দেখিল তখন সে বিস্ময়ে ঘৃণায় ও ক্রোধে অবিভূত হইয়া গেল। খাদিজা যারপর নাই কুরূপা। যে যুবতী দোকানে গিয়াছিল তাহার দাসীও এরচেয়ে অধিক সুন্দরী। ওস্‌মান ভাবিল নিশ্চয় জুয়াচোর হোসেন তাহাকে প্রতারণা করিয়াছে। কিন্তু যখন অনুসন্ধান করিয়া জানিল খাদিজাই হোসেনের একমাত্র কন্যা তখন সে অতিশয় লজ্জিত ও দুঃখিত হইল। কিন্তু সে মনের ভাব কাহাকেও প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিল না। ওস্‌মান বুঝিতে পারিল সেই চতুরা স্ত্রীলোক দুইটিই তাহাকে প্রতারিত করিয়াছে। এ দিকে খাদিজা দুই দিন যাইতে না যাইতেই ওস্‌মানের মা চাকর চাকরাণীর সহিত ঝগড়া করিতে আরম্ভ করিল। ওস্‌মানের শান্তিপূর্ণ স্নিগ্ধ গৃহে দুই দিনের মধ্যেই উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। ওস্‌মান সব দেখিয়াও নীরব। বেচারি নিজের অদৃষ্ট ভিন্ন আর কাহাকে গালি দিবে। তখন তাহার মনে হইতে লাগিল ফকির যা বলিয়াছেন ঠিক কথা—স্ত্রীলোক সত্যই সয়তানের সহচরী।

৪

হতভাগ্য ওস্‌মান অতি কষ্টে দিন কাটাইতে লাগিল। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও সেই দুই স্ত্রীলোকের কোন সংবাদ পাইল না। এখন কিরূপে সে তাহার স্ত্রীরত্নকে পরিত্যাগ করিবে সেই চিন্তা করিতে লাগিল। মুসল্‌মানদিগের মধ্যে "তালাক" দেওয়া যদিও আইন ও ধর্ম্ম সঙ্গত তবু কোন দোষ না দেখাইয়া তো 'তালাক' দেওয়া চলে না। খাদিজার পিতা তো পূর্ব্বেই বলিয়াছিল তাহার মেয়ে কুরূপা, আর মেজাজও ভাল নয় সুতরাং তাহাকে কোন দোষ দেওয়াও যায় না।

ওস্‌মানের কাজ কর্ম্ম কিছুই ভাল লাগে না সে দোকানে বসিয়া কেবল নিজ দুরদৃষ্টের কথা ভাবে। একদিন ওস্‌মান দোকানে বসিয়া আছে এমন সময় সে দেখিতে পাইল সেই দুই স্ত্রীলোক তাহার দোকানের দিকে আসিতেছে। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া তাহাদিগকে ঘরে লইয়া আসিল। ওস্‌মান পূর্ব্বে সংকল্প করিয়াছিল এই দুই স্ত্রীলোককে পাইলেই সে প্রতারণার উপযুক্ত শাস্তি দিবে তার পর কপালে যা থাকে হইবে। কিন্তু সুন্দরীকে দেখিয়া ওস্‌মানের ক্রোধ চলিয়া গেল সে সেই যুবতীকে বিনীত ভাবে বলিল "আপনি কেন অকারণ আমার সর্ব্বনাশ করিলেন! আমার রাত্রি দিন অশান্তি। লজ্জায় কাহাকেও মুখ দেখাইতে পারি না।"

এই কথাগুলি বলিতে ওস্‌মানের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। যুবতী ঘুম্‌টা ফেলিয়া দিয়া ওস্‌মানের নিকট গেল এবং ধীরভাবে বলিল—"দেখুন আপনি স্ত্রীজাতির নিন্দা করিয়া যে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন তাহারই প্রতিশোধ লইবার জন্য এই প্রতারণা করিয়াছি।"

ওস্‌মান বলিল কোরাণে যে কথা আছে আমি তাহাই লিখিয়াছি। আমার দোষ কি? দুষ্টা খাদিজার যন্ত্রণায় তো কেহ বাড়ী থাকিতে পারিতেছে না।

স্ত্রীলোক দুইটী ওস্‌মানের কথা শুনিয়া হাসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। ওস্‌মান সজল নয়নে উহাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

যুবতীর হাসির উচ্ছ্বাস থামিলে তিনি ওস্‌মানের হাত ধরিয়া সদয় হৃদয়ে বলিলেন—আপনাকে খাদিজার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভের এক উপায়ের কথা বলিয়া দিতে পারি। তাহাতে সব দিক বজায় থাকিবে, হোসেনও অসন্তুষ্ট হইবেন না এবং আপনারও অর্থ লাভ হইবে।

ওস্‌মান আগ্রহের সহিত বলিল কি উপায় আছে সত্বর বলুন।

যুবতী—আপনার দরজার সম্মুখে যে বিজ্ঞাপন রাখিয়াছেন তাহা তুলিয়া

কাটিতে হইবে এবং তাহার স্থানে লিখিতে হইবে "রমণী স্বর্গের দেবী, তাহার চুল যেমন লম্বা বুদ্ধিও তেমনি তীক্ষ্ণ।" আমার কথায় স্বীকৃত হইলে বলিব নতুবা নয়।

ওসমান—তাহা হইলে যে আমি আর কাহাকেও মুখ দেখাইতে পারিব না। ফকির সাহেব কি বলিবেন? লিখাটা বরং তুলিয়া লইতে পারি।

যুবতী একটী মধুর কটাক্ষ করিয়া বলিল—না, তা হইলে খাদিজাকে লইয়াই সুখে ঘর করুন।

ওসমান একবার প্রতারিত হইয়া বড়ই সতর্ক হইয়াছিল। সে এই সুচতুরা মহিলাকে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিতে পারিল না। সে মনে ভাবিতে লাগিল এই যুবতী কৌশলে তাহার লিখা বদলাইয়া লইতে আসিয়াছে, শেষে পেয়াজ পয়জার দুইই হইবে।

ওসমান বলিল—"আপনি আবার কোন কৌশলে আমাকে জব্দ করিতে আসিয়াছেন।" যুবতী স্বীয় মৃণাল বিনিন্দিত শুভ্র বাহু যুগল ওসমানের স্কন্ধে স্থাপন করিয়া বলিল—"সাহেব স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আপনার বড়ই ভ্রম ধারণা জন্মিয়াছে। রমণীকে এমন নীচ ভাবিবেন না। আমার কথায় সম্মত হইলে নিশ্চয় আপনাকে খাদিজার হাত হইতে মুক্ত করিয়া দিব।" ওসমান অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতীর স্পর্শ-সুখ অনুভব করিয়া একবারে গলিয়া গেল। তাহার মনে একটী ভরসাও হইল সে যুবতীকে বলিল—"আমি আপনার কথা মত কাজ করিতে প্রস্তুত আছি যদি আপনি আমার একটী অনুরোধ রক্ষা করিতে রাজি হন।

যুবতী—কি অনুরোধ বলুন।

ওসমান—আপনি যদি আমাকে বিবাহ করিতে রাজি হন তাহা হইলেই আপনার কথা মত কাজ করিতে আমার আপত্তি থাকিবে না।

রসিকা যুবতী কৌতুক করিয়া বলিল—বলেন কি খাদিজার জ্বালায়ই আপনি অস্থির আমাকে বিবাহ করিলে তো দেশ ছাড়িতে হইবে।

ওসমান—না, না, কিছুতেই নয়। আপনাকে পাইবার জন্যই এই লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছি।

যুবতী—আমি খাদিজাকে আপনার কাঁধ হইতে নামাইতেছি, কিন্তু তার পর আমাকে ছাড়াইবার জন্য ওঝা পাইবেন তো?

ওসমান গভীর আবেগের সহিত যুবতীর কর পল্লব দ্বয় ধারণ করিয়া বলিল আপনি আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়, যে দিন আপনাকে দেখিয়াছি সেই দিনই আপনাকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছি। বলুন আপনি আমার হইবেন।

যুবতী—হইব।

ওস্মান —দোহাই খোদার, আপনার কথা মিথ্যা হইবে না।

যুবতী—না।

ওস্মানের মুখ প্রফুল্ল হইল, সে বলিল—আপনি যে ভূত ঘাড়ে চাপাইয়াছেন এখন তাহাকে নামাইবার উপায় করুন।

যুবতী—সে জন্য আপনার চিন্তা করিতে হইবে না। আমি সব ঠিক করিয়া দিব।

ওস্মান—যদি গাছের ভূত বাসা ছাড়িতে রাজি না হয়।

যুবতী—এক গাছে দুই ভূত আশ্রয় লইবে না। এখন সিন্নি মানত করুন।

ওস্মান—পাঁচশত টাকার হার।

যুবতী—এখন হইবে। আমি কাল ঠিক এই সময়ে আসিব। তখন ব্যবস্থা করিব, এখন আসি।

৫

পর দিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে যুবতী ওস্মানের দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ওস্মান তাহাকে দেখিয়া কতকটা আশ্বস্ত হইল। যুবতী বলিল আজ আপনাকে তিন চার জন কদাকার ভিক্ষুক সংগ্রহ করিতে হইবে। উহাদিগকে পয়সা দিয়া বাধ্য করিবেন। তারপর বলিয়া রাখিবেন আপনি পরশু যখন হোসেন সাহেবের বাড়ীতে খানা খাইতে বসিবেন তাহারা গিয়া আপনার কাছে উপস্থিত হইবে এবং কেহ ভাই, কেহ খুড়া, কেহ মাতুল এরূপ পরিচয় দিবে। হোসেন অতিশয় গর্ব্বিত লোক, বংশ মর্য্যাদার অভিমান তাহার বড়ই প্রবল। নীচ বংশীয় ভিক্ষুকদিগের সহিত যাহার সম্বন্ধ এইরূপ লোককে সে জামাতা বলিয়া পরিচয় দিতে কখনই রাজি হইবে না। হোসেন ক্রুদ্ধ হইয়া নিশ্চয় তাহার মেয়েকে পরিত্যাগ করিবার জন্য পীড়াপিড়ি করিবে। আপনি সহজে স্বীকৃত হইবেন না। যখন সে প্রচুর টাকা দিতে চাহিবে তখনই আপনি রাজি হইবেন।

ওসমান যুবতীর অসামান্য বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া বিস্মিত ও সন্তুষ্ট হইল। পরদিন সে তাহার কথা মত সব ঠিক করিয়া রাখিল। তারপর যে দিন ওস্মান হোসেন সাহেবের বাড়ীতে গিয়া খানা খাইতে বসিল সে দিন ৩।৪ জন ভিক্ষুক ঘরে প্রবেশ করিয়া ওস্মানের পাশে গিয়া বসিল। হোসেন তাহাদিগকে দেখিয়া বড়ই বিস্মিত এবং ক্রুদ্ধ হইলেন। ঐ সকল লোকদিগকে তাড়াইয়া দিতে তিনি তাহার চাকরকে আদেশ করিলেন। তখন তাহারা কেহ

বলিল 'ওস্‌মান আমার ভাগিনেয়' কেহ বলিল 'ও আমার ভাই।'

হোসেন সাহেব তো রাগিয়া একেবারে অস্থির। তাহার রাগ তখন জামাতার উপর। সে গর্জ্জন করিয়া বলিল ওসমান তুমি উহাদিগকে ওখানে আসিতে দিলে কেন? ওসমান বলিল—"সাহেব আমি নিষেধ করিব কিরূপে? উহারা আমার আত্মীয়. আপনি উহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া আমাকে অপমানিত করিতেছেন।"

হোসেন—আমি নিতান্ত বোকা, তাই তোমার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না জানিয়া আমার মেয়ে বিবাহ দিয়াছি। আমি এখন মুখ দেখাইব কিরূপে?

ওসমান—সাহেব! আমি আমার আত্মীয়দেরে কিরূপে ছাড়িব?

হোসেন—তোমার আত্মীয়কে ছাড়িয়া কাজ নাই, আমার মেয়েকে তুমি তালাক দাও।

ওস্‌মান বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিল—সে কি কথা আমার স্ত্রীকে অকারণ পরিত্যাগ করিব। তাহার অপরাধ কি? তা কি হয়?

হোসেন—আমি তোমাকে দুই হাজার টাকা দেই তুমি খাদিজাকে তালাক দাও। আমি তাহাকে সম্মত করাইব।

ওস্‌মান মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল—তবে আপনার কথায় অমত করি কিরূপে? কিন্তু তালাকটা অতি সত্বর—লোকে জানিবার পূর্ব্বে গোপনে হওয়া ভাল। উভয়েরই সম্মান থাকিবে।

হোসেন—নিশ্চয় নিশ্চয়। কালই কাজ শেষ হইবে।

পর দিবস খাদিজার পিতা আসিয়া তাহাকে গৃহে লইয়া গেলেন। দুই দিন পরে ফতেমা নাম্নী পূর্ব্বোক্তা সুন্দরী যুবতীর সহিত ওস্‌মানের বিবাহ সম্পন্ন হইল।

সমাপ্ত।

—※—

৮ম বর্ষ } ময়মনসিংহ, শ্রাবণ, ১৩১৫। { ৮ম সংখ্যা।

আরতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

মা

এসেছি তোমারি ডাকে ব্যাকুল হিয়ায়
সংসারের খেলা-ঘর চরণে দলিয়া,
ক্ষুদ্র সুখ, ক্ষুদ্র তৃপ্তি আর কেবা চায়?
মূর্খ সেই ক্ষুদ্র কাজে যে থাকে ভুলিয়া।

কঠোর দারিদ্র্য-ব্রত করেছি গ্রহণ,
চাহি না ক্ষণিক শান্তি, তুচ্ছ ধন-মান;
দিয়েছ পতাকা তব করিতে বহন,
কি আছে গৌরব আর ইহার সমান?

যে পারে মায়ের পাশ করিতে ছেদন
চির বরণীয় সেই মানব-সমাজে;
—সেও ধন্য, দেয় যেই আহুতি জীবন
বিফল প্রয়াস করি জননীর কাজে।

অভয় দিয়েছ তুমি কি ভয় মরণে?
লহ মা, জীবন-অর্ঘ্য দিতেছি চরণে।

—দীন-সন্তান।

নাইট্রোজেন।

সমুদ্রজলে যেমন লবণ, তেমন আকাশস্থ বায়ুতে নাইট্রোজেন প্রচুর পরিমাণে আছে। বায়ুর পাঁচ ভাগের চারি ভাগ নাইট্রোজেন। আমরা অক্সিজেন প্রবন্ধে দেখাইয়াছি অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন মিশ্রিত না থাকিলে আমাদের জীবন অতি অল্প সময়ে ক্ষয় হইয়া যাইত।

কোনও আবদ্ধ কাচপাত্রে পারদ রাখিয়া তাপ দিলে পারদ মরিচায় পরিণত হয় এবং কাচপাত্রে নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। দীপশলাকা এই কাচপাত্রে প্রবেশ করাইয়া দিলে নিবিয়া যায়। নাইট্রোজেন অগ্নি পোষণ করে না। এ বিষয়ে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন বিরুদ্ধ প্রকৃতির।

এমোনিয়া জলের উপর একটী জলভরা কাচের নল বসাও এবং জলের মধ্যে ক্লোরিণ বাস্প প্রবেশ করাও। ক্রমে ঐ কাচের নলে নাইট্রোজেন বাস্প সঞ্চিত হইবে। এই উপায়ে বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন পাওয়া যাইবে। এই পরীক্ষাটী অতি সাবধানতার সহিত করিতে হইবে। এমোনিয়াতে তিন ভাগ হাইড্রোজেন ও এক ভাগ এমোনিয়া আছে। এমোনিয়ার সহিত ক্লোরিণ মিশ্রিত হইলে একদিকে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড্ ও অপর দিকে নাইট্রোজেন বাস্প প্রস্তুত হয়। জলে অপেক্ষাকৃত অধিক এমোনিয়া থাকিলে নাইট্রোজেন ক্লোরাইড্ প্রস্তুত হইবার আশঙ্কা আছে। নাইট্রোজেন ক্লোরাইড্ দেখিতে হরিদ্রা বর্ণ তৈলের ন্যায় পদার্থ, অত্যন্ত বিস্ফোটক।

নিশাদলের জলের উপর কাচপাত্রে ভরা ক্লোরিণ স্থাপন করিলে নাইট্রোজেন ক্লোরাইড্ প্রস্তুত হইয়া নীচে পড়িতে থাকে। নাইট্রোজেন ক্লোরাইডের গায়ে তৈল, মোম অথবা রজন লাগিবামাত্র অতি জোরে ফাটিয়া যায়। রাসায়নিক পরীক্ষা সময়ে অতি সাবধানতা ব্যতীত ইহা প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করা সঙ্গত নহে।

নাইট্রিক এসিডের মধ্যে এক ভাগ হাইড্রোজেন, এক ভাগ নাইট্রোজেন ও তিন ভাগ অক্সিজেন আছে। সোরা অথবা সোডিয়াম নাইট্রেটের সহিত তেজাপ্ত মিশাইয়া চোয়াইয়া নিলেই নাইট্রিক এসিড প্রস্তুত হয়।

নাইট্রিক এসিডের ভিতর তামা ফেলিয়া দিলে নাইট্রাস ধূম নির্গত হয়। এই নাইট্রাস ধূম প্রাণনাশক।

মলমূত্র ইত্যাদি জান্তব পদার্থে নাইট্রোজেন প্রচুর পরিমাণে থাকে। ছাইয়ের

মধ্যে পোটাসিয়াম কার্ব্বোনেট্ পাওয়া যায়। ছাইয়ের জল ও গলিত জান্তব পদার্থ ও বায়ুস্থ অক্‌সিজেন মিলিত হইয়া সোরা অর্থাৎ পোটাসিয়াম নাইট্রেট্ প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষের মাটিতে নানাস্থানেই সোরা পাওয়া যায়। শীতকালে দালানের গায় যে সাদা সাদা গুড়া দেখা যায় তাহা সোরা ব্যতীত আর কিছুই নহে। দালানের গায় সোরা প্রস্তুত হইলে তাহাকে লোণাধরা বলে। গোয়াল ঘরে, মূত্র পরিত্যাগ করার স্থানে সোরা জন্মে। পশ্চিম প্রদেশে মুনিয়া নামক এক জাতি আছে যাহারা পূর্ব্বে সোরা মিশ্রিত মাটি সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করিত। এখন প্রকৃতিজাত সোরা অপেক্ষা কৃত্রিম সোরা বাজারে অধিক বিক্রয় হয়। নেপোলিয়ান বোনাপার্টের সময়ে ফরাসী দেশে কৃত্রিম উপায়ে প্রথমতঃ সোরা প্রস্তুত হইয়াছিল। যুদ্ধের সময় বিদেশ হইতে সোরার আমদানি হ্রাস হইলে নেপোলিয়ান ফরাসী বৈজ্ঞানিকদিগকে কৃত্রিম উপায়ে সোড়া প্রস্তুত করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন।

কৃত্রিম উপায়ে সোরা প্রস্তুত করিতে সহরের বাহিরে কোনও স্থানে ছায়ার নীচে সহরের সমুদয় জান্তব পদার্থ সঞ্চয় করা হয়। এবং তাহা ক্রমে গলিত অবস্থায় পরিণত হইলে তাহাতে চুণ ও মূত্র নিক্ষেপ করা হয়। এইগুলি বায়ুস্থ অক্‌সিজেনের সংস্পর্শ পাওয়ার জন্য উলট-পালট করিয়া দিতে হয়। এই উপায়ে প্রচুর পরিমাণে কেলসিয়াম নাইট্রিট জন্মে। গলিত পদার্থের মধ্যে এখন জল ঢালিয়া দিলে কেলসিয়াম নাইট্রেট জলের সহিত মিশিয়া নামিয়া আসিবে। কেলসিয়াম নাইট্রের জলে ছাইয়ের জল যাহাতে পোটাসিয়াম কার্ব্বোনেট্ থাকে অথবা বিশুদ্ধ পোটাসিয়াম কার্ব্বোনেট দিলে একদিকে চক প্রস্তুত হইয়া নীচে পরে ও পোটাসিয়াম নাইট্রেট প্রস্তুত হইয়া জলের সহিত মিশিয়া থাকে। এই জল অগ্নিতাপে উড়াইয়া দিলে সোরা প্রস্তুত হয়। সোড়াতে দুই ভাগ পোটাসিয়াম, এক ভাগ নাইট্রোজেন ও তিন ভাগ অক্‌সিজেন আছে।

সোরার মধ্যে জ্বলন্ত অঙ্গার নিক্ষেপ করিলে প্রবল বেগে জ্বলিতে থাকে ও সোরা পোটাসিয়াম কার্ব্বোনেটে পরিণত হয়।

নিশাদলের মধ্যে একভাগ নাইট্রোজেন চারিভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ ক্লোরিণ আছে। ইতিপূর্ব্বে উটের বিষ্ঠা হইতে নিশাদল প্রস্তুত হইত; এখন প্রধানতঃ গ্যাস কারখানায় প্রাপ্ত এমোনিয়া জল হইতে ও কতকটা জান্তব গলিত পদার্থ হইতে প্রস্তুত হয়।

নিশাদলের সহিত চুণ মিশাইলে এমোনিয়া পাওয়া যায়। এমোনিয়া বাষ্পে

তিনভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ নাইট্রোজেন আছে। নিশাদলের সহিত মিশিলে কেলসিয়াম ক্লোরাইড পড়িয়া থাকে ও এমোনিয়া উড়িয়া যায়। তাপযোগে এই কার্য্য দ্রুত সম্পাদিত হয়। কেলসিয়াম ক্লোরাইডকে ব্লিচিং পাউডার বলে। কেলসিয়াম ক্লোরাইডে এসিড দিলে ক্লোরিণ নির্গত হয়। উদ্ভিদজাত রঙ্গে ক্লোরিণ লাগিলে সাদা হইয়া যায়। ক্লোরিণ বিষাক্ত পদার্থ। বায়ুতে মিশ্রিত হইলে বীজানু নষ্ট করে। কেলসিয়াম ক্লোরাইড কোনও পাত্রে করিয়া ঘরে রাখিয়া দিলে বায়ু হইতে তাহাতে কার্ব্বন দ্বি অক্‌সাইড লাগিয়া ধীরে ক্লোরিণ প্রস্তুত হয়। ইহাতে বায়ুর বীজানু নষ্ট হইয়া পরিষ্কৃত হয়।

বৃক্ষ ও জীব শরীরের সৃষ্টি বৃদ্ধি ও সংরক্ষণে নাইট্রোজেন অতি আবশ্যকীয় পদার্থ। নাট্রোজেন সাহায্যে বর্ত্তমান সময়ে ক্ষেত্রে সার দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। সোরা, গোময় বৃক্ষাদির সার তাহা পূর্ব্বেও জানা ছিল। আমাদের দেশে কৃষকেরা গোবর ও ছাই ক্ষেত্রে ব্যবহার করিয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে এক প্রকার বীজাণুর আবিষ্কার হইয়াছে তাহা বায়ু হইতে নাট্রোজেন সংগ্রহ করে। ছিম জাতীয় গাছের গোরায় এই বীজাণু পাওয়া যায়। নাইট্রোজেন বীজাণুদ্বারা ক্ষেত্রে টিকা দিলে শস্য প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

বর্ত্তমান সময়ে বৈজ্ঞানিকেরা বায়ু হইতে বিদ্যুতের সাহায্যে নাইট্রিক এসিড্ প্রস্তুত করার প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন।

খুর, নখ, চামের টুক্‌রা ইত্যাদি জান্তব পদার্থ হইতে পোটাসিয়াম সায়ানাইড্ প্রস্তুত হয়। পোটাসিয়াম সায়ানাইডের সহিত নাইট্রিক্ এসিড্ মিশ্রিত করিলে হাইড্রোসায়ানিক এসিড্ বাষ্প প্রস্তুত হয়। এই বাষ্প সাংঘাতিক বিষ। ইহার সামান্য অংশ নাকে প্রবিষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে। শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেরাও উৎকৃষ্ট বিজ্ঞানাগার ব্যতীত ইহা প্রস্তুত করিতে সাহস করেন না।

নাইট্রিক এসিডের মধ্যে পারদ, রৌপ্য ইত্যাদি ধাতু নিক্ষেপ করিলে ধাতু হাইড্রোজেনের স্থান অধিকার করে ও ধাতব নাইট্রেট্ প্রস্তুত হয়। পোটাসিয়াম নাইট্রেট্, সোডিয়াম্ নাইট্রেট্ ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। তুলা, কাগজ ইত্যাদি নাইট্রেটেড্ হইলে কলোডিয়ন গানকটন প্রস্তুত হয়। কলোডিয়ন হইতে কৃত্রিম রেসম ও সেলোলুজ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মজুমদার।

অবিশেষ তন্মাত্র।

পাশ্চাত্য মায়াবাদী Idealistic দার্শনিকদিগের কয়েকটি মত আছে। তন্মধ্যে একটি মত Subjective Idealism—উহার মর্ম্ম এই যে বহির্জগতের বস্তুতঃ কোনও অস্তিত্ব নাই, তাহা কেবল মনঃকল্পিত ভাব মাত্র। অর্থাৎ বহির্জগৎ সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা আমরা যে জ্ঞান লাভ করি সেই জ্ঞানের অনুরূপ প্রকৃত পক্ষে কোনও পদার্থ নাই, তাহা মনের বিকার মাত্র। এই সংসার কেবল প্রহেলিকাময়;—মানসিক ভাব ব্যতীত তাহা আর কিছুই নহে। অপর আর একটি মত Objective Idelaism or Realism—এই যে ইন্দ্রিয়দ্বারা আমরা যে বাহ্যজগতের পদার্থ বিশেষের জ্ঞান লাভ করি তাহা ব্যতীত বস্তু সমষ্টির সাধারণ বা অবিশেষ সারভূত গুণময় ভাবের বস্তুতঃ অস্তিত্ব আছে। ঐ ভাবময় পদার্থের জ্ঞান ইন্দ্রিয়দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। উহা পদার্থ বিশেষ জ্ঞান হইতে একটি পৃথক সাধারণ জ্ঞান। এবং ঐ গুণময় ভাবের বস্তুতঃই পৃথক অস্তিত্ব আছে। ইহা সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর মত। একটা দৃষ্টান্ত দিলে পরিষ্কার হয়। রাম, শ্যাম, যদু প্রভৃতি ব্যক্তি বিশেষ ভিন্ন তাহাদের সমুদয়ের সারভূত ধর্ম্ম বিশিষ্ট ভাবময় একটা প্রকৃত পক্ষে সত্বা আছে।

প্লেটোর মতে পার্থিব মানব সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল মাত্র সারভূতগুণময় পুরুষেরই অস্তিত্ব ছিল। এই ভাবময় পুরুষের কোনও রূপরস গন্ধাদি বিশিষ্ট দেহ নাই। তাহা কেবল মাত্র স্বধর্ম্মেই স্থিত। ভূতময় মানবের সৃষ্টি ঐ গুণময় আদর্শের অনুযায়ী ও তাহারই অল্পাধিক পরিমাণ সামঞ্জস্যে গঠিত। কিন্তু কোনও ব্যক্তি বিশেষেই তাহার সম্যক অনুরূপ নহে। এই প্রকার সকল পার্থিব পদার্থেরই গুণময় আদর্শের অস্তিত্ব আছে এবং সেই গুণময় আদর্শের অনুরূপে ভূতময় পদার্থ গঠিত। দেবগণ তাঁহাদের দিব্য চক্ষুদ্বারা এই সারভূত জ্ঞানের উপলব্ধি করেন। মানব তাহার চর্ম্ম চক্ষুদ্বারা ঐ জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। কিন্তু তাহার এই ভূতাত্মক দেহ ধারণ করিবার পূর্ব্বেই সেই ভাবরাজ্যে স্থিতিকালে সে ঐ সারভূত ভাবের জ্ঞান সম্যক লাভ করিতে পারিত। কিন্তু যখনই নশ্বর দেহ ধারণ করিয়া সে এই সংসারে অবতীর্ণ হইল তখন চঞ্চলও বিকৃতি স্বভাবাপন্ন বহিরাকৃতি জ্ঞান দ্বারা তাহার সেই দিব্য জ্ঞান আবৃত হইল এই সদ্জ্ঞান লাভ সম্যকরূপে ছিন্ন করিবার আর তাহার ক্ষমতা রহিল না। কেবল সময় সময় ঘোর মায়াবরণ ছিন্ন করিয়া বিজলির ন্যায় তাহার ঐ সদ্জ্ঞান স্মৃতি উদ্ভাসিত

হইতে লাগিল, পুনরায় সেই ঘন আবরণে আবৃত হইয়া গেল। কারণ সেই ভাবরাজ্যের স্মৃতি তাহার মন হইতে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। এই সংসারে যতই তাহার স্থিতিকাল দীর্ঘ হইতে থাকে ততই সেই বহিরাবয়ব জ্ঞানরূপ মায়াজাল তাহাকে জড়াইয়া ধরে; আবার কখনও কোনও প্রকারে সেই সারভূত ভাবের বিকাশ দেখিতে পাইলে তাহার পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হয়। এই প্রকারে যতই তাহার চেষ্টা বলবতী হয় ততই ঐ স্মৃতিপট বিকশিত হয় কিন্তু সম্যক উদ্ঘাটিত হয় নাই। কিন্তু ঐ চেষ্টার পুনরাবৃত্তি না হয় তবে পুনরপি সেই মোহাবরণ কঠিন হইয়া যায়, এবং সে বিকার স্বভাব সংসার হইতে অবিনশ্বর ভাবরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে না।

এখন আমার প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে গ্রীক দার্শনিক প্ল্যাটোর মতে সারভূত গুণময় ভাবরাজ্যের সত্বা তদ্‌গুণ সম্পন্ন পার্থিব জগতের সৃষ্টির পূর্ব্বে। এবং পার্থিব পদার্থ ঐ সারভূত গুণময় ভাবের সামঞ্জস্যে অথবা উপাদানে গঠিত। এই মতটি আমাদিগের আর্য্য দার্শনিক মতের বিরোধী নহে পরন্তু উভয় মতের মধ্যে অনেকটা ঐক্য আছে। তন্মাত্রের সৃষ্টিও তদ্‌গুণসম্পন্ন পদার্থের সৃষ্টি সিদ্ধান্তটি, মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত বিষ্ণুপুরাণের বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে কয়েকটি শ্লোকে পরিস্ফুট হইয়াছে।

ভূতাদিস্তু বিকুর্ব্বাণঃ শব্দ তন্মাত্রিকং ততঃ
সসর্জ্জ শব্দতন্মাত্রাদাকাশং শব্দলক্ষণং।
শব্দমাত্রং তথাকাশং ভূতাদিঃ সসমাবৃণোৎ॥ ৩৭
আকাশস্তু বিকুর্ব্বাণঃ স্পর্শমাত্রং সসর্জ্জহ।
বলবানভবদ্বায়ুস্তস্য স্পর্শো গুণোমতঃ ॥ ৩৮
আকাশং শব্দতন্মাত্রং স্পর্শমাত্রং সমাবৃণোৎ।
ততো বায়ুর্ব্বিকুর্ব্বাণো রূপমাত্রং সসর্জ্জহ॥ ৩৯
জ্যোতিরুৎপদ্যতে বায়োস্তদ্রূপগুণমুচ্যতে।
স্পর্শমাত্রশ্চৈব বায়ুরূপমাত্রং সমাবৃণোৎ॥ ৪০
জ্যোতিশ্চাপি বিকুর্ব্বাণং রসমাত্রং সসর্জ্জ হ।
সম্ভবন্তি ততোম্ভাংসি রসাধারাণি তানি চ॥ ৪১
রসমাত্রাণি চাম্ভাংসি রূপমাত্রং সমাবৃণোৎ।
বিকুর্ব্বাণানি চাম্ভাংসি গন্ধমাত্রং সসর্জ্জিরে॥ ৪২

সংঘাতা জায়তে তস্মাৎ তস্য গন্ধোগুণোমতঃ।
তস্মিং স্তস্মিংস্ত তন্মাত্রা তেন তন্মাত্রতা স্মৃতা ॥ ৪৩"

(বিষ্ণু পুরাণ দ্বিতীয় অধ্যায়)

উহার ভাবার্থ এই, ভূতাদি (তামস অহঙ্কার) বিকৃত হইয়া শব্দ তন্মাত্রের সৃষ্টি হইল, এবং শব্দ তন্মাত্র হইতে শব্দ গুণ সম্পন্ন আকাশের উদ্ভব হইল, ঐ আকাশ তামস অহঙ্কার দ্বারা আবৃত হইল। অনন্তর আকাশ বিকৃত হইয়া স্পর্শ তন্মাত্র এবং স্পর্শ তন্মাত্র হইতে স্পর্শ গুণ সম্পন্ন বলবান বায়ুর সমুদ্ভব হইল এবং ঐ বায়ুরাশি অনন্ত আকাশ ব্যাপ্ত হইয়া রহিল। তৎপর বায়ু ক্ষোভিত হইয়া তাহা হইতে রূপতন্মাত্র সৃষ্টি হইল, তৎপর রূপ গুণ সম্পন্ন জ্যোতি রূপতন্মাত্র হইতে উৎপন্ন হয়। সেই স্পর্শ সম্ভব বায়ু রূপ সম্ভব জ্যোতিকে আবরণ করিল। জ্যোতি ক্ষোভিত হইয়া রসতন্মাত্রের উদ্ভব হইল, রসতন্মাত্র হইতে রসাধার জলের সৃষ্টি হইল রসমাত্র (রস সম্ভব) জল রূপ মাত্র জ্যোতি পদার্থকে আবৃত করিল। অম্ভ বিকৃত হইয়া গন্ধ তন্মাত্র উদ্ভুত হইল। গন্ধ তন্মাত্র হইতে গন্ধ গুণ বিশিষ্ট স্পর্শাদি সর্ব্বগুণের সমষ্টিস্বরূপ কাঠিন্যযুক্ত পার্থিব পদার্থ সমূহ উদ্ভুত হইল। জন্য পদার্থ উপাদান পদার্থের অবস্থান হেতু উপাদান পদার্থকে তন্মাত্র শব্দে উল্লিখিত হয়।

এখন ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে তদ্‌গুণ সম্পন্ন পদার্থ হইতে পৃথকরূপে তন্মাত্রের সৃষ্টি এবং এই তন্মাত্রের উদ্ভব তৎগুণ সম্পন্ন পদার্থের উদ্ভবের পূর্ব্বে ; কিন্তু তন্মাত্র তদ্‌গুণ সম্পন্ন পদার্থে বিলীন হইয়া গেল তাহার আর পৃথক অস্তিত্ব রহিল না।

একটুক পরিষ্কার করা উচিৎ যে তন্মাত্র দ্বারা আমরা কি বুঝি। স্বয়ং মহর্ষিই ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; উহার ভাব এই যে তন্মাত্র সকল, না শান্ত (সুখকর) না ঘোর (দুঃখজনক) না মূঢ় (মোহোৎপাদক); ইহাদের কোন ও 'বিশেষ' নাই এজন্য ইহাদের একটি সাধারণ নাম 'অবিশেষ'। স্থূল কথায় বলিতে গেলে তদ্‌গুণ সম্পন্ন পদার্থের সাধারণ গুণময় সারভূতকেই তন্মাত্র শব্দে উল্লেখ করা যায়। এখানে শব্দ গুণ সম্পন্ন আকাশ হইতে তাহার সারভূত গুণময় শব্দই তন্মাত্র রূপে অভিহিত হইল সুতরাং এই তন্মাত্র এবং Platonic Idea বা Reality প্রায় একার্থ বোধক। এই তন্মাত্রের বাহ্য জগতে কোন অস্তিত্ব আছে কি না তদ্বিষয়ে আলোচনা করিবার আমার অভিপ্রায় নহে। আমি কেবল মাত্র এই তন্মাত্র সম্বন্ধে গ্রীক দার্শনিক প্ল্যাটোর ও আর্য্য দার্শনিক বেদব্যাসের

মতের এক বিষয়ে সামঞ্জস্য দেখাইয়াই আমার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে চাহি। এবং এই প্রসঙ্গে আমি একটু বলিয়া রাখি যে তন্মাত্র (Idea) সম্বন্ধে উভয়ের মত সর্ব্ববিষয়ে এক নহে। যথা প্লাটোর মতে ঐ Idea বা তন্মাত্রের প্রকৃত পক্ষে পদার্থ বিশেষ হইতে আর একটি পৃথক অস্তিত্ব আছে। কিন্তু মহর্ষির মত তাহা নহে, তন্মাত্র তদ্‌গুণ সম্পন্ন পদার্থে বিলীন হইয়া রহিয়াছে, তাহার আর পৃথক অস্তিত্ব নাই।

এই দার্শনিক মত সম্বন্ধে সমালোচনা করা আমার অধিকারও নাই এবং উদ্দেশ্যও নহে। আমার ইহাই বলিবার উদ্দেশ্য যে এই তন্মাত্র আলোচ্য পার্থিব জগতের উদ্ভবের পূর্ব্বে, এই সিদ্ধান্তের একটি দৃষ্টান্ত দিলেই তাহার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে পরিষ্কার হয়। যখন কোনও কারিকর একটি ঘট প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করে, তখন তাহার মনে ঘট সম্বন্ধে সাধারণ ভাব পূর্ব্বে উদ্ভূত হয়, তৎপর পার্থিব আবরণেও উপাদানে তাহার আদর্শ-ভাবের অনুরূপে ঘটটি প্রস্তুত করে সুতরাং আদর্শ ভাবের সৃষ্টি ঘট সৃষ্টির পূর্ব্বে। সেই প্রকার বিশ্বস্রষ্টার জ্ঞানময় স্বরূপে প্রথমে ভাব রাজ্যের উদ্ভব তৎপরে ভূতাত্মক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে।

শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

রামধনু।

বৃষ্টি-জল-বিন্দু'পর পড়িয়া রবির কর
শোভিতেছে রামধনু আকাশের গায়;
নর-নারী একধ্যানে চেয়ে আছে তার পানে
কতই আমোদ তা'রা লভিছে সবায়!
কিন্তু হায়! কয় জনে দেখিয়াছে এ জীবনে
এ সুন্দর রামধনু আপন হিয়ায়?
অনুতাপে নর-নারী ফেলে যবে অশ্রুবারি
পড়িয়া জ্যোতির্ম্ময়ের জ্যোতি-কণা তায়
সুনির্ম্মল হৃদাকাশে রামধনু পরকাশে
পরাণ ছাইয়া পড়ে ত্রিদিব শোভায়।

বিদ্যাময়ী দেবী। *

বল্ হরি বল্!

কাঁপিছে বরুণা অসী, কাঁপিতেছে বারাণসী,
শিবের ত্রিশূলে কাশী কাঁপে টলমল!
যেন কি প্রলয় ঝড়ে, কি যেন কি ভয়ে ডরে,
তরঙ্গে তরঙ্গে আজ ভাঙ্গে গঙ্গাজল!
ভূমিকম্প নাহি তথা, তবে কি সে মিথ্যা কথা?
কি ভয়ে সে মহারুদ্র সভয়ে চঞ্চল?
জটায় জাহ্নবী কাঁপে, সঘনে ফোঁপায় সাপে,
টগবগ করে যেন কণ্ঠের গরল!
কপালের শশী রবি, নিস্তেজ মলিন সবি,
নীরব ডমরু শিঙ্গা——ত্রিনয়নে জল!
সে অভয় মহারুদ্র কি ভয়ে চঞ্চল?

২

বল্ হরি বল্!

কেন আজ কাশীবাসী, কিবা গৃহী কি সন্ন্যাসী,
শোকের সাগরে ভাসি কাঁদিয়া পাগল,
অনাথ অনাথা যত, সত্রে সত্রে কাঁদে কত,
পথে পথে কেঁদে যায় ভিখারীর দল!
পিতৃ মাতৃ ভ্রাতৃ শোকে, যেন মুগ্ধ সর্ব্ব লোকে,
বিনষ্ট কি এক সঙ্গে আত্মীয় সকল?
ভকত দেবতা স্থানে, কাঁদিছে আকুল প্রাণে,
শুদ্ধ নহে রুদ্ধ মন্ত্র—রুদ্ধ কণ্ঠতল,
নিষ্ফল বিফল পূজা, মিছা অই চোখ বুজা,
হাতের খসিয়া পড়ে ফুল বিল্বদল!
কাঁদে ফেলে জপমালা, প্রাচীনা বিধবা বালা,
কণ্ঠের ধুইয়া গেছে বিভূতি ধবল,
কুমারীর করাঘাতে, কঙ্কণ ভাঙ্গিল হাতে,

---

* মুক্তাগাছার বিখ্যাত দানশীলা বিদ্যাময়ী দেবীর কাশীতে মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত।

সিন্দূর মুছিল তাতে মুছিল কজ্জল,
কেন বারাণসী ভরা এত অমঙ্গল ?

৩

বল্ হরি বল্।
মন্দিরে বাজে না শঙ্খ, কি আশঙ্কা—কি আতঙ্ক,
বাজে না কাঁসর ঘণ্টা—নীরব সকল,
অন্নপূর্ণা জগন্মাতা, ফেলিয়া কনক হাতা,
ঝাঁপিয়াছে চন্দ্রাননে কনক অঞ্চল !
বিষে যা'র নাহি ডর, ভীত সেই বিশ্বেশ্বর,
হেরি এ সাগর সম শোক-হলাহল,
দেবতা যতেক আর, ম্লানমুখ সবাকার,
কাঁপিছে মন্দিরচূড়া—পতাকা চঞ্চল !

৪

বল্ হরি বল্ !
মণিকর্ণীকার ঘাটে, পবিত্র চন্দন কাঠে,
জ্বলিছে কাহার অই পূত চিতানল,
কাহার পবিত্র স্পর্শে, পবিত্র হইয়া হর্ষে,
এত কান্তি এত দীপ্তি পাবক উজ্জ্বল ?
কার চিতা স্পর্শ জন্য, হইল কৃতার্থ ধন্য,
হইল পবিত্র আরো পূত গঙ্গাজল,
জীবনে অজস্র দানে, কে ছিল অতৃপ্ত প্রাণে,
আত্মদানে কার আজি বাসনা সফল ?
দয়াদানে জন্মসিদ্ধা, মূর্ত্তিমতী পরাবিদ্যা,
ঋষির পরম প্রজ্ঞা পুণ্য তপোবল,
স্নেহময়ী প্রীতিময়ী, পুণ্যময়ী 'বিদ্যাময়ী',
সে ছিল রাণীর রাণী অবনী উজ্জ্বল !

৫

বল্ হরি বল্ !
কেবলি কি কাঁদে কাশী ? কাঁদিছে ভারতবাসী,
ভারতের প্রতি তীর্থ অরণ্য অচল,

বৃন্দাবন হরিদ্বার, প্রভাস পুষ্কর আর,
কুরুক্ষেত্র করতোয়া কাঁদে কনখল,
চির শোকরাহুগ্রস্ত, কাঁদে শূন্য ইন্দ্রপ্রস্থ,
কাঁদিছে নৈমিষারণ্য কাঁদে বিন্ধ্যাচল,
আদিনাথ চন্দ্রনাথ, শোকে করে অশ্রুপাত,
জ্বলিছে কুমারীকুণ্ড হুহুঙ্কারে জল!
অযোধ্যা অবন্তীপুরী, সমস্ত ভারত যুড়ি,
পশ্চিমে দ্বারকা কাঁদে পূরবে উৎকল।
ভূতলে বৈকুণ্ঠ ভ্রম, কাঁদে বদরিকাশ্রম,
যমুনা জাহ্নবী কাঁদে কাঁদে হিমাচল!
দুর্ভাগিনী মুক্তাগাছা, হারায়ে প্রাণের বাছা,
হাহাকারে ভাঙ্গিতেছে গগন মণ্ডল,
হায় রে যাহার জন্য, সে ছিল জগতে ধন্য,
কে বুঝিবে বুকে তার কত চিতানল?

৬

বল্ হরি বল্!

দরিদ্র কাঙ্গাল দীন, হইল আশ্রয় হীন
কোথা পাবে অন্ন বস্ত্র রোগে পথ্য জল,
সন্ন্যাসী পরমহংস তাহাদের আশা ধ্বংশ,
কে দিবে বিজয়া ভোজ্য কৌপীন কম্বল?
পিতৃদায় মাতৃদায়, কন্যাদায় ঋণদায়,
শতদায়গ্রস্ত আজ মুছে অশ্রুজল,
কেবা আর এত দায়, উদ্ধারিবে নিরুপায়,
দয়ায় কাহার এত হৃদয় কোমল?
অন্নদা কেবলি কাশী, বিতরেণ অন্নরাশি,
তাঁর ছিল বারণসী ভারত মণ্ডল,
নাহি হেন তীর্থ স্থান, তাঁর দয়া তাঁর দান,
নাহি তাঁর যশোকীর্ত্তি যেথানে উজ্জ্বল!
তাই সে তাঁহার তরে, দেশে দেশে ঘরে ঘরে,
কাতরে ভারত আজ বর্ষে অশ্রুজল,

সে ছিল মমতা গড়া, হৃদয়ে করুণা ভরা,
তাই সে করেছে ধরা স্নেহে সুশীতল!

৭

বল্ হরি বল্!

উজলি উঠিছে চিতা, জ্যোতির্ম্ময়ী যেন সীতা,
উজলি জলধি নীল নভ নীলতল,
মন্দাকিনী পাদ্য অর্ঘ্য, আদরে অর্পিছে স্বর্গ
নন্দনে মন্দার বর্ষে সুরনারীদল!
ত্রিদিব হইয়ে পার, বৈকুণ্ঠের ঊর্দ্ধে তার,
আরো ঊর্দ্ধে সহস্রার হিরণ্য মণ্ডল
যথা চতুর্ব্বিংশ তত্ত্ব, লভে শান্তি নিষ্ক্রিয়ত্ব,
মিশিলা সে পরাবিদ্যা কৈবল্যে কেবল!

৮

কাঁদিও না—

কাঁদিও না বঙ্গভূমি, কেঁদ না ভারত তুমি,
কাঁদিও না মুক্তাগাছা মুছ অশ্রুজল,
দিয়ে গেছে বিদ্যাময়ী, কোলে চেয়ে দেখ অই,
'জগত' 'জিতেন্দ্র' তব জগত উজ্জ্বল!
যেমন আছিলা মাতা, ততোধিক পুত্র দাতা,
মিলে না কোথাও তার উপমার স্থল,
যাচক তাহার কাছে, ফিরে নাহি আসিয়াছে,
দয়ার দুয়ার তার নাহিক অর্গল!
জিতেন্দ্র সে জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী জনপ্রিয়,
প্রশান্ত প্রকৃতি তার পূত নিরমল,
দীনের ভরসা আশা, ভিখারীর ভালবাসা,
সে সাধিবে মা তোমার মহান্ মঙ্গল,
কাঁদিও না জন্মভূমি মোছ অশ্রুজল!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

ভূতের বাড়ী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আশ্রিত

রাজা বিজয় সিংহের মৃত্যুর পর যুবক কুমার সিংহের উচ্ছৃঙ্খলতা আরও বৃদ্ধি পাইল। রাজকার্য্য দেখা যে দূরের কথা তিনি অতি অল্প সময়ই গৃহে থাকেন। সমবয়স্ক আমোদ প্রিয় যুবকদিগের সহিত তিনি শিকার উপলক্ষ করিয়া এক একবার বাহির হইয়া যান আর দীর্ঘকাল পরে আরাম-ভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অমলা-বাই স্বামীর চরণে পড়িয়া কত মিনতি করিয়াছেন, কত অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন কিন্তু কিছুতেই তাঁহার পরিবর্ত্তন হইল না। অমলা বাই দুর্ব্বিসহ যাতনা বুকে ধরিয়া বন্দিনীর ন্যায় আরাম-ভবনে জীবন কাটাইতে লাগিলেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে সিপাহী যুদ্ধের উত্তাল তরঙ্গাভিঘাতে সমগ্র ভারতবর্ষ কম্পিত হইতেছিল। মিরাট, কাণপুর, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে ভীষণ লোমহর্ষণ কাণ্ডের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। রাজ পুতনার রাজন্যবর্গ নির্ব্বিকার চিত্তে সেই সকল বৈপ্লবিক ব্যাপার দেখিতে ছিলেন; সহসা তথায় বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিল! নিমুচের এক দল সৈন্য বিদ্রোহী হইয়া নসিরাবাদ আগমন করিল; সমগ্র রাজপুতনা কাঁপিয়া উঠিল।

বিদ্রোহিগণ নসিরাবাদে দীর্ঘকাল অবস্থান করিল না, ক্রমেই দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু অধিক দূর অগ্রসর না হইতেই বেওয়ারের নিকটবর্ত্তী এক স্থানে কএকজন রাজপুত রাজার সমবেত সৈন্যের নিকট তাহারা এক খণ্ডযুদ্ধে পরাস্ত হইয়া গেল। পরাজিত বিদ্রোহিগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল।

যে দিন পূর্ব্বোক্ত খণ্ডযুদ্ধ হইল তাহার পর দিবস প্রাতঃকালে একজন বিদ্রোহি-নেতা আরাম ভবনের বাহিরের ফটকের নিকট অচেতন অবস্থায় পড়িয়াছিল। এই সংবাদ সর্ব্বত্র তড়িত—গতিতে প্রচারিত হইল। বিদ্রোহিদিগের আগমন আশঙ্কায় সকলেই ম্রিয়মান হইল।

সৈনিক পুরুষের অবস্থা অতি শোচনীয়; বোধ হয় তাহার প্রাণবায়ু বাহির হইবার আর বিলম্ব নাই। এ সংবাদ রাণী অমলা বাইএর নিকট পৌঁছিল। এই আহত মৃত-প্রায় সৈনিক পুরুষের কথা শুনিয়া রাণীর দয়ার্দ্র হৃদয় ব্যথিত হইল, তিনি বিপদের কথা ভুলিয়া গেলেন। মুমূর্ষু শত্রু গৃহদ্বারে এরূপ শোচনীয় অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিবে ইহা আশ্রিতবৎসলা রাজপুত রমণীর প্রাণে সহ্য হইল না। তিনি তাহাকে আপন ভবনের এক কক্ষে রাখিয়া শুশ্রূষা করিতে আদেশ করিলেন।

স্বভাবতঃই রমণী দয়াশীলা; অমলা বাই এর প্রাণ অতিশয় করুণ, পরের দুঃখে তাঁহার কোমল হৃদয় অধীর হইয়া পড়ে। এই আসন্ন-মৃত্যু-যুবকের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তিনি বড়ই ব্যাকুল হইলেন, বৈদ্যকে বলিলেন "বিদ্রোহী দলের নেতা বলিয়া ইহার চিকিৎসায় যত্নের ত্রুটী করিবেন না। এই বিপন্ন আশ্রিত ব্যক্তিকে ভগবানই আমাদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।"

সৈনিক পুরুষের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া অমলা বাই এর দয়ার্দ্র হৃদয় বড়ই অধীর হইল। অধিকাংশ সময়ই তিনি রোগীর গৃহে যাপন করিতে লাগিলেন। সঙ্গীহীনা উপেক্ষিতা অমলাবাই এই নূতন দায়িত্ব ভার গ্রহণ করিয়া স্বীয় জীবনের বিষাদময়ী স্মৃতির দংশন হইতে কিয়ৎপরিমাণে মুক্তি লাভ করিলেন। আশ্রিতের জন্য আপন হৃদয়ের স্নেহ মমতা ঢালিয়া দিয়া তিনি প্রাণে বিমল তৃপ্তি লাভ করিতে লাগিলেন।

ভগবান অমলাবাই এর প্রার্থনা শুনিলেন, তাঁহার যত্ন সার্থক হইল; সৈনিক পুরুষ ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন। বৈদ্য বলিলেন আর ভয়ের কোন কারণ নাই। আর পনর দিনে তিনি একটু সবল হইলেন। এই সময়ে একদিন একদল ছত্রভঙ্গ বিদ্রোহী সৈন্য সহসা আসিয়া আরাম—ভবন আক্রমণ করিল। মুহুর্ম্মুহুঃ বন্দুকের ধ্বনিতে ও সৈন্যের বিকট কোলাহলে আরাম ভবন কাঁপিয়া উঠিল। অরক্ষিত অধিবাসিগণ ভয়ে সকলেই অস্থির হইয়া গেল; রমণীর আর্ত্তনাদে গৃহ পূর্ণ হইয়া উঠিল। আত্মরক্ষার কোন উপায় না দেখিয়া সকলেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

সৈনিক পুরুষ সেই সংবাদ শুনিলেন; তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া স্বীয় বেশ পরিধান করিলেন এবং অতি কষ্টে দ্বিতল হইতে নামিয়া ফটকের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইলেন। সৈন্যগণ তাঁহাকে দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ বিষধরের ন্যায় মস্তক অবনত করিল। যুবক তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া তীব্রস্বরে বলিলেন—"এই তোমাদের

ব্রত পালন? তোমরা দেশ-সেবার নামে দুর্ব্বলের উপর অকারণ অত্যাচার করিতেছ!”

এই দুর্ব্বল যুবকের কণ্ঠধ্বনি শুনিয়াই সৈন্যগণ স্তম্ভিত হইল। যুবকের আদেশে তাহারা মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। সন্ত্রাসিত নরনারী তাঁহার ক্ষমতা দেখিয়া বিস্মিত হইল। সকলে এক বাক্যে এই দয়ালু যুবকের প্রশংসা করিলেন।

অমলাবাই কৃতজ্ঞ হৃদয়ে যুবককে বলিলেন—“আমাদের মান সম্ভ্রম রক্ষার জন্যই ভগবান আপনাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। আজ আপনি এখানে না থাকিলে যে কি ভয়ানক কাণ্ড হইত তাহা চিন্তা করিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে।” যুবক বিনীত ভাবে বলিলেন—“এ গৃহে আশ্রয় না পাইলে আমার জীবন কবে অবসান হইত।”

উভয়েই উভয়ের নিকট কৃতজ্ঞ।

যুবকের নাম হীরা সিং। হীরা সিং দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। অধঃপতিত জন্মভূমির পূর্ব্ব গৌরব উদ্ধার কল্পে তিনি কঠোর সাধনায় নিমগ্ন। হীরা সিংহ বিদ্রোহী নহেন অথবা যশঃলিপ্সু নর হন্তাও নন। উৎপীড়িত অসহায় প্রজা মণ্ডলীকে অত্যাচারীর হস্ত হইতে রক্ষার জন্যই তাঁহার এই অভিমান। রাজপুতনার রাজন্যবর্গ হীরা সিংহের উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে বিদ্রোহী দলের নেতা বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন। তাহার ফলে হীরা সিংহের সৈন্যের সহিত বেওয়ারের নিকটে রাজপুত সৈন্যের সংঘর্ষ হইল, হীরা সিংহের সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল, তিনি আহত হইয়া পলায়ন করিলেন। পর দিবস আরাম ভবনের সম্মুখে তাঁহাকে মূর্চ্ছিত অবস্থায় পাওয়া গেল।

হীরা সিং অমলাবাইএর যত্নে ততোধিক তাঁহার সদয় ব্যবহারে অতিশয় মুগ্ধ হইলেন। অমলাবাইএর প্রতি তাহার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জন্মিল। অমলা বাইও হীরা সিংহের জ্ঞান, উদারতা ও আত্মোৎসর্গের পরিচয় পাইয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং নীরবে এই দেশ-সেবকের চরণে তিনি ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগিলেন। হীরা সিংহের সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হইতে প্রায় আরও এক মাস সময় লাগিল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি কখনও আরাম ভবনের বাহিরে যান নাই, সর্ব্বদা কক্ষে আবদ্ধ রহিয়াছেন। সঙ্গীহীনা রাণী অধিকাংশ সময় তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া অতিবাহিত করিয়াছেন। অপরিচিত বিদ্রোহী যুবক হীরা সিংহের সহিত রাণীর এরূপ ঘনিষ্ট ভাব কেহ পছন্দ করিল

না। কর্ম্মচারিগণ অতিশয় বিরক্ত হইল।

দেখিতে দেখিতে একটী মাস চলিয়া গেল, এক দিন হীরা সিং বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হইলেন। অমলা বাই এই সংবাদ শুনিয়া অধীর হইলেন। হীরা সিংহের মধুর ব্যবহারে অমলা বাই আপন হৃদয়ের তীব্র জ্বালা কিয়ৎপরিমাণে বিস্মৃত হইয়া ছিলেন। এই অপরিচিত যুবক এক মাসের মধ্যে অমলা বাইকে এমনি-স্নেহ মমতায় জড়াইয়া ছিলেন যে তাঁহাকে বিদায় দিতে রাণীর অতিশয় কষ্ট হইল। তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। হীরা সিংহ সহৃদয় চিত্তে ম্লান মুখে রাণীর অশ্রুজল মুছাইয়া বলিলেন—"আপনি অধীর হইবেন না; বাঁচিলে আবার সাক্ষাৎ হইবে।"

এই কথা বলিতে হীরা সিংহেরও কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। তাঁহার দুই চক্ষে অশ্রু দেখা দিল।

এইরূপে বিদায় অভিনয় পরিসমাপ্ত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অঙ্কুর।

হীরা সিংহ চলিয়া গেল এক দিন পর সংবাদ আসিল কুমার সিংহ আরাম ভবনে ফিরিয়া আসিতেছেন। তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট দিনে যানবাহনাদি সহ এক জন কর্ম্মচারী প্রেরিত হইল।

কুমার সিংহ শুনিয়াছিলেন বেওয়ার রাজ্যে বিদ্রোহী সৈন্যগণ প্রবেশ করিয়াছে এই সংবাদ শুনিয়াই তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ছিলেন। কুমারসিংহ প্রথমেই কর্ম্মচারীকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

কুমার—শুনিয়াছি সিপাহীরা আমাদের বেওয়ার রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে; তাহারা তো কোন অনিষ্ট করে নাই?

কর্ম্মচারী—সিপাহীরা মহারাজার আরাম-ভবন আক্রমণ করিয়াছিল—মহারাজ উপস্থিত না থাকায় আমরা সকলেই অতিশয় ভীত হইয়াছিলাম কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে মান সম্মান রক্ষা পাইয়াছে।

কুমার সিংহ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বিদ্রোহীরা আরাম-ভবন আক্রমণ করিয়াছিল! তোমরা কিরূপে রক্ষা পাইয়াছ?"

হীরা সিংহ আরাম-ভবন যেরূপে উন্মত্ত সিপাহীদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন কর্ম্মচারী তাহা বিবৃত করিল। কুমার সিংহ বিদ্রোহী সেনাপতির ঈদৃশ দয়া ও মহানুভবতার কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হীরা সিংহ কে ?

কর্ম্ম—তাহা বলিতে পারিব না মহারাজ। হীরা সিং আমাদের কাহারও সহিত আলাপ করেন নাই। বোধ হয় রাণী মা বলিতে পারিবেন।

কুমার—রাণী কিরূপে জানিবেন ?

কর্ম্ম—হীরা সিংহ অধিকাংশ সময়ই রাণীমার সহিত আলাপ করিয়া কাটাইতেন, তাই মনে হয় তিনি রাণীমার নিকট আপন পরিচয় দিয়াছেন।

কুমার—বোধ হয় হীরা সিংহের সহিত রাণীর পূর্ব্বের পরিচয় আছে।

কর্ম্ম—আজ্ঞে না, মহারাজ, রাণী মা তাহাকে দেখিয়া চিনিতে পারেন নাই।

কুমার—তবে রাণী দয়া করিয়াই তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। হীরা সিং কত দিন আরাম ভবনে ছিলেন ?

কর্ম্ম—প্রায় দেড় মাস।

কুমার—এত দিনই ছিলেন ? হীরা সিংহ তবে খুব সাংঘাতিক আঘাত পাইয়াছিলেন।

কর্ম্ম—তেমন সাংঘাতিক নয়; ১০। ১২ দিনের মধ্যেই তিনি আরোগ্য লাভ করেন, কেবল রাণীমার অনুরোধে তিনি আরও কিছুকাল ছিলেন।

কুমার—বিদ্রোহিনেতাকে এতদিন অকারণ আশ্রয় দেওয়া ভাল হয় নাই।

কর্ম্ম—এখনই লোকে নানা কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

কুমার—কি বলে ? রাণী বিদ্রোহীদের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ?

কর্ম্ম—না মহারাজ, সে কথা নয়।

কুমার—তবে ?

কর্ম্মচারী নীরব রহিল। তাহার নীরবতা শত জিহ্বা বাহির করিয়া রাজার প্রাণে সন্দেহের বিষ ঢালিয়া দিল।

কুমার—হীরা সিংহ এত দিন কিরূপে কাটাইলেন ?

কর্ম্ম—হীরা সিংহ কখনও নীচে নামিতেন না। তিনি অধিকাংশ সময়ই রাণীমার কক্ষে কাটাইতেন। সেখানে দাসীরা গেলেও রাণী অসন্তুষ্ট হইতেন।

কর্ম্মচারীর শেষোক্ত কথাগুলি কুমার সিংহের হৃদয়ে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইল। বোধ হয় বিদ্ধ হইবার জন্যই কর্ম্মচারী ঐ কথাগুলি বলিয়াছিল।

তাঁহার মস্তক কিছু উষ্ণ হইল, তিনি কর্ম্মচারীকে প্রহার করিবার জন্য চাবুক তুলিয়া ছিলেন, আবার কি মনে করিয়া চাবুক নামাইলেন এবং অপেক্ষাকৃত গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—

হীরা সিংহের বয়স কত? দেখিতে কেমন?

কর্ম্ম—পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর হইবে। হীরা সিংহ দেখিতে অতি সুশ্রী।

কুমার—কত দিন হইল হীরা সিং আরাম ভবন পরিত্যাগ করিয়াছেন?

কর্ম্ম—প্রায় এক মাস হইয়াছে।

কুমার—তিনি কোথায় গিয়াছেন বলিতে পার?

কর্ম্ম—এক জন সিপাহী আসিয়া একদিন তাহাকে কি সংবাদ দিল অমনি তিনি আরাম-ভবন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

কুমার সিংহ নিদারুণ মর্ম্ম বেদনায় ব্যথিত হইলেন, তাঁহার হৃদয়ে সন্দেহের অনল প্রজ্জলিত হইল। তিনি অবিলম্বে অশ্বারোহণে আরাম-ভবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বিষ-বৃক্ষের বীজ অঙ্কুরিত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আশার মুকুল।

"যা বলিলেন তা' সত্য রাণী মা?"

"সত্য।"

"তবে এতদিন সুসংবাদটা গোপন করিলেন কেন?"

পা বাই কাঞ্চনের প্রতি একটী স্নিগ্ধ মধুর কটাক্ষপাত করিয়া মুখখানি একটু ফিরাইলেন। তাঁহার রক্তিম অধরে ও বড় বড় চক্ষু দুইটীতে প্রাণের হাসি উছলিয়া উঠিল।

কাঞ্চন বলিল—যা'হউক এতদিনে আমাদের আশা পূর্ণ হইবে—রাজকুমারের মুখ দেখিতে পাইব।

অমলা বাই স্বীয় চম্পক অঙ্গুলি দিয়া কাঞ্চনের গাল টিপিয়া দিলেন।

কাঞ্চন হাসিয়া বলিল—রাণী মা, মহারাজ বোধ হয় আজ কালের মধ্যেই ফিরিবেন। এই সুসংবাদ শুনিয়া তিনি খুব সন্তুষ্ট হইবেন। পুত্রের মুখ দেখিলে তাঁহার এই ভাব থাকিবে না, রাজ্যের প্রতি মমতা জন্মিবে।

অমলা বাই নীরবে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

কাঞ্চন আবার বলিল—রাণী মা, আমার একটা অনুরোধ, আমি রাজকুমারের ধাত্রীর কাজ করিব। আপনি যেমন রোগা হইয়াছেন সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে আপনি তার যত্ন করিতে পারিবেন না।

অমলা বাই দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—কাঞ্চন, আমার এমন সৌভাগ্য কি হইবে আমি পুত্রমুখ দেখিতে পাইব! আজ কয়েক দিন যাবত আমার মনটা বড়ই খারাপ বোধ হইতেছে, আমার কিছুই ভাল লাগে না।

কাঞ্চন—এই সময়ে সকলেরই মনে নানা রকম চিন্তা হয়; সে জন্য আপনি ভয় করিবেন না। সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকিবেন, আজ হইতে আমি আপনার কাছ ছাড়া হইব না।

কাঞ্চন সর্দ্দার কিরাৎ সিংহের কন্যা; অহল্যার কনিষ্ঠা ভগিনী। অমর-সিংহও অহল্যার নির্ব্বাসনের কিছুদিন পরই কিরাৎ সিংহ পরলোক গমন করিলেন। কিরাৎ সিংহ বেওয়ার রাজ্যের সেনাপতি ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় জামাতা, কাঞ্চনের স্বামী জীবন সিংহ আসিয়া শ্বশুরের পদ গ্রহণ করিলেন। কাঞ্চন পিতৃগৃহেই রহিল।

অশোকবনে সীতা-সঙ্গিনী-সরমার ন্যায় কাঞ্চন অমলাবাইএর প্রিয়-সখী। যদিও উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য তথাপি রাণী কাঞ্চনকে আপন ভগ্নীর ন্যায় ভালবাসেন। ভালবাসা উচ্চ নীচ বিচার করে না। দুঃখিনী অমলা বাইকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখাই কাঞ্চনের প্রধান কার্য্য। অমলাবাইও কাঞ্চনকে না দেখিয়া থাকিতে পারেন না। কাঞ্চন কাছে না থাকিলে স্বামী-স্নেহ-বঞ্চিতা অমলা বাইএর জীবন অসহ্য হইত।

অমলা বাই কাঞ্চনের হাতখানি ধরিয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইলেন, কাঞ্চনও আবেগ ভরে রাণীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিল। অমলাবাই বলিলেন—কাঞ্চন, বোধ হয় আমার দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে!

কাঞ্চন রাণীর কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। সে বিস্মিত হইয়া রাণীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, দেখিল, তাঁহার চক্ষু ছল্ ছল্ করিতেছে, মুখ বিবর্ণ! কাঞ্চন বলিল—রাণী মা, এমন কথা মুখে আনিবেন না। অমঙ্গল হইবে।

রাণী—আমার আর কি অধিক অমঙ্গল হইবে কাঞ্চন?

সহৃদয়া কাঞ্চন বলিল—রাণী মা, আপনি গর্ভবতী, এখন এরূপ দুশ্চিন্তা

মনে স্থান দিলে গর্ভস্থ সন্তানের অমঙ্গল হইবে।

সন্তানের অমঙ্গলের কথা শুনিয়া রাণী একটু ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন এবং কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন—কাঞ্চন, সেদিন এক জ্যোতিষী আসিয়াছিলেন তাঁহাকে আমি হাত দেখাইয়া ছিলাম। জ্যোতিষী আমার হাত দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া আমার শরীর কাঁপিতে লাগিল। তিনি বলিলেন শীঘ্রই একটা বিপদের আশঙ্কা আছে, কি বিপদ বলিলেন না, কিন্তু এ অবস্থায় কি বিপদ হইবে তাহা আমার বুঝিতে বাকী নাই।

কাঞ্চন রাণীর কথা শুনিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিল কিন্তু সে আত্মভাব গোপন করিয়া বলিল—এই কথা! যাগ যজ্ঞ করিলেই দোষ কাটিয়া যাইবে। এক জ্যোতিষী বাবাকে বলিয়াছিল দশ বৎসরের সময় আমার মৃত্যুর আশঙ্কা আছে। বিশ বছর পার হইয়া যায় আজও-তো বাঁচিয়া আছি। এখন আর ভাল জ্যোতিষী নাই; কতগুলি লোক কেবল বুজরোকি করিয়া পয়সা উপার্জ্জন করে। আপনি অকারণ মন খারাপ করিবেন না।

অমলা বাই বলিলেন—আচ্ছা কাঞ্চন আমি আর চিন্তা করিব না। তুই বলিতে পারিস্ মহারাজা কবে আরাম-ভবনে আসিয়া পৌছিবেন!

কাঞ্চন হাসিয়া বলিল—রাণী মা, রাজা, সেনাপতি দুই জনের খবরই আমাকে রাখিতে হইবে!

রাণী হাসিয়া বলিলেন—সেনাপতি মহাশয়ের সংবাদের জন্য তো পান্নাকেই রাখিয়াছি।

পান্না রাণীর একজন রূপসী পরিচারিকা। লোকে বলে জীবন সিংহ তাহার রূপে মুগ্ধ।

কাঞ্চন রাণীর প্রতি একটী সহাস্য কটাক্ষ করিয়া বলিল—আচ্ছা রাণী মা, পান্নাকে যদি তিন দিনের মধ্যে বেওয়ার হইতে না তাড়াই তবে আমি কাঞ্চন না। এই কথা বলিয়া কাঞ্চন দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেল এবং পাঁচ মিনিট পরে আসিয়া খবর দিল—মহারাজ কাল সন্ধ্যার পূর্ব্বে আরাম-ভবনে আসিয়া পৌছিবেন।

এই সংবাদ শুনিয়া রাণী মনে একটু বল পাইলেন, তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল।

(ক্রমশঃ)

প্রাচীন ও আধুনিক সমাজ।

প্রাচীনকালে ভারতীয় আর্য্যজাতির সামাজিক অবস্থা অতিশয় উন্নত ছিল। অসামান্য মনীষা সম্পন্ন আর্য্যঋষিগণ সূক্ষ্মদৃষ্টি ও অভিজ্ঞতাবলে হিন্দু সমাজকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া একটী সুদৃঢ় সমুন্নত ভিত্তির উপর সংস্থাপন করিয়াছিলেন। আর্য্যসমাজের গঠন প্রণালীতেই উন্নতির বীজ নিহিত ছিল। কিন্তু আমাদের অধঃপতনের সহিত ঋষি প্রতিষ্ঠিত সমাজের মহান্ আদর্শ বিকৃত হইয়াছে। তাঁহাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে অক্ষম হইয়া বর্ত্তমানে আমরা কেবল কতকগুলি কঠোর সংকীর্ণ বিধানের অন্ধ উপাসক হইয়াছি। ইহার ফলে সমাজের শক্তি খর্ব্ব এবং ঐক্য বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছে।

বর্ণাশ্রমই হিন্দুসমাজের ভিত্তি; বর্ণাশ্রমই হিন্দুজাতির উন্নতির সোপান। বর্ণাশ্রমের অধঃপতন আমাদের বর্ত্তমান অধঃপতনের অন্যতম কারণ। যাহারা পাশ্চাত্য শিক্ষালাভ করিয়াছেন, পাশ্চাত্য সমাজকে যাহারা আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, বর্ণাশ্রম তাঁহাদিগের চক্ষুশূল। তাঁহাদের মতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মটা জগদ্দল প্রস্তরের ন্যায় সমাজের বুকে বসিয়া উহার নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়াছে! তাঁহারা মনে করেন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সমূলে উৎপাটন করিলেই সমাজের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। ইঁহারা বর্ণাশ্রমের মহোদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। আবার যাঁহারা মনে করিতেছেন ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিলেই সমাজের উপর প্রভুত্ব করিবার তাঁহাদের দাবী জন্মিল তাহারাও ভ্রান্ত। নব্য শিক্ষিতগণ পাশ্চাত্য জাতিদিগের অনুকরণে উদ্ভ্রান্ত হইয়া বর্ণাশ্রমের উপর অজস্রগালি বর্ষণ করিতেছেন, আবার প্রাচীনের পক্ষপাতী গোঁড়া সম্প্রদায় সর্ব্বপ্রকার সদ্‌গুণচ্যুত হইয়াও সমাজে প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সংস্কার বিরোধী। কিন্তু তাঁহারা কেহই বর্ণাশ্রমের নিগূঢ়তত্ত্ব একবার চিন্তা করিয়া দেখেন না।

ইয়ুরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি সুসভ্য দেশে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত নাই সত্য তথাপি ঐ সকল দেশে নানাবিধ কাল্পনিক বৈষম্যের প্রাধান্য হইয়াছে। আর্‌ল, নাইট, বেরণ, কাউণ্ট প্রভৃতি উপাধি শোভিত মহোদয়গণ দরিদ্র প্রপীড়িত শূদ্রের মস্তকে দাঁড়াইয়াই সমুন্নত হইয়াছেন। বণিকগণ দীন শূদ্রের মুখের গ্রাস কাড়িয়াই স্ফীত হইতেছে! ঐ সকল দেশের সাম্যবাদী সুসভ্য জাতির মধ্যেও অসার আভিজাত্যের অসীম প্রভাব।

[illegible] বিজ্ঞান-সম্মত; উহার ভিত্তি ক্রম-বিকাশের

(Evolution এর) উপর প্রতিষ্ঠিত কে ব্রাহ্মণ কে ক্ষত্রিয়, কে বৈশ্য কে শূদ্র তাহা "গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ" নির্ণিত হইয়া থাকে। আর্য্যঋষিগণ বিবর্ত্তন বাদের নিগূঢ় তত্ব অবগত ছিলেন তাই বিজ্ঞান সম্মত Evolution এর উপর সমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। আমরা সেই মহাসত্য উপেক্ষা করিয়া বংশ-মর্য্যাদাকে বাড়াইয়া তুলিয়াছি।

জন্ম মাত্র সকলই শূদ্র থাকে ; সংস্কারদ্বারাই মানুষ উন্নতি লাভ করে। ব্রাহ্মণত্ব লাভই চরমোন্নতি ; ব্রাহ্মণ বিবর্ত্তনের পূর্ণ পরিণতি।

মহর্ষি নারদ মান্ধাতাকে যে উপদেশ বাক্য প্রদান করেন, তাহা হইতে জানা যায় যে পূর্ব্বে সকলেই একজাতি মধ্যে গণ্য হইতেন কেবল সংস্কারদ্বারাই বর্ণভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। তখন জাতিভেদ বলিয়া পরস্পর কোন ভেদই ছিল না। যদিও তাঁহারা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের মত জাতিভেদের এমন কঠোর বন্ধন ছিল না। চতুর্ব্বর্ণের পরস্পরের মধ্যে কন্যাদানাদি করিতেন। এমন কি বংশ বৃদ্ধির জন্য সহজাতের পাণিগ্রহণ করিতেন। স্বায়ম্ভু মনু তাঁহার সহজাত শতরূপাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিয়া আকুতি নাম্নী কন্যার জন্ম দেন। এইরূপ বহুবিধ নৈকট্য বিবাহ প্রচলিত ছিল। কালক্রমে জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং নৈকট্য বিবাহে দোষ লক্ষিত হওয়াতে ঋষিগণ নৈকট্য বিবাহ নিষেধ উদ্দেশে বংশের পরিচয় নিমিত্ত গোত্র কল্পনা করিয়া সগোত্র বিবাহ প্রথা রহিত করিলেন। এক্ষণে আমরা বহু বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পরস্পর আদান প্রদান দূরে থাকুক—নীচ জাতির জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করি না। ইহা কি সমাজের অবনতি নয়? রামচন্দ্র একজন চণ্ডালের সহিত সখ্যতা করিতে সঙ্কুচিত হন নাই, এক্ষণে চণ্ডাল ঘরে উঠিলেই গৃহের জল পর্য্যন্ত ফেলিয়া দিতে হয়। এইরূপে নীচ জাতীয় বহু হিন্দুগণ মনের কষ্টে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতেছে। আর একটি অদ্ভুত কথা শুনিলে হাসি পায়, নাপিতগণ পর্য্যন্ত চণ্ডালদিগকে ঘৃণায় ক্ষৌর কর্ম্ম করে না। কিন্তু যেই মাত্র চণ্ডাল ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে তখন আর নাপিতের ক্ষৌর কর্ম্ম করিতে আপত্তি থাকে না। ইহা কি সমাজে কুপ্রথা নয় ? এইরূপ কুপ্রথা প্রচলিত থাকিলে হিন্দুসমাজ ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া হ্রাস পাইতে থাকিবে।

প্রাচীন ভারতে বহুকাল পর্য্যন্ত এক শ্রেণীর লোক নিজ গুণ ও কর্ম্মানুসারে অপর শ্রেণীতে উন্নীত অথবা অবনীত হইতে পারিত। বেদে উল্লিখিত কবস ঋষি শূদ্র কুলে, পুরাণে উল্লিখিত বিশ্বামিত্র মুনি ক্ষত্রিয় কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও

নিজ নিজ প্রতিভাবলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন; ইহা প্রাচীন ভারতের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইহা ব্যতীত রামচন্দ্র, কৃষ্ণ ও বলরাম ক্ষত্রিয় হইয়াও ঈশ্বরত্ব লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন। কথিত আছে "জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্‌দ্বিজউচ্যতে। বেদপাঠী ভবেদ্ বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ।" পুরাকালে এইমত হইতেই সমাজ চালিত হইত কিন্তু বহুকাল হইতে সেই প্রথার পরিবর্ত্তন ঘটিয়া ব্রাহ্মণের পুত্রই ব্রাহ্মণ হইতেছে। কিন্তু যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া অন্য কর্ম্ম করে সে "শূদ্রতামাশু গচ্ছতি সান্বয়।" আজ সহস্রাধিক বৎসরের অধীনতায় ভারতের হিন্দুসমাজকে বিদেশী ধর্ম্মে যেরূপ অনবরত আঘাত করিতেছে এবং আমরা যেরূপ এতৎসম্বন্ধে উদাসীন, তাহাতে সমাজের অবনতি ছাড়া উন্নতি সুদূর পরাহত। অতএব বর্ত্তমান যুগে সমাজের কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়া পড়িতেছে।

শ্রীশৌরীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

জন্মান্তরে।

আবার আসিতে হবে!
এত সাধ আশা, এত ভালবাসা,
এমনি কি বৃথা যাবে?

করি হাসি মুখে সারা প্রাণ-পণ,
যে মহান্ ব্রত করেছি সাধন,
যে শকতি আজ আকুলে এমন
সকলি কি পড়ে রবে?

আবার আসিতে হবে!
এত সাধ আশা, এত ভালবাসা,
না-হলে যে বৃথা যাবে!

জননী জনম ভূমি!
আজিকার মত, দীনাহীনা এত,
তখন রবে না তুমি

তোমার প্রত্যেক রেণু পরমাণু,
উজলিবে সুখে স্বাধীনতা-ভানু,
তব হিতে সুত বিসর্জ্জিবে তনু
তোমারি চরণ চুমি' !

জননী জনম ভূমি !
আজিকার মত, দীনাহীনা এত,
তখন রবে না তুমি !

তোমার প্রাসাদ-দ্বারে
এ দীন এমনি দাঁড়াবে জননী,
লয়ে অর্ঘ্য ভারে ভারে !

সারা হৃদয়ের ভক্তি প্রীতি দিয়ে
তব পদ-ধূলি এমতি পূজিয়ে,
নিবে মা উরসে তখন তুলিয়ে!
মুছি তপ্ত আঁখি-সারে'!

তোমার প্রাসাদ-দ্বারে
এ দীন এমনি, দাঁড়াবে জননী,
লয়ে অর্ঘ্য ভারে ভারে !

এই রবি শশী তারা.
তখনো এমনি, দিবস রজনী,
ঢালিবে কিরণ ধারা !

তখনো বিহগ শুনাইবে গান,
নাচিবে তটিনী ধরিয়ে সুতান,
বহিবে মলয় পুলকি পরাণ,
হাসিবে যে কলিকারা !

এই রবি শশী তারা
তখনো এমনি, দিবস রজনী,
ঢালিবে কিরণ-ধারা !

ওই আকাশের বুকে,
তখনো ছুটিবে,   তখনো লুটিবে
প্রাণ মোর সুধা সুখে।

তখনো এমনি ধীরে ধীরে ধীরে
ভাসিবে নীরব অসীমের নীরে,
তখনো আসিবে ফিরে ফিরে ফিরে
ষড়ঋতু সকৌতুকে!

ওই আকাশের বুকে,
তখনো ছুটিবে,   তখনো লুটিবে
প্রাণ মোর সুধা সুখে।

ওগো মোর মন-প্রিয়া!
তখন তুমি-ত   রহিবে নিয়ত
গৃহ মম আলোকিয়া।

না রবে বিচ্ছেদ, না রবে অন্তর,
মহা প্রেম-যোগে ডুবি নিরন্তর
দোঁহাতে হেরিব দোঁহে মহেশ্বর
আপনারে হারাইয়া।

ওগো মোর মন-প্রিয়া!
তখন তুমি-ত   রহিবে নিয়ত
গৃহ মম আলোকিয়া।

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

ঋণ-শোধ।

"মাথায় আবার বরফ দেওয়া হউক, কি বলেন?"

যুবতী ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দিলেন—আমি আবশ্যক বোধ করি না; আপনি যদি ভাল মনে করেন তবে দিন্।

ডাক্তার বাবু বরফ আনিতে আদেশ করিলেন। একজন পরিচারিকা ক্ষিপ্রহস্তে 'আইস্ ব্যাগে' বরফ পুরিয়া লইয়া আসিল এবং শয্যার কোণে বসিয়া রোগিনীর মাথায় আইস্ ব্যাগ দিতে লাগিল।

ডাক্তার বাবু বলিলেন—চুলগুলি কাটিয়া ফেলিলে ভাল হইত।

সুদীর্ঘ ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি শৈবালের ন্যায় যুবতীর মুখকমল আবৃত করিয়া বালিশের দুই পার্শ্বে পড়িয়াছিল। যুবতী একগুচ্ছ কেশ ক্ষীণ হস্তে তুলিয়া একবার দেখিলেন ; দেখিয়া বলিলেন—না চুল আর কাটিতে হইবে না ; এগুলি আমার সহিত ভস্ম হইবে।

ডাক্তার—আপনি অকারণ হতাশ হইতেছেন। আপনার অবস্থা তো আমি তেমন খারাপ দেখিতেছি না।

যুবতী—ডাক্তার বাবু! আমি আজ খুব ভাল আছি ; আমার কোন অসুখ নাই। শরীর ভাল হইয়াছে, মনও প্রফুল্ল হইয়াছে। মৃত্যু শয্যায় আমি নব-জীবন পাইয়াছি। এখন আমি সুখে চক্ষু বুজিতে পারিব।

ডাক্তার সুধীর চন্দ্র যুবতীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন ম্লান গোলাপের ন্যায় বিবর্ণ কপোলদ্বয় ঈষৎ আরক্তিম হইয়াছে। বুঝিলেন জ্বরের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনি যুবতীর বক্ষোপরি স্থাপিত কঙ্কালময় বাহুখানি গ্রহণ করিয়া নাড়ীর স্পন্দন গণনা করিলেন ; তারপর থার্ম্মোমিটার দিয়া দেখিলেন জ্বর ১০৪ ডিগ্রী। তাঁহার মুখ মলিন হইল।

যুবতী বলিলেন—কি দেখিলেন? জ্বর এখন কম নয়? আমি-তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি আজ খুব ভাল আছি। আমার ব্যারাম সারিয়াছে।

যুবতী ডাকিলেন—'মা!'

একজন বর্ষীয়সী রমণী মেজেতে বসিয়া নীরবে চক্ষের জল ফেলিতে ছিলেন, তিনি আঁচলে চক্ষু মুছিয়া দ্রুতপদে শয্যাপার্শ্বে গেলেন এবং যুবতীর মুখের কাছে মুখ নিয়া সদয়ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি মা? কেন ডাকিয়াছ?

যুবতী—জান্‌লাগুলি খুলিয়া দাও। আজ বাসন্তী পূর্ণিমা ; না মা? আমি চাঁদ দেখিব, জন্মের মত একবার চাঁদ দেখিব।

প্রৌঢ়া অনুমতির জন্য একবার ডাক্তার বাবুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

ডাক্তার বাবু বলিলেন—জান্‌লাগুলি খুলিতে বলিয়াছেন, খুলিয়া দেন, তাহাতে কোন হানি হইবে না।

জান্‌লা উন্মুক্ত হইল। আকাশে পূর্ণচন্দ্র হাসিতেছিল, তাহার স্নিগ্ধ রজত-কিরণে গৃহ প্লাবিত হইয়া গেল। যুবতীর কমনীয় কলেবর কোমল জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত হইল। তাহার বদনে আর ব্যাধির ক্লেশ পরিব্যক্ত নাই, বিষাদের চিহ্ন তিরোহিত হইয়াছে! ডাক্তার দেখিলেন, আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

বিগত-শ্রী কঙ্কালময়-দেহে অপূর্ব্ব লাবণ্য বিকসিত হইয়াছে!

যুবতী বলিলেন—মা আমার বিছানা এখন ফুল দিয়া সাজাইয়া দাও।

বৃদ্ধা রমণী রাশীকৃত ফুল আনিয়া বিছানায় ছড়াইয়া দিলেন। কুসুমগন্ধে গৃহ আমোদিত হইল।

যুবতী বলিলেন—এখন তোমরা নীচে যাও। ডাক্তার বাবুর সহিত আমার একটা কথা আছে।

ঘরের সকল লোক নীচে নামিয়া গেল। আসন্ন-মৃত্যু রোগিনীর সহিত নিভৃতে কি আলাপ থাকিতে পারে সুধীরচন্দ্র মনে মনে তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। এই রমণী তাঁহার নিকট একটি দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকার মত বোধ হইতেছিল।

যুবতী বলিলেন—ডাক্তার বাবু আপনাকে বড় কষ্ট দিয়াছি। আজ সারাদিন আপনাকে বাড়ী যাইতে দেই নাই। পাছে আমার জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকিয়া যায় সেই ভয়ে আজ আপনাকে কাছ-ছাড়া করি নাই। শুধু চিকিৎসার জন্য হইলে আপনাকে এত কষ্ট দিতাম না, হয়-তো অন্য ডাক্তার ডাকিতাম। ডাক্তার বাবু! আজ চিরবিদায় লইয়া চলিয়াছি। আজ আমার মরণেও সুখ, আমার মত ভাগ্যবতী কে? বুঝিলাম ভগবান আছেন; আর বুঝিলাম সতীর বাসনা অপূর্ণ থাকে না।

সুধীরচন্দ্র যুবতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। বিশুভ্র শয্যায় দুগ্ধফেননিভ কুসুমরাশি চারিদিকে বিক্ষিপ্ত, মধ্যস্থলে আলুলায়িত-কুন্তলা গৌরকান্তি-যুবতী শায়িতা! তদীয় দেহ বাসন্তীচন্দ্রমার সুবিমল কৌমুদীরাশি পতিত হইয়া দিব্য শোভা বিকাশ করিয়াছে! যেন নন্দনকাননে দেববালা জ্যোৎস্নালোকে কুসুমশয্যায় শায়িত রহিয়াছেন! এ কি মৃত্যু-শয্যা না ফুল-শয্যা? বোধ হয় উভয়ই!

যুবতী বলিলেন—আমার জীবনের ক্ষুদ্র কাহিনী আজ আপনার নিকট বলিব। আপনি হয়-তো মনে করিতেছেন রোগের ইতিহাসে ডাক্তারের প্রয়োজন আছে কিন্তু রোগিনীর ইতিহাস জানিয়া চিকিৎসকের দরকার কি? কিছু দরকার আছে। আমার জীবনের ইতিহাসই রোগের ইতিহাস! আমার রোগের কারণ না জানিয়া ঔষধ দিলে কোন ফল হইবে না। তাই আপনাকে ধৈর্য্য ধরিয়া আমার কথা শুনিতে হইবে।

"ডাক্তার বাবু! আমি জন্মদুখিনী; শৈশবে আমি পিতৃহীনা হই; মা আমি

কষ্টে আমাকে লালন পালন করেন; আমি মা'র একমাত্র সন্তান। দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিলেও আমার আদরের অভাব ছিল না। মা আর জেঠীমা ভিন্ন সংসারে আমার আর কেহ ছিল না। মা ইহলোকে নাই; জেঠীমাকে এখন আপনি দেখিয়াছেন। দুঃখিনীর মেয়ে বলিয়া সকলই আমাকে খুব স্নেহ করিত।

"শুনিয়াছি আমি খুব সুন্দরী ছিলাম। প্রতিবাসিনীরা মাকে বলিতেন "এ মেয়ে বিবাহ দিতে আর টাকা লাগিবে না।" এই বলিয়া যুবতী ডাক্তার বাবুর প্রতি স্থির কটাক্ষপাত করিলেন! ডাক্তার বাবু যুবতীর সর্ব্বাঙ্গ একবার নিরীক্ষণ করিলেন; দেখিলেন যুবতীর কথা অবিশ্বাস করিবার কোনই কারণ নাই। তেমন সুন্দরী রমণী দুর্লভ।

"কিন্তু চৌদ্দ বৎসর পার হইয়াগেল আমার বিবাহ হইল না। আমি লজ্জায় ঘরের বাহির হইতাম না। মার প্রাণে আমি শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইয়া রহিলাম। দেবতার নিকট প্রতিদিন মৃত্যু কামনা করিতাম কিন্তু যম আমাকে দেখা দিলেন না। তখন মরিলে সব জ্বালা ফুরাইয়া যাইত! বোধ হয় জন্মান্তরে আমি কোন পতিপ্রাণা সতী রমণীর জীবন দুঃখময় করিয়াছিলাম তাই এ যাতনা ভোগ করিতেছি।

"আমার মৃত্যু কামনা বিফল হইল। মৃত্যু হইল না বিবাহ স্থির হইল। বর অতি সুন্দর; কলিকাতায় মেডিকেল কলেজে পড়েন; নগদ চারিহাজার টাকা পণ দিতে হইবে। বরের কথা শুনিয়া আমার মনে খুব আনন্দ হইল। হতভাগিনীর জন্য এমন স্বামী মিলিবে তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। কিন্তু মা যখন চারিহাজার টাকার জন্য জমা জমি বিক্রয় করিতে লাগিলেন তখন আমার বড়ই কষ্ট হইল। আমি মাকে বলিলাম—মা—তুমি খাইবে কি? মা হাসিয়া বলিলেন "মনো, আমার সৌভাগ্য—এমন জামাতা পাইয়াছি। তোর বাড়ীতে কি তোর মার জন্য এক মুট অন্ন মিলিবে না?" মার কথা শুনিয়া আমি মনে গৌরব অনুভব করিলাম এবং কল্পনার সাহায্যে অন্তরে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল চিত্র আঁকিতে লাগিলাম।

"তখন স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই আমার ভাগ্যে এত দুঃখ রহিয়াছে। বিবাহের পূর্ব্বদিন রাত্রে ঘরে চোর ঢুকিয়া নগদ চারি হাজার টাকা লইয়া গেল। মা জেঠী মা আর আমি মাটিতে পড়িয়া কাঁদিয়া রাত্রি কাটাইলাম। পরদিন মা অবশিষ্ট জমি ও বসত বাড়ী খানি বিক্রয় করিয়া হাজার টাকা সংগ্রহ করিলেন। পাড়ার লোকেরা আশ্বাস দিলেন তাহারা অনুরোধ করিলে এই টাকা দিয়াই বর

পক্ষকে মানাইতে পারিবেন।

"বর গৃহে আসিলেন। বিবাহের পূর্ব্বেই আমার শ্বশুর সমস্ত টাকা বুঝাইয়া দিতে আদেশ করিলেন। তখন আর কোন কথা গোপন করা চলে না। মা হাজার টাকা দিয়া আমার শ্বশুরের হাত ধরিয়া কাঁদিয়া দৈবদুর্ব্বিপাকের কথা বলিলেন। তাঁহার দয়া হওয়া দূরে থাকুক তিনি ক্রোধে অধীর হইলেন। মা পাড়ার কয়েক জন বিশিষ্ট ভদ্রলোককে পূর্ব্বেই সংবাদ দিয়াছিলেন, তাঁহারা আসিয়া আমার শ্বশুরকে অনেক অনুনয় করিলেন কিন্তু তিনি কাহারও কথা গ্রাহ্য করিলেন না; পুত্র ও লোকজন সহ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। মা মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন, আমি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলাম।

যখন চৈতন্য হইল তখন দেখিলাম সকলে আমাকে সাজাইয়া গুজাইয়া কলা গাছের নীচে নিয়া বসাইল। শুভক্ষণে কি অশুভক্ষণে বলিতে পারি না আমার বিবাহ হইয়া গেল। কিরূপে মীমাংসা হইল জানিবার জন্য আমার ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। বিবাহের পর সকল কথা শুনিলাম; শুনিয়া আমার শরীর শিহরিয়া উঠিল। আমার শ্বশুর গমনে উদ্যত হইলে পাড়ার লোকেরা খুব উত্তেজিত হইয়া সদলবলে তাঁহাকে বাধা দিল এবং ভয় দেখাইল বিবাহ না দিয়া গেলে তাহারা পিতাপুত্রকে খুন করিবে। শ্বশুর মহাশয় অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু প্রাণভয়ে প্রতিবাদ করিতেও সাহস করিলেন না। বিবাহ হইয়া গেল। হায়! এ হতভাগিনীর জন্য তাহারা যদি এরূপ দুর্ব্যবহার না করিত তাহা হইলে হয়-তো আমার এ দশা হইত না!

"বাসর-ঘরে আমি আমার স্বামীর পায় ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। তিনি রাগিয়া বলিলেন—'এ অপমানের প্রতিফল শীঘ্রই ভোগ করিতে হইবে!' ভয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। সারা রাত্রি কাঁদিয়া পোহাইলাম। সেইদিন হইতে অভাগিনীর দুঃখময় জীবন আরম্ভ হইল। আমার চক্ষের জল আর শুকাইল না।

"বিবাহের পর এক বৎসর চলিয়া গেল, আমার স্বামী কি শ্বশুর আমার কোন সংবাদও লইলেন না। স্বামীর নিকট কাঁদিয়া মিনতি করিয়া কত পত্র দিলাম কিন্তু তিনি আমার সব পত্র ফেরত দিতে লাগিলেন! আমি দিনে গোপনে বসিয়া কাঁদিয়াছি। রাত্রে চক্ষের জলে বালিশ ভিজিয়া গিয়াছে, তবু বিধাতার দয়া হইল না। মা'র দুশ্চিন্তার অবধি নাই। অগত্যা মা একবার আমাকে নিয়া নৌকায় আমার শ্বশুরালয় গেলেন। শ্বশুর আমাদিগকে বাড়ীতে উঠিতে দিলেন না। আমি গোপনে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, তাঁহার পায় পড়িয়া কাঁদিলাম।

আমার চক্ষে জল দেখিয়া যেন তাঁহার কিছু দয়া হইল, তিনি বলিলেন—বিবাহের পণ চারি হাজার টাকা দিলে বাবাকে বলিয়া দেখিতে পারি।" সেই আশা লইয়া ফিরিলাম।

"ইহার কিছুদিন পর অকস্মাৎ মা'র মৃত্যু হইল। আমি অকূল সাগরে ভাসিলাম। মা মৃত্যুর পূর্ব্বে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"মনো, আমার নামে তিনি পাঁচ হাজার টাকার জীবন-বীমা করিয়া ছিলেন, আমি মরিলে সেই টাকা তুই পাইবি। এই টাকা তোর শ্বশুরকে দিস্।" এই কথা বলিয়া মা হাসি মুখে চক্ষু বুজিলেন।

"আমার জেঠীমা বিপদে আমার একমাত্র সহায় হইলেন। মা হারাইয়াও মায়ের স্নেহ ও যত্ন হইতে বঞ্চিত হইলাম না। মায়ের নামে যে টাকা ছিল তাহা পাইতে কিছু বিলম্ব হইল; তখন আমার শ্বশুর ধন সম্পত্তির মায়া ত্যাগ করিয়া স্বর্গবাসী হইয়াছেন। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম আমার স্বামী ডাক্তারী পাশ করিয়া কলিকাতা ব্যবসা করিতেছেন। আশায় বুক বাঁধিয়া তাঁহার সন্ধানে আসিলাম। অনেক তালাস করিয়া তাঁহার বাসা বাহির করিলাম। একদিন গোপনে ঝির সহিত তাঁহার অন্তঃপুরে গেলাম। তথায় গিয়া দেখিলাম আমার স্বামী নব পত্নীর ভালবাসা লাভ করিয়া বেশ সুখে আছেন। তাঁহার হাসিমাখা মুখখানি দেখিয়া আমি প্রাণের যাতনা ভুলিলাম, কিন্তু আমার হৃদয়ের আশা হৃদয়েই বিলীন হইল। পাছে আমার দুশ্চিন্তা স্বামীর সুখময় দাম্পত্য জীবন বিষাদপূর্ণ করিয়া তুলে সেই ভয়ে আমি তাঁহাকে দেখা দিলাম না; উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া বাসায় ফিরিলাম। সেই দিন হইতে আমার জ্বর আরম্ভ হইল।

সুধীরচন্দ্র এতক্ষণ যুবতীর মুখের উপর স্থির দৃষ্টি স্থাপন করিয়া নিবিষ্ট চিত্তে তাহার কাহিনী শুনিতেছিলেন; তাহার কথা শেষ হইতেই গভীর আবেগ ভরে বলিয়া উঠিলেন—"মনো, তুমি—তুমি" !—

তাঁহার মুখ হইতে আর কথা বাহির হইল না। তিনি যুবতীকে বাহুপাশে জড়াইয়া আলিঙ্গন করিলেন।

যুবতী বলিলেন—আমিই তোমার উপেক্ষিতা হতভাগিনী মনো।

যুবতী উৎসাহে উঠিয়া শয্যার উপর বসিলেন, সুধীরের নিষেধ মানিলেন না। বালিশের নীচ হইতে চারি হাজার টাকার নোট বাহির করিয়া স্বামীর চরণতলে রাখিলেন এবং স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিলেন—এতদিনে আমার ঋণ-শোধ হইল! এখন তোমাকে স্বামী বলিবার আমার অধিকার হইল।

আজ মৃত্যু-শয্যায় আমার বাসর! এস প্রিয়তম তোমাকে বুকে ধরিয়া আমার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করি।

সুধীরচন্দ্র পত্নীকে সাদরে বুকে টানিয়া লইলেন, যুবতী তাহার অবশ মস্তক স্বামীর স্কন্ধে স্থাপন করিয়া বাহুলতা দিয়া কণ্ঠ বেষ্টন করিলেন। তারপর ক্ষীণ কণ্ঠে অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন—'প্রিয়তম, এ জন্মে তোমাকে পাইলাম না, জন্মান্তরে যেন তোমাকে পাই।"

এই বলিয়া যুবতী স্বামীর ক্রোড়ে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। জীবন-প্রদীপ নিবিয়া গেল! সব ফুরাইল!

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী—শ্রাবণ। রবিবাবুর উপন্যাস 'গোরা' চলিতেছে। সঙ্কলন ও সমালোচনায় অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জাপানের ধর্ম্ম' উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। 'সাগরের প্রতি' শ্রদ্ধেয় অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের To sea কবিতার অনুবাদ। এই কবিতার প্রতিছত্রে অনুবাদক শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের বিফল চেষ্টার পরিচয় পরিস্ফুট হইয়াছে। বিস্তারিত সূচীতে সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন "ইহা পাঠ করিলে কর্ম্মবিমুখ অলস ভীরুর প্রাণেও কর্ম্মোৎসাহ ও কর্ম্ম করিবার সাহস সঞ্চার হয়।" তথাস্তু। শ্রীযুত শরচন্দ্র রায়ের 'মারাঠা জাতির অভ্যুদয়' স্বর্গীয় রাণাডে মহোদয়ের Rise of the Maratha নামক গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। অনেক শিখিবার ও ভাবিবার বিষয় আছে। 'মেগাস্থেনিসের ভারত-ভ্রমণ' শ্রীযুত রজনীকান্ত গুহের লিখিত Megasthenis Indicaর ভূমিকার অনুবাদ। অনেকগুলি সমস্যার উল্লেখ আছে কিন্তু সমাধান নাই। আমরা রজনী বাবুকে উক্ত গ্রন্থখানির অনুবাদ করিতে অনুরোধ করি। 'ফুলহার' শ্রীযুত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত একটী ছোট গল্প। ইহার উপাখ্যান বস্তু যেমন অকিঞ্চিৎকর তেমনি অস্বাভাবিক। ভাষাও ভাল হয় নাই। শ্রীযুত অনাথবন্ধু সরকারের 'ফলরক্ষণ' প্রবন্ধটীতে অনেক অভিনব তথ্যের সমাবেশ আছে। শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বর্ণবণিকবৃত্তি' একটী উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত ইন্দুমাধব মল্লিকের 'আমাদের সংসারে নিত্যকার অপচয়' প্রবন্ধে গৃহস্থের অনেক জানিবার কথা আছে। ভালবাসার প্রতিশোধ একটী ক্ষুদ্র গল্প; লেখক শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

সকলের অনধিগম্য ফরাসী সাহিত্য হইতে এই রত্ন সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। আমরা জহুরী নই, এই রত্নের মূল্য বুঝিতে পারিলাম না। 'পাট ও নালিতা' কৃষিতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুত দ্বিজদাস দত্ত মহাশয়ের লিখিত সারগর্ভ মৌলিক প্রবন্ধ।

নব্যভারত—জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়। শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' সময়োপযোগী হইয়াছে। লেখকের উচ্ছ্বসিত আবেগ প্রবন্ধের প্রতিছত্রে পরিব্যক্ত হইয়াছে। 'বাণ ও শোণিতপুরে' প্রত্নতত্ত্বের অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে। শ্রীযুত বনোয়ারীলাল গোস্বামীর 'জন্মভূমি' কবিতাটী অতিশয় মর্ম্মস্পর্শিনী হইয়াছে। শ্রীযুত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্যের 'অদ্বৈতবাদ ও ঋগ্বেদের দেবতা' শ্রীযুত আশুতোষ দেবের গীতার অবতার বাদ ও শ্রীযুত দেবেন্দ্রবিজয় বসুর 'সাংখ্য সূত্র' গবেষণাপূর্ণ ক্রমশঃ প্রকাশ্য দার্শনিক প্রবন্ধ। শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর 'গিরিজাপ্রসন্ন' একটী সুখপাঠ্য প্রবন্ধ। শ্রীযুত নিখিলচন্দ্র চন্দের 'দুর্গেশনন্দিনীর বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে বাগাড়ম্বর আছে কিন্তু পাদার্থ নাই।

জাহ্নবী—বৈশাখ। এই সংখ্যার জাহ্নবীতে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আছে। শ্রীযুত মুনীন্দ্রনাথ দেবের 'পদ্ম-করবী' কবিতাটী বেশ হইয়াছে। শ্রীযুত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের "পতঞ্জলির কাল নির্ণয়" প্রবন্ধে পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীযুত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শাচীনামায়' অনেক ঐতিহাসিক মসলা আছে। শ্রীযুত শশধর রায়ের 'উদ্ভিদের দুষ্টামি' কৌতূহলপূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ।

অলৌকিক রহস্য—শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ এম, এ, মহোদয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই মাসিক পত্রিকা খানির একটু বিশেষত্ব আছে; ইহাতে কেবল আত্মিক-কাহিনী প্রকাশিত হয়। আজকাল সকল দেশেই ভৌতিকতত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য চেষ্টা হইতেছে। ক্ষীরোদ বাবুকে এই ক্ষেত্রে অবতীর্ণ দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছিলাম কিন্তু দুঃখের বিষয় সম্পাদক মহাশয় 'অলৌকিক রহস্যে' কেবল বৈদেশিক গল্পের অনুবাদ প্রকাশ করিতেছেন। এপর্য্যন্ত স্বাধীন চিন্তা ও অনুসন্ধিৎসার কোন পরিচয় পাইলাম না। ভৌতিক ব্যাপার সম্বন্ধে শুনা কথা-ত আবাহমানকাল হইতেই প্রচারিত হইতেছে; তাহাতে কি কোন সত্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে?

আরতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

৬ষ্ঠ বর্ষ } ময়মনসিংহ, ভাদ্র, ১৩১৬। { ৫ম সংখ্যা।

রাজ-সূর্য্য।

আকাশে কালপুরুষ নামক একটী নক্ষত্র-মণ্ডলী আছে। সাধারণ লোকে স্থান বিশেষে উহাকে 'আদমসুরত' বলে। এখন অগ্রহায়ণের শেষভাগে কালপুরুষ সন্ধ্যার পরই পূর্ব্বাকাশে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই নক্ষত্র-মণ্ডলী দেখিতে অনেকটা পুরুষের আকৃতি-সদৃশ; আর বোধ হয় আদিম কালের অধিবাসীরা ইহা দেখিয়া রাত্রিতে কাল নির্ণয় করিত। এইজন্য উহার কালপুরুষ নাম-করণ হওয়া বিচিত্র নহে। এই নক্ষত্র-মণ্ডলীর ইংরেজী নাম "অরায়ন' (orion); উহা গ্রীক্ শব্দ। গ্রীক্‌দিগের অরায়ন (orion) কথাটী হিন্দুদিগের নিকট হইতে গৃহীত। অরায়ন, অগ্রয়ণ (অগ্রহায়ণ) কথার অপভ্রংশ। ঋগ্বেদে শারদ বর্ষের উল্লেখ আছে। শারদ বর্ষের প্রথম মাসেরই নাম অগ্রহায়ণ। প্রাচীন বৈদিক কালে এক সময়ে অগ্রহায়ণ মাস হইতে বর্ষ গণনা হইত।

কালপুরুষের নক্ষত্র-রাজীর ন্যায় উজ্জ্বল ও বৃহৎ নক্ষত্র আর কোন নক্ষত্র-মণ্ডলীতে দৃষ্ট হয় না। উহার মস্তকের নক্ষত্রগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র; হস্তের একটী নক্ষত্র খুব উজ্জ্বল এবং দেখিতে লাল; ইহার নাম 'বেটেলগো'। কালপুরুষের কোমরে কতকগুলি নক্ষত্র আছে উহাদিগকে কালপুরুষের পেটিকা(Belt) বলে। ঐ পেটিকার নিম্নভাগে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র পর পর বস্থিত, উহাদিগকে কালপুরুষের তরবারি (Sword) বলে। কালপুরুষের পাদদেশে একটী অত্যুজ্জ্বল তারকা আছে, তাহার নাম রিগেল (Rigel) রিগেলের রঙ সুনীল।

এ হেন বিচিত্র কালপুরুষকে আকাশে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন নহে। কালপুরুষের পেটিকাটি বর্দ্ধিত করিয়া নীচের দিকে মনে মনে একটী রেখা

টানিলে ঐ রেখা একটী অতি উজ্জ্বল নক্ষত্রে আসিয়া ঠেকিবে। এই নক্ষত্রের নাম লুব্ধক বা মৃগব্যাধ; ইংরেজীতে উহাকে Sirius সিরিয়স কহে। প্রাচীন আর্য্য সাহিত্যে উহার মৃগব্যাধ নামই বিশেষ প্রসিদ্ধ।

অশীতি ভাগৈর্যাম্যায়ামগস্ত্যো মিথুনান্তগঃ।
বিংশেচ মিথুনস্যাংশে মৃগব্যাধো ব্যবস্থিতঃ॥

সূর্য্যসিদ্ধান্ত, ৮ম অধ্যায়।

মিথুন রাশিকে আশীভাগে বিভক্ত করিলে উহার শেষ ভাগে অগস্ত্য এবং বিংশতিভাগে মৃগব্যাধ অবস্থিত। লুব্ধক আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। লুব্ধক স্বীয় উজ্জ্বলতায় সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। ইহা যেমন উজ্জ্বলতায় শ্রেষ্ঠ তেমনি আয়তনেও সুবৃহৎ এই জন্য জ্যোতির্ব্বিদগণ উহাকে "রাজ-সূর্য্য" বলিয়া থাকেন।

লুব্ধক কালপুরুষের পাদদেশে অবস্থিত হইলেও উহা কেনিস্ মেজর (Canis major) নামক নক্ষত্র-মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত। যদিও অতি প্রাচীনকালে এই নক্ষত্রটী জ্যোতির্ব্বিদগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল তথাপি উহার অচিন্তনীয় দূরত্বহেতু তাঁহারা ইহার কোন তত্ত্বই আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন নাই। পৃথিবী হইতে সূর্য্য ৯২৭০০০০০ নয় কোটি সাতাইশ লক্ষ মাইল দূরে আছে; লুব্ধক এই বিশাল দূরত্বেরও অন্ততঃ দশ লক্ষ গুণ দূরে অবস্থিত।

লুব্ধক মিনিটে প্রায় হাজার মাইল গতিতে আকাশে ছুটিতেছে তবু আমরা উহাকে নিশ্চল দেখিতে পাই। কিন্তু লুব্ধক নক্ষত্রের বেগ সর্ব্বদা সমান থাকে না, তাহার হ্রাস বৃদ্ধি হয়। এই ব্যাপারটী লক্ষ্য করিয়া জ্যোতির্ব্বিদগণ অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। কোনও বাধাপ্রাপ্ত না হইলে জড় পদার্থের বেগের বৈষম্য হইতে পারে না, তবে লুব্ধকের গতির বেগ হ্রাস বৃদ্ধি হয় কেন?

লুব্ধক যে সমগতিতে চলিতেছে না এই তথ্য ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত বেসেল্ (Bessel) আবিষ্কার করেন। বেসেল ভাবিলেন নিশ্চয়ই কোন প্রতিকূল শক্তি লুব্ধকের গতির বেগ হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে। অনন্ত আকাশে প্রতিরোধক শক্তি আকর্ষণ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। পণ্ডিতেরা আলোচনা করিয়া স্থির করিলেন, লুব্ধকের একটী সঙ্গী আছে। ঐ সঙ্গী লুব্ধককে প্রদক্ষিণ করিতেছে। সুতরাং লুব্ধককে আমরা যুগল নক্ষত্র বলিতে পারি।

লুব্ধকের সহচর যখন লুব্ধককে প্রদক্ষিণ করে তখন উহা কখন পশ্চাতে পড়ে

কখন সম্মুখে আসে। সম্মুখ হইতে টানিলে উহার গতি বৃদ্ধি পায় আর পশ্চাৎ হইতে টানিলে কমে। এই অনুমানে জ্যোতির্ব্বিদগণ যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিলেন। অতঃপর ঐ অদৃষ্টচর নক্ষত্র কোন সময়ে কোথায় অবস্থান করিবে তাহাও নির্দ্ধারিত হইল। কিন্তু নক্ষত্রটী তখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আমেরিকায় এল্‌বান ক্লার্ক নামক একজন প্রসিদ্ধ দূরবীক্ষণ নির্ম্মাতা ছিলেন। ক্লার্ক ও তদীয় পুত্র একত্র কারখানায় কাজ করিতেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ক্লার্কের কারখানায় একটী সুবৃহৎ দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মিত হইল। কনিষ্ঠ ক্লার্ক যখন ঐ দূরবীক্ষণ পরীক্ষা করিবার জন্য লুব্ধক নক্ষত্রে উহার দৃষ্টি স্থাপন করিলেন তখন উহার সঙ্গীটী ধরা পড়িল। ঐ সঙ্গীটী ঐ সময়ে যে স্থানে থাকিবে বলিয়া পণ্ডিতেরা পূর্ব্বে নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল ঠিক সেই স্থানেই আছে!

লুব্ধকের সঙ্গী লুব্ধককে ঊনপঞ্চাশ বৎসরে একবার প্রদক্ষিণ করে। ঐ সহচরটী অতিশয় হীনপ্রভ; লুব্ধক হইতে পৃথক করিয়া দেখিলে উহা উজ্জ্বলতায় সপ্তম শ্রেণীর নক্ষত্র পর্য্যায়ভুক্ত হইবে। লুব্ধক স্বীয় সহচর হইতে হাজারগুণ অধিক উজ্জ্বল কিন্তু মাত্র দ্বিগুণ ভারী। ইহা আমাদের সূর্য্য হইতে ওজনে অধিক ভারী কিন্তু ঔজ্জ্বল্যে অতি হীন। ঐরূপ একশত নক্ষত্র একত্র করিলেও পার্থিব সূর্য্যের সমান জ্যোতিঃ লাভ করিবে না। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় ব্রহ্মাণ্ডে হয়ত অতি ক্ষীণ-জ্যোতিঃ অনেক বৃহৎ নক্ষত্র পরিভ্রমণ করিতেছে কিন্তু দূরবীক্ষণের দৃষ্টিতে ধরা পড়িতেছে না!

জ্যোতির্ব্বিদ্ প্রক্‌টার বলেন লুব্ধকের আয়তন আমাদের সূর্য্যের আয়তন হইতে প্রায় দুই হাজার গুণ বৃহৎ। অর্থাৎ লুব্ধক উহার বিরাট উদর গহ্বরে আমাদের সূর্য্যের ন্যায় দুই হাজার সূর্য্য ধারণ করিতে পারে। সাগর শোভিতা শৈল-কিরীটিনী পৃথিবী হইতে আমাদের সূর্য্য প্রায় ১২ লক্ষ গুণ বৃহৎ; আবার অনন্ত আকাশে দীপশিখার ন্যায় প্রতীয়মান লুব্ধক নক্ষত্র, সেই বিরাট সূর্য্য হইতেও দুই হাজার গুণ বড়! এইজন্যই উহাকে **রাজ-সূর্য্য** কহে। লুব্ধকের আয়তন কত বড় তাহা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য! কিন্তু লুব্ধক সূর্য্য হইতে মাত্র ২০ বিশগুণ অধিক ভারী। সুতরাং উহার উপাদান সূর্য্যের উপাদান হইতে হাল্‌কা।

ভারতবর্ষ

জগতে রয়েছে তব কর্ত্তব্য মহান্ ;
অহল্যা পাষাণী প্রায়, আছ পড়ে এ ধরায়;
তোমায় চিনে না কেহ, করে না সম্মান ;
চিরদিন তুমি ভবে অনাদৃতা নাহি রবে
অচিরে লইবে সবে তোমার সন্ধান ;
তব পুণ্য তপোবনে সন্তপ্ত ব্যাকুল মনে
আসিবে বিশ্বের লোক জুড়াতে পরাণ ;
তোমার অক্ষয় কীর্ত্তি, অসীম বীরত্ব স্ফূর্ত্তি,
পর-নির্য্যাতন নহে, আত্ম-বলিদান ;
জগতে রয়েছে তব কর্ত্তব্য মহান্ !

জগতে রয়েছে তব কর্ত্তব্য মহান্ ;
জিগীষু সৈনিক বেশে কভুও পরের দেশে
প্রবেশ করেনি তব তাপস-সন্তান ;
জ্ঞান-অস্ত্র-বলে তারা, বিজয় করেছে ধরা,
তুলিয়াছে সগৌরবে গৈরিক নিশান ;
মহত্ব গৌরব তব ক্ষমা ত্যাগ অভিনব
পালিছ সমগ্র বিশ্ব করি স্তন্য দান ;
কিবা সাম্য উদারতা, অসামান্য বদান্যতা,
এমন কাহার নাই আত্মপর জ্ঞান ?
অহিংসা পরম ধর্ম্ম, পর-সেবা প্রিয় কর্ম্ম,
মহা শিক্ষা তুমি সবে করেছ প্রদান ;
জগতে রয়েছে তব কর্ত্তব্য মহান্ ।

হইবে জননী তব পুন অভ্যুদয় ;
অস্ত্র-শস্ত্র অভিনব, কিছুই চাহি না তব
আছে তব তপোবল অমূল্য অক্ষয় ;
মনে পড়ে একদিন, আরব পারস্য চীন,
'কিনিস' '[illegible]নী' আদি জাতি সমুদয় ।

বসি তব পদতলে, শিখিয়াছে কুতূহলে,
জ্ঞান, ধর্ম্ম, কত তত্ত্ব হইয়া তন্ময় ;
সে অমূল্য রত্নরাজি, তোমারি কুটিরে আজি,
উপেক্ষিত, অনাদৃত, ম্লান ধূলিময় !
তুলে নেও সেই রত্ন অমূল্য অক্ষয়।

গৌরবের দিন তব আসিছে আবার ;
সাম্রাজ্য-বিভব ফেলি, ঐশ্বর্য্য চরণে দলি,
হৃদয়ে লইয়া তৃষা দুঃসহ দুর্ব্বার,
জ্বলিয়া বিষয়-বিষে, চির সুখ শান্তি আশে,
আসিবে সকল জাতি দুয়ারে তোমার !
পাপ পুণ্য সদসৎ, নির্ব্বাণ মুক্তির পথ,
তুমিই জগতে পুন করিবে প্রচার ;
নিবৃত্তির মহা ফল, বৈরাগ্যে যে কত বল,
তুমি ভিন্ন শিখাইতে কার অধিকার ?
তব বেদ তব গীতা, বেদান্ত অমৃতগাথা,
জুড়াইবে মর্ম্মদাহ সন্তপ্ত জনার ;
ওগো রাজ-রাজেশ্বরী, সে দিন আসিছে ফিরি,
পূরবে উঠেছে রবি ভেদিয়া আঁধার !
গৌরবের দিন তব আসিছে আবার।

—দীন সন্তান।

ভূতের বাড়ী।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দুই সখী।

দরিদ্র ভিক্ষুক সহসা অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইলে যেমন আনন্দের আতিশয্যে বড়ই অধীর হইয়া পড়ে, সন্তপ্তা অমলাবাইও তেমনি বহুদিন পর হৃদয়ে শান্তিলাভ করিয়া সুখে আত্মহারা হইয়া গেলেন। সুখের [illegible] তীব্রতা তাঁহাকে দুঃখের মত আকুল করিয়া তুলিল।

নিদ্রা হইল না। বিছানায় শুইয়া অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ করিলেন; প্রতি মুহূর্ত্ত তাঁহার নিকট বৎসরের ন্যায় দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল। চিন্তা স্রোত যখন অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল তখন শয্যায় শুইয়া থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইল।

কাঞ্চন সেই কক্ষেই নিদ্রিতা ছিল। অমলাবাই তাহাকে জাগাইবার জন্য তাহার গায় ধাক্কা দিলেন; গৃহে প্রদীপ জ্বলিতে ছিল, কাঞ্চন চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিল রাণী তাহার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্টা! কোন দুর্ঘটনা হইয়াছে আশঙ্কা করিয়া কাঞ্চন তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল এবং ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি হইয়াছে রাণী মা?

অমলা—ভয় নাই; কিছু হয় নাই।

কাঞ্চন--তবে এত রাত্রে জাগিয়া বসিয়া আছেন কেন? আপনি না ঘুমাইয়া ছিলেন?

অমলা—এক মুহূর্ত্তের জন্য আমার তন্দ্রাও হয় নাই, ঘুম-তো দূরের কথা।

কাঞ্চন হাসিয়া বলিল—এত সুখের চিন্তা যা'র প্রাণে তা'র কি ঘুম আসে! আরও মহারাজ কাল আসিবেন।

অমলা-- চল্ কাঞ্চন বারেন্দায় গিয়া বসি।

অমলাবাই কাঞ্চনের হাত ধরিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইলেন।

তখন নিশীথ কাল। রজনী জ্যোৎস্নাময়ী; সুবিমল চন্দ্রকিরণে বৃক্ষবল্লরী উদ্ভাসিত হইয়াছে; পাপিয়ার মাদকতাপূর্ণ সুমধুর সঙ্গীতধ্বনিতে কানন-কান্তার মুখরিত হইতেছে। প্রকৃতিদেবী যেন আপন সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

অমলাবাই একখানি আসনে উপবেশন করিলেন, কাঞ্চন তাঁহারই পার্শে বসিল। প্রেমের কাছে যেন শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল।

অমলাবাই বলিলেন—কাঞ্চন, আজ আমার মনটা বেশ ভাল বোধ হইতেছে, কেন বল্ দেখি?

কাঞ্চন—কাল মহারাজ আসিবেন, তাহাকে সুসংবাদ দিবেন, সেইজন্য।

অমলা—না কাঞ্চন, তা নয়; ভগবান আমাকে এখন মনে বল দিয়াছেন, তিনি আমার ভুল দেখাইয়া দিয়াছেন। আমি বুঝিয়াছি আমার নিজের দোষেই আমার জীবন দুঃখময় হইয়াছে। যে সকল বিষয় অন্যে তুচ্ছ বলিয়া উপেক্ষা করে আমি তাহাই অতিশয় গুরুতর মনে করিয়া দিবারাত্রি জ্বলিয়া মরিয়াছি।

কাঞ্চন—রাণী মা, আমি-তো অনেকদিন সেই কথাই বলিয়াছি। আমরা রমণী, নীরবে সব সহ্য করিয়া থাকিব।

অমলা—কাঞ্চন, আগে তোর এই সকল কথা শুনিলে আমার রাগ হইত, তোকে নিতান্ত নির্ব্বোধ মনে করিতাম, এখন দেখিয়াছি আমারই ভুল।

কাঞ্চন—রাণী মা আপনি যেমন শিক্ষিতা ও ধর্ম্মপরায়ণা, মহারাজের ব্যবহারে আপনার ঘৃণা ও ক্রোধ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু তাহাতে যে সুফল হয় নাই এখন বুঝিতে পারিয়াছেন।

অমলা—কাঞ্চন, আমি পিতৃগৃহে যে শিক্ষালাভ করিয়াছি তাহা ক্ষুদ্র সংসারের শিক্ষা নয়। আমি শৈশবে মাতৃহীনা হইয়াছি, পিতা আমার সর্ব্বত্যাগী তাঁহার উপদেশে ও আদর্শেই আমার জীবন গঠিত হইয়াছে; তাই অন্যের সামান্য দুর্ব্বলতাও আমার অসহ্য বোধ হয়। অনেক চেষ্টা করিয়াছি; স্বামীর দোষের কথা বলিয়া আর তাঁহার অপ্রিয় হইব না। এখন ঈশ্বরের নিকট হৃদয়ের প্রার্থনা বলিব, স্বামীর জন্য তাঁহার নিকট কাঁদিব, তিনিই তাঁহার সুমতি দিবেন। আমি স্বামীর স্নেহ পাই আর নাই পাই, তিনি আমার দেবতা; সকল অবস্থায়ই তিনি আমার ভক্তির পাত্র।

অমলাবাই এখন শোক দুঃখের অতীত। তাঁহার চিত্তের গ্লানি তিরোহিত হইয়াছে। কাঞ্চন সরল-হৃদয়া রাণীর আত্মত্যাগের পবিত্র উচ্ছ্বাস শ্রবণ করিয়া প্রাণে বিমল আনন্দ অনুভব করিল।

কাঞ্চন বলিল—রাণী মা, মহারাজ সুসংবাদ শুনিয়া কি বলেন আমাকে বলিবেন, তা'হলে তাঁ'র মনের ভাব বুঝিতে পারিব।

অমলা—দূর-বা আমি কি তাঁকে বলিব? তিনি বাড়ী আসিবেন শুনিয়াই আমার লজ্জা হইতেছে।

কাঞ্চন—ভারি-তো লজ্জার কথা; আপনার মনে এ কথা বেশীক্ষণ গোপন থাকিবে না তা আমি জানি।

অমলা—আচ্ছা দেখিস্।

কাঞ্চন—রাণী মা দুঃখ কাহারো চিরদিন থাকে না; আপনার দুঃখের দিন শেষ হইয়াছে। সন্তানের মুখ দেখিলেই নিশ্চয় মহারাজের জীবনের পরিবর্ত্তন হইবে। তিনি এখন হইতে আপনাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিবেন।

বাগানের নিবিড় লতা-মণ্ডপ হইতে একটা পেঁচক বিকট চীৎকার করিয়া যেন কাঞ্চনের কথার তীব্র প্রতিবাদ করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিনামেঘে বজ্রাঘাত।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কুমার সিংহ আরাম ভবনে আসিয়া পৌঁছিলেন। অমলাবাই স্বামীর আগমন সংবাদ শুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। কিন্তু অচিরে স্বামীর দর্শন সুখ লাভের বাসনা হৃদয়ে স্থান দিতে ভরসা হইল না। ইদানীং কুমার সিংহ আরাম ভবনে অবস্থান করিলেও পত্নীর সহিত দৈবাৎ তাহার সাক্ষাৎ হইত। তিনি বহির্ব্বাটিতেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। অমলা-বাই যখন কিছুতেই স্বামীর হৃদয় অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন না তখন তিনিও সাবধানে তাঁহার চক্ষুর অন্তরালে থাকিতে লাগিলেন। যাচিয়া সোহাগ লাভের জন্য এত দিন কোন আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই।

এবার তিনি পবিত্র প্রেমানলে অভিমান আহুতি দিয়া স্বামীর চিত্ত-বিনোদন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। তাই স্বামীর আগমন সংবাদ শুনিয়া তিনি অতিশয় প্রফুল্ল হইলেন এবং তাঁহার চরণে আত্ম-সমর্পণ করিতে ব্যাকুল হইলেন।

নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া অমলাবাই স্বামীর দর্শন লাভের উপায় চিন্তাকরিতে-ছিলেন এমন সময় সিঁড়িতে সেই চির পরিচিত পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল। তিনি দ্রুত পাদবিক্ষেপে দ্বারের সমীপবর্ত্তী হইলেন। কুমার সিংহ প্রকোষ্টে প্রবেশ করিবা মাত্র অমলাবাই সাদরে সুকোমল বাহু যুগলদ্বারা স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া সাহাস্যে কহিলেন— যা হউক এতদিনে মনে হইয়াছে।

কুমার সিংহ পত্নীর নিকট এরূপ সাদর অভ্যর্থনা প্রত্যাশা করেন নাই। দম্পতির অন্তরের ব্যবধান যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহাতে তাদৃশ প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষণ তাহার নিকট নিতান্ত অস্বাভাবিক বলিয়াই প্রতীয়মান হইল। ইহাতে তাঁহার হৃদয়ের সন্দেহ অধিকতর বৃদ্ধি হইল। তিনি সবলে পত্নীর বাহুপাশ ছিন্ন করিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন। স্বামীর গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া অমালাবাই অতিশয় ভীত হইলেন। তাঁহার অধরের মধুর হাসি-রেখা অধরেই মিশিয়া গেল। নিশ্চল প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় তিনি স্বামীর মুখের দিকে বিস্ময় বিস্ফারিত লোচনে তাকাইয়া রহিলেন। রাজা কোন কথা বলিলেন না; তিনি এত আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছিলেন যে তাহার কোন কথা বলিবার শক্তি ছিল না। কিন্তু তাঁহার আরক্ত নয়ন ও কুঞ্চিত ভ্রূযুগল হৃদয়ের প্রবল ঝটিকার আভাস প্রদান করিতেছিল।

সরলা অমলাবাই মনে করিলেন নিশ্চয়ই রাজ্য সম্বন্ধীয় কোন দুর্ঘটনা হইয়াছে, তাই ক্ষোভে ও রোষে রাজা এমন অধীর হইয়াছেন। তিনি হৃদয়ের সমগ্র বল একত্র করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমাকে এমন বিমর্ষ ও উৎকণ্ঠিত দেখিতেছি কেন? রাজ্যের কি কোন অমঙ্গল হইয়াছে?

এতক্ষণে ঝড় বহিল! রাজা তীব্র ভ্রূকুটি করিয়া কর্কশস্বরে কহিলেন—রাজ্যের অমঙ্গল? সে তো সামান্য কথা, কুমার সিংহ তাহা গ্রাহ্যও করিত না। কিন্তু কুলের কলঙ্ক অসহনীয়!

অমলাবাই স্বামীর প্রহেলিকাময় কথার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহার ধারণা হইল নিশ্চয়ই কোন গুরুতর ব্যাপার উপস্থিত। তাই তিনি ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি হইয়াছে? কিসের কলঙ্কের কথা বলিতেছ?

রাজা অধিকতর উত্তেজিত হইয়া কহিলেন—আমাকে ছলনা! বৃথা চেষ্টা! আমি তোর সব কথা শুনিয়াছি!

অমলাবাই স্তম্ভিত হইলেন, তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল; তিনি স্বামীর চরণ যুগল জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন—মহারাজ, বুঝিয়াছি আমিই তোমার ক্রোধের কারণ; বোধ হয় না জানিয়া কোন অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছি। দাসীকে ক্ষমা কর।

রাজা বসিয়াছিলেন আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং গর্জ্জিয়া কহিলেন—পাপিষ্ঠা তোর পাপের ক্ষমা নাই; সত্বর প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রস্তুত হ?

নির্ম্মম কুমার সিংহ মত্তমাতঙ্গের ন্যায় অমলাবাইএর বাহুলতা চরণে দলিয়া দ্রুতবেগে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অমলাবাই দুঃসহ মর্ম্মবেদনায় মেজে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার কেবল মনে হইতে লাগিল—"হায়! আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে মহারাজ এরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, এমন কি অন্যায় কাজ করিয়াছি যে কুলে কলঙ্কস্পর্শ করিয়াছে? প্রিয়তম, হে আমার হৃদয় দেবতা, আমি তো কোন দোষ জানি না; যদি না জানিয়া কোন অপরাধ করিয়া থাকি, তবে আমাকে বলিয়া দাও নাথ, আমি প্রাণ দিয়া তোমার ক্লেশ দূর করিব।"

অমলাবাইএর শোক প্রবাহ হৃদয়ে উছলিয়া উঠিল, দুই কপোল বাহিয়া অশ্রু ধারা পড়িতে লাগিল। এমন সময় সিঁড়িতে কাহার পদ শব্দ শ্রুত হইল। তিনি তাড়াতাড়ি চক্ষের জল মুছিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। কাঞ্চন কক্ষে প্রবেশ করিল।

কাঞ্চন চিরহাস্যময়ী, কথায় কথায় তাহার রসিকতা, বিষাদ কাহাকে বলে সে কখনও জানে না। কিন্তু কক্ষে প্রবেশ করিয়া সে যখন অমলা-বাইএর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল তখনই তাহার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। আর পরিহাস করিতে সাহস হইল না। যদি'ও অমলাবাই স্বীয় হৃদয়ের ভাব গোপন করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন তবু তাঁহার বদনে তীব্রমর্ম্ম বেদনা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। রাজা যে অমলাবাইএর প্রতি নিতান্ত দুর্ব্যবহার করিয়াছেন তাহা বুঝিতে কাঞ্চনের বিলম্ব হইল না। কিন্তু কক্ষে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ চলিয়া যাওয়া ভাল দেখায় না তাই অনিচ্ছাস্বত্বেও কাঞ্চন জিজ্ঞাসা করিল,—রাণী মা, মহারাজের সহিত আলাপ হইয়াছে ?

অমলা—বিশেষ কিছু আলাপ হয় নাই ; তিনি এই মাত্র ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছেন।

কাঞ্চন—শুভ সংবাদটা দিয়াছেন ত !

অমলা—দেই নাই ; অবসর মত দিব।

এই সময় একজন পরিচারিকা আসিয়া অমলাবাইএর হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিল। অমলাবাই হস্তাক্ষর দেখিয়া বুঝিলেন পত্র মহারাজ স্বয়ং লিখিয়াছেন। পত্রখানি তৎক্ষণাৎ আঁচলে বাধিলেন। কাঞ্চন তাহা দেখিয়াও চিঠি পড়িবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল না। সে বুঝিতে পারিয়াছিল স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্যের নূতন কারণ উপস্থিত হইয়াছে। স্বামীকৃত অপমানের কথা বুদ্ধিমতী রমণী কাহাকেও প্রকাশ করিয়া বলে না তাহা সে জানিত; তাই কাঞ্চন আর কোন কথা কহিল না। রাণীকে পত্র পড়িবার অবকাশ দিবার জন্য একটা কাজের উপলক্ষ করিয়া তাড়াতাড়ি সেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

কাঞ্চন চলিয়া গেলে অমলাবাই পত্র খুলিয়া পড়িলেন—

"পাপিষ্ঠা ! আমি আর তোর মুখ দেখিব না। এই মুহূর্ত্তেই তোর পাপের শাস্তি দিতাম কিন্তু কলঙ্ক দেশময় ছড়াইবে তাই ক্ষান্ত রহিলাম। আজ হইতে তুই শয়ন কক্ষে বন্দিনী হইলে। কাঞ্চন আর আরায় ভবনে আসিতে পারিবে না ; প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রস্তুত থাক্।"

পত্র পড়িয়া অমলাবাই কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু কোন একটা গুরুতর কাণ্ড হইয়াছে এবং রাজা তজ্জন্য তাঁহাকেই অপরাধিনী মনে করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন তাহা তিনি অনুমান করিতে পারিলেন। তিনি চিন্তায়

অধীর হইলেন, তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া গেল। অমলা-বাই মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল! ক্রমশঃ।

প্রসাদ-সঙ্গীতপ্রসঙ্গ (৪)।

কেবল আশার আশা ভবে আসা আসা মাত্র হ'লো,
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে ভ্রমর ডুবে র'ল॥
মা, নিম খাওয়ালে চিনি বলে কথায় করে ছল,
এখন মিঠার লোভে তিতমুখে সারা দিনটা গেল॥
মা, খেলবে বলে ফাঁকি দিয়ে নাবালে ভূতল,
এবার যে খেলা খেলিলে মাগো আশা না মিটিল॥
প্রসাদ বলে ভবের খেলা যা হবার তা হ'ল,
এবার সন্ধ্যা বেলা কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চল॥

কেবল আশার আশা ভবে আসা আসা মাত্র হ'লো,
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে ভ্রমর ডুবে র'ল॥

যাহার আশায় এ সংসারে বারম্বার আসা যাওয়া করিতেছি—যাহাকে পাইবার জন্য অনন্তকাল হইতে এই মহা আবর্ত্তনে ব্রতী হইয়াছি, তাহাকে পাইলাম কৈ? কেবল যে আশার ছলনাতেই মুগ্ধ হইয়া রহিলাম। শুনিয়াছি, "যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পেসুখমস্তি, অথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং তদ্দুঃখমিতি॥" যিনি অনন্ত তিনিই সুখস্বরূপ, তুচ্ছ বিষয়ানুসরণে সুখ নাই। সুখানুকৃতি বিষয় সমূহ যে সমুদয়কে সুখের আধার বলিয়া বিবেচনা করি, সে সমস্তই বিনাশশীল—ক্ষণস্থায়ী, সে সমস্তই দুঃখের স্বরূপ! হায়! মধুলুব্ধ ভ্রমর যেমন চিত্রিত পদ্ম হইতে মধুলাভের আশায় ব্যর্থ শ্রম করে,—বারম্বার বিফলমনোরথ হইয়াও তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না, প্রত্যুত তাহাতেই মজিয়া থাকে সেইরূপ অমিত সুখস্বরূপিণী তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া সুখের আশায় ব্যর্থ নামধেয় বিষয়সুখে মগ্ন হইয়া আছি। বারম্বার প্রতারিত হইয়াও সর্ব্বদা অতৃপ্তি অশান্তিতে দহ্যমান হইয়াও তাহা পরিত্যাগ করিতেছি না।

তৃষ্ণাসূচী বিনির্ভিন্নং মিশ্রং বিষয়সর্পিষা
রাগদ্বেষানলে পক্বং মৃত্যুরশ্নাতি মানবম্ ॥

(কুলার্ণব)

বাসনারূপ সূচীদ্বারা ছিন্নভিন্ন, বিষয়রূপ ঘৃত মিশ্রিত, অনুরাগ এবং বিদ্বেষরূপ অগ্নিতে পচ্যমান মানবকে মৃত্যু গ্রাস করিয়া থাকে। বাস্তবিক আমরা সুখতৃষ্ণায় পথভ্রষ্ট হইয়া সর্ব্বদা বিষয়রাজ্যে বিচরণ করি এবং অনুরাগ ও বিদ্বেষের বশীভূত হইয়া জীবন অশান্তিময় করিয়া তুলি, ইত্যবসরে মৃত্যু আসিয়া অলক্ষিতভাবে আমাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলে।

মা, নিম খাওয়ালে চিনি বলে কথায় করে ছল,
ও মা মিঠার লোভে তিতমুখে সারা দিনটা গেল ॥

গৃহকার্য্যে ব্যতীব্যস্তা জননী উৎসঙ্গাভিলাষী সন্তানকে মিষ্ট দ্রব্য দিয়া ভুলাইয়া রাখেন, তোমার কোলে যাইবার জন্য সমুৎসুক এই হতভাগ্যকেও তুমি সেইরূপ করিয়া ভুলাইয়া রাখিয়াছ। আমার প্রাণ চায় তোমাকে কিন্তু পাষাণী তুমি, তুচ্ছ বিষয়সুখে আমাকে ভুলাইয়া রাখিয়া নির্ম্মম হইয়া আছ, আর আমি হতভাগা সুখের আশায় সুখস্বরূপিণী তোমাকে পাইবার জন্য পথভ্রষ্ট হইয়া পাপের পিচ্ছিল বর্ত্মে আছার খাইতেছি। তোমার ছলনায় "মিঠার" লোভে "নিম" খাইয়া সারটা জীবন তিক্ত রসাস্বাদনেই কর্ত্তন করিতে বসিয়াছি।

মা খেলবে বলে ফাঁকি দিয়ে নাবালে ভূতল।
এবার যে খেলা খেলিলে মাগো আশা না পূরিল ॥

সেই একদিন ছিল—যখন "আমিত্ব পরিশূন্য" আমি তোমারই ক্রোড়ে সুখসুপ্ত ছিলাম, খেলার ছল দিয়া আমাকে ভূতলে নামাইয়াছ—তোমা হইতে পৃথক সত্তায় অনুভূতি দিয়া আমাকে সংসারী করিয়াছ, কিন্তু মা, এ খেলায়-ত আশা মিটিল না—প্রাণের সেই উৎকট পিপাসার-ত নিবৃত্তি হইল না! বুঝিতে পারিলাম তোমাকে ছাড়িয়া ইন্দ্রের অতুল ঐশ্বর্য্যেও শান্তি নাই—আর তোমাকে লইয়া তোমার ক্রোড়ে থাকিয়া শাকান্নে দিনপাত করাতেও মহা সুখ, কারণ তুমিই-ত সুখস্বরূপিণী।

প্রসাদ বলে ভবের খেলায় যা হবার তা হ'ল,
এখন সন্ধ্যা বেলা কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চল ॥

মা, ভবের খেলায় সুখ হইল না, তোমাকে ছাড়িয়া সংসারে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি মাত্র। এখন এ বৃদ্ধ বয়সের নিরানন্দময় জীবন-সন্ধ্যা সমাগত।

আজীবন মোহকরী আশার আলোকচ্ছটা কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে, এখন নৈরাশ্যের অন্ধকার মৃত্যুর করাল ছায়ার সঙ্গে একীভূত হইয়া হৃদয়-রাজ্য আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। খেলার চমক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখন আর ছলনা করিও না, আর ফাঁকি দিয়া লুকাইয়া থাকিও না। যাহাদের সঙ্গে খেলিয়াছি একে একে তাহারা সকলেই চলিয়া গিয়াছে। আর কেন? এখন সন্ধ্যা বেলা কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চল। "প্রবৃত্তির পথে সুখ নাই" এ কথা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি। বুঝিতে পারিয়াছি ভোগের দ্বারা ভোগাশার নিবৃত্তি হয় না, কিন্তু বুঝিলে কি হইবে মা, প্রবৃত্তির পথ হইতে সরিয়া যাই এমন শক্তি আমার নাই। আমাকে তুমি কোলে তুলিয়া না গেলে আমি যাইতে পারিব না। তাই বলি মা! "এখন সন্ধ্যাবেলা কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চল।"

শ্রীহরিকিশোর ভট্টাচার্য্য।

সান্ধ্য-বিলাপ।

কবে কোন্ দূর বর্ষে সময়ের তিমির মন্দিরে
নাহি আজি মনে;
সন্ধ্যাচ্ছায়া বিমলিন জনশূন্য তটিনীর তীরে
কোন্ ফুল বনে,
প্রান্তরের প্রান্তশায়ী আম্রবনে পল্লব মর্ম্মরে
কোন্ সন্ধ্যাবেলা
জাগিয়া উঠিত হৃদে বিহগের কল গুঞ্জস্বরে
স্বপনের মেলা।

নিস্তব্ধ আকাশ তলে মধ্যাহ্নের নিবিড় ছায়ায়,
সুতীব্র কিরণে
পল্লীবালকের খেলা, বংশীধ্বনি মৃদু মূর্চ্ছনায়
পড়ে আজি মনে;
স্মৃতির দিগন্তশিরে অতীতের মেঘরাজ্য হতে
আসে আজি ভাসি

বিচ্ছুরিয়া দীপ্তপ্রভা হৃদয়ের পরতে পরতে
স্বর্ণকর রাশি।

তাই আজ সাধ যায় কল্পনার কনক উচ্ছ্বাসে
ভাসাব হৃদয় ;
পক্ষিরব মুখরিত হেমন্তের সায়াহ্ন আকাশে
হবে তার লয় ;
সুদূর গগন প্রান্তে পশ্চিমের নীরব শিয়রে
মেলিয়া নয়ন,
জাগায়ে তুলিব হৃদে সন্ধ্যারুণ রক্তিমার পরে
বিস্মৃতির গান।

কিন্তু হায় কল্পনার স্বর্ণ তন্ত্রী গেছে আজি ভেঙ্গে,
সঙ্গীত উচ্ছ্বাস—
তটিনীর তান হ'তে মলয়ের হিল্লোলিত রঙ্গে
অতীত আভাষ
গেছে মিশে কোন্ দূর—দূরতম কুহেলিকাদেশে
অস্তাচল পারে,
আজিকার গিরি-নদী লতা-কুঞ্জ সকলের শেষে,
অতীতের দ্বারে।

পুষ্পমঞ্জরীর তুল্য কত অস্ফুট বাসনারাশি,
নিষ্ফল প্রয়াস,
জাগিয়া উঠিছে মনে নবতর কিরণ বিকাশি—
নব নব ভাষ,—
প্রদোষ তমসাতীরে নক্ষত্রের স্তিমিত আলোকে
আকাশের পটে
দেখিনু স্বপন আঁকা অতীতের সমাধি ফলকে
তিমিরের তটে।

ম্লান জ্যোতি তারাদল, শশি হীন অনন্ত আকাশ
মোর পানে চেয়ে
নীরবে ফেলিছে অশ্রু, কাঁদিতেছে আকুল বাতাস,
ক্লান্ত গেয়ে গেয়ে;
মাঝে মাঝে কানে আসে আরতির শঙ্খ ঘণ্টা তান
নদী পর পারে,
দূরে কোন্ গৃহস্থের জ্বলিতেছে সন্ধ্যাদীপ শিখা
নীরব কুটীরে।

থেকে থেকে শুনা যায় দগ্ধতৃণ প্রান্তরের পারে,
তরু অন্তরালে
শিবার প্রহর-ধ্বনি বসে আছি নদীর কিনারে
আলসে বিরলে,
শ্রান্তকায় ধেনুগুলি ধীরে ধীরে, চলে গৃহপানে
শূন্য জল স্থল—
আমি শুধু নিরখিছি তারি মাঝে উন্মুক্ত নয়নে
হৃদয়ের তল।

বেলা বয়ে গেছে চলে আলোকের অনন্ত আলয়ে
কোন্ স্বর্গপুরে—
জীবনের কাজ কর্ম্ম আঁধারের প্রচ্ছন্ন নিরয়ে
রয়ে গেল পড়ে;
আঁধারে রয়েছে ঘিরে সম্মুখের অনন্ত গগন
উদার মহিমা,
উপরে ভাসিছে শূন্যে দীপ্তিহীন নক্ষত্র নিচয়—
নিম্নে মলিনিমা!

—শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ।

গীতা।

হিন্দুধর্ম্মের সারস্বরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রের সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ শ্রীমদ্‌ভাগবদ্‌ গীতা' আজ সভ্য জগতের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। বর্ত্তমান সময়ে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা নানা ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়া পৃথিবীর প্রায় সকল মহাদেশেই নীত হইয়াছে। গীতা হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের শীর্ষ স্থানীয়, একথা একরূপ সর্ব্ববাদী সম্মত। সম্প্রতি গীতা কত আকারে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সংস্করণ (পকেট গীতা) হইতে বহু টীকা টিপ্পনি ভাষ্য অনুবাদ সমন্বিত বৃহত্তম সংস্করণ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। আজ ভারতবাসীর গৃহে গৃহে গীতা বিরাজমান। কেহ পাঠ করুন্ বা না করুন্ সভ্যতার অনুরোধেও এক একখানা গীতা সকলেরই রাখিতে হয়। এজন্য ভারতে বর্ত্তমান সময়টি "গীতা যুগ" বলিয়াও অভিহিত হইয়া থাকে। হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে বহু সারবান্ বৃহৎ গ্রন্থাবলী বিদ্যমান থাকিতে গীতা শাস্ত্রগ্রন্থের সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু এই সর্ব্বজন সমাদৃত শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌-গীতার উৎপত্তি রহস্য বড়ই কলঙ্কপূর্ণ। যে গীতা কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, প্রভৃতি অত্যুচ্চ যোগোপদেশ-পূর্ণ অদ্বিতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ, যে গীতা ধর্ম্ম জীবনের প্রধান অবলম্বন, যাহার উচ্চআদর্শ লক্ষ্যভ্রষ্ট মানবের পথ প্রদর্শক, সে গীতার উৎপত্তিস্থান কি কলঙ্ক কলুষিত হইতে পারে? তাই আজ কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন্ সময় গীতার উৎপত্তি হইয়াছে, এবং হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে বহু বৃহৎগ্রন্থ বিদ্যমান থাকিতে মহাভারতান্তর্গত এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার এত মাহাত্ম্য কেন? এই প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা করিব।

গীতা পাঠে জানা যায় কুরুক্ষেত্র মহাসমরের প্রারম্ভে কুরুপাণ্ডব পক্ষীয় অসাধারণ বীর্য্যবান নৃপতিবৃন্দ ও অন্যান্য বীরগণ যুদ্ধার্থ ব্যূহাকারে সমবেত হইয়া শঙ্খধ্বনি সিংহনাদে আকাশমণ্ডল পরিপূরিত ও পৃথিবী প্রকম্পিত করিলে পর দুর্য্যোধনাদিকে যুদ্ধোদ্যমসহ অবস্থিত এবং শরবর্ষণে প্রবর্ত্ত দেখিয়া কপিধ্বজ অর্জ্জুন শরাসন উত্তোলন পূর্ব্বক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, হে অচ্যুত! এই রণোদ্যমে কে কে আমার সহিত যুদ্ধ করিবে, তাহা যতক্ষণ আমি ভাল করিয়া না দেখাইয়া লই, ততক্ষণ তুমি উভয় সেনাদলের মধ্যস্থলে রথ সংস্থাপন কর। ভগবান্ বাসুদেব অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া উভয়

সৈন্যের মধ্যস্থলে রথ সংস্থাপন পূর্ব্বক কহিলেন, হে পার্থ? ভীষ্ম, দ্রোণ ও অন্যান্য রাজেন্দ্রবর্গ সমন্বিত কুরুবীরগণকে দর্শন কর।

অর্জ্জুন তখন উভয় পক্ষীয় সৈন্যমধ্যে পিতামহ, আচার্য্য. মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, শ্বশুর, শালক প্রভৃতি আত্মীয়গণকে যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত দেখিয়া অতিশয় কৃপাপরবশ ও বিষণ্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন. "হে ভগবন্! এই সকল আত্মীয় বন্ধুগণকে সমরেচ্ছায় সমুপস্থিত দেখিয়া আমার সর্ব্ব শরীর অবসন্ন ও মুখ বিশুষ্ক হইতেছে, দেহ বিকম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িতেছে, এবং শরীরে এক প্রকার দাহ উপস্থিত হইতেছে. আমি যেন আর বসিয়া থাকিতে পারিতেছি না, আমার মনে হয় যেন সমস্ত পদার্থ আমার চতুর্দ্দিকে বিঘূর্ণিত হইতেছে, আমি নানারূপ দুর্নিমিত্ত দর্শন করিতেছি? হে কৃষ্ণ! আমি রণস্থলে আত্মীয় স্বজনকে নিধন করা শ্রেয়ঃ মনে করি না। আমার রাজ্য সুখ বা বিজয়ে আকাঙ্ক্ষা নাই, যাহাদিগের জন্য লোকে রাজ্য সুখাদি কামনা করে, তাহারা সকলেই অদ্য যুদ্ধস্থলে প্রাণ দিতে সমুদ্যত, অতএব এই সমস্ত আত্মীয়-বর্গকে বিনাশ করিয়া আমি কিরূপে রাজ্য ভোগ করিব? সামান্য রাজ্যের কথা দূরে থাকুক ত্রৈলোক্যের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেও আমি ইহাদিগকে বধ করিতে পারিব না। হে কৃষ্ণ? দুর্য্যোধনাদিকে বধ করিয়া আমাদের কি সুখইবা লাভ হইবে? কুলক্ষয় করা মহাপাপ, আমরা জানিয়া শুনিয়া কেন এই মহাপাপে লিপ্ত হইব? আমি যুদ্ধে বিরত হইয়া অস্ত্রত্যাগ করিলে, নিরস্ত্রাবস্থায় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ যদি আমাকে বধ করে, তাহাও আমি মঙ্গলকর বলিয়া মনে করিব। অর্জ্জুন এইরূপ আরও অনেক কথা বলিয়া শোকোদ্বিগ্ন মনে অস্ত্র ত্যাগ পূর্ব্বক রথোপরি উপবেশন করিলেন।

অর্জ্জুন জ্ঞাতি হত্যাদি পাপের ভয়ে ভীত হইয়া অস্ত্র ত্যাগ করিলে পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে প্রথমতঃ শ্লেষপূর্ণ তীব্র তিরস্কার বাক্যে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতে অর্জ্জুনের অসার দেহে উত্তেজনার চিহ্ন মাত্র না দেখিয়া পরিশেষে কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতি নিগূঢ় তত্ত্বোপদেশ ও নিষ্কাম কর্ম্ম এবং কৈবল্য সাধক পরম জ্ঞানের উপদেশদ্বারা যুদ্ধবিমুখ অর্জ্জুনকে কুরুক্ষেত্রের মহা যুদ্ধে প্রবর্ত্ত করাইয়াছিলেন; ইহাই অষ্টাদশ অধ্যায়াত্মক শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার মূল বিষয়। এবং এই যুদ্ধপ্রবর্ত্তক উপদেশ সূত্রেই গীতার উৎপত্তি। যদি ইহাই প্রকৃত কথা হয়, তবে গীতার উৎপত্তি রহস্য যে ঘোর কলঙ্কপূর্ণ তাহার আর সন্দেহ নাই।

"সর্ব্বোপনিষদো গাবো
দোগ্ধা গোপালনন্দন।
পার্থ বৎস সুধী র্ভোক্তা
দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গাভী স্বরূপ সমস্ত উপনিষদ্ হইতে অর্জ্জুনকে বৎস কল্পনা করিয়া গীতারূপ অমৃতোপম শ্রেষ্ঠ দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন, সুধীগণ সেই দুগ্ধ পান করিয়া থাকেন। এতদ্দ্বারা বুঝিতে হইবে কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদেই গীতার উৎপত্তি। অর্জ্জুনকে যোগশিক্ষা, নিষ্কামকর্ম্ম, এবং মুক্তির উপদেশ প্রদান ব্যপদেশে ত্রিলোকের উপকারার্থ ভগবান্ জগতে গীতোক্ত ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন। গীতোক্ত ধর্ম্ম সংস্থাপন জন্যই যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কংস, কেশী, শিশুপাল প্রভৃতি দুষ্ক্রিয়াসক্ত কতিপয় পরাক্রান্ত ব্যক্তিকে বিনাশ করিয়া সাধুব্যক্তিগণের পরিত্রাণ করাও কৃষ্ণাবতারের উদ্দেশ্য বটে কিন্তু বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের বহুল প্রচার দ্বারা প্রকৃত ধর্ম্মের গ্লানি ও তদ্‌ঘটিত নরমেধ, গোমেধাদি হিংসা প্রধান যজ্ঞাদি দ্বারা অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইলে নিষ্কাম কর্ম্ম ও মোক্ষসাধক গীতোক্ত অদ্বৈতবাদধর্ম্ম সংস্থাপন জন্যই পরমাত্মা পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ নরদেহ ধারণ করিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

"যদা যদাহিধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতান্
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" (৪র্থ অঃ ৭।৮)

হে ভারত! যে যে সময় ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, সেই সেই সময়ই আমি দেহ ধারণ করিয়া থাকি। দুষ্টের বিনাশ ও সাধুদিগের পরিত্রাণার্থই আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। সুতরাং সর্ব্বোপনিষদের সারভূত যোগ রহস্যাত্মক ভগবদ্ বাক্য-গীতা যে কাপুরুষোচিত ক্লীবত্ব প্রাপ্ত অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবর্ত্ত করিবার জন্য লোকক্ষয়কর মহাসমরে শোণিত প্রবাহে পৃথিবী প্লাবিত করিবার জন্য যুদ্ধস্থলে প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহা অতি অশ্রদ্ধেয়।

মনোনিবেশ পূর্ব্বক ভগবদ্‌গীতা আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়, কোন গুপ্ত অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য কোন কৃতিকবি অর্জ্জুন চরিত্রে কাপুরুষোচিত ক্লীবত্বের আরোপ করিয়া গীতার উৎপত্তি রহস্য কলঙ্ক কলুষিত করিয়াছেন।

আমি গীতার দ্বারাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব, গীতার প্রথম অধ্যায় সম্পূর্ণ ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের কিয়দংশ অর্থাৎ যদ্দ্বারা কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধারম্ভে গীতা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা সূচিত হইয়াছে, তাহা কবি কল্পনার অপ্রাসঙ্গিক চেষ্টা মাত্র। এবং ভীষ্ম পর্ব্বের প্রথমভাগে (যুদ্ধারম্ভে) গীতার অবতারণা না করিলে মহাভারতের কোনই অঙ্গহানি হয় না।

প্রথম দেখা উচিত মহাভারতের শ্রেষ্ঠ নায়ক আদর্শ ক্ষত্রিয় মহাবীর অর্জ্জুনের পক্ষে উপস্থিত যুদ্ধক্ষেত্রে অনার্য্যোচিত অকীর্ত্তিকর ক্লৈব্যভাব প্রকাশ করা কত দূর অস্বাভাবিক? রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মানুরোধে কৌরব সভায় এক বস্ত্রা ঋতুমতী ভার্য্যা দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ বিহ্বলা এবং বস্ত্র হরণে সমুদ্যতা দেখিয়াও ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া ছিলেন না; সেই ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরও পূর্ব্বকৃত অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ এবং প্রতিজ্ঞাপালন জন্য শত্রুশোণিতে হস্ত রঞ্জিত করিতে সঙ্কুচিত হন নাই, অথচ যে অব্যাহত প্রতিজ্ঞ অর্জ্জুন স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ পিতৃতুল্য পূজনীয় অগ্রজ মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের শিরশ্চেদন করিবার জন্য খড়্গোত্তোলন করিয়াছিলেন, সেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অর্জ্জুন পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের ভয় না করিয়া পত্নীর কেশাকর্ষণ, বসনাকর্ষণকারী দুর্বৃত্তগণের প্রতি "নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কাপ্রীতি স্যাৎ জনার্দ্দন?" ধৃতরাষ্ট্রাত্মজ দুর্য্যোধনাদিকে বধ করিয়া আমাদিগের কি সুখ হইবে?—বলিয়া উপেক্ষা করিবেন, ইহা কি নিতান্ত অসম্ভব এবং অস্বাভাবিক নহে?

যুদ্ধারম্ভের অত্যল্প পূর্ব্বে (উদ্যোগ পর্ব্বের শেষ ভাগে) রাজা দুর্য্যোধন শ্লেষপূর্ণ বাক্যে উত্তেজিত করিয়া যুদ্ধে আহ্বান করার জন্য পাণ্ডবগণ সমীপে দূতরূপে উলুককে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তৎকালে সর্ব্ব সমক্ষে উলুকের হস্তধারণ করিয়া মহাবীর অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন,—

"দুর্য্যোধন মনে করিয়াছে, পাণ্ডব দয়াপরবশ হইয়া ভীষ্মকে সংহার করিবেন না, কিন্তু তুমি যাঁহার বীর্য্য আশ্রয় করিয়া অহঙ্কার পরতন্ত্র হইয়াছ, আমি সকল ধনুর্দ্ধরগণের সমক্ষে প্রথমেই সেই ভীষ্মকে বিনাশ করিব।"

অন্যস্থলে—

"আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমার সমক্ষে প্রথমেই দ্বীপস্বরূপ কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মকে রথ হইতে নিপতিত এবং বিনাশ করিব।" (মূল মহাভারতের বঙ্গানুবাদ)

অতএব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অর্জ্জুন অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়া যুদ্ধের প্রাক্কালেই যে বলিবেন,

"কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন॥"

(২য় অঃ)

হে মধুসূদন! পরমার্চ্চনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত কিরূপে আমি বাণদ্বারা প্রতিযুদ্ধ করিব?

দুইদিন অতীত হইতে না হইতেই এরূপ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা কি ক্ষত্রিয়-চূড়ামণি অর্জ্জুনের পক্ষে সম্ভব?

অর্জ্জুন এইরূপ বলিলে পর, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন,—

"কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতং
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন?

(২য় অঃ)

হে অর্জ্জুন! এই ঘোর সঙ্কট সময়ে কি জন্য তোমার অনার্য্যোচিত অকীর্ত্তিকর এবং স্বর্গকামীর অনাচরিত মোহ উপস্থিত হইল?

"ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ পার্থ! নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥"

হে পার্থ! তুমি ক্লীবত্ব অবলম্বন করিও না। হে শত্রুতাপন! তুমি কাপুরুষোচিত হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থ উত্থিত হও।

যুদ্ধক্ষেত্রে জ্ঞাতিবর্গ দেখিয়া অর্জ্জুনের যদি প্রকৃতই হৃদয়দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হইত, তবে তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণের এই শ্লেষপূর্ণ তিরস্কারের তীব্র কষাঘাতই যথেষ্ট; কিন্তু অর্জ্জুনের অসাড় দেহে ইহাতে কিছুমাত্র উত্তেজনার চিহ্ন লক্ষিত হইল না। অর্জ্জুন আত্মপক্ষ সমর্থনার্থ শ্রীকৃষ্ণকে পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন,—

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।"

(২য় অঃ ৫)

মহানুভব গুরুজনকে বিনাশ না করিয়া বরং ইহলোকে ভিক্ষান্নদ্বারা উদর পূরণ করাও আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। ইহা অক্ষাত্রোচিতবাক্য হইলেও না হয় অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে কতকটা সঙ্গত বলিয়া মনে করিলাম, কিন্তু অর্জ্জুন আবার বলিলেন,—

"যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ॥"

যাহাদিগকে বিনাশ করিয়া আমরা জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করি না, সেই ধৃতরাষ্ট্রাত্মজ দুর্যোধনাদিই আমাদিগের সম্মুখে অবস্থিতি করিতেছে। কি অপূর্ব্ব দয়া!! যে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ কৌরব সভামধ্যে পাণ্ডবগণের সমক্ষে পরিণীতা পত্নী পাঞ্চালাত্মজার কেশাকর্ষণ করিয়া বিবস্ত্রা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, এবং কামপরবশ হইয়া অনাবৃত উরু প্রদর্শন ও বহুবিধ অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, যাহাদিগের অসদ্ব্যবহারের সমুচিত দণ্ডবিধানার্থে ভীমার্জ্জুনাদি পাণ্ডবগণ ভীষণ প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, যে দুর্যোধনাদি শৈশবাবধি পাণ্ডবের শত্রুতা হৃদয়ে হৃদয়ে চিরপোষণ করিতেছে, জতু-গৃহ দাহ ও বিষ প্রদানাদি নানা কপট ষড়যন্ত্রদ্বারা পাণ্ডবগণের ধন প্রাণ বিনাশের চেষ্টা করিয়াছে, বিনা যুদ্ধে ধর্ম্মতঃ প্রাপ্য পৈতৃক রাজ্যের সূচ্যগ্র পরিমিত ভূমিও দান করিতে অসম্মত হইয়াছিল, "সেই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে বিনাশ করিয়া জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন না"—বলিয়া অর্জ্জুন বিষণ্ণমনে সম্মুখ যুদ্ধে অস্ত্রত্যাগ করিলেন, ইহা কি গাণ্ডীবধন্বা বিশ্ববিজয়ী অর্জ্জুনের পক্ষে সম্ভব? উপস্থিত যুদ্ধক্ষেত্রে নিতান্ত হীনবীর্য্য পুরুষেও এরূপ কাপুরুষতা দেখাইতে পারে না। আবার অব্যবহিত পরেই অর্জ্জুনের একটু ভাবান্তর হইল। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন,—

"কার্পণ্য দোষোপহত স্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্ম সংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহিতন্মে,
শিষ্যস্তেঽহং শাধিমাং ত্বাং প্রপন্নম্॥"

আমি ইন্দ্রিয় বিজয় করিতে অসমর্থ হইয়া কলুষিত স্বভাব এবং ধর্ম্মবিমূঢ় চিত্ত হইয়াছি; আমি শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্ব্বক তোমার শরণাপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমার পক্ষে নিঃসন্দেহরূপে যাহা শ্রেয়ঃ, তুমি আমাকে সেই শিক্ষা প্রদান কর। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কোন উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই, অর্জ্জুন আবার বলিতে লাগিলেন;—আমি পৃথিবীরাজ্যই প্রাপ্ত হই বা স্বর্গরাজ্যই প্রাপ্ত হই, ইহার কোনটিই আমি কল্যাণকর মনে করি না।

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বাতূষ্ণীং বভূবহ॥"—

শত্রুতাপন জিতনিদ্র অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিয়াই "আমি যুদ্ধ করিব না" এইরূপ স্পষ্ট জবাব দিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

এক্ষণ দেখা উচিত "কার্পণ্য দোষোপহত স্বভাব" ইত্যাদি শ্লোকের সহিত "ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দ!" এই পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের তৃতীয় চরণের কিরূপ গুরুতর অসঙ্গতি?

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পাণ্ডবেরা ঈশ্বর বলিয়াই জানিতেন; সে কথা ছাড়িয়া দিলে, মনুষ্য মধ্যেও বাসুদেব নরশ্রেষ্ঠ অদ্বিতীয় আদর্শ পুরুষ এবং পাণ্ডবগণের আশ্রয়। ধর্ম্মবিমূঢ়চিত্ত অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন, এবং অর্জ্জুনের পক্ষে কি কর্ত্তব্য, তাহার উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই তৎক্ষণাৎ আবার বলিলেন, "আমি যুদ্ধ করিব না" এরূপ অসঙ্গত প্রলাপ কি অর্জ্জুনের ন্যায় সর্ব্বগুণান্বিত ব্যক্তির উপযুক্ত? বোধ হয় কোন গুপ্ত কবি তাঁহার নিজের মস্তিষ্কতারল্য অর্জ্জুনের প্রতি আরোপ করিয়াই শ্লোকদ্বয়ের অসঙ্গতির হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন।

আমি গীতাদ্বারাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব যে গীতার প্রথম অধ্যায় সম্পূর্ণ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের কিয়দংশ, যদ্দ্বারা কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধারম্ভে গীতা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা কবিকল্পনার অসঙ্গত চেষ্টা মাত্র।

বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গম হয় এবং ক্রমে তাহা শাখা প্রশাখা ও পুষ্প ফলে সুশোভিত হইয়া থাকে, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। কোন কবি রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করিবার সময়েও এই নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকেন।

যেরূপ জপাদি ক্রিয়া ও গুরুগীতাদি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠের সময় ঋষ্যাদি ন্যাস করাঙ্গন্যাস ও ধ্যানাদি আনুসঙ্গিক ক্রিয়ার কর্ত্তব্যতা বিহিত আছে। তদ্রূপ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা পাঠোপক্রমেও ঋষ্যাদি ন্যাস করাঙ্গ ন্যাস ও ধ্যান করিবার বিধান পুরাকাল হইতেই প্রচলিত আছে। যথা—

অস্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতামালা মন্ত্রস্য ভগবান বেদব্যাস ঋষিরনুষ্টুপছন্দ শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা দেবতা "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে"—ইতি বীজং "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজেতি শক্তিঃ"—"অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ"—ইতি কীলকং। ইতি ঋষ্যাদিন্যাস। এই শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতামালা মন্ত্রের ভগবান্ বেদব্যাস ঋষি; অনুষ্টুপ ছন্দ; শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা দেবতা, "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে" ইহাই গীতার "বীজ" "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" ইহাই গীতার শক্তি অর্থাৎ গীতাতে কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রভৃতির উপদেশ প্রদান করিয়া পরিশেষে ভগবান বলিয়াছেন, সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমারই

শরণাপন্ন হও, ইহাই গীতার শেষ উপদেশ; সুতরাং এইটাই গীতার শক্তি। "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামিমাশুচঃ" ইহা গীতার কীলক অর্থাৎ মেরুদণ্ড। আমার শরণাপন্ন হইলে আমিই তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব; তুমি শোক করিও না। *

(ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্গাদাস ঠাকুর।

স্বপ্ন।

মধ্যরাত্রি সমাগম, শারদী গগনে,
অর্দ্ধখণ্ড চন্দ্র হ'তে ম্লান অংশুজাল,
বিকীর্ণিত ভূমণ্ডলে। ব্রহ্মপুত্র নদ
বহিতেছে খরবেগে; কোটি ক্ষীণ শশী,
মৃদু বীচিমালা মাঝে শোভে অনুপম।
পথভ্রান্ত অপরূপ পিঙ্গল বরণ,
একখানি মেঘস্তর অতিক্রমি ধীরে,
আবরিল পরিক্ষীণ ম্লান শশধর;
কিন্তু মৃদু সমীরণ বিদূরিল ত্বরা,
ছুটিল দক্ষিণদিশি ব্যর্থ মনোরথে।
বিমল সৈকত দেশে দেবতা মন্দির,
সৌধাবলী, রাজপথ, উদ্যান বাটিকা;
ওপারে প্রান্তর ভূমি, নিবিড় বনানী,
ধূসর পর্ব্বতরাজি, নীলিমায় মিশি,
নিদ্রার সৌন্দর্য্য স্বপ্নে রয়েছে মগন।
নিঝুম নিশার এই মহা নিস্তব্ধতা
ভাঙ্গিতেছে নিদ্রাহীন তৃষিত চাতক।
চন্দ্রকর-প্রতিভাত শ্যাম দুর্ব্বাদলে,

* শ্রদ্ধাস্পদ লেখক মহাশয় গীতার প্রথম অধ্যায় সম্পূর্ণ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের কিয়দংশ প্রক্ষিপ্ত প্রমাণ করিতে চান। তিনি তাঁহার মত সমর্থনের জন্য যুক্তি প্রদান করিয়াছেন। এ বিষয়ে পণ্ডিতদিগের আলোচনা প্রার্থনীয়। আঃ সঃ।

নীপশ্রেণী সুশোভিত রম্য ঘাটে বসি,
সুখস্পর্শ নদস্নাত পবন পরশে,
নিদ্রাঘোরে অবসন্ন হইনু পুলকে।
হেরিনু স্বপন এক, নদীগর্ভ হ'তে
বীণা হস্তে দিগম্বর জটাজুটধারী,
সৌম্যমূর্ত্তি পূত দেহ ব্রহ্মপুত্র দেব,
গাহিল অপূর্ব্ব স্বরে শ্রবণ-সুষমা
অশ্রুত জীবনে তাহা, এক মহা গীতি,
কিবা ভাষা, কিবা ভাব, কিবা পদাবলী !
কিবা দীপ্র অনুরাগ জ্বলন্ত উচ্ছ্বাস।
অখণ্ড পুণ্যের সম সঙ্গীত শ্রবণে,
হইল পবিত্র মম গলিত হৃদয়।
সহসা দেবতা মূর্ত্তি হইল বিলীন,
নদের অতল গর্ভে বুদ্‌বুদের সম।
ভাঙ্গিল স্বপন মম, ভুলিলাম গান,
ভুলিলাম পদাবলী, ভুলিলাম কথা।
শ্রবণ-মরমে তবু এখনো ধ্বনিছে,
সপ্তসুরে ঝঙ্কারিত সেই পুণ্যগীতি।
মনে পড়ে বুঝি—এই মহান বারতা,
প্রচারিল দেববর স্বপনের ঘোরে
বিশ্বপ্রেম,—দয়া-ভক্তি, জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ,
মুক্তি-তীর্থ, দান-যজ্ঞ, তপ-পুণ্য-ফল।

শ্রীপ্রমোদকান্ত বসু।

স্নেহের বন্ধন।

যোগেশের বিবাহের পর হইতেই বড় বৌ মনোরমার ভাবগতি সম্পূর্ণ অন্য রকম হইয়া উঠিল। যে ঠাকুর-পো একদিন বড় বধূর অন্ধের যষ্টি ছিল, যাহাকে ছাড়া তাহার একদিনও চলিত না, আজ সেই যোগেশচন্দ্র চক্ষুঃশূল হইয়াছে। সংসারের বিচিত্র গতি !

রমণী-সমাজে মনোরমার সৌন্দর্য্যের খুব খ্যাতি ছিল। দীর্ঘকাল যাবত তিনি এই গৌরব নির্ব্বিবাদে ভোগ করিয়া আসিতে ছিলেন। কিন্তু ছোট বৌ তরঙ্গিনী বাড়ীতে পা দিয়াই তাহার বহুদিনের গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া দিল।

কোন কোন মহিলার সুন্দরী বলিয়া পূজা পাইবার আকাঙ্ক্ষা আজীবন সমান প্রবল থাকে। মনোরমা এই শ্রেণীর রমণী। তরঙ্গিনীর রূপের প্রশংসা তীব্র বিষাক্ত বাণের ন্যায় তাহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইতে লাগিল। এই দুর্লক্ষ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া মনোরমার হৃদয়ে হিংসার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রবেশ করিল।

রায়দের বাড়ীতে 'স্বর্ণলতার' পুনরভিনয় আরম্ভ হইল। জননী মৃত্যুশয্যায় জ্যেষ্ঠপুত্র রমেশকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—"বাবা, আমার পাগলকে তোর হাতেই দিয়া গেলাম; তুইই এখন তার মা বাপ।" জননীর শেষ-কথা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত রমেশ বাবুর মনে জাগ্রত ছিল, কিন্তু মনোরমার অবিশ্রান্ত আকর্ষণে স্নেহের বন্ধন ছিঁড়িয়া গেল,—একদিন ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইলেন।

রমেশ বাবুর ছেলে ননি যোগেশকে বড় ভালবাসে। ননিও কাকা বাবুর নয়নের মণি। কাকা বাবুকে ছাড়িয়া সে একদণ্ড থাকিতে পারে না; কাকা বাবুও ননিকে না দেখিয়া অধীর হইয়া যায়। কবি বলিয়াছেন শৈশবে মানুষ স্বর্গের কাছে থাকে, যতই সংসারে প্রবেশ করে ততই স্বর্গ হইতে দূরে সরিয়া যায়। ননি পাঁচ বছরের বালক, আজও তার দেব-ভাব যায় নাই, আজও আত্মপর বোধ হয় নাই।

একদিনে যে সংসারের কি পরিবর্ত্তন হইয়া গেল পাঁচ বছরের ননি তাহা বুঝিল না। সে দেখিল দু'পর বেলা তার কাকী মা অন্য এক ঘরে রান্না করিতেছেন। সে দৌড়িয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কাকী মা এই ঘরে রাঁধ যে? ঐ ঘরে রাঁধ্‌বে না?

ঐ ঘরে তোর মা রাঁধ্‌বেন।

কেন, মা তো একদিনও রাঁধে না।

আজ রাঁধ্‌বে।

কাকা বাবু কোথা খাবে?

এখানে।

তবে আমিও এখানে খাব।

ননি তার মা'র ঘরে গিয়া দেখিল তিনি রান্না করিতেছেন। সে জিজ্ঞাসা করিল—মা কাকা বাবু এখানে খাবে না?

না।

কেন ?

তাঁরা পৃথক হয়ে গেছে।

পৃথক হওয়া ব্যাপারটা ননি কিছুই বুঝিল না। সে বলিল—আমি কাক বাবুর সাথে খাব। মা ধমক দিয়া বলিলেন—না তুই এখানে খাবি। তোর জন্য আমি ভাল তরকারি রান্না করেছি।

এমন সময় যোগেশ ননিকে ডাকিল। ননি "যাই কাকা বাবু" বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া একবারে কাকা বাবুর কোলে। যোগেশ বলিল—ননি, তোর জন্য দেখ কেমন বড় বড় পেয়ারা আনিয়াছি। যোগেশ পকেট হইতে দুইটা সুবৃহৎ পেয়ারা বাহির করিয়া ননির হাতে দিল। ননি পেয়ারা হাতে করিয়া দৌড়িয়া মাকে দেখাইতে গেল। যোগেশ ননিকে কেন ডাকিয়াছে তাহা দেখিবার জন্য মনোরমা রান্নাঘরের বেড়ার ছিদ্র দিয়া উঁকি মারিয়া ছিলেন, ননি পেয়ারা হাতে হাসিতে হাসিতে ঘরে প্রবেশ করিবা মাত্র তিনি ভীষণ গর্জ্জন করিয়া কহিলেন—সকলে মিলে ছেলেটাকে না মেরে ছাড়বে না। ছেলে পেটের অসুখে মর মর হয়েছে, তাই আদর করে তাকে পেয়ারা দেওয়া হয়েছে।

মনোরমা ননির হাত হইতে পেয়ারা কাড়িয়া লইয়া আঙ্গিনায় ফেলিয়া দিলেন। যোগেশ নিঃশব্দে স্বীয় গৃহে প্রবেশ করিল।

ছেলে মানুষের কথা অধিক্ষণ মনে থাকে না। বিশেষতঃ মা যে পেয়ারার উপর রাগ করেন নাই সে তাহা বুঝিতে পারিল না। দুপর বেলা ননি চুপচাপ গিয়া কাকা বাবুর সহিত খাইতে বসিল। মনোরমা ননিকে ঘরে না দেখিয়া মনে করিলেন নিশ্চয়ই সে যোগেশের ঘরে গিয়াছে। অমনি তাহার ডাক পড়িল। ননি ডাক শুনিয়া বলিল—মা, আমি এখানে কাকা বাবুর সঙ্গে খাই। মনোরমা স্বর পঞ্চমে চড়াইয়া কহিলেন—"তোর অসুখ করেছে, আমি তোর জন্য সরু চালের ভাত রান্না করেছি, তুই ওখানে খাচ্ছিস, লক্ষ্মীছাড়া ছেলে।"

যোগেশ তাড়াতাড়ি ননির হাত মুখ ধুইয়া দিয়া কহিল—বাবা তোর অসুখ করেছে এই ভাত খেয়ে কাজ নাই। ননি বলিল—আমার অসুখ করেনি কাকা বাবু আমি তোমার সঙ্গে খাব। আঙ্গিনার মাঝখানে দাঁড়াইয়া মনোরমা বজ্রগম্ভীর স্বরে ডাকিলেন—ননি!

ননি কাঁপিতে কাঁপিতে ঘর হইতে বাহির হইল। আঙ্গিনায় যাইতে না যাইতেই তার পিঠে অজস্র কিল পড়িল। যোগেশ ভাত ফেলিয়া দৌড়িয়া

আসিল। "বৌ-দি ননিকে মার কেন? ওকে খেতে দেই নাই।"

মনোরমা রাগে গড় গড় করিতে করিতে ছেলেকে নিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। প্রতিদিন এইরূপ ঘটনার অভিনয় হইতে লাগিল। কিন্তু পিতা মাতা পাঁচ বছরের ছেলে ননিকে কিছুতেই সংযত করিতে পারিলেন না। মনোরমার কঠোর প্রহারেও যোগেশের স্নেহের বন্ধন ননি ছিন্ন করিতে পারিল না। মনোরমা নিতান্ত উত্যক্ত হইয়া আঙ্গিনার মাঝ খান দিয়া এক প্রকাণ্ড প্রাচীর উঠাইলেন। ননির পথ রুদ্ধ হইল। হায়! ক্ষুদ্র বালকের জন্য এই নির্ম্মম বিধান! কিন্তু ননির ভালবাসার পথ প্রাচীরে রুদ্ধ হইল না। স্রোতের জল বাধা পাইলে যেমন আরও ফুলিয়া উঠে তেমনি শিশুর প্রাণের ভালবাসা বাহিরে বাধা পাইয়া ভিতরে উছলিয়া উঠিল। পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর ন্যায় বালক গৃহে থাকিয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। "কাকা বাবু হয়তো ননির জন্য ঘুড়ি তৈয়ার করিতেছে, কাকা বাবু ননির জন্য বাজার হইতে খেলনা আনিয়াছে ইত্যাদি" কত কথা বালক দেওয়ালের দিকে চাহিয়া ভাবে। দেওয়ালের বাহিরে কাকা বাবুর শব্দ শুনিয়া ননির হৃদয় নাচিয়া উঠে। ক্ষুদ্র শিশুটী কারারুদ্ধ হইয়া কি নির্ম্মম যন্ত্রনাই ভোগ করিতে লাগিল! তাহা কেহ ভাবিতে পারিল না। যে চঞ্চল বালক সর্ব্বদা ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইত, যাহার হাসি কৌতুকে গৃহ সর্ব্বদা মুখরিত হইত, সেই বালক এখন বৃদ্ধের ন্যায় স্থির গম্ভীর! মুখে হাসি নাই, মনে স্ফূর্ত্তি নাই! প্রাচীরের ইটগুলি যেন বুকে চাপিয়া তাহার শ্বাস রুদ্ধ করিয়া ফেলিতেছে!

এক সপ্তাহকাল তীব্র অন্তর্দাহে দগ্ধ হইয়া বালক শয্যাগ্রহণ করিল। ননির প্রবল জ্বর; সে জ্বর আর ছাড়ে না। ডাক্তার কবিরাজ পরাস্ত হইল। যোগেশ পরের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া ননির সংবাদ লয়। তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। যাহার জন্য আঙ্গিনায় দেওয়াল সে কোন সাহসে দাদার ঘরে যায়।

জ্বরের অষ্টম দিন ননির অবস্থা বড়ই খারাপ হইল। রমেশের একমাত্র পুত্র মৃত্যু-শয্যায়! পিতা মাতার আর্ত্তনাদে আকাশ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। ঔষধে কোন ফল হইল না; চিকিৎসক অবাক্ হইলেন। রোগের নিদান কেহ ভাবিয়া দেখিল না।

নবম দিন রোগ আত্ম-প্রকাশ করিল। সে দিন বিকার; ননি প্রলাপ বকিতে লাগিল—"কাকাবাবু এসেছ? আমি তোমার কোলে যাব; কাকাবাবু

আমার ঘুড়ি তৈরি করেছ। কাকাবাবু আমি আসব না, মা মারবে; তুমি এস; বাবা, পাঁচীলটা ভেঙ্গে ফেল।" ইত্যাদি

পিতা মাতা এত চেষ্টা করিয়াও শিশুর হৃদয় জয় করিতে পারিলেন না। স্নেহের মূল গভীরতম প্রদেশে গিয়া তাহার কোমল ক্ষুদ্র হৃদয়কে শত শিকড়ে জড়াইয়া ধরিয়াছে!

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন—কাকাবাবু কে? রমেশ বাবু বলিলেন আমার ভাই।

তা'কে-তো দেখি নাই; সত্বর তা'কে এখানে আস্‌তে বলুন।

রমেশ বাবুর মাথায় বজ্রাঘাত হইল! কিন্তু প্রাণাধিক পুত্র মৃত্যু-শয্যায় শায়িত এখন লজ্জায় সঙ্কুচিত হইলে চলিবে কেন? পাছে যোগেশ না আসে এই আশঙ্কায় নিজেই তাহাকে ডাকিতে গেলেন।

যোগেশ দুইটা বেদানা হাতে করিয়া অন্তঃপুরের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া ছিল প্রতীক্ষা করিতে ছিল। রমেশ বাবু ঘর হইতে বাহির হইয়াই তাহাকে পাইলেন। ভাইকে দেখিয়া তাহার রুদ্ধ শোক-স্রোত উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। যোগেশ ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কাঁদ কেন দাদা? ননি কেমন?"

"ননির অবস্থা বড় খারাপ। আজ তোকে দেখ্‌তে চায়।"

যোগেশের প্রাণ ননির জন্য উৎকণ্ঠিত। সে দাদার কথা শুনিবা মাত্র দ্রুতপদে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। ঘরে ঢুকিয়া দেখিল ডাক্তারে, শুশ্রূষাকারী স্বজনবর্গে গৃহ পূর্ণ। ননি একখানি খাটে শুইয়া আছে; মনোরমা শয্যার কোণে বসিয়া অশ্রুপাত করিতেছেন। ননিকে দেখিয়া চিনিতে পারা যায় না; তাহার শরীর কঙ্কালসার হইয়াছে।

যোগেশকে দেখিয়া মনোরমা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—'ঠাকুর-পো আমার ননি আর বাঁচবে না।' হিংস্রক বাঘিনীও সন্তানের মায়ায় হিংসা ভুলিয়া যায়। মনোরমা যোগেশের হাত ধরিয়া কহিল—'ঠাকুর-পো আমার ননিকে বাঁচাইয়া দাও।' যোগেশের চক্ষু হইতে অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরিতে ছিল। সে আত্ম সম্বরণ করিয়া কহিল—'বৌ-দি অধীর হইও না' ননি ভাল হইবে।

যোগেশ ননির কাছে গিয়া বসিল। ননি তাহার ডাগর ডাগর চোক্ দুটী মেলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল এবং অস্ফুটস্বরে বলিল—কাকা বাবু—

যোগেশ তাহার গালে হাত বুলাইয়া কহিল—এই তো বাবা আমি তোমার

কাছেই আছি। ননির যেন বিশ্বাস হইল না সে চক্ষু দুইটী খুব বিস্ফারিত করিয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

যোগেশ বলিল—ননি বেদানা খাবে?

বালক মাথা নাড়িয়া বলিল—না, মা মারবে!

মনোরমা লজ্জিত হইয়া বলিলেন—না বাবা, আমি কিছু বল্‌ব না তুমি খাও।

ননি আনন্দের সহিত বেদানা লইল।

ডাক্তার বলিলেন—দেখেন তো যোগেশ বাবু আপনি একটু পথ্য করাইতে পারেন কি না। যোগেশ বাটিতে একটু গরম দুধ লইয়া কহিল—

'ননি' বাবা, একটু দুধ খাও।' ননি একবার মার দিকে তাকাইল। মা তাহার মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন—খাও বাবা, তোমার কাকা বাবুর হাতে একটু দুধ খাও। ননি নিরাপত্যে দুধ খাইল। পূর্ব্বে আর কেহই তাহাকে সেদিন খাওয়াইতে পারে নাই।

স্নেহের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা। সেই দিনই ননির বিকার থামিল, পরদিন জ্বরও থামিল। সকলই দেখিয়া অবাক্। ডাক্তার আগে বুঝিতে পারে নাই ব্যাধি দেহে নহে, মনে। তিনি সকল কথা শুনিয়া রমেশ বাবুকে কহিলেন আপনার ছেলে কাকা বাবুকে এতই ভালবাসে।

ননি একটু সুস্থ হইয়া মা'কে বলিল—মা, কাকা বাবু আমাদের ঘরে থাক্‌বে?

হাঁ, বাবা। থাক্‌বে।

আর যাবে না?

না।

তুমি তা'কে গালি দিবে না?

কেন গালি দিব বাবা?

বালকের ম্লান অধরে হাসি ফুটিল। ননি যোগেশের হাতখানি বুকে চাপিয়া ধরিয়া কহিল কাকা বাবু মা বলেছে তুমি আমাদের ঘরে থাক্‌বে, আর যাবে না কাকা বাবু?

যোগেশ কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই রমেশ বাবু কহিলেন, হাঁ, বাবা, তোমার কাকা বাবু আর যাবে না।

ঠিক বলছ? কাকা বাবুকে আর তাড়াবে না?

না, বাবা, কেন তাড়াব?

সেই দিন হইতে দুই ভাই আবার একাত্ম ভুক্ত হইলেন। যে স্নেহের বন্ধন পিতা অনায়াসে ছিন্ন করিয়াছিলেন তাহা দ্বিগুণ প্রভাবে পুত্রের হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিল। সেই স্নেহের বন্ধন আর কেহ ছেদন করিতে পারিল না।

ইহাই প্রকৃতির প্রতিশোধ।

শরৎ-সমাগম।

এসেছে শরৎ, হাসিছে জগৎ,
ধরিছে প্রকৃতি মোহন সাজ ;
বিটপী সকল, স্নাত সুবিমল,
পূত সৌম্য সাজে সাজিবে আজ।
নির্ম্মল গগনে, সুবর্ণ বরণে,
উদিছে অরুণ উজলি দিশি ;
বিহঙ্গমগণে, সুমধুর তানে,
ঢালিছে শ্রবণে সুধার রাশি।
সৌরকর জালে, শ্যাম শষ্পদলে,
শোভিছে নীহার মুকুতা প্রায় ;
ধেনুবৎস ল'য়ে, গোপালকচয়ে,
পুলকিত মনে গোঠেতে যায়।
অমল-কোমল, শ্যাম-শস্য-দল,
নেহারি সবার জুড়ায় আঁখি ;
যত চাষীগণ, হ'তেছে মগন,
আশার সাগরে, সুশস্য দেখি।
আকুল-আবিল, উচ্ছ্বাস-পঙ্কিল,
সরিত সরসী তড়াগ সবে—
বর্ষা অবসানে, স্ফটিক বরণে,
সুবিমল বারি শোভিছে এবে।
কুমুদ কহ্লার, সৌন্দর্য্য-আধার,
শোভিছে সরসী তরাগে কত ;

মত্ত মধুপানে, কমল-কাননে,
গুঞ্জরিছে সুখে ভ্রমর যত।
দলে দলে দলে, কোথা কুতূহলে,
রাজহংস হংসী করিছে খেলা;
কোথা নীরে পশি', সারস সারসী,
বিহরে প্রভাত-প্রদোষবেলা।
ছড়া'য়ে গগনে, রুচির কিরণে'
পশি' অস্তাচলে মরীচিমালী—
সৌধ-শাখী-শিরে, পর্ব্বত শেখরে,
তরল কনক দিতেছে ঢালি'।
কোথা বা সুন্দর, নীল-পীত-স্তর,
কোথা তুষারাভ মেঘের মালা—
কত শোভা ধরে, সুনীল-অম্বরে
রক্তিম-হিঙ্গুলে হ'য়ে উজলা।
বেলা গেল হেরে, ফিরে ধেনু ঘরে,
ক্ষুর সহযোগে উড়ায়ে ধূলি;
বসিয়া নীড়েতে, নানাদিক হতে,
বিহগনিচয়ে করে কাকলি।
শঙ্খ-ঘণ্টাস্বনে, মাতায়ে পরাণে,
বাজিছে আরতি মন্দিরে যত;
উঠিছে বিমানে, মধুর নিক্কণে,
ভক্তি-সুধারসে প্লাবিয়া চিত।
বাজায়ে নূপুর, আহা! কি মধুর,
কুলবধূগণ সস্মিত মুখে—
আমোদি আবাসে, ধূপ-ধুনাবাসে,
জ্বালে দীপমালা বিমল সুখে।
ফুটি' ধীরে ধীরে, তারকানিকরে,
সাজায় অম্বরে হীরকমালে;
হাসাইয়া নিশি, প্রকাশিয়া দিশি,
শোভে সুধাকর গগনভালে।

তটিনী নির্ঝরে, শুভ্র সৌধপরে,
সরসী পল্বল তড়াগে পড়ি',—
করে বিকীরণ, শশাঙ্ক-কিরণ,
রজতের ছটা হৃদয়হারী।
প্রকৃতি হাসিয়ে, গুণ্ঠন সরা'য়ে,
করিতেছে খেলা জোছ্না সনে;
সুধাপানে ভোর, চকোরী চকোর,
গাহে সুমধুর ললিত তানে।
দিগন্ত ছাপিয়া, কভু বা পাপিয়া,
দিতেছে ঝঙ্কার অমিয় স্বরে;
বহি' প্রতিধ্বনি, সে মধুর ধ্বনি,
খেলিছে বিমানে সোহাগভরে।
কেতকী বকুল, নিশা-গন্ধ-ফুল,
সুমিষ্ট সৌরভ করিছে দান;
সেফালি-সুবাস, বহিয়া বাতাস,
পুলকে মাতায় জীবের প্রাণ।
কোথা ধীরে ধীরে, নদী নদোপরে,
জোছনা-তরঙ্গে তরণী ল'য়ে
প্রমোদ কারণ, ভ্রমে কত জন,
বিমল আনন্দে বিভোর হ'য়ে।
তালে-তালে-তালে, পড়ে দাঁড় জলে,
উথলি অব্যক্ত-মধুর-ধ্বনি;
কোথা সারি-গানে, জুড়ায়ে শ্রবণে,
ভাসায় বিপিনে; হাসে যামিনী।
সুখ-শোভা-ভরা, সুষমা-পসরা,
দেখা'য়ে জগতে মাতাতে' সবে—
মাধুরী-সদন, মানস-মোহন,
মরতে শরত উদিত এবে।

শ্রীযতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

আরতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

৮ম বর্ষ } ময়মনসিংহ, আশ্বিন, ১৩১৬। { ১০ম সংখ্যা।

কবি।

প্রকৃতির মণি-মুক্তা রতন-কাঞ্চন
নিখিল ঐশ্বর্য্যরাশি ধাত্রী ধরণীর,
মানবের সরবস্ব জীবন-যৌবন
চিরদিন রচি' রাখে কবির শিবির।

তোমাদের মত তার বসন ভূষণ,
দেহপাত্র শীতাতপে সুখে দুঃখে ভরা;
কিন্তু তার প্রাণ-পদ্মে রয়েছে গোপন
ক্ষীরোদ-সাগরলব্ধ অমৃত-পসরা।

সংসারে ভোগের আছে যত আয়োজন
তোমাদেরে অন্ধ করি জাগায় বিস্ময়;
তাদের ভিতর দিয়া কবির নয়ন
হেরে অনন্তের লীলা চির জ্যোতির্ম্ময়!

তোমরা স্রোতের মাঝে ডুবিয়া ভাসিয়া,
অহর্নিশ, নাহি জান চলেছ কোথায়;
কিন্তু সে স্রোতের তীরে আছে দাঁড়াইয়া
সৃষ্টি-ধারা নিরখিছে অনন্ত সীমায়।

তোমরা গতির মাঝে খুজিতেছ রস.
তাই সর্ব সুখ দুঃখ হয় না নির্ব্বাণ;
সে যে দ্রষ্টা; তাই তার প্রাণের বংশীতে
স্বতঃ জাগে স্বৈরগতি নিখিলের গান!

তোমাদের দৃষ্টিপথ যেথা হয় শেষ.
ঘনায় সংশয়দ্বন্দ্বে ভীত অন্ধকার;
সেথা তার নেত্রভরা প্রথম উন্মেষ.
হিরণ্ময়ী রূপ রাশি হরিণী উষার!

আত্মা তার অভিভবি দিক্ দেশকাল,
সৃষ্টি করে সনাতন কত স্বপ্নজাল!
নিবিড় সুপ্তির মাঝে সে জাগ্রত স্থির,
এ ব্রহ্মাণ্ড ভাবময় তাহার শরীর।

শ্রী—

"এও" এর নিবেদন।

মহামহিমান্বিত—

শ্রীশ্রীল শ্রীশ্রীযুক্ত শ্রীশ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাহিত্য-সম্রাট মহিমার্ণবেষু।

স্তুতি।

ঠাকুর, আমি অধম, আপনার স্তুতি আমি কি করিব? আপনার গুণের সীমা নাই। আকাশের তারাগুলি বরং গণিয়া দিতে পারি, সমুদ্রের বারিরাশি কলসী কলসী তুলিয়া ফেলিতে পারি, সাহারা মরুর বালুকাকণাগুলি এক এক করিয়া সংখ্যা করিতে পারি, তথাপি আপনার গুণাবলীর কিয়দংশও বর্ণনা করিতে পারিব না, তবে সনাতন প্রথানুসারে স্তুতিবাক্য না বলিয়া আবেদন করা যায় না, তাই এই অসাধ্য সাধনেও কথঞ্চিৎ প্রয়াস।

আপনি ভট্টণারায়ণের বংশধর "প্রিন্‌সের" পৌত্র "মহর্ষির" পুত্র স্বয়ং "সাহিত্য-সম্রাট"। লোকে উপাধি লাভের জন্য কত আরাধনা ও অর্থব্যয় করে কিন্তু আপনার পিতামহ কি পিতা কি আপনি অনায়াসেই এই সকল উপাধি লাভ করিয়াছেন, কেবল তাহা নয় এখন "মহর্ষি" বলিলে আর বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র প্রভৃতি বুঝায় না, আপনার স্বর্গীয় পিতাঠাকুরকেই বুঝায়।

আপনি একাধারে অনেক গুণের অধিকারী, কর্ম্মক্ষম, শরীর সুন্দররূপ, মধুর ভাষা, অমায়িক প্রকৃতি, নির্ম্মল স্বভাব। আপনি কবি দার্শনিক রাজনীতিজ্ঞ, সংগীতরচক, সুকণ্ঠ গায়ক, গদ্যে পদ্যে গল্পে, সমালোচনায় ব্যঙ্গে-করুনে আপনার প্রতিভা নিরঙ্কুশ।

আপনার গুণরাশি দর্শনে ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়া এই অধঃপতিত বঙ্গদেশের কোনও কোনও লোক নানা কথা বলিয়া থাকে। আপনি সংগীত দ্বারা দেশকে নূতনভাবে উদ্দীপিত করিয়া শেষে যখন ধরপাকড় আরম্ভ হইল তখন প্রবন্ধ পাঠ দ্বারা শান্তিবারি সেচন করিয়াছেন; এই উপলক্ষে নানাজনে নানা কথা বলে। এই সকল খল ব্যক্তিরা জানে না যে হিন্দুদের যে সকল পরম দেবতা উঁহাদেরও এক হাতে গদা অন্য হাতে পদ্ম, এক হাতে চক্র অপর হাতে শঙ্খ, এক হাতে খড়্গ আর হাতে বর, এক হাতে সদ্যশ্ছিন্ন মুণ্ড অন্য হাতে অভয়। ফলতঃ ঠাকুর চতুর্ভুজ লোকদের (অর্থাৎ চৌকস্ ইংরেজীতে যাহাকে ভার্শেটাইল বলে) মহিমা না বুঝিয়া অনেক পামরই এইরূপ বলিতে পারে। ইহাদিগকে ধিক্ অন্ততঃ হিন্দু হইলে ততোহধিক।

আপনার ক্ষমতা অসীম; যিনি যত বড় পণ্ডিতই হউন না কেন বহুদিন মাথা ঘামাইয়া তত্ত্বপূর্ণ কোনও কিছু প্রবন্ধ লিখিলেন, আপনি মুহূর্ত্তে তাহা তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন—হিং টিং ছট্ (? ওঁ তৎ সৎ)! আপনার রসিকতার চোটে পাঁচুঠাকুর চিরকালের জন্য আসর ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছেন, দাশুরায়, ঈশ্বরগুপ্ত প্রভৃতির যশঃ প্রদীপ প্রায় নিভিয়া গিয়াছে। ধন্য আপনি! ঈর্ষ্যাবান্ লোকেরা আপনার রচনার রসাস্বাদনে অসমর্থ হইয়া উহা "জ্যাঠামি" "ভাড়ামি" প্রভৃতি বলিয়া থাকে তাহাও কিন্তু প্রকাশ্যে বলিতে সাহসী হয় না। সেই কাপুরুষদিগকে ধিক্!

আপনাকে কেহ কোনওদিন স্কুলকলেজে পড়িতে দেখে নাই অথচ আপনি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, ইহাতেও পাষণ্ডীদের চক্ষুঃ টাটায়; উহারা বলিতে পারে কি মহর্ষি নন্দন কেহ কোনও দিন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছে? বিশেষতঃ "কবিতা

যত্যন্তি জ্ঞানেন কিং" (পূর্ব্বে ছিল রাজ্যেন কিং)। কবি কালিদাস মূর্খ হইয়াও পরম পণ্ডিত; কবি শেক্‌স্‌পিয়ার বিনা অধ্যয়নে সর্ব্বতত্ত্ব পারদর্শী। জিহ্বায় ও কলমে জোর থাকিলে আর কবিত্বের এসেন্স রসিকতা থাকিলে লিখা পড়া বেশী না করিলেও বিশ্বের তাবৎ জ্ঞানের কথা অনায়াসে বলিতে ও লিখিতে পারা যায়।

আপনি প্রথম সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতি বৃত হওয়াতে অনেকেরই মাৎসর্য্যের আবির্ভাব হইয়াছিল কিন্তু সেই সকলের বুঝা উচিত যে বার বার তিন বার বিষয় বাধা পড়িয়াও যে চতুর্থবার সম্মিলন হইতে পারিয়া ছিল, সে কেবল আপনার বিঘ্ন বিনাশন শক্তির মহিমায়, এই সকল অসূয়া পরায়ণ লোকের অত্যন্তাভাব না হওয়া পর্য্যন্ত এদেশের কল্যাণ নাই, আপনি পতিত পাবন ঠাকুর, এমনটি আর বঙ্গদেশে হয় নাই, হইবেও কি না সন্দেহ, চৈতন্য নিত্যানন্দ রাম কৃষ্ণ প্রভৃতির প্রসার ধর্ম্মজগতে মাত্র কথঞ্চিৎ, এখন ধর্ম্মজগতের খবর কে লয়? আপনার মাহাত্ম্য বিশেষরূপে কবিতায়, সঙ্গীতে ও ভাষায়, যাহার সঙ্গে স্বতঃ পরতঃ সকলেরই সম্বন্ধ রহিয়াছে।

ঐ যে বাব্‌রি চুলওয়ালা ছোকরাপানা স্নিগ্ধাকৃতি ব্যক্তিটী বিদ্যালয়ে বড় কিছু হইল না দেখিয়া কাগজে পেন্‌সিলে কবিতাদেবীর আরাধনার্থ প্রয়াস করিতেছে সে কেবল আপনার কৃপায়। ছন্দের বাঁধ আপনিই মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ত্রিপদী, চতুষ্পদী প্রভৃতিতে এখন আর অক্ষর গণিবার ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না, ভাবের জন্যও ভাবিতে হয় না "স্বপনের ছায়া পারা" কোনও কিছু লিখিলেই হইল; যদি কেহ না বুঝে তজ্জন্য সেই অবোধের অদৃষ্টই দায়ী। আর ভাষা,—সেই কথা পশ্চাৎ বলিব।

সংগীত রচনার পথও এখন নির্ব্বাধ; রাশি রাশি অক্ষর এক এক পদে পূরিয়া দিলেও তাড়াতাড়ি করিয়া সুর ধরিয়া বলিয়া গেলেই হইল। অক্ষর সংখ্যার বিরলতা হইলেও রাগিণী একটুক টানিয়া গেলেই সব গোল চুকিয়া যায়। এই দ্রুতাবলম্বিতের লীলা খেলা যে না বুঝিবে সে গ্রীকপুরাণোক্ত মিডাস্ নৃপতির ন্যায় লম্বকর্ণ হইবার যোগ্য।

ভাষার সম্বন্ধেও এখন আর কাহাকেও ভাবিতে হইবে না। এক দিন ঠাকুর টেকচাঁদ "আলালের ঘরের দুলালে" যে ভাষার অবতারণা করিয়া ছিলেন, হুতোম প্যাঁচা যে ভাষায় সমাজের নক্‌সা আঁকিয়া গিয়াছেন, সেই ভাষা এতদিন কেবল নাটকওয়ালাদের কৃপায় (এবং কিছু পরিমাণে নভেলওয়ালাদের

অনুগ্রহেও) কথঞ্চিৎ প্রাণ ধারণ করিতে ছিল। পতিতপাবন ঠাকুর, আপনারই অনুকম্পায় ইহা এখন অনেকটা গা ঝাড়া দিয়া খাড়া হইয়া সাহিত্য প্রাঙ্গনে বিচরণ করিবার সাহস প্রাপ্ত হইয়াছে। আপনার ধর্ম্মতত্ত্ব ও দার্শনিক প্রবন্ধেও সেই পতিতকল্প ভাষার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। বঙ্গবাসী, বসুমতী, হিতবাদী, সঞ্জীবনী প্রভৃতি সর্ব্বসাধারণের নিমিত্ত যে সকল সাময়িক পত্রিকার প্রচার, যাহা ইতর ভদ্র নির্ব্বিশেষে পঠিত হইয়া থাকে, সেই সকলেও যে উপভাষা স্থান পায় নাই, আজ উচ্চ শ্রেণীর মাসিক পত্রিকাদিতে আপনি এবং অন্যান্য ঠাকুর লোক করুণা করিয়া ইহাকে স্থান দান করিতেছেন ইহাই আপনার পতিত পাবনাবতার চূড়ান্ত নিদর্শন।

আমি ক্ষুদ্র আমার প্রদত্ত উপাধি কি সর্ব্বসাধারণে গৃহীত হইবে? আমি আপনাকে "পতিতপাবন" এই নাম ভক্তিসহকারে অর্পণ করিতেছি; ভক্তের দান আপনি গ্রহণ করিবেন কি?

এই পতিতোদ্ধার কার্য্যে আপনি যে সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন ইহার তুলনা নাই। এই দেশের লোক "যেনাস্য পিতরো যাতাঃ যেন যাতাঃ পিতামহাঃ তেন যায়াৎ সতাং মার্গং" ইত্যাদি বচন আওড়াইয়া অধঃপাতে গিয়াছে। আপনি অনায়াসে পিতৃ পিতামহের পথ উল্লঙ্ঘন করিয়া সর্ব্বজন বরেণ্য হইয়াছেন। পাদশতাব্দী পূর্ব্বে "সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়" নামক গ্রন্থে দেখিয়াছিলাম, আপনার পিতামহ "প্রিন্‌স্" স্বর্গে থাকিয়া বঙ্গদেশে হুতোমী ভাষায় প্রসার হইতেছে শুনিয়া শিহরিয়া ছিলেন; আপনার পিতাঠাকুর "মহর্ষি" প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাদিতে ঐ ভাষা কদাচ দেখা যাইত না, আপনি করুণা করিয়া পতিতের আশ্রয়দান করিয়াছেন, পিতৃ পিতামহের উপরোধ রাখেন নাই। ফলতঃ "তাতস্য কূপোঽয়মিতি ব্রুবাণাঃ ক্ষারং জলং কাপুরুষা পিবন্তি"। আপনি সুপুরুষ কাপুরুষোচিত কাজ করিবেন কেন?

কোনও কোনও কাপুরুষ ভাবে যে নাটুকেদের জ্বালায় পূর্ব্ববঙ্গের কাহারও এখন নাটক লিখা পোষাইয়া উঠে না, কেন না হুতোমী ভাষার উপর ইহাদের অধিকার নাই। আবার সাধারণ সাহিত্যেও আপনারা হুতোমী ভাষা চালাইলে, পূর্ব্ববঙ্গের লোকেরা এই ভাষার সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়া বঙ্গদেশের মত বঙ্গভাষাটারও দ্বিধা বিভাগ ঘটাইতে পারে। কিন্তু তাহারা অতি বর্ব্বর নন্দনেরা যে ত্রিকালদর্শী, ইহা জানে না, ভূত ও বর্ত্তমানের মাত্র তাহার ভবিষ্যতে আপনাদের নখাগ্রে দেদীপ্যমান "তাই ইহাতে যে ও সৌভাগ্যবান,

এই "প্রবাসী" প্রবাসী

হইবে না ইহা দেখিতে পাইয়াই আপনারা ঐ পথ ধরিয়াছেন। আপনারা যাহা করিবেন তাহাতে কার কি বলিবার আছে? ঐ যে কথায় বলে "রাজার নন্দিনী প্যারী যা' কর তাই শোভা পায়।"

আমি স্তুতি উপসংহার করিলাম; ইহা কেবল আমার বাক্য সসীম, এবং আপনার গুণ অসীম বলিয়া। নচেৎ পুষ্পদন্তের ভাষায় বলিতে পারিতাম "যদি সুরবর তরু শাখা কলম হইত, পৃথিবীটা কাগজ হইত, কৃষ্ণপর্ব্বত প্রমাণ কালী হইত" তবে অনন্তকাল পর্য্যন্ত লিখিয়াও আপনার গুণের ইয়ত্তা করিতে পারিতাম না।

পরিচয় ও প্রার্থনা।

আমি ঞ, আমার দুঃখের কথা আর কি বলিব? দুঃখের বোঝা বহন করিবার নিমিত্তই বোধ হয় ভগবান্ আমাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন নচেৎ এত ভাগ্য বিপর্য্যয় হইবে কেন? মহেশ্বর যখন প্রথম বর্ণমালার শ্রেণী বিভাগ করেন তখন আমার স্থান ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে ছিল। প্রথম স্থান অবশ্যই স্বরবর্ণের হওয়াই উচিত; মধ্যমস্থান অর্দ্ধস্বর "হ য ব র ল" এর তৎপর ব্যঞ্জনবর্ণের সংস্থান এবং সর্ব্বাগ্রে "ঞ ম ঙ ণ ন ম" হয় নয় পাণিনির ব্যাকরণ খানি খুলিয়া দেখুন; তিনি আদি অকৃত্রিম মাহেশ্বরসূত্র গ্রহণ করিয়া ন্যায়ের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন তাই আজ পাণিনির এত আদর, ইস্তক সরস্বতীর বিলাসস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ে।

তৎপরবর্ত্তী বৈয়াকরণ পুঙ্গবদের মাথায় কি খেয়াল চাপিল। উহাদের স্কন্ধে বোধ হয় শনিদেব অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন, উহারা সেই সনাতন বর্ণসংস্থান পরিত্যাগ করিয়া আমাকে স্বজাতীয় ব্যঞ্জনবর্ণ মধ্যে দশমস্থান এবং সগোত্র অনুনাসিকগণের মধ্যে দ্বিতীয়স্থান প্রদান করিয়া হতমান করিয়া দিয়াছেন। কাতন্ত্রের কলাপসূত্রে আবার (মর্লে সাহেব যেমন বঙ্গবিভাগকে সেট্‌লড্ ফেক্ট বলিয়া চূড়ান্ত ব্যবস্থা করিয়া ফেলিয়াছেন) "সিদ্ধোবর্ণ সমাম্নায়ঃ" বলিয়া আমার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্তির আশা একবারে নির্ম্মূল করিয়া দিয়াছে।

ঠাকুর গো, দুঃখের কথা, আর কি বলিব? দেবনাগরে আমার বেশ একটু টেঁঅবস্থাই ছিল বাঙ্গালার 'অ' কারের ন্যায় আমি বেশ ঈজি চেয়ারে ঠেস্ হতোশ নিতে ভর করিয়া আরাম উপভোগ করিতে ছিলাম, কিন্তু আমার কেবল বাঙ্গালার—এই হতভাগ্য দেশের—বর্ণমালায় "পেঠে বোচ্‌কা" বহন

করিতে নিযুক্ত হইয়াছি। এতদবস্থায় আমাকে সর্ব্বদাই অধোবদনে থাকিতে হয়। তথাপি যখন স্বাধীন থাকি তখন পা খানি মেলিয়া একটু আরাম করিতে পারি, কিন্তু দুঃখের কপাল আমার, সেই স্বাধীনতা দিন দিনই অতি বিরল হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে "মিঞা" সাহেবেরা এবং "গোসাঞি" প্রভুরা আমার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; আজকাল তাঁহারাও বিরূপ হইয়াছেন এখন 'মিয়া' ও 'গোসাই' হইয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে বঙ্গীয় ব্যাকরণে প্রেরণার্থ ধাতুতে—'ঞি' হয়, এইরূপ থাকিত, এখন নিচ্ আসিয়া আমার এক প্রকার তিরোধান ঘটাইয়াছে। 'ঘঞ' এ আমি আছি বটে কিন্তু "বিবাহ" রূপ শুভ কর্ম্মে (বি পূর্ব্বক বহ ধাতুর অন্তে) আমাকে সঙ্গে দেখিয়াই বোধ হয় কোনও কোনও পণ্ডিত—রসিক "এ বেটা এখানে কেন?" বলিয়া "ঘঞ" কে পর্য্যন্ত তাড়া করিতে সমুদ্যত।

আমার সুতরাং অস্তিত্ব এখন সংযুক্তবর্ণে; সেখানে আমার বিড়ম্বনার এক শেষ। কেবল যাহাতে মান যায় সেই "যাজ্ঞা" তে আমাকে সম্পূর্ণাবয়ব দেখা যায় তাহাও কি কষ্টের অবস্থায়। আস্ত বেগুণে চ টাকে মাথায় বহন করিতে হয়, পিঠে বোচ্কা ত আছেই। তাহাতে আবার উচ্চারণের সময় আমার সপিণ্ডকরণ সমাধা হইয়া যায়। অন্যান্য সংযুক্তাক্ষরের বেলায় আমার লজ্জা সূচক হেট মুণ্ডটী এবং ক্লেশের হেতু সেই—বোচকাটী মাত্র বহাল থাকে। যথা ঞ্চ, ঞ্জ, ঞ্ছ, জ্ঞ, আবার যখন জ এর নীচে যাই তখন কেবল বোচ্কাটী থাকে।

আমি সবই সহিয়া যাইতাম কিন্তু জ্ঞাতি ভাই ঙ এর শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া আমার ক্লেশ দ্বিগুণ পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। পূর্ব্বে যে ঙ আমা হইতে দুই স্থান পরে বসিত প্রথম সে ডবল প্রমোশন পাইয়া আমার উপরে বসিয়া গেল। দেবনাগরে ঙ স্কন্ধে এক বিন্দু বহন করিত, বঙ্গভাষায় সে মাথায় পাগ্ড়ী পরিয়া ঈষৎ শিখাটি দেখাইয়া ভূঁড়ি ফুলাইয়া বেশ একটী মহামহোপাধ্যায় সাজিয়া বসিয়া আছে। পূর্ব্বে কদাচিৎ উহাকে স্বাধীন অবস্থায় দেখা যাইত; বেঙ্, ঠেঙ্, সঙ্ ইত্যাদি নেহাৎ অপকৃষ্ট স্থলেই তাহার দর্শন মিলিত, কিন্তু পতিত পাবন ঠাকুর আপনার কৃপায় সে "বাঙালী"র মধ্যে সাটোপে আসন পরিগ্রহ করিতে পারিয়াছে।

সংযুক্তবর্ণেও ঙ কখনও নীচে বসে না; আবার ঙ্ক ও ঙ্গ স্থলে মাত্র তাহার বিকৃতি ঘটে বটে কিন্তু সম্মানসূচক পাগড়ীটি বজায় থাকে। ঙ সৌভাগ্যবান,

তাহার একটী গোমস্তা আছে "ং"; বড় লোক যেমন সামান্য লোকের বাড়ীতে গোমস্তা পাঠাইয়া তত্ত্ব লইয়া থাকেন, তেমনই ঙ ঠেং সং প্রভৃতিতে ং অনুস্বারটিকে পাঠাইয়া এখন কাজ সারিতেছে।

এখন করপুটে প্রার্থনা যে, যেহেতু আপনি পতিতপাবন, আমি অধম পতিতের প্রতি কৃপাকটাক্ষ ক্ষেপণ পূর্ব্বক ঙ এর ন্যায় একটু স্বাধীনতা প্রদান করুন. আপনি যখন সাহিত্য-সম্রাট তখন আপনার নিকট না কাঁদিয়া আর কোথায় গিয়া দুঃখ জানাইব?

আপনার দীনপ্রজা

শ্রীঞ।

পুনশ্চ।

ঠাকুর গো বুঝি একেবারে গেলাম। এই দরখাস্ত লিখিয়া পেস্ করিতে যাইতেছি এমন সময় সংবাদ পাইলাম একজন ক্ষমতাবান বৈজ্ঞানিক লেখক নাকি আমাকে এবং সগোত্র সমস্ত অনুনাসিককেই সংযুক্তবর্ণ হইতে তাড়াইয়া দিয়া কিষ্কিন্ধ্যার অনুকরণে ঙ এর গোমস্তা সেই "ং" দ্বারা কাজ চালাইতে চান, তবেই ত! আমাদের স্ববর্গীয় অন্য বর্ণের কাঁধে চড়ার অধিকাররূপ যে সম্মানটি ছিল তাহাও যাইতে বসিল। আমার তথা অনেকের, অবশ্যই এই কাঁধে চড়া ব্যাপার বিড়ম্বনারও কারণ ছিল বটে, কিন্তু সম্মানজনক কাজ (যথা অনারেরি মাজিষ্টরি) বিড়ম্বনার হেতু হইলেও তাহা কে কবে ছাড়িতে পারিয়াছে! বিশেষতঃ তাহা হইলে আমার যে অস্তিত্বের প্রায় সম্পূর্ণ লোপ? দোহাই সম্রাটের, এই আপাত সঙ্কটে আমাদিগকে রক্ষা করুন। *

শ্রীঞ।

* এই প্রবন্ধের কোন কোন বিষয়ে আমরা লেখক মহাশয়ের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। আঃ সঃ।

শান্তি শতকের প্রাচীন বঙ্গানুবাদ।

সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ পাঠকগণের নিকট পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞ কবি শিহ্লন মিশ্র কৃত 'শান্তিশতক' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ অপরিচিত নহে। উহার ন্যায় উপাদেয় গ্রন্থ তত্ত্বপিপাসুগণের বড়ই আদরের সামগ্রী। শঙ্করাচার্য্যের 'মোহমুদ্গর' যেমন সংসার-বাসনার মূলে কুটারাঘাত করে, 'শান্তি শতক' পাঠেও তেমন সর্ব্ব শান্তির আধারভূত সেই একমেবাদ্বিতীয়মের' অনুধ্যানে ভবকারারুদ্ধপ্রাণপক্ষী প্রধাবিত হইতে চায়! পদ্মপত্রস্থিত সলিল-বিন্দুবৎ জগৎচির টলটলায়মান; কিন্তু সুচতুর বিশ্বশিল্পী কি কৌশলে মানুষকে এমন এক অহংজ্ঞানরূপ-মদিরা দিয়া উন্মত্ত করিয়া রাখিয়াছেন যে, মানুষ পদে পদে সংসারের নশ্বরত্ব বুঝিয়াও বুঝে না! এই আছি, মুহূর্ত্তের পর জল বুদ্বুদের মত কোথায় মিলাইয়া যাইব যে ছার মানুষ বলিতে পারে না, হায়! সে ছার মানুষ কেন আমার, আমার, করিয়া এত বড়াই করে!

কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম। 'শান্তি-শতক' অন্বর্থনামা গ্রন্থ। উহার প্রতি শ্লোকে যেন অমিয় ধারা ক্ষরিত হইতেছে। বৈরাগ্য প্রতিপাদক গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যে কয় খানি আছে, বলিতে পারি না। কিন্তু যত খানিই থাকুক, 'শান্তি শতক' যে তন্মধ্যে একতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না।

এ হেন শান্তি শতকের বঙ্গানুবাদ অনেক বাঙ্গালা সাহিত্য প্রেমিকের নিকট খুব সমাদৃত হওয়ার কথা। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের আমলে বর্দ্ধমানের অন্তর্গত সাহাবাদ পরগণাস্থিত বলগণা গ্রামবাসী পণ্ডিত রামমোহন ন্যায়বাগীশ মহাশয় কর্ত্তৃক এই অনুবাদ কার্য্য সম্পন্ন হয়। পণ্ডিত মহাশয় গ্রন্থের ভূমিকা স্বরূপ যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এস্থলে আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

শ্রীগুরুচরণ দ্বন্দ্ব পঙ্কজের মকরন্দ
পানানন্দে আনন্দ হৃদয়।
ক্ষিতি মধ্যে ধন্য২ নৃপতির অগ্রগণ্য
শান্ত দান্ত শুদ্ধ পুণ্যময়।
গো-দ্বিজগণের পাতা দানে কর্ণ সম দাতা
কল্পতরু তুল্য জম্বুদ্বীপে।

অবনী মণ্ডল বীর সমুদ্র সম গম্ভীর
জগত-কম্পিত বীর-দাপে ॥
বৰ্দ্ধমান পুরে ধাম তেজশ্চন্দ্র যাঁর নাম
মহারাজাধিরাজ বিদিত।
তাঁর রাজ্যে আছে গ্রাম বলগণা বিখ্যাত নাম
সাহাবাদ পরগণা ঘটিত ॥
সেই গ্রাম নিজ ধাম শ্রীরামমোহন নাম
উপনাম শ্রীন্যায়বাগীশ।
শান্তি শতকের অর্থ পয়ারেতে কহে তথ্য
শুনি সবে করিবে আশীষ ॥
গ্রন্থ কর্ত্তা শ্রীশিহলন মিশ্র কবি রসায়ন
নিগূঢ়ার্থ বুঝিতে দুর্গম।
পুঁথি চারি পরিচ্ছেদ যাহে ঘুচে ভবখেদ
হৃদয়ের গ্রন্থি উপশম ॥
গ্রন্থ পরিচ্ছেদ চারি তাহা কহি সুবিস্তারি
ক্রমে পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদে।
আদ্য পরিচ্ছেদে কয় পরিতাপ দূর হয়
দ্বিতীয়ে বিবেক জন্মে হৃদে ॥
তৃতীয়েতে সবিশেষ কর্ত্তব্যের উপদেশ
চতুর্থে আনন্দময় হয়।
প্রতি শ্লোক পরিষ্কৃত বুঝিবে পণ্ডিত যত
এই গ্রন্থ শুদ্ধ সত্বময় ॥

মহারাজাধিরাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর কোন্ সময়ের লোক, তাহা স্থির করিতে পারিলেই এই অনুবাদের সময় নির্দ্ধারণ সম্ভব হইতে পারে। দুঃখের বিষয়, আজ আমাদের সাহিত্যিক উপকরণরাজি হাতের নিকটে না থাকায় তদ্বিষয়ে আমরা নীরব থাকিতে বাধ্য হইলাম।

প্রথমে সংস্কৃত শ্লোক, তার নীচে অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। অনুবাদে পয়ার আর কোন ছন্দ অনুসৃত হয় নাই। অনুবাদে সর্ব্বমোট ১০৭টি শ্লোক যায়। মঙ্গলাচরণ শ্লোকাদি 'শতকের' সংখ্যাভুক্ত হওয়াতেই সম্ভবত এই ক অতিরিক্ত হইয়া গিয়াছে।

টোলের পণ্ডিতেরা সাধারণতঃ ভাল বাংলা জানেন না বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে; কিন্তু সমালোচ্য গ্রন্থের অনুবাদক পণ্ডিত মহাশয় স্বসম্প্রদায়ের সে অপযশ-ক্ষালণে সক্ষম হইয়াছেন। ঘটত্ব পটত্ব লইয়া যাঁহার কেশহীন মস্তক হয়ত অহর্নিশ আলোড়িত থাকিত, তাঁহার পক্ষে এমন সরল সহজবোধ বাঙ্গালা লেখা খুব প্রশংসার কাজ, সন্দেহ নাই। তাঁহার অনুবাদ যেমন অনাড়ম্বর, রচনাও তেমন হৃদয় গ্রাহিণী। পরবর্ত্তী উদ্ধৃতাংশে পাঠকগণ তাহার পরিচয় পাইবেন।

গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোকটি এই:—

প্রণাম করিতে চাহি যত দেবগণে।
বিধাতার বশ তারা বন্দি কি কারণে॥
তবে কি বন্দিব বিধি বলিয়া প্রধান।
কর্ম্মফল বিনা তাঁর সাধ্য নাহি আন॥
মনে বিচারিয়া দেখ কর্ম্মের মহত্ব।
শুভাশুভ ফল যত কর্ম্মের আয়ত্ত॥
কি করিবে বিরিঞ্চ্যাদি যতেক দেবতা।
কর্ম্মেরে প্রণাম যাহা হইতে হীন ধাতা॥

উক্ত শ্লোক হইতে অনুমিত হয়, শিহ্লন মিশ্র কর্ম্মফলবাদী বৌদ্ধ দার্শনিক ছিলেন; কিন্তু একেশ্বরের প্রতি তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এরূপ ভাববোধক শ্লোক রাজিও এ গ্রন্থে অনেক দৃষ্ট হয়। তিনি শুদ্ধ সাত্বিক ভাবে পরম ব্রহ্মোপাসনার জন্য বারম্বার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

অনুবাদক নিজেই বলিয়াছেন, 'এই গ্রন্থ শুদ্ধ সত্বময়'। ধর্ম্মপিপাসুগণ ইহাকে অত্যন্ত উপাদেয় ও আদরণীয় মনে করিবেন, সন্দেহ নাই। অনুবাদের সরলতার নমুনা স্বরূপ পাঠকগণকে নিম্নে কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ উপহার দিতেছি:—

(১) নারী চরিত্র।

সংশয়ের আরম্ভ নারী বিরোধ-ভবন।
দোষের আশ্রয় নারী সাহস পতন॥
শতেক কপট যুক্ত সর্ব্বমায়াময়।
অবিশ্বাস স্থান নারী না হয় প্রত্যয়॥

মায়ার প্যাটারা নারী কি কহিব কথা।
না পারে ত্যজিতে যারে দেবাসুর ধাতা॥
এমন স্ত্রীলোক ধর্ম্ম নাশের কারণ।
বিষময় অমৃত কে করিল সৃজন॥

(২) দেহের অনিত্যতা।

দেখ ভাই এই দেহ শোকের আধার।
রেত রক্ত পুরীষ প্রস্রাব মাত্র সার।
এ হেন ভূতের বাসে মিথ্যা দেহে আশা।
দেহ ধরি কত কি না হইল দুর্দ্দশা॥
ধীরের উচিত নহে এ দেহ রাখিতে।
ছায়াবাজি মাত্র ভেবে দেখহ মনেতে॥

৩) ভবরূপ ভয়ানক দুর্গম বনেতে।
না না ছিদ্র আছে দেখ তনুর গৃহেতে॥
সর্ব্বদান্ধকার রাত্রি মোহ মন ঘোর।
তাহে অতি বলবান পিছে কাল চোর॥
অতএব বলি ভাই শুন সাবধানে।
জ্ঞানরূপ অসি ধরে থেকো জাগরণে॥

৪) আকাশে বা যাও তুমি যাও বা দিগন্তে।
জলধি প্রবেশ কিম্বা থাকহ একান্তে॥
যা ইচ্ছা তাহাই কর শুন ওহে ভাই।
কর্ম্মফল বিনা আর কিছু পাবে নাই॥
শুভাশুভ কর্ম্ম ফল যেমত বিধান।
মরিলে সঙ্গেতে যাবে নাহিক ছাড়ান॥

(৫) যাহার জনক ধৈর্য্য ক্ষমা যার মাতা।
শান্তি যার গৃহিণী আর সত্য যার সুতা॥
মনের সংযম ভ্রাতা ভগিনী যার দয়া।
যার শয্যা মহীতল যার নাহি মায়া॥
দশদিক বস্ত্র যার পান জ্ঞানামৃত।
ব্রহ্মানন্দে সমাধি যে করে অবিরত॥

একেক কুটুম্ব যার যোগী বলি তারে।
বল দেখি ওহে সখা সে ডরে কাহারে।

নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে গ্রন্থ পরিসমাপ্ত হইয়াছে :—

আশা নামে নদী তাহে মনোরথ জল।
তৃষ্ণারূপ তরঙ্গেতে সর্ব্বদা বিকল॥
মোহের আবর্ত্ত তাহে কে হইবে পার।
অতিশয় উচ্চ চিন্তা স্বরূপ দুধার॥
রাগরূপ কুম্ভীর ভাসিছে দেখ তায়।
বিতর্ক স্বরূপ পক্ষী দুধারে খেলায়॥
ধৈর্য্যরূপ বৃক্ষ সেই ভাঙ্গে নিরবধি।
বড়ই দুর্ব্বার সেই আশা রূপা নদী।
তপোবনে যোগীগণ গেছে পার হয়ে।
আনন্দে আছে তারা ব্রহ্মপদ পেয়ে॥
আপনার শান্তিতে যদ্যপি মন যায়।
যদ্যপি কাহারো মুক্তিপদে রীতি চায়॥
যদ্যপি এড়াবে ভাই ভবের যাতনা।
শিহ্লান মিশ্রের মত কর আরাধনা।

সংস্কৃত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিলে অনুবাদের সহিত মূলের তুলনা করার সুবিধা হইত, সন্দেহ নাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ মূল গ্রন্থখানি নিকটে না থাকায় তাহা করিতে পারি নাই। আশা করি, তাহাতে পাঠকগণের ক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ নাই।

প্রাপ্ত হস্তলিপিতে লিপিকারকের নাম ধাম ও তারিখাদি নাই।

আবদুল করিম।

আর্য্য-সন্তানের সমুদ্র-পথে বিদেশ গমন।

আর্য্য সন্তানের সমুদ্র পথে বিদেশ গমন বিষয়ের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা মীমাংসা করিতে গেলে এ সম্পর্কে হিন্দু শাস্ত্রের কিরূপ অভিমত, প্রাচীন আর্য্য সমাজে সমুদ্র পথে দেশান্তর গমনের প্রথা প্রচলিত ছিল কি না, বিশিষ্টরূপে আলোচনা করিয়া তাহা সম্যকরূপে অবগত হওয়া সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। কারণ ধর্ম্মনিষ্ঠ

হিন্দুর জীবন সর্ব্বদা শাস্ত্র নিয়ন্ত্রিত। এ জন্যই হিন্দুর শাস্ত্রাপেক্ষিতা পৃথিবী বিশ্রুত। শাস্ত্রাপেক্ষিতা আর কিছুই নয়, —কোন বিষয়ের কর্ত্তব্যতা কিংবা অকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ বিষয়ে শাস্ত্রাদেশ অপেক্ষা করিয়া কার্য্য করাই শাস্ত্রাপেক্ষিতা। ব্যক্তিগত, পরিবার গত কিংবা সমাজগত যে কোন বিষয়ে শাস্ত্রাদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া যথেচ্ছাচরণ করিতে ধর্ম্মভীরু হিন্দু কদাচ অগ্রসর হইবেন না। সার্ব্বজনীন মুক্তিমন্ত্রের শ্রেষ্ঠ উপাসক হিন্দু চিরদিনই স্বাধীনতার গুণ-গ্রাহী ভক্ত ও স্তাবক, কিন্তু যথেচ্ছাচারকে হিন্দু চিরদিনই ঘৃণা করেন এবং বিভীষিকার চক্ষেই অবলোকন করেন।

আমরা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত নহি। সুতরাং সমুদ্র যান গমন সম্পর্কে হিন্দু শাস্ত্রের কিরূপ অভিমত, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান বুদ্ধির সাহায্যে স্বয়ং সিদ্ধান্ত করিবার আমরা অধিকারী, এরূপ মনে করি না। আমাদের ন্যায় শাস্ত্রানভিজ্ঞ প্রাকৃত জনের এরূপ প্রগল্‌ভতা জন্মিলে তাহা যে বস্তুতই নিন্দার্হ তাহা আমরা বেশ জানি। তবে, নানা শাস্ত্রার্থদর্শী বহু জনবরেণ্য শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত মহোদয়েরা এ বিষয়ে কিরূপ বিধি ব্যবস্থা দান করিয়াছেন, তাহারই আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান সময়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা আমরা সমীচীন মনে করি।

কলিকাতাস্থ গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের সুবিখ্যাত অধ্যাপক, "বাচস্পত্যা-ভিধান" নামক সুপ্রসিদ্ধ শব্দকোষ প্রণেতা পণ্ডিত ৺তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় এ বিষয়ে যে ব্যবস্থাপত্র দান করিয়াছিলেন সর্ব্ব প্রথমে আমরা তাহারই উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করি। ১৯২৮ সংবতে এই ব্যবস্থা পত্র প্রদত্ত হয়। নিম্নে তাহা অবিকল উদ্ধৃত হইল।

সমুদ্রযান গমনদোষ মীমাংসা।

ওঁ তৎসৎ

বাণিজ্যরাজাজ্ঞাদিনিমিত্তকসমুদ্রনৌযানে তৎকালে স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে ম্লেচ্ছাদিভিন্ন ক্কতর সংসর্গাভাবে চ দ্বিজানাং প্রায়শ্চিত্তাভাবোঽব্যবহার্য্যতাভাবশ্চ ধর্ম্মার্থসমুদ্রযানগমনে তু স্বধর্ম্মত্যাগে ম্লেচ্ছাদিভিন্ন ক্কতরসংসর্গে চ কৃতপ্রায়শ্চিত্তা-নামপি দ্বিজানামব্যবহার্য্যতা শূদ্রাণান্তু প্রায়শ্চিত্তাচরণে ব্যবহার্য্যতেতি বিশেষঃ।

তথাহি, হেমাদ্রৌ কলিবর্জ্য-প্রকরণে,

"বিধবায়াং প্রজোৎপত্তৌ দেবরস্য নিয়োজনম্" ইত্যুপক্রম্য "দ্বিজস্যাব্ধৌ তু নৌযাতুঃ শোধিতস্যাপি সংগ্রহঃ" ইতি

আদিত্য পুরাণ বচনে শোধিতস্যাপীত্যনেন কৃতপ্রায়শ্চিত্তস্যৈব সংগ্রহপদবাচ্যব্যবহার্য্যতানিষেধেন যত্র বিষয়ে সমুদ্রনৌযানং নিষিদ্ধং তত্রৈব বিষয়ে কৃতপ্রায়শ্চিত্তস্যাপ্যসংগ্রহ ইতি প্রতিপাদিতম্। অত্র শোধিতস্যোক্ত্যৈব প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্তীভূতপাপনিশ্চয় আক্ষিপ্যতে তন্নিশ্চয়শ্চ পাপাবেদকশাস্ত্রাদেব, সমুদ্রনৌগমনমাত্রে চ কুত্রাপি শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তাদ্যদর্শনাৎ ন তস্য নিষিদ্ধতা, কিন্তু তদ্গমনকালে ম্লেচ্ছাদিস্পৃষ্টজলান্নসেবন এব, তৎপাপনোদনায় কৃতেঽপি প্রায়শ্চিত্তে ন তস্যাতুঃ সংগ্রহ ইত্যেব কল্পয়িতুমুচিতং শোধিতস্যাপীতি পদস্বারস্যাৎ। অন্যথা সমুদ্রনৌগমনমাত্রে সংগ্রহ ইত্যেবাভিদধ্যাৎ। ন চ তথাভিহিতম্। ন চ

"সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণম্।
দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপরমস্তথা॥
দেবরাচ্চ সুতোৎপত্তি মধুপর্কে পাশোর্ব্বধঃ।
মাংসদানং তথাশ্রাদ্ধে বাণপ্রস্থাশ্রমস্তথা॥
দত্তাক্ষতায়াঃ কন্যায়াঃ পুনর্দ্দানং বরস্যচ।
দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধসৌ।
মহাপ্রস্থানগমনং গোমেধশ্চ তথা মখঃ
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্যানাহুর্মনীষিণঃ॥

ইতি বৃহন্নারদীয় বচনে সমুদ্রযাত্রা স্বীকারস্য কলৌ নিষিদ্ধতয়া নিষিদ্ধাতিক্রমে চ।

"বিহিতাস্যাননুষ্ঠানান্নিন্দিতস্য চ সেবনাৎ।
অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়াণাং নরঃ পতনমৃচ্ছতি॥"

ইতিস্মৃতৌ ক্রমশস্তথাচরণে পাতিত্যপ্রতিপাদনাৎ তদ্বিষয় এব প্রায়শ্চিত্তাচরণসম্ভবেন তত্রৈব শোধিতস্যাপীত্যস্যাবকাশ ইতি বাচ্যম্ বৃহন্নারদীয়বচনে উপসংহারে "ইমান্ ধর্ম্মান্" ইত্যুক্তেঃ ধর্ম্মরূপসমুদ্রযাত্রাস্বীকারস্যৈব কলৌ নিষেধাৎ বাণিজ্যরাজাজ্ঞাদিনিমিত্তকস্য তস্য নিষেধাভাবেন তদ্বিষয়কত্বাসম্ভবাৎ। স্মর্য্যতে চ ব্রহ্মহত্যাদি পাপাপনোদনার্থং সমুদ্রগমনং পরাশরেণ, প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে

"শতযোজনবিস্তীর্ণং শতযোজনমায়তং।
রামচন্দ্রসমাদিষ্টনলসঞ্চয়সঞ্চিতম্॥
সেতুং দৃষ্টা সমুদ্রস্য ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি।"

ইত্যনেন

ন চাত্র সমুদ্রসেতু দর্শনস্যৈব ব্রহ্মহত্যানাশকত্বং শঙ্কাং, সমুদ্রযাত্রাস্বীকারং বিনা শতযোজনায়তস্য সেতোর্দর্শনাসম্ভবেন আক্ষেপেণৈব তদগমনলাভাৎ। অন্যথা সেতোর্যৎকিঞ্চিদংশমাত্রস্য তথাত্বে "শতযোজনমায়তম্" ইতি বিশেষণমনর্থকং স্যাৎ তথা চ শতযোজনবিস্তারায়তসেতুবন্ধদর্শনস্যৈব প্রকৃতব্রহ্মহত্যাপাপনাশকত্বং ন তু যৎকিঞ্চিন্মাত্রদর্শনস্য, পাপপ্রাবল্যেন পরিশ্রমপ্রাবল্যস্যাপেক্ষিতত্বাৎ কিন্তু একাদশ্যাদিব্রতস্যেব যৎকিঞ্চিন্মাত্রদর্শন-স্যাতিদিষ্ট ব্রহ্মহত্যানাশকতত্বম্ যুক্তম্। অতএব

"গোভূয় অরভতে তস্যফলে বিশেষ"

ইতি জৈমিনিনা সম্যগায়ামে ফলবাহুল্যং নির্ণীতং, নির্ণীতঞ্চ ঋগ্বেদভাষ্যে মাধবাচার্য্যেণ সম্যগায়ামাদিনা অনুষ্ঠিতাশ্বমেধাদ্যপেক্ষয়া তত্তদ্যজ্ঞবিদ্যাবোধক-বেদাধ্যায়িনী ন্যূনফলত্বম্। এবঞ্চ প্রকৃতব্রহ্মহত্যায়া অপনোদনার্থং শত যোজনদীর্ঘবিস্তারসেতুদর্শনং স্মৃতৌ বিহিতং। তেনৈব চ সমুদ্রনৌগমনম্-র্থাপত্তিলভ্যম্ এবং দ্বারবত্যাদিতীর্থযাত্রাঙ্গমপি সমুদ্রযানগমনমর্থাপত্তিপ্রমাণ লভ্যম্। এবঞ্চ ঈদৃশসমুদ্রযানস্যৈব ধর্ম্মরূপতয়া বিহিতস্য কলৌ নিষেধ বৃহন্নারদীয় বচনে কমণ্ডলুবিধারণাদিভিঃ পুণ্যাপরপর্য্যায়ধর্ম্মসাধনত্বেন ধর্ম্মরূপৈঃ সমভিব্যাহারেণ পঠিতত্বাৎ ধর্ম্মরূপস্যৈব সমুদ্রযানস্য নিষিদ্ধত্বৌচিত্যাৎ।

"প্রায়েণ সমানরূপাঃ সহচরা ভবন্তি"

ইতি ন্যায়াৎ। এতেন বৃহন্নারদীয়ে সমুদ্রযাত্রা স্বীকার ইতি পাঠে রঘুনন্দন মাধবাচার্য্যাদিবহুনিবন্ধকারসম্মতে স্থিতে নির্বিসিন্ধৌ সমুদ্রযাতুঃ স্বীকার ইতি পাঠ কল্পনমনাকরমনুচিতঞ্চ তথা সতি সমুদ্রযাতুর্জনস্য স্বীকাররূপ ব্যবহারস্য ধর্ম্মরূপত্বাভাবেন "ইমান্ ধর্ম্মান্" ইত্যভিধানস্যাযুক্তত্বাপত্তেঃ। ততশ্চ ধর্ম্মার্থসমুদ্রযাত্রাস্বীকারস্যৈব নিষিদ্ধতয়া বাণিজ্যরাজাজ্ঞাদিনিমিত্ত কস্য তস্য কুত্রাপ্যনিষেধাৎ তৎসময়ে ম্লেচ্ছাদিগুরুতরসংসর্গে সন্ধ্যাবন্দনাদিত্যাগে চ তৎপাপ নোদনার্থং শোধিতস্যাপি (কৃতপ্রায়শ্চিত্তস্য) ন সংগ্রহ ইত্যত্রৈব আদিত্যপুরাণ বচনতাৎপর্য্যম্। যথা চ

"কামতোহ ব্যবহার্য্যস্তু বচনাদিহ জায়তে"

ইতি যাজ্ঞবল্ক্যেন পাতকবিশেষে প্রায়শ্চিত্তাচরণেঽপি অব্যবহার্য্যতাভিহিতা তৎসমানন্যায়াদত্রাপি প্রায়শ্চিত্তাচরণেঽপি ন ব্যবহার্য্যতেতি যুক্তমুৎপশ্যামঃ। এবঞ্চ সমুদ্রনৌগমনকালে সন্ধ্যাদিকর্ত্তুঃ ম্লেচ্ছাদিভিগুরুতরং সংসর্গমকুর্ব্বতশ্চ প্রায়শ্চিত্তজ্ঞাপকশাস্ত্রাভাবাৎ ন অব্যবহার্য্যতা নাপি প্রায়শ্চিত্তাচরণম্।

ততশ্চ

"উষিত্বা যত্র কুত্রাপি স্বধর্ম্মং প্রতি পালয়ন্।"
ষট্ কর্ম্মাণি প্রকুর্ব্বীরন্নিতি ধর্ম্মস্য নিশ্চয়ঃ॥

ইতি স্মৃতৌ যত্র কুত্রাপি বাসেঽপি স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে পাপশূন্যত্বমুক্তং শৃপপহম্।

অতএব কলৌ বাণিজ্যার্থসমুদ্রযানে শিষ্টাচারোপি দৃশ্যতে। তথাপি রত্নরাজামাতায়োর্যৌগন্ধরায়ণবাভ্রব্যয়োর্যদ্ধার্থং রত্নরাজরাজাজ্ঞয়া সমুদ্রযানং রত্নাবলী নাটকে বর্ণিতং বর্ণিতঞ্চ ভাষাচণ্ডীপুস্তকে শ্রীমন্তাভধবণিজস্তৎ পিতুশ্চ ইতো বঙ্গদেশাৎ সিংহলগমনং নচ তদ্গমনং তদা কেনাপি বিজীতম্ যদি তদ্বিজীতং স্যাত্তদা তেহি শিষ্টাঃ কথং তৎকুর্য্যুঃ। এতন্মূলকমেব ইদানীমপি অন্যৈ শিষ্টৈর্বাণিজ্যাদ্যর্থং সিংহলাদিগমনং অনুষ্ঠীয়তে। অতঃ সমুদ্রযানগমনমাত্রং নিষিদ্ধমিতি তু রিক্তং বচঃ! ততশ্চ ধর্ম্মার্থসমুদ্রযাত্রাগমনমেব কলৌ নিষিদ্ধমা-যাতন্। তদ্গমনকালে চ যদা ম্লেচ্ছাদিভিশ্চ্ছক্কতরসংসর্গঃ সন্ধ্যাদি যশ্চ তদৈব প্রায়শ্চিত্তাচরণেঽপি দ্বিজানামব্যবহার্য্যতা শূদ্রাণান্তু প্রায়শ্চিত্তাচরণে ব্যবহার্য্যতৈব দ্বিজপদেস্বারস্যাৎ অন্যথা লোকস্যাদ্যৌ দ্বিত্যাভিদষ্যাৎ। ইত্যেব দ্বিজেভ্যঃ শূদ্রাণাং বিশেষ ইতি দিঙ্মাত্রমুপদর্শিতম্।

অত্র যদি কেচিৎ বিপক্ষপক্ষং সমর্থয়মানাঃ প্রমাণযুক্তভাসাসাবষ্টম্ভেন প্রত্যবতির্ষ্ঠেরন্ তদা দৃঢ়তরপ্রমাণোপন্যাসেন তেষামতোপমর্দ্দন স্বপক্ষে পশ্চাৎ পশ্চাৎ স্থিরীকরিষ্যতে ইত্যলমতিবিস্তরেণ। শুভমস্তু। শিবম্।

কলিকাতা রাজকীয় সংস্কৃতবিদ্যামন্দিরাধ্যাপকস্য
শ্রীতারানাথ তর্কবাচস্পতেঃ, সংবৎ ১৯২৮।

ঐ ব্যবস্থা পত্রের মর্ম্মার্থ এই যে সমুদ্রযান গমন বিষয়ে কোনও শাস্ত্রের প্রায়শ্চিত্তাদির বিধান না থাকায় সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ নহে। বৃহন্নারদীয় বচনের শেষ ভাগে "ইমান্ ধর্ম্মান" অর্থাৎ এই সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানে কলিযুগে বর্জ্জনীয় এরূপ লিখিত আছে। সুতরাং ধর্ম্মার্থে সমুদ্রযাত্রা স্বীকারই কলিযুগে নিষিদ্ধ, পরন্তু বাণিজ্য বা রাজাজ্ঞাদি নিমিত্ত সমুদ্রযাত্রা স্বীকার নিষিদ্ধ নহে। পরাশর প্রায়চিত্ত প্রকরণে ব্রহ্মহত্যাদি পাপ পরিহারার্থ সমুদ্রযাত্রা বিধান করিয়াছেন। শত যোজন বিস্তীর্ণ এবং শত যোজন আয়ত রামচন্দ্রের আদেশানুসারে বানর সৈন্যসৃষ্ট সমুদ্র সেতুদর্শন করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ বিনষ্ট হয়। শত যোজন আয়ত এবং শত যোজন বিস্তীর্ণ সমুদ্র দর্শন সমুদ্র যান গমন ভিন্ন অসম্ভব। সুতরাং সমুদ্রযান গমনে পাপ হওয়া দূরে থাকুক, বরং শাস্ত্র মতে

ব্রহ্মহত্যাজনিত মহাপাতক নাশন প্রায়শ্চিত্ত বলিয়াই শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। সমুদ্রযান গমনকালে সন্ধ্যাবন্দনাদির বিঘ্ন না ঘটিলে এবং ম্লেচ্ছাদির সহিত গুরুতর সংসর্গ না করিলে প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন এ কথাও কোন শাস্ত্রে কুত্রাপি লিখিত নাই। সুতরাং সমুদ্রগামী ব্যক্তির অব্যবহার্য্যতা হয় না। যজন যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, প্রতিগ্রহ ষট্‌কর্ম্মান্বিত থাকিয়া স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে ব্রাহ্মণ সন্তানও যে কোন দেশে বাস করিতে পারেন, ইহাও শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ বাক্য। অতএব কলিযুগে বিদ্যাশিক্ষা, বাণিজ্যাদি নিমিত্ত কিংবা রাজাদেশ অনুসারে সমুদ্র যাত্রার শিষ্টাচার দেখা যাইতেছে। রত্নাবলী নাটকে সে রাজার অমাত্য যৌগন্ধরায়ণ ও বাভ্রব্যের যুদ্ধের নিমিত্ত রাজাজ্ঞানুসারে সমুদ্রযানারোহণ এবং ভাষা "চণ্ডী" নামক পুস্তকে শ্রীমন্তনামক বণিকের এবং তাঁহার পিতার বঙ্গদেশ হইতে সিংহলদ্বীপে গমন ইত্যাদি তাহার উদাহরণ। পূর্ব্বকালে সমুদ্র গমন নিন্দিত ছিল না। নিন্দিত থাকিলে তাঁহারা শিষ্ট হইয়া কখন গর্হিত অশিষ্টাচরণ করিতেন না। বর্ত্তমান কালেও ভারতের বহু শিষ্ট ব্যক্তি সিংহলাদি নানা স্থানে সমুদ্র পথে গমন করিয়া থাকেন। অতএব সমুদ্র যাত্রা মাত্রই নিষিদ্ধ, এইটি সম্পূর্ণ অলীক বাক্য। কলিযুগে ধর্ম্মোদ্দেশ্যে সমুদ্র যাত্রাই নিষিদ্ধ।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের প্রসিদ্ধ টীকাকর কাশীরাম ভট্টাচার্য্য মহাশয় বৃহন্নারদীয় পুরাণোদ্ধৃত "সমুদ্রযাত্রাস্বীকার" শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিতেছেন :—অত্র সমুদ্রযাত্রা স্বীকার শব্দেন, মরণমুদ্দিশ্য সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ মহাপ্রস্থানগমনাঞ্চ মরণমুদ্দিশ্য হিমালয়াদি গমনং ইতোবঞ্চাপিসুধীভি র্বিভাব্যম্"। অর্থাৎ উক্ত টীকাকার মহাশয়ের মতে মরণাভিপ্রায়ে সমুদ্রযাত্রাই কলিযুগে নিষিদ্ধ ইহাই শাস্ত্রের প্রকৃত অভিপ্রায়।

রঙ্গপুরের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় পাব্লিক্ সার্ভিস কমিশন (Public service commission) নামক রাজাদেশ-গঠিত বিশিষ্ট সমাজে সাক্ষ্য দান কালে এ সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরে যে অভিমত প্রকাশ করেন তাহা আমরা উল্লেখযোগ্য মনে করিতেছি। তিনি বলেন, যে হিন্দু সন্তানের সমুদ্রপথে দেশান্তর গমন শাস্ত্রে নিষিদ্ধ নহে। "সমুদ্রযাত্রা" বলিতে সমুদ্রে প্রাণত্যাগ বুঝাইত। পূর্ব্বতন কালে প্রায়শ্চিত্তার্থ সমুদ্রে দেহত্যাগের প্রথা ছিল। কলিযুগে ঐরূপ "সমুদ্রযাত্রাই" শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। কিন্তু খাদ্যাখাদ্য বিচার বিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিলে সমুদ্র পথে ভ্রমণ কিংবা দেশান্তরে গমন

হিন্দু শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হয় নাই। ম্লেচ্ছসংস্পর্শ ও খাদ্যাদি সম্পর্কে এক শ্রেণীর পণ্ডিত মহোদয়গণের অভিমত এই যে এই পাপের মোচন হইতে পারে. কিন্তু যে ব্যক্তি এরূপ পাপাচরণ করে সে স্বশ্রেণীস্থ অপরাপর ব্যক্তির সহিত সমাজে আচরণ যোগ্য হইবে না। অপর একশ্রেণীর পণ্ডিত মহোদয়গণের অভিমত কিন্তু অন্য প্রকারের। তাঁহারা বলেন যে এরূপ পাপানুষ্ঠান সমাজের উপেক্ষার যোগ্য নহে। কিন্তু বিহিত প্রায়শ্চিত্ত করিলে এরূপ পাপাচারী স্বসমাজে পুনরায় প্রবেশ লাভ করিবার সম্যক অধিকারী হইবে।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের নাম সর্ব্বত্র সুবিদিত। তাঁহার ন্যায় সুপণ্ডিত এ যুগে অধিক নাই। উক্ত পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কর্ত্তারা তাঁহারও সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহাদের সমক্ষে যে সাক্ষ্য দান করেন তাহার মর্ম্ম এই যে:— সমুদ্রপথে দেশান্তরে গমন শাস্ত্রমতে প্রকীর্ণ * নামক পাপ বিশেষ। শূলপাণি কৃত প্রায়শ্চিত্ত বিবেকোক্ত নববিধ পাপ মধ্যে ইহা অতি পাতক, মহাপাতক প্রভৃতি অষ্টবিধ গুরুপাপের কোনটির অন্তর্ভূত নহে। লোকে সচরাচর যে সকল পাপ করিয়া ফেলে, ইহা সেই শ্রেণীর অন্তর্গত। এরূপ শ্রেণীর পাপাচরণ করিলে কেহ জাতিভ্রষ্ট হয় না। সমুদ্র পথে ইংলণ্ড গমন এবং অপর কোনও স্থানে গমন, উভয়ই তুল্য পাপ। যে ব্যক্তি সমুদ্র পথে পুরীধামে শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দর্শন করিতে যায়, † তাহারও যে প্রকার পাপ, ইংলণ্ড গামীরও সেই শ্রেণীর পাপ। যে হিন্দুগণ ইংলণ্ড অথবা কোন ম্লেচ্ছ দেশে গমন করেন (যে সকল দেশের লোক গোখাদক, যাহারা বেদানুগামী নহে, এবং যারা জাতিভেদ মানে না, শাস্ত্রমতে তাহাই ম্লেচ্ছ দেশ) তাঁহারা এক প্রকার পাপাচরণ-দুষ্ট হন। কিন্তু এই পাপে তাঁহারা জাতিচ্যুত হন না ইত্যাদি।

---

* তথা বিষ্ণুঃ—যদনুক্তং তৎপ্রকীর্ণকম্।
প্রকীর্ণ পাতকে জ্ঞাত্বা গুরুত্বমথ লাঘবম্।
প্রায়শ্চিত্তং বুধঃ কুর্য্যাৎ ব্রাহ্মণানুমতে সদা॥
অনুক্তং অনুক্ত নিষ্কৃতিকম্ পাপম্।
অতি পাতকাদ্যন্যতমত্বেন। বিশেষতোঽনুক্তকম্
ইতি প্রায়শ্চিত্ত বিবেকঃ

† যে সময়ে স্মৃতিরত্ন মহাশয় এই উক্তি করেন তখন ৺ পুরী পর্য্যন্ত রেলপথ হয় নাই, তখন বহু লোক কলিকাতা হইতে সমুদ্র পথে জাহাজে চড়িয়া শ্রীক্ষেত্র যাইতেন। তাহাতে কেহ জাতিভ্রষ্ট হইতেন না।

সমুদ্র যাত্রাকারীর সহিত সুদীর্ঘকাল ব্যাপী ঘনিষ্টতম সংসর্গ,—একত্রে এক পরিবারে একান্নে অবস্থিতি কালে ভোজনাদি কিরূপ পাপ, যে বিষয় অল্প কয়েক দিন হইল বঙ্গের অনেকগুলি প্রথ্যাতনামা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত "পাতি" দিয়াছেন। আমরা সেগুলি এখানে উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি।

ভাগলপুরের রাজা শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ড গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার ইংলণ্ড গমনের পূর্ব্বেই কুমার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। সম্প্রতি কুমার সতীশচন্দ্রের কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ঐ বিবাহোপলক্ষে কুমারের পক্ষ হইতে নবদ্বীপ এবং ভট্টপল্লীর পণ্ডিত সমাজের নিকট ব্যবস্থা প্রার্থনা করা হয়।

নবদ্বীপের বর্ত্তমান পণ্ডিত কুল চূড়ামণি মহাশয়দিগের অভিমত এই :—

জ্ঞানকৃত-ম্লেচ্ছ-দেশ-গমন-তদন্ন-ভক্ষণাদিভিঃ পাতিত্যমাপন্নেন পিত্রা মহান্তরা-ন্তরা চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত জ্ঞানকৃতে কপংক্তি ভোজনাদি লঘুসংসর্গ তথাবিধ কৃত-তৎসংস্পৃষ্ট-মাতৃ পক্কান্নাদি-ভক্ষণ-জনিত পাপ ক্ষয়ায় তন্ম্লেচ্ছ দেশগমনাৎ পূর্ব্বোৎপন্নঃ পুত্রঃ পাদোনচতুর্ব্বিংশতি বার্ষিকব্রতাচরণাক্ষশক্তৌ সার্দ্ধশত কার্ষাপণী লভ্যরজতাদিদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং কৃত্বা ব্যবহার্য্যোভবতীতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

(স্বাক্ষর) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযদুনাথ সার্ব্বভৌমস্য, তর্করত্নোপাধিক শ্রীহরিশ্চন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্, বাচস্পত্যুপাধিক শ্রীসিতিকণ্ঠ শর্ম্মণাম্, প্রভৃতি।

ভট্টপল্লীর ব্যবস্থা :—

"অসকৃন্ ম্লেচ্ছান্নভোজন ম্লেচ্ছ দেশ গমনজনিত পাপবতো বর্ষাধিক কালং প্রথম সংসর্গিনা ব্রাহ্মণেন তৎপাপক্ষয়ার্থমষ্টাদশবার্ষিকব্রতাক্ষশক্তৌ সার্দ্ধশতকার্ষা-পণী দক্ষিণক-দশাধিকাষ্টশতকার্ষাপণী-লভ্য-রজত-দানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়ং কৃত প্রায়শ্চিত্তস্য তস্য ব্যবহার্য্যতা ভবতীতি বিদুষাং পরামর্শঃ। অত্র প্রমাণং— যো যেন সংপিবেদ্বর্ষং সোঽপি তৎসমতামিয়াৎ। পাদন্যূনং চরেৎ সোঽপি তস্য তস্য ব্রতংদ্বিজঃ। ইতি শূলপাণিধৃত ব্যাসবচনম্।

মরণাতিদেশাসম্ভবাৎ তদ্বৈকল্পিক চতুর্ব্বিংশতি বার্ষিক সৈবাতিদেশঃ তদেব পাদ ন্যূনং কর্ত্তব্যমিতি শূলপাণি সন্দর্ভশ্চ॥

(স্বাক্ষর) ভট্টপল্লীনিবাসিনাং মহামহোপাধ্যায় শ্রীশিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম দেবশর্ম্মণাম্, বিদ্যাভূষণোপাধিক শ্রীরামময় দেবশর্ম্মণাম্, তর্করত্নোপাধিক শ্রীশশিশেখর দেবশর্ম্মণাম্ প্রভৃতি।

এতৎসম্পর্কে আর একটি বিশিষ্ট অভিমত আমরা এস্থলে প্রকাশ করিতে

ইচ্ছা করি। এখানি "বঙ্গবাসী"র শাস্ত্রানুবাদক, অধুনা বঙ্গে সর্ব্বত্র সুপরিচিত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের প্রদত্ত ব্যবস্থা পত্র। তিনি বলেন :—
"এবং বিধানুপাতকক্ষয়ার্থিনা ব্রাহ্মণেন বৈধ গঙ্গাস্নান প্রতিবন্ধকাধিপাপক্ষয়ায় একৈকং বর্জ্জয়েৎ শুক্রে ইত্যাদি স্মৃত্যুক্ত চান্দ্রায়ণব্রতং কৃত্বা বিশ্বাস-বিশুদ্ধ-চেতসা যথা-দক্ষিণক-বৈধ-গঙ্গাস্নানরূপং প্রায়শ্চিত্তং তদান্তর পুনরুপনয়নং করণীয়ং কৃত প্রায়শ্চিত্তঃ পুনরুপনীতশ্চ ব্যবহার্য্যো ভবতীতি বিদূষাং পরামর্শঃ॥

মনুসংহিতার অষ্টমাধ্যায়ের ১৫৭ শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়।

"সমুদ্রযানকুশলা দেশ-কালার্থদর্শিনঃ।
স্থাপয়ন্তি তু যাং বৃদ্ধিংসা তত্রাধিগমং প্রতি॥"

সমুদ্রপথে দেশান্তর গমন হিন্দুগণের পক্ষে নিষিদ্ধ হইলে, মানবধর্ম্ম শাস্ত্রে আমরা কদাচ এই শ্লোকটি দেখিতে পাইতাম না। এই শ্লোক লিপিবদ্ধ করিবার কোন আবশুকতাও থাকিত না সুতরাং মনুর মতে আর্য্যগণের সমুদ্রপথে গমন নিশ্চই নিষিদ্ধ নহে প্রমাণিত হইতেছে।

বিশেষতঃ শূদ্রগণের সম্পর্কে ভগবান মনু বলেন যে প্রয়োজন বোধে শূদ্র যে কোন দেশে, স্থানে বাস করিতে পারে, তাহাতে যে পাতিত্য দুষ্ট হইবে না,—
"শূদ্রস্তু যস্মিন্ কস্মিন্ বা নিবসেদ্বৃত্তি কর্ষিতঃ।"

ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়—

"আয়দ্রুহাব বরুণশ্চ নাবং প্রযৎসমুদ্রমীর্বযাষ মধ্যং।
অধিযদপাং স্নুভিশ্চরবি প্রপেঙ্খইঙ্খযাবহৈশুভের্বাং॥
প্রথমাষ্টক, অধ্যায় ৮ মণ্ডপ ১।

ভাবার্থ এই যে, যখন বশিষ্ট বংশাবতংস আমি এবং বরুণ নৌকাযোগে মধ্য সমুদ্রে গমন করিতে ছিলাম। তৎকালে নৌকা খানি এরূপ প্রবল তরঙ্গাঘাতে আন্দোলিত হইতেছিল যে আমরা যেমন একটী দোলকশয্যায় নৃত্যানন্দ সম্ভোগ করিতেছিলাম।

প্রাচীন ভারতে সমুদ্রপথে গমন আর্য্যগণের নিত্যানুষ্ঠিত ব্যাপার ছিল বলিয়া অনেক প্রামাণ্য গ্রন্থে তাহার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কা বিজয় এতৎ সম্পর্কে অন্যতম প্রমাণ; রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের ৪০ চত্বারিংশ সর্গে "সপ্তরাজ্যো বিভক্ত যবদ্বীপ, স্বর্ণকায় বহুল স্বর্ণদ্বীপ, ও রৌপ্যদ্বীপ," যবদ্বীপের পরে "দেব দানবগণের নিত্য নিবাসস্থল শিশির পর্ব্বত," ঐ সকল দ্বীপের গিরিদুর্গ, প্রস্রবণ ও বন প্রভৃতির বিস্তারিত বর্ণনা আছে। সমুদ্র-পারবর্ত্তী

সিদ্ধ চারণগণ সেবিত শোণনদ, সমুদ্রের অন্তর্গত দ্বীপপুঞ্জ, সমুদ্র মধ্যস্থ ঋষভ নামক ধবল পর্ব্বত, সুদর্শন নামে এক সরোবর এবং উদয়পর্ব্বতের ও আমরা তথায় উল্লেখ দেখিতে পাই। কবিগুরু বাল্মিকী লিখিয়াছেন, "বৈখানস ও বালখিল্য প্রভৃতি তেজঃপুত্রজ কলেবর ঋষি সকল" ঐ দ্বীপস্থ সুশোভন পর্ব্বতশৃঙ্গে বাস করিতেন। মহাভারতেও কনিষ্ঠ পাণ্ডব সহদেব অনেকগুলি দ্বীপ জয় করিয়াছিলেন লিখিত আছে। সুতরাং তৎকালে সমুদ্রগমন নিষিদ্ধ ছিল বলিতে পারা যায় না।

শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, বায়ুপুরাণ, হরিবংশ, শকুন্তলা, রত্নাবলী, দশকুমার চরিত, হিতোপদেশ, কথা সরিৎসাগর প্রভৃতি বহু প্রাচীন গ্রন্থে আর্য্যগণের সমুদ্রপথে দেশান্তর গমন বিষয়ের উল্লেখ আছে। ক্রমশঃ।

শ্রীকালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী

ক্লোরিন্।

ক্লোরাইড অবলাইম অথবা ব্লিচিং পাউডার দূষিত বায়ু সংশোধন করার জন্য ব্যবহৃত হয়। ব্লিচিং পাউডারে কোনও এসিড দিলে এক প্রকার পীতবর্ণের বাষ্প বাহির হইতে থাকে। এই পীতবর্ণ বাষ্প তীব্র গন্ধযুক্ত ও প্রাণনাশক। ইহার নাম ক্লোরিন্। ক্লোরিন্ সহজেই জলের সহিত মিশিয়া থাকে। ক্লোরিন্ জলও পীতবর্ণ ধারণ করে। ক্লোরিন্ উদ্ভিজ্জবর্ণ নষ্ট করে। লাল জলে ক্লোরিন্ বাষ্প ধরিলে সাদা হইয়া যায়। উদ্ভিজ্জ বর্ণে কাপড় রঙ্গাইয়া যদি তাহাতে ব্লিচিং পাউডারের জল দ্বারা ছবি আঁকা যায় তবে ঐ কাপড় কোনও এসিডের জলে ডুবাইবা মাত্র সাদা ছবি উঠিয়া যায়। এই প্রণালীতে সুন্দর ছিট্ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এসিড্ সহযোগে ব্লিচিং পাউডার হইতে ক্লোরিন্ নির্গত হইয়া এই রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পাদন করে। ব্লিচিং পাউডার মুক্ত বায়ুতে রাখিয়া দিলে তাহা হইতে ধীরে ধীরে ক্লোরিন্ নির্গত হয়। ব্লিচিং পাউডারের জলে কাপড় ভিজাইয়া বায়ুতে রাখিয়া দিলে তাহা হইতে ধীরে ক্লোরিন্ নির্গত হয়। এই ক্লোরিনই জীবাণু নষ্ট করিয়া স্বাস্থ্যের সহায়তা করে। বায়ুতে যে কার্ব্বন দ্বি অক্সাইড্ বাষ্প থাকে তাহা এসিড্ স্বরূপে কার্য্য করে। কার্ব্বন্ দ্বি অক্সাইড্ বাষ্প ব্লিচিং পাউডারে লাগিয়া ক্লোরিন্ বহির্গত হয় ও খড়িমাটি প্রস্তুত হয়।

বিজ্ঞানাগারে ব্লিচিং পাউডার হইতে ক্লোরিন্ প্রস্তুত হয় না। একটী সরু

মুখ বিশিষ্ট কাচ পাত্রে ম্যাঙ্গনিজ দ্বি অক্সাইড্ ও হাইড্রোক্লোরিক এসিড্ মিশাইয়া উত্তাপ দিলে ক্লোরিন্ নির্গত হয়। ইটের টুক্‌রা তুতের জলে ভিজাইয়া শুকাইয়া নিয়া যদি তাহাতে ৪০০° সেণ্টিগ্রেট উত্তাপ দেওয়া যায় এবং যদি ঐ উত্তপ্ত ইটের টুকরার মধ্য দিয়া বায়ু মিশ্রিত হাইড্রোক্লোরিক এসিড্ বাষ্প চালাইয়া দেওয়া যায় তবে ক্লোরিন্ বাষ্প বহির্গত হয়। হাইড্রোক্লোরিক এসিডে এক ভাগ হাইড্রোজেন ও এক ভাগ ক্লোরিন্ আছে।

পোটাসিয়াম ক্লোরেট প্রস্তুত করিতে ক্লোরিন্ বাষ্পের প্রয়োজন হয়। পোটাসিয়াম ক্লোরেটে দুই ভাগ পোটাসিয়াম ধাতু এক ভাগ ক্লোরিন ও তিনভাগ অক্সিজেন আছে। পোটাসিয়াম ক্লোরেট হইতে অক্সিজেন অতি সামান্য উত্তাপে বাহির হইয়া আইসে। কোন দাহ্য পদার্থের সহিত পোটাসিয়াম ক্লোরেট মিশাইয়া আঘাত করিলে অক্সিজেন বাহির হয় ও সমস্তটা একেবারে ফাটিয়া যায়। এই পটাস ও মনঃশিলা ও ইটের টুক্‌রা একত্র কাগজে বান্ধিয়া কোনও শক্ত জিনিষে আঘাত করিলে বিস্ফোটন শব্দ হয়।

কষ্টিক পটাস অথবা পোটাসিয়াম কার্ব্বণেটের জলে ক্লোরিন্ বাষ্প প্রবেশ করাইলে পোটাসিয়াম ক্লোরেট প্রস্তুত হয়। এই জলে পোটাসিয়াম ক্লোরেট ও পোটাসিয়াম ক্লোরাইড মিশ্রিত থাকে। পোটাসিয়াম ক্লোরাইড্ পোটাসিয়াম ক্লোরেট অপেক্ষা জলে অধিকপরিমাণে মিশে। এজন্য ঐ জলে উত্তাপ দিয়া ঠাণ্ডা করিলে পোটাসিয়াম ক্লোরেট অগ্রে বাহির হইয়া আইসে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছি যে হাইড্রোক্লোরিক এসিডে্ একভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ ক্লোরিন্ আছে। এই হাইড্রোজেনকে বাষ্পীয় ধাতু বলা যায়। এই হাইড্রোজেনের স্থানে অন্যান্য ধাতু বসিয়া থাকে। যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড্ লবণ, পোটাসিয়াম ক্লোরাইড্, এমোনিয়াম ক্লোরাইড্ সিলভার ক্লোরাইড্, মার্কারি ক্লোরাইড্. কেলোমেল, গোল্ড ক্লোরাইড্ ইত্যাদি।

লবণ পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণে আছে। অতএব ক্লোরিনও প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। কিন্তু লবণ হইতে ক্লোরিন একবারে প্রস্তুত করিবার প্রণালী এখনও আবিষ্কার হয় নাই। লবণের মধ্যে সলফিউরিক এসিড দিলে হাইড্রো ক্লোরিক অথবা মিউরিয়াটিক্ এসিড্ বাষ্প নির্গত হয় এবং এই হাইড্রোক্লোরিক এসিড্ হইতে ক্লোরিন প্রস্তুত হইয়া থাকে।

লবণের সাহায্যে পোটাসিয়াম ক্লোরাইড্ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। কষ্টিক পোটাসের জলে চর্ব্বি জাল দিলে সাবান প্রস্তুত হয়। এই সাবান নরম সাবান।

এই সাবানের জলে লবণ দিলে সোডা সাবান শক্ত সাবান প্রস্তুত হয় এবং জলে লবণের স্থলে পোটাসিয়াম ক্লোরাইড্ পাওয়া যায়। সমুদ্রের জলে লবণের সঙ্গে কিছু কিছু পোটাসিয়াম ক্লোরাইড্ থাকে। পোটাসিয়াম ক্লোরাইডে লবণ অপেক্ষা বায়ু হইতে অধিক জল ধরে এজন্য লবণ শুষ্ক রাখিতে হইলে লবণ হইতে পোটাসিয়াম ক্লোরাইড্ ছাড়াইয়া নিতে হয়।

এসিডে পারদ ফেলিলে নাইট্রেট অব মার্কারি প্রস্তুত হয়। নাইট্রিক এসিডে্ রূপা ফেলিলে নাইট্রেট অব সিল্‌ভার (কষ্টিক) প্রস্তুত হয়। নাইট্রেট অব মার্কারির জলে লবণ দিলে সাদা ক্লোরাইড্ অব মার্কারি বাহির হইয়া আইসে। রূপার কষ্টিকের জলে লবণ দিলে সাদা সিলভার ক্লোরাইড বাহির হইয়া আইসে। এই সিলভার ক্লোরাইডে আলো লাগিবা মাত্র কাল হইয়া যায়। সিলভার ক্লোরাইডে এই গুণ থাকাতে ফটোগ্রাফিতে ব্যবহৃত হয়।

নাইট্রিক এসিড্, সলফিউরিক এসিড্ অথবা হাইড্রোক্লোরিক এসিড্ কোন এসিডই সোনা আক্রমণ করে না। কিন্তু হাইড্রোক্লোরিক এসিড্ ও নাট্রিক এসিড্ সমভাগে মিশাইলে নাইট্রোমিউরিয়াটিক এসিড্ প্রস্তুত হয়। তাহাতে সোনা মিশাইয়া গোল্ড্ ক্লোরাইড প্রস্তুত হয়। গোল্ড্ ক্লোরাইড ঔষধও ফটোগ্রাফিতে ব্যবহৃত হয়।

হাইড্রোক্লোরিক বা মিউরিয়াটিক্ এসিড্ যোগে অনেক ধাতু হইতে ক্লোরাইড্ প্রস্তুত হয়। হাইড্রোক্লোরিক এসিডে টিন কি রাঙ্গ নিক্ষেপ করিলে ষ্টেনাস ক্লোরাইড্ প্রস্তুত হয়। এই ষ্টেনাস ক্লোরাইড্ কাপড়ে লাগাইয়া কতকটা পাকা রং দেওয়া হইয়া থাকে।

নিশাদলে চূণ মিশাইয়া তাপ দিলে ব্লিচিং পাউডার প্রস্তুত হয়। চূণের মধ্যে ক্লোরিন্ প্রবেশ করাইয়া সাধারণতঃ উহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। খড়িমাটিতে হাইড্রোক্লোরিক এসিড্ দিলে কেলসিয়াম ক্লোরাইড্ প্রস্তুত হয়। তাহা স্বতন্ত্র জিনিস। ক্লোরিন্ বাষ্পের ভিতর মোমের বাতি রাখিলে প্রচুর পরিমাণে অঙ্গার বাহির হইয়া পরে। ক্লোরিন্ বাষ্পের ভিতর ফসফরস প্রবেশ করাইলে উজ্জ্বল আলো ছড়াইয়া জ্বলিতে থাকে।

ক্লোরিন্ প্রস্তুত করিতে সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে ক্লোরিন্ প্রাণ নাশক। ক্লোরিন্ বাষ্পে কীট পতঙ্গ অতি দ্রুত মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মজুমদার।

আরতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

অষ্টম বর্ষ। } ময়মনসিংহ, কার্ত্তিক, ১৩১৬। { ১১শ সংখ্যা।

প্রাচীন ভারতের শিল্প ও স্থাপত্য।

অতি প্রাচীনকালে ভারতীয় শিল্পের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা সম্যক্ অবগত হইবার উপায় নাই; কারণ সে সকল যুগের ইতিহাস-প্রদীপ নির্ব্বাপিত। যে সকল অত্যাশ্চর্য্য গুহা-চিত্র, খোদিত শিলা-লিপি, প্রস্তর-স্তূপ প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা সকলই বৌদ্ধযুগের। বৌদ্ধযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও মন্দির, মূর্ত্তি প্রভৃতি অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে আমাদিগের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য প্রাচীন গ্রন্থাদির উপর নির্ভর করিতে হইবে।

বৈদিক যুগ।

বেদ হিন্দুদিগের সর্ব্বপ্রধান এবং প্রাচীনতম ধর্ম্মগ্রন্থ। পৃথিবীতে অপর কোনও জাতির এরূপ প্রাচীন গ্রন্থ নাই। বেদে সিন্ধুতীরবাসী প্রাচীন আর্য্যজাতির সূক্ষ্মশিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। আর্য্যগণ কোন্ সময়ে হিন্দুকুশ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া সিন্ধুতীরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত কালনিরূপণ করা কঠিন। এ বিষয়ে ঐতিহাসিকগণের মত পরস্পর বিরোধী। কেহ কেহ বলেন, খ্রীষ্টজন্মের চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যগণ সিন্ধুতীরে আগমন করেন। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ২০০০ পূঃ খৃঃ হইতে ১৪০০ পূঃ খৃঃ পর্য্যন্ত বৈদিককাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (১) হুইলার সাহেব

(১) Civilization in Ancient India (R. C. Dutt) P.6

কোনও সময় নিরূপণ করিতে অক্ষম হইয়া লিখিয়াছেন—"অতি প্রাচীন কালে আর্য্যগণ পঞ্জাব প্রদেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন।" (১)

বৈদিক যুগের সময় নির্দ্ধারণের ব্যর্থ প্রয়াস না করিয়া, সেই স্মরণাতীত কালেও হিন্দুগণ শিল্পবিষয়ে কিরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, আমরা তাহারই আভাস প্রদান করিব। সে সময়ে চর্ম্ম ও পশমদ্বারা বস্ত্র নির্ম্মিত হইত, সুবর্ণ ও রৌপ্যদ্বারা নানারূপ অলঙ্কার প্রস্তুত হইত, এবং লৌহ বা অন্য কোন প্রকার কঠিন ধাতুদ্রব্যদ্বারা তীক্ষ্ণ অস্ত্রাদি নির্ম্মিত হইত। ঋগ্বেদে গলদেশে পরিধেয় সুবর্ণের 'নিষ্ক' ও 'স্রকেম' উল্লেখ আছে এবং বক্ষস্থলে পরিধেয় 'রুক্ম', হস্ত ও পদে পরিধেয় 'খাদি' এবং শিরোদেশে পরিধেয় হিরণ্ময় শিপ্রের উল্লেখ আছে। অস্ত্র সমূহের মধ্য শিরস্ত্রাণ, বর্ম্ম, বর্শা, খড়্গ, তীর এবং ধনুক প্রভৃতির উল্লেখ আছে। যুদ্ধ সময়ে সুসজ্জিত ঘোটক, রথ ও শকট ব্যবহৃত হইত। ঋগ্বেদে উল্লেখ আছে যে তৎকালে আর্য্যগণ অট্টালিকা, এবং সমুদ্র গমনের উপযোগী জলযান নির্ম্মাণ করিতে জানিতেন। ঋগ্বেদে স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, তন্তুবায়, সূত্রধর প্রভৃতি শিল্পীর কার্য্যের উল্লেখ আছে। তৎকালে আর্য্যগণ কৃষিকার্য্য ও পানাদির জন্য কূপ খনন করিতেন এবং কূপ হইতে জল উত্তোলনের জন্য ঘটিচক্র নামক যন্ত্র ব্যবহার করিতেন।

রামায়ণী যুগ।

রামায়ণী যুগে ভারতবর্ষে শিল্প ও স্থাপত্য বিষয়ে কিরূপ আশ্চর্য্য উন্নতি হইয়াছিল, বাল্মীকির রামায়ণে তাহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহর্ষি বাল্মীকি দশরথ ও রামের সমসাময়িক ছিলেন, সুতরাং তাঁহার উক্তি নিঃসন্দিগ্ধভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। রামায়ণের আদিকাণ্ডে অযোধ্যানগরীর এইরূপ বর্ণনা আছে—"সরযূতীরে নিবিষ্ট, প্রমোদান্বিত, প্রভূত ধনধান্যশালী অতিবৃহৎ ও উত্তরোত্তর-বর্দ্ধমান কোশলনামক জনপদে সর্ব্বলোকবিখ্যাতা অযোধ্যানাম্নী নগরী আছে। যে নগরীকে মানবেন্দ্র মনু স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; যে মহাপুরী সুবিভক্ত মহাপথে শোভিতা, দ্বাদশ-যোজনায়তা ত্রিযোজন-বিস্তৃতা ও অতিশয় শোভাবতী এবং যাহার সুন্দর সুবিভক্ত বৃহৎ বৃহৎ

(১) The great Aryan race made their appearance in the Punjab at some period of remote antiquity (Wheeler's History of India Vol. I P. 43)

রাজপথসকল সর্ব্বদা জলসিক্ত ও বিকশিত-পুষ্প-বিকীর্ণ থাকিত। সেই নগরী কপাট তোরণান্বিতা, সুবিভক্ত-ক্ষুদ্রপথ-শোভিতা, সমস্ত যন্ত্র-সমন্বিতা অতুল প্রভাবতী, সর্ব্বায়ুধবতী ও অতি শ্রীমতী। তাহাতে সমস্ত শিল্পবিদ্যাবিশারদ ব্যক্তি এবং অনেক সূত ও মাগধ বাস করিত। তাহাতে ধ্বজশালী উচ্চ উচ্চ অট্টালক, শত শত শতঘ্নী, উদ্যান ও আম্রবন ছিল। তাহার সকল স্থানেই সীমন্তিনীদিগের নাট্যশালা ছিল। সেই নগরী গম্ভীরজল দুর্গম পরিখাদ্বারা পরিব্যাপ্তা থাকা প্রযুক্ত সকলেরই দুর্গম্যা; বিশেষতঃ শত্রুপক্ষ তাহার নিকটেও গমন করিতে পারিত না।"

এই বর্ণনা হইতে জানা যায় অযোধ্যানগরী বর্ত্তমান যুগের কোনও সমৃদ্ধিশালী নগর হইতে কোনও বিষয়ে হীন ছিল না। ইহা হইতে আমরা আরও জানিতে পারি অতি প্রাচীনকালেও ভারতবর্ষে নানাবিধ যন্ত্র প্রস্তুত হইত এবং যে শতঘ্নী অস্ত্রের উল্লেখ আছে, তাহাতে বুঝা যায় যে হিন্দুগণ বর্ত্তমানকালের কামানের সমকক্ষ একপ্রকার অস্ত্র নির্ম্মাণে পারদর্শী ছিলেন। মহারাজ দশরথের রাজত্বকালে অযোধ্যানগরীতে বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্পীগণ বাস করিত; তাহাদের পরস্পর প্রতিযোগীতায় শিল্প কলার অশেষপ্রকার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। দশরথ পুত্রকামনায় অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করিলে বসিষ্ঠদেব যজ্ঞকার্য্যকুশল, সুধার্ম্মিক, প্রাচীন স্থপতি, শিল্পকর, ভৃত্য, খনক, নট, নর্ত্তক ও শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক প্রত্যেকের কার্য্য বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। মহারাজ দশরথের রাজত্বকালে অযোধ্যায় বহু প্রকার শিল্পের চর্চ্চা হইত, শিল্পের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন প্রকার শিল্পীর হাতে ন্যস্ত থাকিত। রাম বনবাসে প্রস্থান করিলেপর তাঁহাকে রাজধানীতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য ভরত অযোধ্যা হইতে বহুসংখ্যক লোক সহকারে বনগমন করিয়াছিলেন। যে সকল নগরবাসী ভরতের অনুগমন করিয়াছিলেন তাহাদের সম্বন্ধে অযোধ্যাকাণ্ডে এইরূপ বর্ণনা আছে:—"অযোধ্যানগরে যে সকল প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ বণিক ও রাজানুগত প্রজা বাস করিত, তাহারা সকলেই হর্ষাবিষ্ট চিত্তে রামের প্রতিগমন করিল এবং মণিকার, সুদক্ষ কুম্ভকার, সূত্রনির্ম্মাণদক্ষ তন্তুবায়, কর্ম্মকার, ময়ুরপুচ্ছনির্ম্মিত ব্যজনাদি ব্যবসায়ী, করপত্র (করাত)-ব্যবসায়ী, মণিমুক্তাদির ছিদ্রকার, কাচাদি নির্ম্মাণকার, দন্তব্যবসায়ী, সূপকার, গন্ধবণিক, বিখ্যাত স্বর্ণকার, কম্বলকার, স্নাপক (যাহারা স্নান করাইয়া দেয়), অঙ্গমর্দ্দক, বৈদ্য, ধূপজীবী, মদ্যকার, রজক,

সীবন কারক, গ্রাম ও আভীর পল্লীবাসী প্রধান প্রধান ব্যক্তি, নট ও কৈবর্ত্তগণ সকলে স্বস্ব স্ত্রীর সহিত গমন করিতে লাগিল।"

এই প্রকার উৎকৃষ্ট শিল্পীগণের যে স্থানে একত্র সমাবেশ সেই স্থান অতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইবে ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? উপরে অযোধ্যানগরীর যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা উহার বিশালতা, সুবিন্যস্ততা ও সমৃদ্ধির পরিচয় পাইয়াছি। অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ ও অট্টালিকা প্রভৃতি সম্বন্ধে বাল্মীকি কিরূপ বর্ণনা করিয়াছেন নিম্নে আমরা তাহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিব।

আদিকাণ্ডের সপ্তসপ্ততিতমসর্গে লিখিত আছে যে রামের বিবাহের পর মহারাজ দশরথ পুত্র ও পুত্রবধূগণকে সঙ্গে লইয়া হিমগিরিতুল্য শ্বেতকান্তি বিচিত্র আবাসে প্রবেশ করিলেন। অযোধ্যাকাণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে যে দশরথের রাজভবন "শরৎকালীন নিবিড় মেঘ সদৃশ ও কৈলাস শৃঙ্গতুল্য নানাপ্রকার মনোহর প্রাসাদশিখর এবং গগনস্পর্শী, বিমান তুল্য, পাণ্ডুর-বর্ণসম্পন্ন ও রত্নসমূহশোভিত ক্রীড়া-গৃহে শোভিত ছিল এবং পৃথিবীতে তাহার উপমার স্থান ছিল না।" (১৭শ সর্গ)

রাজপুরীতে প্রবেশের দ্বার সাতিশয় উচ্চ ও প্রশস্ত ছিল; সেই দ্বারের ভিতর দিয়া অশ্বযুক্ত রথ ও আরোহীসহ হস্তী যাতায়াত করিত। অযোধ্যা নগরীতে দ্বিতল ত্রিতল এমন কি ধনী ব্যক্তির সপ্ততল অট্টালিকাও ছিল। রামের বনগমনকালে শ্রীসম্পন্ন নাগরিক ব্যক্তিসকল প্রাসাদ, হর্ম্ম্য ও সপ্তভূমিক গৃহের উপরিভাগে আরোহণ করিয়া, ঔদাস্যযুক্ত হইয়া রামকে অবলোকন করিতে লাগিলেন, এইরূপ বর্ণনা আছে—

"ততঃ প্রাসাদ হর্ম্ম্যাণিবিমান শিখরাণি চ॥
অভিরুহ্য জনঃ শ্রীমানুদাসীনঃ ব্যলোকয়ৎ॥"

(অযোধ্যাকাণ্ড—৩৩ সর্গ)

রাজপুরীতে দ্বিতল, ত্রিতল, ও সপ্ততল নানাবিধ বিচিত্র অট্টালিকা ছিল। কৈকেয়ীর অন্তঃপুরের অতি সুন্দর বর্ণনা আছে; তাহা হইতে জানা যায় আবাসগৃহ সকল সজ্জিত করিতে তৎকালীন হিন্দুদিগের কিরূপ আগ্রহ ছিল, এবং সৌধ সকলও কিরূপ চিত্রিত করা হইত:—

"লতাগৃহৈশ্চিত্রগৃহৈশ্চম্পকাশোকশোভিতৈঃ
দান্ত রাজত সৌবর্ণ বেদিকাভি সমাযুতম্।"

অযোধ্যাকাণ্ডে রামের বাসভবনের যে বর্ণনা আছে তাহা অপূর্ব্ব শিল্পকুশলতার পরিচায়ক। আমরা দেখিতে পাই, রামের আলয় কৈলাসসদৃশ দ্যুতি সমন্বিত তাঁহার বাসভবন বৃহৎ কপাটযুক্ত, চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীরের উপরিভাগ শত শত বেদিকায় শোভিত এবং তাহাতে অনেক কাঞ্চননির্ম্মিত প্রতিমা স্থাপিতা, বহির্দ্বার মণি ও বিদ্রুমে খচিত। রাম-ভবনের ভিতরে প্রবিষ্ট হইলে অধিকতর শিল্প কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই প্রদীপ্ত ভবন মণি ও মুক্তা সমূহে সমাকীর্ণ এবং স্বর্ণনির্ম্মিত পুষ্পমাল্যদাম ও মহাদীপ্তিসম্পন্ন মণিগণে অলঙ্কৃত, তাহা চন্দন ও অগুরুগন্ধে সুবাসিত, সারস ও ময়ূরগণে বিরাজিত, সুবর্ণ প্রভৃতি ধাতুনির্ম্মিত বৃক সমূহে সমাকীর্ণ এবং সূত্রধরখোদিত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চিত্রযুক্ত কাষ্ঠফলকে শোভিত। অযোধ্যাকাণ্ডের ষোড়শ সর্গে লিখিত আছে যে এই মনোহর ভবনে কুবের সদৃশ সম্যক অলঙ্কৃত রাম উৎকৃষ্ট আস্তরণে আচ্ছাদিত সুবর্ণ নির্ম্মিত পর্য্যঙ্কে সমাসীন রহিয়াছেন।

উপরে অযোধ্যানগরীর রাজপ্রাসাদ ও অন্যান্য হর্ম্ম্যাবলীর যে কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করা হইয়াছে, তাহাতেই অযোধ্যার স্থাপত্যশিল্পের উন্নতির প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু ঐতিহাসিক হুইলার সাহেব বলেন, অযোধ্যার চতুর্দ্দিক্‌বর্ত্তী প্রাচীর ইষ্টক বা প্রস্তর নির্ম্মিত ছিল না, সম্ভবতঃ তাহা কাষ্ঠ বংশাদি নির্ম্মিত সাধারণ বেষ্টনী মাত্র ছিল। (১) হুইলার সাহেবের এই ধারণা ভ্রান্তিপূর্ণ।

মহারাজ দশরথ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠকে নিমন্ত্রিত বিভিন্ন দেশীয় রাজগণের বাসোপযোগী গৃহাদি নির্ম্মাণের ভার অর্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন :—

"ইষ্টকা বহু সাহস্রী শীঘ্রমানীয়তামিতি।" (২)

বালকাণ্ডের চতুর্দ্দশ সর্গে মহারাজ দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞের যে বিস্তৃত বর্ণনা আছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, "এই যজ্ঞে যে পরিমাণ ইষ্টকের প্রয়োজন, তাহা প্রস্তুত হইয়াছিল, শিল্পনিপুণ যাজ্ঞিকগণ ঐ ইষ্টকে অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিলেন। ঐ কুণ্ডের প্রত্যেক স্তর ইষ্টকরচিত হইল; বিপ্রগণ তাহাতে বহ্নি স্থাপন করিলেন।" যে স্থানে যজ্ঞাদি অস্থায়ী ক্রিয়ানুষ্ঠানে ইষ্টকের ব্যবহার হইত, এবং অস্থায়ী আবাস গৃহাদি ইষ্টক নির্ম্মিত হইত, সে স্থানে

(১) Wheeler's Ramayana P. 8

(২) বালকাণ্ডম্ ১৩শ সর্গ

অযোধ্যার ন্যায় বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী-নগরীতে, মহারাজ দশরথের দ্বিতল, ত্রিতল, সপ্ততল প্রাসাদাবলীর চতুর্দ্দিকবর্ত্তী প্রাচীর ইষ্টক নির্ম্মিত ছিল না, তাহা কাষ্ঠ বা শাদি নির্ম্মিত সাধারণ বেষ্টনী মাত্র ছিল, এইরূপ কল্পনা নিতান্তই হাস্যোদ্দীপক সন্দেহ নাই। খৃষ্টজন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয়েরা স্থাপত্য শিল্পে এইরূপ উৎকর্ষ ও প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন ইহা বোধহয় হুইলার সাহেব বিশ্বাস করিতে অনিচ্ছুক।

লঙ্কাপুরী অযোধ্যানগরী হইতে আরও অধিক ঐশ্বর্য্যশালী ছিল; প্রাকার তোরণ ও অট্টালিকাসমূহে সেই সমুদ্রবেষ্টিতা নগরী পরম সমৃদ্ধি ও নিরতিশয় সৌভাগ্যশালিনী ছিল। সুন্দরকাণ্ডে লঙ্কার বর্ণনায় লিখিত আছে যে লঙ্কার দ্বারসকল স্বর্ণ এবং মণিস্ফটিকমুক্তা ও বৈদূর্য্যময় এবং সোপানশ্রেণী স্ফটিকময়। "চারিদিকে অত্যুচ্চ গৃহশ্রেণী সন্নিবিষ্ট থাকাতে বোধ হইত, লঙ্কা যেন আকাশ স্পর্শ করিয়াছে এবং হীরক-খচিত গবাক্ষ পরিবৃত ও বজ্রাঙ্কুশ প্রতিম গৃহ সমূহের সান্নিধ্য বশতঃ, মেঘমালা বিরাজিত আকাশ মণ্ডলের ন্যায় লঙ্কা নগরী শোভা পাইত।" রাবণের গৃহ "পর্ব্বত শেখরে প্রতিষ্ঠিত, শ্বেতপদ্ম শেখরে শোভিত, পরিখাবলয় বেষ্টিত, অতি উচ্চ প্রাকারে বেষ্টিত, সাক্ষাৎ স্বর্গ সদৃশ দিব্যভাবে অলঙ্কৃত ছিল।" রাবণের অন্তঃপুরে "প্রাকার মণ্ডল সপ্তবর্ণ স্বর্ণ খচিত ষোড়শ বর্ণ সুবর্ণে বিনির্ম্মিত, শিরোভাগ মহামূল্য মুক্তা মণি সমূহে সুশোভিত এবং অত্যুৎকৃষ্ট কৃষ্ণবর্ণ অগুরু চন্দন গন্ধে সুবাসিত" ছিল। লঙ্কা নগরীতেও সপ্ততল প্রাসাদের উল্লেখ দেখা যায়।

রাবণের সভামণ্ডপ অতিশয় সুন্দর ছিল। কথিত আছে যে শিল্পীবর বিশ্বকর্ম্মা ইহার নির্ম্মাণ কর্ত্তা। "উহার কুট্টিম প্রদেশ স্বর্ণ ও রৌপ্যে সংগ্রথিত, মধ্যস্থলে শুদ্ধ স্ফটিকস্বর্ণময় উত্তম ছাদ। রাজার উপবেশন জন্য মরকত-ময় উৎকৃষ্ট আসন বিন্যস্ত, উহা সুকোমল মৃগচর্ম্ম-বিমণ্ডিত এবং উপাধান বিশিষ্ট। রাবণের মস্তকে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বিমল রাজচ্ছত্র। তদীয় দক্ষিণ ও বামদিকে স্বর্ণমঞ্জরীপূর্ণ শুদ্ধ স্ফটিকধবল চামরদ্বয় ব্যজন করিতেছে।"

লঙ্কার বর্ণনায় অনেকবার "স্ফটিকের" উল্লেখ দেখা যায়। অযোধ্যাকাণ্ডেও অযোধ্যার পথিপার্শ্বস্থিত যে সকল বিপণির উল্লেখ আছে তাহা "বহুবিধ পণ্যদ্রব্যে সমাকুল, এবং নিশ্ছিদ্র মুক্তা, উত্তম স্ফটিক পট্টবস্ত্র ও কৌশাম্বর সমূহে শোভিত" বলিয়া লিখিত আছে। সুতরাং রামায়ণী যুগ হইতে এদেশে

কাচনির্ম্মাণ প্রথা প্রচলিত আছে তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে

রামায়ণে বহুবিধ অলঙ্কারের নাম পাওয়া যায়। কৈকেয়ীর পরিচারিকা কুব্জা, রশনা অর্থাৎ চন্দ্রহার ব্যবহার করিত, কৈকেয়ী নিজে বহুমূল্য মুক্তাহার ও বহুমূল্য সুন্দর আভরণসকল গাত্রে ধারণ করিতেন বনগমন করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে রাম তাঁহার সমস্ত ধনরত্ন ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বসিষ্ঠপুত্র সুযজ্ঞকে স্বর্ণময় অঙ্গদ অর্থাৎ বাজু মনোহর কুণ্ডল, হেমসূত্রে গ্রথিত মণিমালা, কেয়ুর, বলয় ও অনেক ধনরত্ন দান করিয়া বলিয়াছিলেন "হে শুভদর্শন! আপনার সখী সীতা দেবী বনগমনে উদ্যতা হইয়া আপনার ভার্য্যাকে হার হেমসূত্র, রশনা, বিচিত্র অঙ্গদ, মনোহর কেয়ূর ও নানা রত্ন বিভূষিত শ্রেষ্ঠ আস্তরণ সম্বলিত পর্য্যঙ্ক প্রদান করিতেছেন; আপনি ভৃত্যদ্বারা তাঁহার নিকট তৎসমুদায় প্রেরণ করুন। হে দ্বিজবর! মদীয় মাতুল আমাকে এই শত্রুঞ্জয়নামা হস্তী প্রদান করিয়াছিলেন; আমি সহস্র নিষ্কের সহিত ইহা আপনাকে দান করিতেছি এই নিষ্ক শব্দে বুঝা যায় তৎকালে স্বর্ণ মুদ্রার বহুল প্রচলন ছিল। রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ কালে সীতাদেবী বহু অঙ্গাভরণ পথিমধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন। তাহাতেও স্বর্ণ নির্ম্মিত নানাবিধ অলঙ্কারের পরিচয় পাওয়া যায়—

"চরণান্নূপুরং ভ্রষ্টং বৈদেহ্যা রত্নভূষিতম্।
বিদ্যুন্মণ্ডলসঙ্কাশং পপাত ধরণীতলে"॥ (১)

"তৎকালে জানকীর চরণ হইতে রত্ন ভূষিত নূপুর ভ্রষ্ট হইয়া বিদ্যুন্মণ্ডলের ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইল। অগ্নিবর্ণ শব্দায়মান ভূষণ সমস্ত তদীয় দেহ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল। বোধ হইল যেন তারকাস্তবক গগন হইতে বিচ্যুত হইতেছে। দীপ্তিবিশিষ্ট হারগুচ্ছ গগনভ্রষ্ট গঙ্গার ন্যায় শোভা বিস্তার করতঃ পতিত হইতে লাগিল। সীতা যাইতে যাইতে গিরিশৃঙ্গে উপবিষ্ট প্রধান প্রধান পাঁচটী বানরকে দর্শন করিলেন। তাহারা রামকে এই ঘটনা বলিতে পারে এই আশায় তিনি তাহাদের মধ্যে আপনার সুবর্ণপ্রভ কৌশেয় উত্তরীয় ও সুন্দর অলঙ্কার সকল নিক্ষেপ করিলেন।"

(১) আরণ্যকাণ্ড ৫২ সর্গ।

লঙ্কার রাক্ষসদিগের মধ্যেও নানাবিধ মণি মুক্তা ও স্বর্ণ নির্ম্মিত আভরণ ব্যবহৃত হইত। রাবণের পত্নীগণের এবং অন্যান্য রাক্ষসিদিগের বহু অলঙ্কারের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাক্ষসরাজ স্বয়ং গাত্রে বহুমূল্য আভরণ পরিধান করিতেন ও মণিমুক্তাবিরাজিত কাঞ্চনমুকুট ধারণ করিতেন।

কৈকেয়ীর অন্তঃপুরে গজদন্তনির্ম্মিত আসন ছিল। দশরথের মহিষীগণ আভরণ মাল্য, চন্দন, অঞ্জন প্রভৃতি দ্বারা নিজ নিজ দেহের প্রসাধন করিতেন।

অযোধ্যা নগরীতে রেশমী কাপড়ের বহুল প্রচলন ছিল। কৈকেয়ীর দাসী মন্থরার পরিধানে ক্ষৌমবাস অর্থাৎ রেশমী কাপড়ের উল্লেখ আছে। বনগমন কালে রাম ও সীতা গুহকের পুরীতে ইঙ্গুদী বৃক্ষ তলে তৃণ শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। সেই শয্যা অবলোকন করিয়া ভরত বলিতেছেন—

মন্যে সাভরণা সুপ্তা সীতাস্মিঞ্ছয়নে শুভা।
তত্রতত্রহি দৃশ্যন্তে সক্তাঃ কনকবিন্দবঃ॥
উত্তরীয়মিহাসক্তং সুব্যক্তং সীতয়া তদা।
তথাহ্যেতে প্রকাশন্তে সক্তাঃ কৌশেয় তন্তবঃ॥ (১)

"কল্যাণী সীতাও অলঙ্কৃত হইয়া এই শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, বোধ হইতেছে; কেন না ইহার সর্ব্বত্রই স্বর্ণকণাসকল সংলগ্ন দৃষ্ট হইতেছে। সীতার উত্তরীয় যে ইহাতে সংলগ্ন ছিল, তাহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে, কেন না রেশমের সূতা সকল উহাতে সংলগ্ন হইয়া শোভা পাইতেছে।" এই সরস বর্ণনা হইতে আমরা বুঝিতে পারি পূর্ব্বকালে স্বর্ণ ও রেশমের কিরূপ স্বচ্ছন্দ ব্যবহার হইত।

ভরত ও তাঁহার সঙ্গীয় লোকজনদিগকে গঙ্গা পার করিয়া দিবার জন্য গুহ কতিপয় সুন্দর নৌকা আনয়ন করিয়া ছিলেন; ঐ সকল নৌকার নাম "স্বস্তিক," তাহা অনেক বিষয়ে বর্ত্তমানকালের বজরার ন্যায় ছিল। ঐ সকল নৌকা সুবর্ণরঞ্জিত চিত্রসমূহ দ্বারা অতিশয় শোভাবিশিষ্ট, শত শত দণ্ড ও নাবিকসমন্বিত; উহাদের সন্ধিবন্ধসকল অতিশয় দৃঢ় এবং উহাদের পতাকাসকলে বৃহৎ ঘণ্টা লম্বিত ছিল।

রাজা জনক কন্যাগণকে বিবাহের সময় স্ত্রীধন স্বরূপে যে সকল বহুমূল্য রত্ন ও অলঙ্কার প্রদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দিব্য কম্বল ও ক্ষৌম

---

(১) অযোধ্যাকাণ্ড ৮৮ সর্গ।

যন্ত্রের উল্লেখ আছে। রামের বিবাহের সময় দশরথ মিথিলা নগরীতে উপস্থিত হইয়া পটমণ্ডপে বাস করিয়া ছিলেন, সুতরাং পট্টাবাসও যে বহুকাল যাবৎ এদেশে প্রচলিত আছে ইহা তাহারই প্রমাণ।

রামের অভিষেক উপলক্ষে অযোধ্যানগরীর পথ ঘাট অতি সুন্দর রূপে সজ্জিত হইয়াছিল। "শুভ্র মেঘবৎ দেবগৃহ, চতুষ্পথ, রথ্যা, অট্টালিকা, চৈত্য, পণ্যপরিপূর্ণ বিপণি, সুসমৃদ্ধ লোকালয়, সভা ও অত্যুন্নত বৃক্ষে পতাকা সকল স্থাপিত হইতে লাগিল।" রাত্রিকালে নগর পরিভ্রমণ জন্য বৃক্ষাকার দীপস্তম্ভ সকল প্রস্তুত হইল। নগরীর তোরণ সকল বিচিত্র মাল্যে অলঙ্কৃত ও সমস্ত গৃহ ধ্বজদণ্ডে বিশোভিত হইল।

রামায়ণে বীণা, ডমরু, পটহ, বিপঞ্চী, মৃদঙ্গ, ডিম্‌ডিম্, আড়ম্বর যন্ত্র প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্রের উল্লেখ আছে।

লঙ্কা বিজয়ের পর রাম পুষ্পক রথে আরোহণ করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেই রথ অতি বিশাল ছিল, কারণ সমস্ত কপিসৈন্য সহিত রাম লক্ষ্মণ সীতা বিভীষণাদি তাহাতে আরোহণ করিয়াছিলেন। সেই রথের সাজসজ্জা ও কারুকার্য্য অতি আশ্চর্য্য ছিল, লঙ্কাকাণ্ডের শেষ ভাগে তাহার সুন্দর বর্ণনা আছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রায়।

দেব-টিকা সম্প্রদায়।

গতবৎসর শরৎকালে একদিন প্রাতে বিখ্যাত কন্‌সাল্টিং ডিটেক্‌টিভ্ কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম তিনি একটী ভদ্রলোকের সহিত আলাপ করিতেছেন। লোকটির কপালে একটি সুবৃহৎ তিল। অনধিকার প্রবেশের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলে কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু আমাকে টানিয়া একখানি চেয়ারে বসাইয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন এবং তৎপরে সাদরে বলিলেন, "ডাক্তার তুমি ঠিক সময়ে আসিয়াছ।"

আমি বলিলাম, "আমি মনে করিয়াছিলাম আপনি কার্য্যে ব্যস্ত আছেন";

"প্রকৃতই আমি ব্যস্ত আছি"—

"তবে আমি পাশের ঘরে অপেক্ষা করি ;"

"আদপেই নয়"; কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু ভদ্রলোকটিকে বলিলেন, "সুরেন্ বাবু, ইনি অনেক রহস্যোৎঘাটনে আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন ; আমি নিঃসন্দেহে বলিতেপারি যে আপনার 'কেস্'টিতেও ইনি আমার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইবেন ;"

লোকটি চেয়ার হইতে উঠিয়া আমাকে নমস্কার করিল এবং তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে একবার চাহিল।

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু গম্ভীরভাবে আমাকে বলিলেন, এই ভদ্রলোকটীর নাম সুরেন্দ্রনাথ সেন, ইনি পরামর্শের জন্য আমার নিকট আসিয়াছেন ; তাঁহার কেস্টির মোটামুটি বিবরণ শুনিয়াছি ; ইনি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে ইঁহার 'কেস্'টি নূতন ধরণের মনে হইল। কিন্তু ইহার ভিতরে হত্যাকাণ্ড' 'গুপ্তপ্রেম' ইত্যাদির সংযোগ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। সুরেন্ বাবু যদি অনুগ্রহ করিয়া ঘটনাটি বিস্তৃতভাবে বলেন তবে বড়ই অনুগৃহীত হইব ; ঘটনাটি যে প্রকার বৈচিত্র্যময় তাহাতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সকল কথা আপনার নিকট হইতে শ্রবণ করা আবশ্যক ; আমার হাতে বহু 'কেস্' এর ভার পড়ায় সমাজ সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে ; একটী ঘটনার অভিজ্ঞতার সাহায্যে আর একটী ঘটনা কতক পরিমাণ অনুমান করিয়া লইতে পারা যায় কিন্তু বর্ত্তমান ঘটনা সম্বন্ধে আমি বলিতে বাধ্য যে ইহা সম্পূর্ণ অভিনব।"

আগন্তুক গর্ব্বভরে চক্ষু সমুন্নত করিল ও তাহার বৃহৎ পকেট হইতে একখানি জীর্ণ মলিন খবরের কাগজ বাহির করিয়া বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠার উপর চক্ষু বুলাইতে লাগিল ; ইত্যবসরে আমি তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম ; কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর প্রণালীতে তাহার আকার প্রকার দেখিয়া কিছু অনুমান করা যায় কি না তাহাই দেখিতে লাগিলাম, বস্তুতঃ আমি কিছুই অনুমান করিতে সমর্থ হইলাম না ; লোকটির বয়স চল্লিশের কম হইবে না, দেখিতে সাধারণ বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মতই ; পরণে মোটা থান, গায়ে মলিন সার্ট, ও পায়ে জুতা ; বিশেষত্বের মধ্যে তাহার কপালে একটী সুবৃহৎ তিল ; কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু আমার মনোভাব বুঝিয়া হাসিয়া বলিলেন, "এর সম্বন্ধে বলিতে পারি, ইনি কোনও সময়ে শারীরিক পরিশ্রম করিয়াছেন, নস্য ব্যবহার করিয়া থাকেন, একবার বর্ম্মায় গিয়াছিলেন এবং অল্পদিন হইল অনেকটা লিখিতে হইয়াছে ; ইহা ব্যতীত আর কিছুই বলিতে পারিব না।"

ভদ্রলোকটি চমৎকৃত হইয়া কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর দিকে চাহিয়া রহিল, পরে বিস্মিত হইয়া বলিল, "ঈশ্বরের দোহাই, কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু, আপনি এ সকল কথা কিরূপে অবগত হইলেন বলুন; প্রথমে শারীরিক পরিশ্রম করিবার কথা; ইহা প্রকৃতই সত্য; আমি কিছুদিন বর্ম্মায় কাঠের কাজ করিয়াছিলাম;"

"আপনার হস্তদ্বয় হইতে এ অনুমান করিয়াছি, সুরেন্ বাবু; আপনার দক্ষিণ হস্তটি বাম হস্ত হইতে ঈষৎ বৃহত্তর; দক্ষিণ হস্তদ্বারা কোনও পরিশ্রমের কাজ করায় উহা এইরূপ পুষ্টিলাভ করিয়াছে।"

"বেশ, কিন্তু নস্যের কথা এবং বর্ম্মায় যাওয়ার কথা?"

"আপনার সার্টে কতকটা নস্যের গুঁড়া লাগিয়া আছে; আর আপনার বাম করতলে নীল বর্ণের মৎস্যটি অঙ্কিত রহিয়াছে উহা হইতে আমার শেষোক্ত অনুমান;—উহা বর্ম্মার কোনও বিশেষ স্থানে অঙ্কিত হইয়া থাকে; আমি বর্ম্মায় গিয়াছিলাম কি না তাহাতেই উহা সহজে ধরিতে পারিয়াছি।"

"যাক্,—কিন্তু লেখার কথা?"

"আপনার সার্টটির দক্ষিণ হস্তের আস্তিন ও বাম হস্তের কনুইএর নিকট অত্যন্ত মলিন, অপরিষ্কৃত ডেস্কে অনেকক্ষণ লিখিলে সার্টের গায়ে এইরূপ দাগ বসে;"

আগন্তুক হাসিয়া বলিল "আমি পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম যে কথাগুলি বলিতে আপনার খুবই বাহাদুরি আছে কিন্তু দেখিতেছি উহা কিছুই নয়;"

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিলেন "দেখ ডাক্তার, আমার অনুমান করিবার কারণগুলি সর্ব্বসাধারণকে জানান সঙ্গত নয়, ইহাতে আমার ব্যবসায়ের ক্ষতি হইতে পারে।—কি সুরেন বাবু, এখনও বিজ্ঞাপনটি বাহির করিতে পারিলেন না?"

সুরেন্দ্র বাবু খবরের কাগজে একটি স্থানে অঙ্গুলিদ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, "হাঁ এতক্ষণে উহা বাহির করিতে সক্ষম হইয়াছি;—এই যে, ইহাই সমস্তের মূল; আপনি নিজেই দেখুন না, মহাশয়।"

আমি তাঁহার হাত হইতে কাগজখানি লইয়া পাঠ করিলাম, "**দেব-টিকা সম্প্রদায়**;—পঞ্জাবের বিখ্যাত "দেব-টিকা সম্প্রদায়ের" একজন সভ্যের মৃত্যু হওয়ায় সেই পদ খালি আছে; যাঁহাদের কপালে তিল আছে ও বয়স ২৫ বৎসর অপেক্ষা অধিক তাঁহারা শনিবার ১১টার সময়, ৭নং বোসপাড়া লেনে "দেব-টিকা সম্প্রদায়ের" কলিকাতাস্থ আফিসে স্বয়ং কর্ম্ম-প্রার্থী হইবেন;

মাসিক বেতন ১২০৲ টাকা; কার্য্য যতদূর সম্ভব লঘু ও সাধারণ। বিষ্ণুচরণ চক্রবর্ত্তী, কার্য্যাধ্যক্ষ।”

আমি ইহা দুইবার পাঠ সমাপন করিয়া বিস্ময়ের সহিত বলিলাম “এ সব কথার মানে কি?”

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু পা দুলাইতে দুলাইতে কহিলেন “ইহা সাধারণ ‘কেস’ হইতে একটু পৃথক ধরণের, নয় ডাক্তার?—সুরেন্দ্র বাবু আপনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সকল কথা খুলিয়া বলুন; আপনি কিরূপ অবস্থায় ছিলেন ও তৎপর ইহা পাইয়া আপনার ভাগ্যাকাশ কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইল ইত্যাদি কিছুই গোপন করিবেন না। ডাক্তার তুমি প্রথমে কাগজখানি এবং উহার তারিখ লক্ষ্য কর।

“ইহা ১৩১৫ সনের ২০শে ভাদ্রের বসুমতী” “বেশ; তারপর সুরেন্দ্র বাবু আপনার বক্তব্য আরম্ভ করুন;”

(২)

সুরেন্দ্র বাবু বলিতে লাগিলেন, “ক্লাইভ্ ষ্ট্রীটের নিকটে আমার একটি ক্ষুদ্র বাড়ী আছে; তথায় আমি টাকার কারবার চালাই; মূল্যবান জিনিস বন্ধক পাইলে এবং সুদের বন্দোবস্ত উত্তম হইলে কাহাকেও টাকা ধার দিতে আপত্তি করি না; ইহাদ্বারা যে আমার খুব লাভ হয় তাহা নহে; কোনও প্রকারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয় মাত্র; পূর্ব্বে দুইজন গোমস্তা রাখিয়াছিলাম, অর্থের অসচ্ছলতায় এক জনকে বিদায় দিয়াছি, অবশিষ্ট লোকটিকেও বিদায় দিতাম কিন্তু সে কাজ শিখিবার জন্য অর্দ্ধ বেতনেই থাকিতে স্বীকৃত হওয়ায় তাহাকে রাখিয়াছি।

“এই যুবকটির নাম কি?”

“তাহার নাম যোগজীবন দত্ত; তাহাকে নেহাৎ ‘যুবক’ বলা যায় না; তাহার বয়স ঠিক নির্দ্দেশ করা শক্ত। উহার ন্যায় চতুর লোক আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।—সে যে প্রকার বুদ্ধিমান তাহাতে অনায়াসেই যাহা পায় তাহার দ্বিগুণ উপার্জ্জন করিতে পারে,—কিন্তু সে দিকে তাহার একেবারেই দৃষ্টি নাই; আমিও তাহাকে সে সকল কথা ভাবিবার অবকাশ দিই না।”

“সঙ্গত কার্য্যই করেন; আজকাল অর্দ্ধ বেতনে এরূপ চতুর লোক পাওয়া খুবই শক্ত; জানি না আপনার গোমেস্তাটি আপনার কথামত কাজের লোক কি না।”

“না মহাশয়, তাহার দোষও আছে; কাহার নিকট হইতে একটি ছবি

উঠাইবার যন্ত্র সংগ্রহ করিয়াছে, অবসরকাল কেবল ছবি তুলিয়াই কাটায়। সে কেবল অন্ধকার কুঠুরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঔষধ ঢালিয়া সময় নষ্ট করে। এই তাহার প্রধান দোষ; কিন্তু মোটের উপর লোকটি অতি উত্তম;—চরিত্রে কোনও দোষ নাই।"

"এখনও সে আপনার কাজ করিতেছে বোধ হয়?"

"হাঁ মহাশয়; সে এবং একটি বৃদ্ধা আমার গৃহে বাস করে; আমি বিপত্নীক কি না, কাজেই রন্ধন করিবার জন্য উক্ত বৃদ্ধাকে রাখিতে হইয়াছে; এই তিনজন ব্যতীত আমার গৃহে আর কেহ থাকে না।"

"প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে উক্ত গোমেস্তাটি একদিন প্রাতঃকালে এই 'বসুমতী' খানা আমাকে দিয়া কহিল, মহাশয় আমার কপালে যদি একটি তিল থাকিত তবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতাম।"

" 'কেন?'

" 'কেন? 'দেব-টিকা সম্প্রদায়ের' একটি পদ খালি হইয়াছে; এই পদ প্রাপ্ত হইলে খুব লাভ; আমার কপোলদেশে যদি তিল থাকিত তাহা হইলে আজ মহালাভবান হইতে পারিতাম, সন্দেহ নাই।'

"কেন কি হইয়াছে?"

"এইস্থানে একটী কথা বলিয়া লই; আমি সর্ব্বদা গৃহে থাকিতে ভালবাসি; এমন কি, এমন সময়ও যায় যখন ১০।১৫দিন পর্য্যন্ত বাড়ী হইতে একেবারেই বাহির হই না! সুতরাং বাহিরের খবর স্বভাবতই আমার নিকট অত্যন্ত প্রলোভনীয়।

"গোমেস্তাটি বলিল, 'আপনি কি দেবটিকা সম্প্রদায়ের নাম কোনও দিন শুনেন নাই'?

" 'কখনও না;"

" 'আশ্চর্য্য'! কারণ আপনি নিজেই একজন এই সম্প্রদায়ের সভ্য হইবার অধিকারী!'

" 'কত টাকা মাহিয়ানা?'

" 'ওঃ, বৎসরে প্রায় দেড় সহস্র মুদ্রা! কিন্তু কাজ এত অল্প যে একজন ব্যবসায়ী ব্যক্তিও অনায়াসে নিজ কাজ চালাইয়া এই কাজ সম্পন্ন করিতে পারে;'

সেই সময়ে আমার ব্যবসায় অত্যন্ত মন্দা হইয়া পড়ায় সংবাদটী আরও লোভনীয় হইল। বলিলাম, "সমস্ত খুলিয়া বল তো, বাপু"।

"আমাকে এই বিজ্ঞাপনটী বাহির করিয়া দিয়া বলিল, 'আপনি নিজেই

দেখুন না ; সম্প্রদায়ের একটি কাজ খালি আছে, এই ঠিকানাতে দরখাস্ত করিলেই সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন। আমি যতদূর জানি, পাঞ্জাবের বিখ্যাত স্বধর্ম্মনিরত জমিদার কিরণসিংহ কর্ত্তৃক এই সম্প্রদায় স্থাপিত ; তিনি বিখ্যাত সন্ন্যাসী "পাহাড়ী বাবার" শিষ্য ছিলেন ; যাহাদের কপালের মধ্য স্থানে তিল আছে তাহারা দেবগণের অধিকতর প্রিয়পাত্র বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল ; বলাবাহুল্য তাঁহার নিজেরও ঐ প্রকার একটি "দেবটিকা" ছিল ; যখন তিনি অপুত্রক অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করেন তখন তাঁহার বিষয় কয়েকজন ট্রাষ্টির উপর ন্যস্ত করিয়া যান ; তাঁহার উপদেশানুসারে ট্রাষ্টিগণ এই সম্প্রদায় স্থাপন করেন ; ইহাতে দেবটিকাধারী ব্যতীত অন্য কাহাকেও নিযুক্ত করা হয় না। যতদূর অবগত আছি, এই সম্প্রদায়ের প্রত্যেক সভ্যের মোটা মাহিয়ানা, অথচ কিছুই করিতে হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।"

"কিন্তু উক্ত কর্ম্মপ্রার্থী দেবটিকাধারীর সংখ্যা কম হইবে না" ;

"আপনি যত অধিক মনে করিতেছেন তত নয় ; দেখিতেছেন বিজ্ঞাপনে লিখিত রহিয়াছে স্বয়ং আফিসে যাইয়া সাক্ষাৎ করিতে হইবে, সুতরাং কলিকাতার লোক ব্যতীত অন্য কেহ আসিতে পারিবে না। তারপর বয়স ২৫ অপেক্ষা অধিক হইতে হইবে ; সুতরাং লোকসংখ্যা আরও কম হইয়া গেল ; আবার উক্ত 'দেব-টিকা' কপালের যে কোনও স্থানে থাকিলে চলিবে না, ঠিক মধ্যস্থানে হওয়া আবশ্যক ; আপনি যদি কর্ম্মপ্রার্থী হন তাহা হইলে উক্ত ঠিকানায় উপস্থিত হইতে হইবে ; কিন্তু আপনি বোধ হয় কয়েকশত টাকার জন্য বাটী হইতে বাহির হইতে স্বীকৃত হইবেন না, কি বলেন ?

"দেখিতেই পাইতেছেন, কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু, তিলটি আমার কপালের ঠিক মধ্যস্থানে রহিয়াছে, সুতরাং ভাবিয়া দেখিলাম যদি 'দেব-টিকা' লইয়া প্রতিযোগিতা হয় তাহা হইলে আমি অধিক নিম্নে স্থান পাইব না ; সুতরাং যাওয়াই স্থির করিলাম। তাহাকে সে দিনকারমত দোকান বন্ধ করিয়া আমার সহিত আসিতে বলিলাম ; সেও ছুটি পাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল, সুতরাং আমরা উভয়েই প্রফুল্লচিত্তে বাটী হইতে বাহির হইলাম।

"বোসপাড়ালেনে আসিয়া দেখিলাম ৭নং বাড়ীর সম্মুখে বিস্তর লোক দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকের কপালে এক একটী তিল ; কাহারও কপালে কাহারও চক্ষুর উপরে কাহারও কর্ণমূলে ইত্যাদি ; কলিকাতায়

যে এতগুলি লোকের কপালে তিল থাকিতে পারে তাহা পূর্ব্বে ধারণা হয় নাই; আমি নিরাশ হইয়া পড়িলাম। যোগজীবন কিছুতেই ছাড়িল না ভিড় ঠেলিয়া আমাকে দ্বিতলে আফিস্ গৃহে লইয়া গেল;"

এই বলিয়া লোকটি কি স্মরণ করিতে লাগিল; কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু বলিলেন, "কাহিনীটি বড়ই কৌতুকপ্রদ; তথায় কি দেখিলেন?"

"আফিস্ গৃহ দেখিয়া আমার অত্যন্ত অশ্রদ্ধা জন্মিল; তথায় কয়েকখানি পুরাতন অর্দ্ধভগ্ন চেয়ার ও একটি মলিন টেবিল ব্যতীত আর কিছুই ছিল না; একখানি চেয়ারে একটি দাড়ি গোপ বিবর্জ্জিত প্রৌঢ় ভদ্রলোক উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহার কপালের ঠিক মধ্যদেশে আমাপেক্ষাও অধিকতর বৃহৎ একটি তিল রহিয়াছে! এক একজন করিয়া কর্ম্মপ্রার্থী আসিতে লাগিল এবং এক একটি খুঁত বাহির হওয়ায় ভগ্নমনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল। আমরা উপস্থিত হইলে তিনি যেন একটু সদয় হইলেন; যোগজীবন বলিল, 'ইঁহার নাম সুরেন্দ্রনাথ সেন, ইনি একজন কর্ম্মপ্রার্থী;' কয়েক মিনিট পর্য্যন্ত লোকটি আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, পরে বলিল, ইঁহার টিকা'টি অতি সুন্দর; ইনি কার্য্য পাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত; সুরেন্দ্র বাবু মাফ করিবেন, আমাকে একটু পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে;' এই বলিয়া লোকটি আমার তিল টিপিয়া দেখিল উহা প্রকৃত কি না, তারপর কহিল, 'আমাদিগকে এই সাবধানতাটুকু গ্রহণ করিতে হয় কারণ দুইবার দুই ব্যক্তি আমাদিগকে প্রতারিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল', এই বলিয়া লোকটি জানালা দিয়া মস্তক বাহির করিয়া চীৎকার করিয়া সকলকে জানাইল যে বিজ্ঞাপিত লোক নিযুক্ত হইয়া গিয়াছে; যাহারা আশান্বিত হইয়া বাহিরে দণ্ডায়মান ছিল তাহারা হতাশ হইয়া একে একে বোসপাড়ালেন পরিত্যাগ করিল;

"লোকটি বলিল, 'আমার নাম বিষ্ণুচরণ চক্রবর্ত্তী, আমি এই সম্প্রদায়ের কলিকাতাস্থ প্রধান কর্ম্মচারী; আপনি কি বিবাহিত, সুরেন্দ্র বাবু?'

"আমি না বলিলে লোকটি একটু অন্যমনস্ক হইল; কিয়ৎক্ষণ মৌন থাকিয়া অবশেষে গম্ভীরভাবে বলিল, "বড়ই দুঃখিত হইলাম; এই সম্প্রদায় যেমন দেব-টিকাধারীদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইতে চায়, সেইরূপ তাহাদের স্ত্রী পুত্রদিগের উপকার সাধন করাও ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য;'

"ইহা শুনিয়া আমার বদন শুষ্ক হইল, মনে করিলাম তীরে উঠিবার সময় বুঝি নৌকা ডুবিয়া যায়; যাহা হউক পরে লোকটি উত্তর করিল যে তাহাতে

কোনও ক্ষতি হইবে না তখন হাঁফ ছাড়িয়া বাচিলাম।

"লোকটি বলিল, 'আপনার টিকাটি যে প্রকার সুলক্ষণযুক্ত তাহাতে দুই একটী আপত্তি গ্রাহ্য নয়; তবে সুরেন্দ্র বাবু আপনি কবে হইতে কার্য্যে যোগদান করিতে পারিবেন?'

"আমি বলিলাম, 'আমার একটু বাধা আছে, আমি একজন ব্যবসায়ী;'

"যোগজীবন বাধা দিয়া বলিল, 'আপনি সেজন্য চিন্তা করিবেন না; তাহা আমি দেখিব;'

"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কয়টা হইতে কয়টা পর্য্যন্ত কাজ করিতে হইবে?,

'প্রাতে ৮টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত;'

সাধারণতঃ প্রাতঃকালে কেহ টাকা ধার করিতে আসে না; সুতরাং আমি যদি ৮টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত দোকান হইতে অনুপস্থিত থাকি তাহা হইলে কার্য্যের কোনই ক্ষতি হয় না; তদ্ব্যতীত যোগজীবন অতি চতুর লোক, যদিই কেহ আমার অনুপস্থিতে দোকানে আসে তাহা হইলে আমার প্রত্যাবর্ত্তন না করা পর্য্যন্ত অনায়াসে তাহাকে বসাইয়া রাখিতে পারিবে.ইত্যাদি ভাবিয়া বলিলাম '৮টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত কাজ করিতে আমার কোনই বাধা নাই; কিন্তু মাহিয়ানা কত?'

" 'মাসিক ১২০৲ টাকা;'

" 'কাজ কি?'

" সাধারণ কাজ;'

" 'আপনি কিরূপ কাজ সাধারণ মনে করেন?'

" 'আপনাকে যে প্রকারেই হউক ৮টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত আফিসে উপস্থিত থাকিতেই হইবে; যদি কোনও দিন অনুপস্থিত হন তবে সে মাসের মাহিয়ানা পাইবেন না; এ সম্বন্ধে আমরা খুব দৃঢ় থাকিব;"

" 'চারি ঘণ্টা থাকিবার কথা, এই সময়টুকের মধ্যে অনুপস্থিত হইবার কোনই কারণ হইতে পারে না;'

" 'হইলেও তাহা গ্রাহ্য হইবে না; 'অসুখই বলুন আর কার্য্যাধিক্যই বলুন কিছুই শুনিব না; অনুপস্থিত হইলেই সমস্ত বেতন কাটা যাইবে।'

" 'কি কার্য্য করিতে হইবে?'

" 'সম্প্রতি বিশ্বকোষ অভিধান নকল করিতে হইবে; আমরা পুস্তক ও কাগজ দিব, আপনাকে নিজের দোয়াত কলম ব্লটিং পেপার ইত্যাদি আনিতে হইবে; কাল হইতে আসিতে পারিবেন?'

" 'কেন পারিব না ?'

" 'তবে নমস্কার সুরেন্দ্রবাবু; এমন লাভজনক কার্য্য পাইলেন এ জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন ;'

"আমরা 'আফিস' পরিত্যাগ করিলাম; কাজটি পাইয়া এরূপ আনন্দিত হইয়াছিলাম যে রাস্তায় একটি কথাও কহিলাম না; সমস্তদিন কেবল চিন্তা করিয়া কাটাইলাম, রাত্রে নিরাশ হইয়া পড়িলাম, ভাবিলাম সবই দমবাজি "বিশ্বকোষ" নকল করিবার জন্য লোকে যে ১২০৲ টাকা দিয়া লোক নিযুক্ত করিতে পারে ইহা একেবারেই অসম্ভব; যাহা হউক পরদিন প্রাতে দোয়াত, কলম, ব্লটিং ইত্যাদি ক্রয় করিয়া বোস্‌পাড়া লেন অভিমুখে যাত্রা করিলাম; যথাসময়ে ৭নং বাড়ীতে আসিয়া দেখিলাম টেবোল, চেয়ার, "বিশ্বকোষ" ইত্যাদি সমস্তই আমার জন্য যথাযথ সজ্জিত রহিয়াছে; বিষ্ণুবাবু আমার জন্য অপেক্ষা করিতে ছিলেন, আমাকে 'অ' অক্ষর ধরাইয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন। মধ্যে মধ্যে আসিয়া দেখিতে লাগিলেন আমি ঠিকমত কার্য্য করিতেছি কি না; অবশেষে ১২ টা বাজিলে আমি নমস্কার করিয়া বিদায় লইলাম; অনেকখানি লিখিয়া ফেলিয়া ছিলাম বলিয়া বিষ্ণুবাবু আমাকে ধন্যবাদ দিলেন।

"এই প্রকারে সাতদিন গত হইলে বিষ্ণুবাবু আমাকে বেতনের এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ ৩০৲ টাকা দিলেন; ইহার পরের সপ্তাহ এবং তাহার পরের সপ্তাহেও এই প্রকার ৩০৲ টাকা করিয়া পাইলাম; কিন্তু তাহার পর প্রায় ১৫।১৬ দিন পর্য্যন্ত বিষ্ণুবাবুকে দেখিলাম না; কার্য্যটী আমার এত ভাল লাগিয়াছিল যে তাঁহার অনুপস্থিতিতে আমি কিছুমাত্র চিন্তান্বিত হইলাম না; বস্তুতঃ এই তিন সপ্তাহে যতটাকা পাইয়া ছিলাম তাহাতে আর ২।৩ মাস বেতন না পাইলেও কিছুমাত্র দুঃখিত হইতাম না।

"এই প্রকারে ৮ সপ্তাহ কাটিয়া গেল; আমিও স্বরবর্ণ শেষ করিয়া ব্যঞ্জন বর্ণের নিকটবর্ত্তী হইলাম; লিখিত কাগজে গৃহের তাক সমস্ত বোঝাই হইয়া আসিল, এমন সময় হঠাৎ একদিন সমস্ত কাজ বন্ধ করিতে হইল;"

"বন্ধ করিতে হইল!"

"হাঁ মহাশয়, বন্ধ করিতে হইল; অদ্য প্রাতে যথাসময়ে আফিসে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম বাড়ীটি তালাবন্ধ রহিয়াছে, দ্বারের উপরে একটী কাগজ লাগান রহিয়াছে তাহাতে বড় বড় অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে,

"অদ্য হইতে 'দেবটীকা' সম্প্রদায় ভাঙ্গিয়া গেল। কার্ত্তিক, ১৩১৫ সন।"

সুরেন্দ্রবাবু যে তাঁহার বক্তব্য সহসা এইরূপ শেষ করিবেন তাহা আমি কিম্বা কৃষ্ণগোবিন্দবাবু কেহই পূর্ব্বে অনুমান করি নাই ; বিশেষতঃ বক্তা শেষ কথাগুলি যে ভাবে উচ্চারণ করিলেন তাহাতে আমরা কিছুতেই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

সুরেন্দ্রবাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আমি যে কোনও হাস্যকর কথার অবতারণা করিয়া ছিলাম এরূপ মনে হয় না ; যদি উপহাস করিয়া উড়াইয়া দেওয়া ব্যতীত শ্রেষ্ঠতর কোনও উপায় উদ্ভাবন করিতে অসক্ষম হন তবে আমাকে বিদায় দিন, অন্যত্র চেষ্টা করিয়া দেখি।"

কৃষ্ণগোবিন্দবাবু চেয়ার হইতে মস্তক তুলিয়া ছিলেন, পুনরায় অর্দ্ধশায়িত হইয়া বলিলেন, "না, না মহাশয়, আমি এ কেসটি কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারি না ; ইহা খুবই অদ্ভুত ঘটনা, সন্দেহ নাই ; কিন্তু যদি মাফ করেন তবে বলিতে পারি যে ঘটনাটী একটু হাস্যরসও বটে ; আচ্ছা, অপনি উক্ত কাগজ খানি পাঠ করিয়া কি করিলেন ?"

"প্রথমে একটু থতমত খাইলাম ; কি যে করিব কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না ; তারপর আফিসের চতুর্দ্দিকস্থ বাটীগুলিতে অনুসন্ধান করিয়া কিছুই অবগত হইতে পারিলাম না ; তখন বাড়ীওয়ালার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি 'দেবটিকা সম্প্রদায়ের' পরিণাম সম্বন্ধে কিছু অবগত আছেন কি না, তাহাতে তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না ; তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে বিষ্ণুচরণ চক্রবর্ত্তী লোকটি কে ; তাহাতে তিনি বলিলেন যে তিনি ইহা এই প্রথম শুনিলেন ; আমি বলিলাম, "কেন, সেই ৭নং বাড়ীর ভদ্রলোকটী ?

" 'যাঁহার কপালে একটি তিল আছে তিনি তো ?'

" 'হঁা ;'

" 'ওঃ, তাঁহার নাম সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তিনি একজন উকিল ; নূতন বাটী প্রস্তুত হইতেছিল তজ্জন্য তিনি দুই মাসের জন্য উক্ত ৭নং বাড়ী ভাড়া করিয়াছিলেন ; অদ্য তাঁহার বাটী সম্পূর্ণ হওয়ায় তথায় উঠিয়া গিয়াছেন।'

" 'কোথায় তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব ?'

" 'তাঁহার নূতন আবাসের ঠিকানা বলিয়াগিয়াছেন ;—১৭নং জিজি লেন্, লালদিঘির নিকট ;'

"উক্ত বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম উহা একটি মনোহারী দোকান

বিষ্ণুচরণ চক্রবর্ত্তী বা সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কেহই তাহার পরিচিত নহে ;"

"তারপর কি করিলেন ?"

"বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গোমেস্তাটির সহিত পরামর্শ করিলাম ; সে নীরবে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে উপদেশ দিল. হয়তো ডাকযোগে বাকি টাকা পাইলেও পাইতে পারি ; কিন্তু তাহার এ পরামর্শ আমার নিকট যথেষ্ট বোধ হইল না ; এরূপ চাকরীর মমতা সহজে বিসর্জ্জন দিতে সম্মত হইলাম না। শুনিয়াছিলাম আপনি অনেক বিপদগ্রস্ত লোককে উদ্ধার করিয়া থাকেন, তাহাই অনর্থক চিন্তা করিয়া সময় নষ্ট না করিয়া একেবারে এখানে চলিয়া আসিলাম ,"

"এখানে আসিয়া অতি সুবিবেচনার কাজই করিয়াছেন ; আপনার ব্যাপারটি খুবই রহস্যপূর্ণ সন্দেহ নাই কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে যেরূপ প্রতীয়মান হয় বস্তুতঃ তাহাপেক্ষা উহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও অধিক গুরুতর ;"

"গুরুতর তাহার আর সন্দেহ কি ? এই ৫ সপ্তাহে আমার ১৬০৲ টাকা ক্ষতি হইয়াছে !"

"এই ঘটনায় আপনি নিজে যেটুকু সংশ্লিষ্ট তাহাতে আপনার অধিক ক্ষতি হয় নাই, বরং আপনি ইহাতে লাভবানই হইয়াছেন বলিতে হইবে ; কারণ প্রথম তিন সপ্তাহে আপনি ৯০৲ টাকা তো পাইয়াছেনই তদ্ব্যতীত 'বিশ্বকোষের' অনেক শব্দের অর্থ আপনার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছে ;"

"না মহাশয়, আমি ইহাদিগকে বাহির করিতে চাই, জানিতে চাই আমার সহিত এরূপ চাতুরী করিবার কারণ কি ; তাহাদের এই রসিকতা করিতে ব্যয় নেহাৎ কম হয় নাই, ৯০৲ টাকা ঘর হইতে বাহির করিয়া দিতে হইয়াছে ;"

"আমরা সমস্ত বাহির করিতে সবিশেষ চেষ্টা করিব ; কিন্তু তৎপূর্ব্বে আপনাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই ; যোগজীবন এই বিজ্ঞাপন দেখাইবার কতদিন পূর্ব্ব হইতে আপনার নিকট আছে ?"

"প্রায় একমাস হইবে ;"

"কি প্রকারে কার্য্যে বহাল হইল ?"

"বিজ্ঞাপন দিয়াছিলাম. তাহা দেখিয়া আমার নিকট উপস্থিত হয় ;"

"সে কি একাকীই উক্ত কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া ছিল ?"

"না, আরও দশ বার জন ছিল ;"

"তাহাকে কি জন্য বাছিয়া লইলেন ?"

"কারণ সে দেখিতে বেশ ভদ্রলোকের মত এবং সর্ব্বাপেক্ষা কম মাহিয়ানায়

থাকিতে স্বীকৃত হইয়া ছিল ;"

"অর্থাৎ, অর্দ্ধেক মাহিয়ানা ?"

"হাঁ ;"

"এই যোগজীবন দেখিতে কিপ্রকার ?"

বেশী দীর্ঘ নয়, বলিষ্ঠ, খুব চটপটে, বয়স ত্রিশের উপরে হইলেও শ্মশ্রু গুম্ফ বিবর্জ্জিত ; কপালের একস্থান ফটোগ্রাফের আরোক লাগিয়া শ্বেতবর্ণ হইয়া গিয়াছে ;"—

উত্তেজিতভাবে আর্ম্মচেয়ার হইতে মস্তকোত্তলন করিয়া কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু বলিলেন, "আমিও ইহাই মনে করিয়া ছিলাম ; আচ্ছা সুরেন বাবু, তাহার দক্ষিণ কর্ণমূলে একটি ছিদ্র আছে কি না লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন কি ?"

"হাঁ মহাশয় ; সে বলিয়াছে যে বাল্যকালে এক বেদে তাহার কর্ণমূল ছিদ্র করিয়া দিয়াছিল ;"

'হুঁ' বলিয়া কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু পুনরায় চেয়ারে শয়ন করিয়া বলিলেন, "এখনও সে আপনার নিকটই আছে ?"

"এই মাত্র তাহাকে বাড়ীতে রাখিয়া আসিয়াছি ;"

"আপনার অনুপস্থিতে কি সেই আপনার কার্য্য চালাইয়া থাকে ?"

"আমার অনুপস্থিতে তাহার কোনও কাজ করিতে হয় না, তবে কোনও গ্রাহক উপস্থিত হইয়া যাহাতে হস্তচ্যুত না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হয় ;"

"আর একটি কথা ; আপনি যে আমার নিকট পরামর্শ করিতে আসিয়াছেন তাহা কি যোগজীবন অবগত আছে ?"

"না, সে ইহার কিছুই জানে না"

"তাহা হইলে তাহাকে ইহা বলিবেন না ; দুই একদিনের মধ্যেই আমার বক্তব্য শুনিতে পাইবেন ; অদ্য শনিবার ; আমার বিশ্বাস সোমবারের পূর্ব্বেই আমি একটা মীমাংসায় উপনীত হইব ; নমস্কার।"

সুরেন্দ্র বাবু নমস্কার করিয়া বিদায় লইলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীজ—

গীতা (২)

এক্ষণ পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, ঋষ্যাদি ন্যাসে গীতার প্রথম শ্লোককে "বীজ" এবং শেষ শ্লোককে গীতার "শক্তি" ও "কীলক" কল্পনা করা হইয়াছে। অর্থাৎ অশোচ্যানন্ব শোচস্ত্বং" ইত্যাদি শ্লোকই গীতার প্রথম শ্লোক বা "বীজ"; সুতরাং এই বীজ হইতেই গীতারূপ বৃক্ষের উৎপত্তি, এবং "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" ইত্যাদি শ্লোকই গীতার পরিসমাপ্তি। যদিও এই শ্লোকের পর গীতায় আরও অল্প কয়টি শ্লোক আছে তাহার সহিত গীতার বিশেষ সম্বন্ধ নাই। ঐ সকল শ্লোকে গীতা পাঠের অধিকারীনির্ণয়, এবং গীতার সংক্ষিপ্ত ফলশ্রুতি ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। অতএব গীতার প্রথম অধ্যায় ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১০ম শ্লোক ("অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং" শ্লোকের পূর্ব্ব) পর্যান্ত যে উভয় পক্ষীয় বলাবল নির্ণয় সৈন্যগণের রণোদ্যম উভয় পক্ষীয় সৈন্যমধ্যে আত্মীয় বন্ধু দর্শনে অর্জ্জুনের বিষাদ ও যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া অস্ত্রত্যাগ, এবং অর্জ্জুনকে যুদ্ধ বিমুখ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের তিরস্কার প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে ইহা কেবল অপ্রাসঙ্গিক কবি কল্পনামাত্র। যুদ্ধারম্ভের প্রাক্কালে যুদ্ধ বিমুখ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবর্ত্ত করাইবার জন্যই যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উপনিষদ সমূহ মন্থন করিয়া তাহার সার স্বরূপ যোগ কথাপূর্ণ-অষ্টাদশ অধ্যায়াত্মক গীতার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, ইহা সমর্থন করিবার উদ্দেশেই "ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে" ইত্যাদি শ্লোক হইতে "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং" ইত্যাদি শ্লোকের পূর্ব্ব পর্যান্ত কোন পরবর্ত্তী কবি গীতার প্রথমভাগে সন্নিবেশ করিয়া দিয়াছেন। "ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে" ইত্যাদি শ্লোক যদি গীতার প্রকৃত প্রথম শ্লোক হইত, তবে "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং" ইত্যাদি শ্লোক গীতার বীজ না হইয়া "ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে" ইতি বীজং পাঠ হইত। গীতার উপক্রম উপসংহার নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিলে ইহা স্বতঃই প্রতীয়মান হয়।

কিন্তু গীতার প্রথম অধ্যায় ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১০ম শ্লোক পর্য্যন্ত পরবর্ত্তী কবি কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকিলেও "ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে" ইত্যাদি প্রথম শ্লোক হইতে ২৫শ শ্লোক পর্য্যন্ত মহাভারতীয় ভীষ্ম পর্ব্বেরই অন্তর্গত বলিলে দোষ হয় না। এবং প্রথম অধ্যায়ের ২৬শ শ্লোক হইতে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১০ম শ্লোক পর্য্যন্ত অসঙ্গতিপূর্ণ শ্লোকগুলি আমি পরবর্ত্তী কবির স্বকর কল্পিত ও প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করি। * (ক)

* (ক) আমার এই সিদ্ধান্তের সত্যতা প্রতিপাদনের জন্য আরও

আমার মতে গীতারম্ভক দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১১শ শ্লোকের পূর্ব্ব পর্যন্ত যখন গীতার অন্তর্গত নহে, তখন ঐ সকল শ্লোকের দোষ গুণ সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণ দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক হইতে গীতাতে যে সমস্ত যুদ্ধ প্রবর্ত্তক শ্লোক বা বাক্য আছে, তাহারই আলোচনা করিয়া দেখিব যে; গীতার উৎপত্তি যুদ্ধ বিমুখ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবর্ত্ত করাইবার জন্য কি না?

অকাট্য প্রমাণ ও দৃঢ়তর যুক্তি প্রদর্শন করিব। যাহা পাঠকবর্গের নিকট নিতান্ত দুর্ব্বল বলিয়া পরিগণিত হইবে না।

বর্ত্তমান সময়ে গীতার যে সমস্ত টিকা ও ভাষ্য প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে "শাঙ্কর ভাষ্যই" প্রাচীনতম। ভগবান শঙ্করাচার্য্য বর্ত্তমান সময়ের প্রায় ১৩০০ তেরশত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী। শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি টিকাকারগণ শঙ্করাচার্য্যের বহু পরবর্ত্তী। শ্রীধরস্বামী মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি টিকাকারগণ বর্ত্তমান সময়ে গীতা যে আকারে বিদ্যমান সেই ভাবেই গীতার টিকা করিয়াছেন, অর্থাৎ "ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ" ইত্যাদি শ্লোককে গীতার প্রথম শ্লোক স্থির করিয়া ঐ শ্লোক হইতেই টীকা আরম্ভ করিয়াছেন।

কিন্তু ভগবান শঙ্করাচার্য্য তাহা করেন নাই। তিনি 'অশোচ্যানন্ব শোচস্বং" ইত্যাদি গীতাবীজ শ্লোক হইতেই শাঙ্কর ভাষ্য আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাদ্বারা নিঃসন্দেহ প্রমাণিত হয় যে, শঙ্করাচার্য্যের সময় "অশোচ্যানন্ব শোচস্বং" ইত্যাদি শ্লোক হইতেই গীতার আরম্ভ, অর্থাৎ ঐ শ্লোকই গীতার প্রথম শ্লোক ছিল। এবং বর্ত্তমান গীতার প্রথম অধ্যায় ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১০ম শ্লোক পর্য্যন্ত তখনও গীতায় সন্নিবিষ্ট হয় নাই। শঙ্করাচার্য্যের সময় গীতা অপ্রাসঙ্গিক ও অসঙ্গত কল্পনায় কলুষিত হইয়াছিল না। সে সময় পর্য্যন্ত গীতা প্রক্ষিপ্ত দোষ বিবর্জ্জিত ছিল। শঙ্করাচার্য্যের পরেও শ্রীধরস্বামীর পূর্ব্বে কোন এক অনির্দ্দিষ্ট সময়ে কোন পরবর্ত্তী কবি ক্লৈবভাবাপন্ন যুদ্ধ বিমুখ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবর্ত্ত করাইবার জন্য গীতার উৎপত্তি কল্পনা করিয়া বর্ত্তমান গীতার প্রথম অধ্যায় ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১০ম শ্লোক পর্য্যন্ত গীতান্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলিতে পারেন "অশোচ্যানন্ব শোচস্বং"—ইত্যাদি শ্লোক হইতেই দার্শনিকতত্ত্ব ও যোগতত্ত্ব বর্ণিত হওয়ায় শঙ্করাচার্য্য ঐ শ্লোক হইতেই ভাষ্য আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু একথার উত্তর অতি সহজ। বেদ পুরাণ কাব্য প্রভৃতি বহুগ্রন্থের টিকাটিপ্পনি ও ভাষ্য বিদ্যমান আছে; কিন্তু কোন টিকাকার বা ভাষ্যকার মূল গ্রন্থের কোন অংশ পরিত্যাগ করিয়া টিকা বা ভাষ্য করেন নাই। যদি অশোচ্যানন্ব শোচস্বং"—হইতেই টিকার প্রয়োজন হইত, তবে বহুগ্রন্থের টিকাকার প্রসিদ্ধ শ্রীধরস্বামী এবং মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি বিখ্যাত টিকাকারগণ কেন শঙ্করাচার্য্যের পদানুসরণ করিলেন না। অন্ততঃ টিকাকারগণ মধ্যে এক ব্যক্তিও ত শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে "অশোচ্যানন্ব শোচস্বং" হইতে টিকা আরম্ভ করিতে পারিতেন।

গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় আদ্যোপান্ত আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবে, দ্বিতীয় অধ্যায়ের কয়েকটি শ্লোক ভিন্ন আর বিশেষভাবে যুদ্ধের কথা কোন অধ্যায়েই নাই। কেবল একাদশ অধ্যায়ের ৩টি শ্লোকে যুদ্ধের আভাস ও একটি শ্লোকে "শত্রু বিজয় করিয়া রাজ্যভোগ কর" এইরূপ প্রলোভন পূর্ণ উৎসাহবাক্য আছে। তবে সপ্তম ও অষ্টাদশ অধ্যায়ের দুই একস্থলে কেবল "যুধ্যস্ব" "নযোৎস্যে" যুদ্ধ কর এবং যুদ্ধ করিব না; এইরূপ দুই একটি কথা আছে। আমি যতক্ষণ ঐ সমস্ত শ্লোক বা বাক্য ভিন্নার্থ প্রতিপাদক বলিয়া প্রতিপাদন করিতে পারিব, ততক্ষণ আমি তাহা "প্রক্ষিপ্ত" বলিতে অগ্রসর হইব না।

ফলতঃ এ কথার ইহাই সহজ উত্তর এবং অভ্রান্ত সত্য যে শঙ্করাচার্য্যের সময় "অশোচ্যানন্ব শোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চভাষসে" এই গীতাবীজ শ্লোক হইতেই গীতারম্ভ অর্থাৎ ইহাই গীতার প্রথম শ্লোক ছিল। তৎপূর্ব্বে আর কিছুই ছিল না। সুতরাং ঐ শ্লোক হইতেই শঙ্করাচার্য্য ভাষ্য আরম্ভ করিয়াছেন। এবং শঙ্করের পরেও শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি টিকাকারের পূর্ব্বে বর্ত্তমান গীতার প্রথমাধ্যায় ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১০ম শ্লোক গীতার অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি "ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে"ইত্যাদি শ্লোক হইতেই টিকা আরম্ভ করিয়াছেন।

তবে শাঙ্করভাষ্যের কোন কোন স্থলে যুদ্ধ প্রবর্ত্তক শ্লোকের টিকায়) অর্জ্জুনকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে প্রবর্ত্ত করাইবার ইঙ্গিত আছে বটে, কিন্তু যে কবি স্বীয় অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য মহাভারতের কতকগুলি শ্লোক ও স্বরচিত কতকগুলি শ্লোকদ্বারা একটি পূর্ণ অধ্যায় ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১০ম শ্লোক গীতান্তর্ভূক্ত করিতে পারেন, তিনি যে শাঙ্করভাষ্যের কোন কোন স্থলে একটু একটু কারিকরী করিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি?

কেহ কেহ বলিতে পারেন, "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে," এই শ্লোকটি কোন একটি প্রশ্নের উত্তর বিশেষ; সুতরাং এটি গীতার প্রথম শ্লোক হইতে পারে না; ইহার পূর্ব্বে অন্ততঃ আর একটি শ্লোক থাকা উচিত। ইহার উত্তর এই যে,—"কার্পণ্য দোষোপহত স্বভাবঃ" ইত্যাদি শ্লোকের উত্তরই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং" ইত্যাদি শ্লোক হইতে গীতার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। ঐ শ্লোকটি মহাভারতের অন্তর্গত ছিল। এবং ঐ শ্লোকের পর হইতেই গীতারম্ভ হইয়াছিল। এক্ষণ ঐ শ্লোক গীতার অন্তর্ভূক্ত হওয়ার ঠিক্ কোন্ সময়ে যে ভগবান্ অর্জ্জুনকে গীতার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না। তবে এই পর্য্যন্ত অনুমান করা যায় যে সুভদ্রা পরিণয়ের পর যখন শ্রীকৃষ্ণ তিন বৎসর কাল ইন্দ্রপ্রস্থে ছিলেন, তাহার কো এক সময়েই গীতার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১২শ শ্লোক হইতে ৩০শ শ্লোক পর্য্যন্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সাংখ্য যোগের মতে আত্মার অবিনশ্বরত্ব এবং দেহের অনিত্যতা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। এ সমস্ত শ্লোকে যুদ্ধের কোন কথাই নাই. কেবল ১৮শ শ্লোকের শেষ চরণে " অতএব যুদ্ধ কর," এই অপ্রাসঙ্গিক যুদ্ধের কথা আছে।

"অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্‌যুধ্যস্ব ভারত॥ (১৮)

হে ভারত! সেই আত্মা নিত্য অবিনাশী ও অপ্রেময়; এই বিনাশ ধর্ম্মশীল দেহ সেই আত্মার, ইহা জ্ঞানীগণ বলিয়া থাকেন। "অতএব তুমি যুদ্ধ কর।"

যে কবি ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য অর্জ্জুনকে কাপুরুষতার মসী বর্ণে চিত্র করিয়া ভগবদ্‌বাক্য গীতাকে যুদ্ধ প্রবর্ত্তক বলিয়াছেন. তাঁহার মতে বোধ হয় আত্মা নিত্য; ও দেহ অনিত্য; অনিত্য দেহের জন্য শোক করা কর্ত্তব্য নহে. "অতএব তুমি যুদ্ধ কর" ইহাই পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য। এস্থলে আমার বক্তব্য এই; যদি ইহাই প্রকৃত ভাব হইত, তবে এই শ্লোকেই আত্মার অবিনশ্বরত্ব বর্ণন সীমা লাভ করিত কিন্তু তাহা না হইয়া ১৯শ শ্লোক হইতে ক্রমে অবিচ্ছেদে ৩০শ শ্লোক পর্য্যন্ত আত্মার নিত্যত্বই বর্ণিত হইয়াছে, এবং আর কোন স্থলেই যুদ্ধের উপদেশ নাই। আত্মা নিত্য, দেহ অনিত্য, "অতএব যুদ্ধ কর" ইহা অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবর্ত্ত করাইবার জন্য বলা হইয়া থাকিলে, আত্মার নিত্যতা বর্ণন শেষ করিয়া পরিশেষে "তস্মাদ্‌যুধ্যস্ব ভারত" বলিলে কতকটা সঙ্গত হইত।

অতএব এইস্থলের "যুধ্যস্ব" শব্দটি "যুদ্ধপ্রবর্ত্তকবিধি" না বলিয়া ক্ষাত্রধর্ম্মে যুদ্ধের কর্ত্তব্যতা মাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে বলিলে অপ্রাসঙ্গিক দোষের লাঘব হয়। অর্থাৎ আত্মা নিত্য; দেহ অনিত্য, এজন্য, প্রবর্ত্তমান যুদ্ধ হইতে বিরত হওয়া ক্ষাত্রধর্ম্মানুমোদিত নহে। শাঙ্করভাষ্য ও মধুসূদন সরস্বতী কৃত টিকাতেও এইরূপ ভাব প্রকাশিত হইয়াছে; যথা—"তস্মাদ্ যুধ্যস্ব"—"যুদ্ধাদুপরমং মাকার্ষীঃ ইতি নহ্যত্র যুদ্ধ কর্ত্তব্যতা বিধিয়তে," অর্থাৎ আত্মা নিত্য, দেহ অনিত্য, অতএব প্রবর্ত্তমান যুদ্ধ হইতে বিরত হওয়া (ক্ষত্রিয়ের পক্ষে) কর্ত্তব্য নহে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্গাদাস ঠাকুর।

// আরতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী

৮ম বর্ষ { ময়মনসিংহ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৬। } ১২শ সংখ্যা।

প্রাচীন ভারতের শিল্প ও স্থাপত্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মহাভারতীয় যুগ।

বঙ্কিমচন্দ্র খৃষ্টপূর্ব্ব ১৪৩০ অব্দে মহাভারতের সময় নির্ণয় করিয়াছেন। রামায়ণীযুগ হইতে মহাভারতীয় যুগে শিল্পের আরও উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। সে সময়ে শিল্পিগণ রাজার নিকট যথেষ্ট উৎসাহ পাইত। একদা নারদ যুধিষ্ঠিরের সভায় উপস্থিত হইয়া রাজার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বহুবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহার একটি প্রশ্ন এই ছিল—"শিল্পকারদিগকেও উপকরণ সামগ্রী সকল নিয়ত প্রদান করিয়া থাকেন ত ?"

দুর্য্যোধন জলবিহারের নিমিত্ত গঙ্গাতীরে প্রমাণ কোটি নামক স্থানে জলে ও স্থলে বস্ত্র ও কম্বলময় এক বিচিত্র বৃহৎ বাটী প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ঐ উদ্যান সুধাধবলিত রাজযোগ্য গৃহ, বলভী, গবাক্ষ ও জলযন্ত্র সমূহে ব্যাপ্তছিল, সৌধকারগণ গৃহ সকল সম্মার্জ্জিত ও চিত্রকরেরা চিত্রিত করিয়াছিল, তথায় সুশীতল জলপূর্ণ বৃহতী দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী সমূহ খনিত হইয়াছিল "বলভী", শব্দে বুঝিতে হইবে তৎকালে গৃহের ছাদে গুম্বজাদিও নির্ম্মিত হইত, এবং "জলযন্ত্র" অর্থে কৃত্রিম প্রস্রবণ বা ফোয়ারা বুঝিতে হইবে।

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভার এইরূপ বর্ণনা আছে—"সভাগৃহ প্রাকার ও পরিখাদ্বারা পরিবেষ্টিত এবং মধ্যে মধ্যে তোরণরাজি বিরাজিত ছিল। উহার চারিদিকে সুধাধবলিত সৌধাবলী, তুষারজালজড়িত হিমালয় শিখরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ সকল প্রাসাদের কুট্টিম ভূমি রমণীয় মণিময় শিলাপট্টে উদ্ভাসিত, দ্বার সকল সমসূত্রপাতে বিন্যস্ত এবং সোপানমার্গ সমুদায় সুসংঘটিত।

বিচিত্র চন্দ্রাতপ ও অপূর্ব্ব মাল্যদাম উহার অতীব মনোহারিণী শোভা সম্পাদন করিতেছে। ঐ প্রদেশ সুবাসিত গন্ধবারি দ্বারা পরিষিক্ত হইয়াছে। স্থানে স্থানে মহার্হ আসন ও দুগ্ধফেননিভ শয্যাসকল সন্নিবেশিত রহিয়াছে।” দ্রুপদরাজের পুরীতে সপ্ততল গৃহও বিদ্যমান ছিল।

দুর্য্যোধনের গৃহ অসামান্য শ্রীসম্পন্ন পুরন্দর-গৃহসদৃশ ছিল। শ্রীকৃষ্ণ সেই গিরিশৃঙ্গের ন্যায় সমুন্নত সুধাধবল পরম শোভাসম্পন্ন প্রাসাদে আরোহণ করিয়া দেখিলেন দুর্য্যোধন মহার্হ আসনে উপবিষ্ট আছেন। কৃষ্ণ দুর্য্যোধনের আলয়ে স্বর্ণময় পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণের আগমন উপলক্ষে হস্তীনানগরী অপূর্ব্ব সাজে সজ্জিত হইয়াছিল। “কৃষ্ণের সম্মান নিমিত্ত নগর অলঙ্কৃত ও রাজমার্গ বহুবিধ রত্নে সমাচিত হইয়াছিল। মহাত্মা বাসুদেব বহুপ্রাসাদশোভিত পাণ্ডুরবর্ণ ধৃতরাষ্ট্রভবনে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে ক্রমে তিন কক্ষ অতিক্রম করিয়া পরিশেষে ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন।” ধৃতরাষ্ট্রের গৃহেও শ্রীকৃষ্ণ কাঞ্চনময় আসনে উপবেশন করিয়াছিলেন।

পাণ্ডবদিগের প্রাণনাশের জন্য দুর্য্যোধনের পরামর্শে পুরোচন বারণাবত নগরে জতুগৃহ নামক আগ্নেয় গৃহ প্রস্তুত করিয়াছিল। ঐ গৃহ নির্ম্মাণে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা ও শিল্পজ্ঞানের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। শণ, ঘৃত, তৈল, জতু, কাষ্ঠ প্রভৃতি উপকরণ দ্বারা ঐ গৃহ প্রস্তুত হইয়াছিল, মৃত্তিকাতে প্রচুর পরিমাণে ঘৃত, তৈল, বসা ও লাক্ষাদি মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা গৃহের প্রাচীরে লেপ দেওয়া হইয়াছিল, অথচ বাহিক দৃষ্টিতে ঐ গৃহকে আগ্নেয় বলিয়া সন্দেহ করিবার উপায় ছিল না।

পুত্রগণ সমভিব্যাহারে কুন্তীর পলায়ন জন্য বিদুর একটি উৎকৃষ্ট নৌকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ঐ নৌকা “বাতবেগ সহনশীল, উর্ম্মিগারা দুরাধৃষ্য, যন্ত্রযুক্ত, দৃঢ় ও পতাকান্বিত” ছিল। সেকালের এই যন্ত্রযুক্ত জলযান আধুনিক বাষ্পীয় যানের কতদূর নিকটবর্ত্তী ছিল তাহা জানিবার উপায় নাই।

পাণ্ডবদিগের ইন্দ্রপ্রস্থ নগরের এইরূপ বর্ণনা আছে—“ঐ নগর সমুদ্র সদৃশ পরিখা দ্বারা অলঙ্কৃত; পাণ্ডুবর্ণ মেঘমালা ও হিমরশ্মির ন্যায় গগনস্পর্শী প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত; শ্বেতনাগ সমাবৃত পাতালগঙ্গা ভোগবতীর ন্যায় সুশোভিত; গরুড়ের ন্যায় দ্বিপক্ষ দ্বারসমূহ ও পরম রমণীয় সৌধ সমূহে সমাকীর্ণ; মন্দর ভূধরের ন্যায় অত্যুন্নত; অস্ত্রশস্ত্র সুরক্ষিত গোপুর সমূদয়ে

সুশোভিত; ভীষণ ভুজঙ্গমাকার শক্তি, তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ, শতঘ্নী লৌহচক্র প্রভৃতি অস্ত্রকলাপ, যন্ত্র সমুদায় ও তন্ত্র সমূহ দ্বারা অলঙ্কৃত এবং যোধগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত। ঐ নগর মধ্যে সুবিস্তৃত রাজপথ সকল সুবিভক্ত রহিয়াছে; সুধাধবলিত বিবিধ পরমোৎকৃষ্ট ভবন সমুদায় চতুর্দ্দিকে শোভা পাইতেছে। ফলতঃ ইন্দ্রপ্রস্থ নগর তৎকালে নভোমণ্ডলস্থ বিদ্যুৎসমাবৃত মেঘবৃন্দের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। উহার মধ্যে পরম রমণীয়প্রদেশে কুবেরগৃহতুল্য ধন সম্পন্ন কৌরব-গৃহ বিরাজিত রহিয়াছে। * * * আদর্শের ন্যায় স্বচ্ছ বহুবিধ গৃহ মনোহর লতাগৃহ ও বিচিত্র গৃহ সকল উহার মনোহারিণী শোভা সম্পাদন করিতেছে। * * * ঐ নগর মধ্যে ক্রমে ক্রমে সর্ব্ব-বেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বভাষাবিশারদ ব্যক্তিগণ, ধনাকাঙ্ক্ষী বণিকগণ এবং শিল্পোপজীবী সুনিপুণ জনগণ আসিয়া বাস করিতে লাগিল।" সেকালে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সঙ্গে শিল্পীদিগেরও নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইত; দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান কালে শিক্ষিত ও পদস্থ লোকদিগের তালিকায় আমরা কুম্ভকার, সূত্রধর, তন্তুবায়, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতির নাম উল্লেখ যোগ্য মনে করি না।

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাপুরী অতিশয় ঐশ্বর্য্যশালিনী ও সৌন্দর্য্যময়ী ছিল। দ্বারকানগরে কাঞ্চননির্ম্মিত রথ, সুরম্য হর্ম্ম্য, রত্নমণ্ডিত অট্টালিকাবলী, মণিবিক্রমাদি খচিত স্বর্ণ সিংহাসন ছিল; পুরবাসিগণ বহুবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া দিব্যাম্বর পরিধান ও দিব্যমাল্য ধারণ পূর্ব্বক বিচরণ করিতেন।

শ্রীকৃষ্ণ কৃতদার পাণ্ডবদিগকে যৌতুক স্বরূপ বিচিত্র বৈদূর্য্যমণি, সুবর্ণের আভরণ, নানাদেশীয় মহার্হ বসন, রমণীয় শয্যা, বিবিধ গৃহসামগ্রী, বহুসংখ্যক দাস দাসী, সুশিক্ষিত গজবৃন্দ, উৎকৃষ্ট ঘোটকাবলী, অসংখ্য রথ এবং কোটি কোটি রজত কাঞ্চন প্রেরণ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়া আনিলে পর কৃষ্ণও বলরাম অন্যান্য বহু দ্রব্যজাত সহ উৎকৃষ্ট সুবর্ণ ও রত্ন সমূহ, মহার্হ বস্ত্র, কিঙ্কিনী জাল জড়িত সহস্র সংখ্যক সুবর্ণ রথ, সুবর্ণালঙ্কার ভূষিতা সহস্র দাসী সুভদ্রাকে প্রদান করিয়াছিলেন।

ময়দানব যুধিষ্ঠিরের অপূর্ব্ব রাজসভা নির্ম্মাণ করিয়াছিল। কথিত আছে এই সভাগৃহ নির্ম্মাণের সমস্ত উপকরণ কৈলাস পর্ব্বতের উত্তরভাগে মৈনাক সন্নিধানে বিন্দু সরোবর তীর হইতে আহরণ করা হইয়াছিল। এই গৃহ প্রস্তুত করিতে চতুর্দ্দশ মাস কাল লাগিয়াছিল। সভাপর্ব্বে এই গৃহের বর্ণনা এইরূপ আছে—

"সুবর্ণ নির্ম্মিত তরুরাজি বিরাজিত সভামণ্ডপ চতুর্দ্দিকে পঞ্চসহস্র হস্ত বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। পাণ্ডব সভা হুতাশন, সূর্য্য ও চন্দ্রের সভার ন্যায় সমধিক শোভা পাইতে লাগিল। তদীয় প্রভাপ্রভাবে প্রভাকরের অতি ভাস্বর প্রভাও নিতান্ত প্রতিহত হইল, তৎকালে অলোক সামান্য সেই সভা স্বীয় তেজঃপুঞ্জ দ্বারা যেন জ্বলিত হইয়া উঠিল। * * * অষ্টসহস্র কিঙ্কর ও রাক্ষস ঐ রমণীয় সভার রক্ষণাবেক্ষণ করিত এবং আবশ্যকমতে বহন করিয়া উহাকে স্থানান্তরেও লইয়া যাইত। ময়দানব ঐ সভাস্থলে এক অপূর্ব্ব সরোবর প্রস্তত করিয়াছিল, ঐ সরোবরের সোপান পরম্পরা স্ফটিকময়, পরিসর-বেদিকা সকল মণিনির্ম্মিত, জল অতি স্বচ্ছ পঙ্কশূন্য ও সুবর্ণনির্ম্মিত মৎস্য কূর্ম্ম-সার্থ-সঙ্কুল। মণিময় মৃণালে পরিশোভিত ও বৈদূর্য্য পত্রে সমলঙ্কৃত বিকসিত কনক কমল কহ্লারজালে উহার অত্যদ্ভুত মনোহারিণী শোভা সম্পাদন করিয়াছিল। * * * মুক্তাফল ও নানাবিধ রত্নে উহার চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। রাজাদিগের মধ্যে কেহ সরোবর সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াও সহসা উহাকে সরোবর বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই। প্রত্যুত তাঁহারা অজ্ঞানতাবশতঃ সরোবরের উপরিভাগ দিয়া গমন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।"

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে নানাদেশীয় নৃপতি বৃন্দ সমাগত হইয়াছিলেন। দুর্য্যোধন সভামধ্যে এক স্ফটিকময় স্থলে উপস্থিত হইয়া জলভ্রমে আপনার বসন উত্তোলিত করিয়া সভাগৃহে প্রবেশে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, অনন্তর জলভ্রমে তথায় নিপতিত হইয়া লজ্জিত হইয়াছিলেন। একস্থানে তিনি স্থলভ্রমে নির্ম্মল দীর্ঘিকা জলে পতিত হইয়াছিলেন এবং অপর স্থানে স্ফটিক নির্ম্মিত ভিত্তিতে দ্বার বিবেচনা করিয়া আহত মস্তক হইয়া পতিত হইয়াছিলেন। স্ফটিক নির্ম্মিত সোপান ও কপাটের উল্লেখ থাকাতে বুঝা যায় কাচ নির্ম্মাণে সেকালের লোক কিরূপ প্রাজ্ঞ ছিলেন।

মহাভারতে কবচ, বর্ম্ম, অঙ্গুলিত্রাণ প্রভৃতি যুদ্ধবেশের এবং শক্তি, অঙ্কুশ, শতঘ্নী, লৌহ-চক্র, তীর, ধনুক, গদা, অসি, শার্ঙ্গ প্রভৃতি অস্ত্রের উল্লেখ আছে। মহাভারতে শঙ্খ, দুন্দুভি, মৃদঙ্গ বেণু, বীণা ভেরী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে।

বৌদ্ধযুগ।

রামায়ণী ও মহাভারতীয় যুগের পরই বৌদ্ধ যুগের শিল্পের উল্লেখ করিতে হয়। খৃষ্ট জন্মের পাঁচশত বৎসর পূর্ব্ব হইতে বৌদ্ধ যুগ আরম্ভ। বৌদ্ধ যুগেই ভারতীয় ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। রামায়ণী ও মহাভার-

তীয় যুগের শিল্পের কোনও চিহ্ন এখন বর্ত্তমান নাই। বৌদ্ধ যুগের শিল্প নৈপুণ্যের কয়েকটী চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া আমাদিগের অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দান করিতেছে। তন্মধ্যে অজণ্টা গুহা চিত্রাবলী পৃথিবীতে বিখ্যাত। তৎপর বুদ্ধগয়ার মন্দির, বরহাট, সারনাথ, কপিলবাস্তু, কুশীনগর, সাঞ্চি, গান্ধার, অমরাবতী প্রভৃতি স্থানের স্তূপের নাম উল্লেখ যোগ্য।

অজণ্টা গুহাচিত্রগুলি বৌদ্ধ শিল্পীদিগের প্রতিভার পূর্ণ নিদর্শন। এই চিত্রগুলি এখন প্রায় লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। সহৃদয় বার্ডউড্ সাহেব তাঁহার বিখ্যাত Journal of Indian arts & Industries নামক পত্রিকায় ইহার অধিকাংশ চিত্রের প্রতিলিপি মুদ্রিত করিয়া জগতের সমক্ষে বৌদ্ধযুগের শিল্পকলার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

যাঁহারা ভারতের প্রাচীনতমশিল্প দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক করিতে চাহেন, তাঁহারা G.I.P Railway লাইনের পাচোরা ষ্টেশন হইতে ১৬। ১৭ ক্রোশ রাস্তা অতিক্রম করিয়া অজণ্টা গুহায় উপস্থিত হইতে পারেন।

অজণ্টায় ২৯টি গুহা আছে, উহার একএকটি গুহা একএকটি অট্টালিকার মত বৃহৎ। প্রত্যেকটি গুহার দেওয়াল, ছাদ প্রভৃতি অঙ্কিত ও খোদিত চিত্রে শোভিত। এখন ঐ সমস্ত চিত্রের বর্ণ মলিন হইয়া গিয়াছে ও স্থানে স্থানে মানুষের অত্যাচারে উঠিয়া গিয়াছে, তথাপি যাহা আছে তাহা ইউরোপীয় শিল্পিগণের নিকট অশেষবিধ প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে।

অজণ্টাগুহা চিত্রের অনেকগুলি চিত্র ভগবান্ বুদ্ধদেবের জীবনের ঘটনা অবলম্বনে অঙ্কিত হইয়াছিল। ঐতিহাসিকের পক্ষে চিত্রগুলির মূল্য অনেক। প্রাচীন কালে এ দেশের লোকেরা কিরূপ অলঙ্কার ব্যবহার করিত, কিরূপ বস্ত্র পরিধান করিত, তাহাদের রীতি নীতি আচার ব্যবহার কিরূপ ছিল ঐ সকল চিত্র হইতে অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। প্রাচীনকালের কাপড়ের পাড়, ছিট, পিরাণ, মুকুট, টুপী কিরূপ ছিল তাহা অবিকল চিত্রিত আছে এবং তৎকালে যে এ দেশে মস্‌লিনের ন্যায় সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হইত তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

গ্রীক ভ্রমণকারী মেগাস্থিনিস্ খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্রের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে এই নগর দৈর্ঘ্যে ৯ মাইল এবং প্রস্থে ২ মাইল বিস্তৃত। নগরের চারিদিকে কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রাচীর, ভিতর হইতে তীর নিক্ষেপের জন্য এই প্রাচীরের গাত্রে

পর্ছ ছিদ্র ছিল। প্রাচীরের বাহিরে প্রাকার ছিল। তখনকার লোকের সাজ সজ্জা সম্বন্ধে মেগাস্থিনিস্ বলেন— "In contrast to the general simplicity of their style, they love finery & ornament. Their robes are worked in gold and ornamented with precious stones, and they wear also flowered garments made of the finest muslin."

(R. C. Dutt's Civilization in Ancient India P. 229)

পাটলিপুত্র নগরে মেগাস্থিনিস্ একটি শোভাযাত্রা দেখিয়া গিয়াছিলেন। সেই শোভাযাত্রায় বহুতর জন্তু ও দ্রব্য প্রদর্শিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কারে সজ্জিত হস্তী ও অশ্ব, স্বর্ণপাত্র ও মূল্যবান্ প্রস্তরখোদিত নানাবিধ ধাতব দ্রব্য এবং স্বর্ণনির্ম্মিত জড়োয়া বস্ত্র বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

সম্রাট কণিষ্ক তাঁহার রাজধানী পুরুষপুরে (বর্ত্তমান পেশোয়ার) একটি উচ্চ স্তূপ ও একটি বৃহৎ বিহার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহাতে ভগবান্ বুদ্ধদেবের পবিত্র দেহাবশেষ রক্ষিত হইয়াছিল। খৃষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক হু-য়েন স্যাং এই বিহারের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া গিয়াছিলেন। সম্রাট কণিষ্কের নির্ম্মিত স্তূপটির তখন জীর্ণ সংস্কার হইতেছিল। এই স্তূপটি ৪০০ ফুট উচ্চ, পঁচিশটী চূড়া বিশিষ্ট ও পঞ্চতল ছিল। ইহার সর্ব্বনিম্নতলের উচ্চতা ১৫০ ফুট ছিল। পঁচিশটী চূড়ার মাথায় ২৫টি স্বর্ণরঞ্জিত বৃহৎ তাম্রচক্র ছিল। এই স্তূপের মধ্যে হু-য়েন-স্যাং একটি ১৬ ফুট উচ্চ বুদ্ধদেবের চিত্রিত ছবি, এবং ১৮ ফুট উচ্চ শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত এক দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্ত্তি দর্শন করেন। এই অত্যাশ্চর্য্য স্তূপ কালপ্রভাবে ধ্বংস ও মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের চেষ্টায় এই স্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে ও তাহাতে রাজা কণিষ্কের নামাঙ্কিত, তাঁহার মূর্ত্তিযুক্ত, পিত্তলের কৌটামধ্যে রাজা কণিষ্কের শিলমোহর ও রাজচিহ্নাঙ্কিত স্ফটিকাধারে শাক্যসিংহের তিন খণ্ড দেহ-পঞ্জর প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

বৌদ্ধযুগের পর হিন্দু ও মুসলমান শিল্পীর সম্মিলনে ভারতের শিল্পকলা উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিল। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহা আলোচনার বিষয় নহে।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রায়।

শূদ্রজাতি।

বর্ত্তমান সময়ে আর্য্য-সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি জাতি ব্যতীত আরও নানা জাতি দৃষ্ট হয়। তাহারা বর্ণশঙ্কর বলিয়া কথিত হয়। প্রাচীন সময়ে শূদ্র জাতি বলিতে কাহাদিগকে বুঝাইত আমরা এই প্রবন্ধে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

মহর্ষি পাণিনি শকাব্দের সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হন ইহা বোধ হয় এক্ষণ অনেকেই স্বীকার করেন।

মহর্ষি পাণিনি প্রণীত অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ হইতে আমরা একটি সূত্র উদ্ধৃত করিতেছি যথা:—

শূদ্রাণাম্ অনির বসিতানাম্

দ্বিতীয় অধ্যায় ৪ পাদ ১০ সূত্র

অনিরবসিত শূদ্রবাচক শব্দের দ্বন্দ্ব সমাস এক বচনান্ত হয়

বৃত্তি:—

যে র্ভুক্তে পাত্রং সংস্কারেণাপি ন শুধ্যতি তে নিরবসিতাঃ।

তদ্ভিন্না যে শূদ্রাস্তদ্বাচিনাং দ্বন্দ্ব একবৎ স্যাৎ।

যাহারা ভোজন করিলে সংস্কার দ্বারাও ভোজন পাত্র শুদ্ধ হয় না তাহাদিগকে নিরবসিত বলা যায়। তদ্ভিন্ন অন্যান্য শূদ্রজাতি শব্দের দ্বন্দ্ব সমাস হইলে একবচনান্ত হয়।

ভাষ্য দ্বিতীয় অধ্যায় ৪র্থ পাদ দ্বিতীয় আহ্নিক।

শূদ্রাণাম নিরবসিতানাম্।

অনিরবসিতা নামিত্যুচ্যতে: কুতোঽনিরবসিতানাম্। আর্য্যাবর্ত্তাদনির বসিতানাম্। কঃ পুনরার্য্যাবর্ত্তঃ। প্রাগাদর্শাৎ প্রত্যক্কাল যবনাদ্দক্ষিণেন হিমবন্ত মুত্তরেণ পারিযাত্রম্। যদ্যেবং কিষ্কিন্ধ গন্ধিকং শকযবনং শৌর্পক্রৌঞ্চমিতি ন সিধ্যতি। এবং তর্হ্যার্য্যানিবাসাদনিরবসিতানাম্। কঃ পুনরার্য্যনিবাসঃ।

গ্রামো ঘোষো নগরং সংবাহঃ সংস্ত্যায়া ইতি। এবমপি য এতে মহান্তঃ সংস্ত্যায়াস্তেষভ্যন্তরাশ্চণ্ডালামৃতপাশ্চ বসন্তি। তত্র চণ্ডাল মৃতপা ইতি ন সিধ্যতি। এবং তর্হি যজ্ঞাৎ কর্ম্মণোঽনিরবসিতানাম্। এবমপি তক্ষায়স্কারং রজক তন্তুবায় মিতি ন সিধ্যতি।

এবং তর্হি পাত্রাদনিরবসিতানাং যৈর্ভুক্তে পাত্রং সংস্কারেণ শুধ্যতি তেঽনির-

বসিতাঃ। যৈর্ভুক্তে পাত্রং সংস্কারেণাপি শুধ্যতি শ শুধ্যতি তে নিরবসিতা ইতি।

অনুবাদ

সূত্রে অনিরবসিতা বলা হইয়াছে। কোন্ স্থান হইতে অনিরবসিতা। (নিরবসিত শব্দে বহিস্কৃত বুঝা যায়) আর্য্যাবর্ত্ত হইতে অবহিস্কৃত কি? আর্য্যাবর্ত্ত শব্দে কোন্ স্থান বুঝা যায়?

আদর্শের পূর্ব্ব, কালকবনের পশ্চিম, হিমালয়ের দক্ষিণ, এবং পারিযাত্রের উত্তর এই স্থান আর্য্যাবর্ত্ত।

আর্য্যাবর্ত্ত হইতে অবহিস্কৃত এরূপ অর্থ করিলে কিষ্কিন্ধ গন্ধিকং শকযবনং শৌর্পক্রৌঞ্চং এই সমস্ত পদ কিরূপে সাধন হইল? ইহারা আর্য্যাবর্ত্তের বাহিরে বাস করিয়া থাকে। অতএব আর্য্যাবর্ত্ত হইতে অবহিস্কৃত এরূপ অর্থ করা যায় না।

তবে কি আর্য্য-নিবাস হইতে অবহিস্কৃত বুঝিতে হইবে? আর্য্য-নিবাস কাহাকে বলে?

গ্রাম ঘোষনগর সংবাহ ইত্যাদি। বৃহৎ বৃহৎ গ্রাম, ঘোষনগর সংবাহাদিতে চণ্ডাল এবং মৃতপাগণ বাস করিয়া থাকে। এই অর্থ হইলে "চণ্ডাল মৃতপাঃ" এই পদ সাধন হইতে পারে না। অতএব এই অর্থ হইবে না।

তবে কি যজ্ঞ-কর্ম্ম হইতে অবহিস্কৃত বুঝিতে হইবে? এই অর্থ হইলে "তক্ষায়স্কারং" "রজক তন্তুবায়ং" এই পদগুলি সাধন হয় না।

অতএব পাত্র হইতে অনিরবসিত বুঝিতে হইবে অর্থাৎ যাহারা ভোজন করিলে ভোজনপাত্র সংস্কার দ্বারা শুদ্ধ হয়, তাহারা অনিরবসিত। আর যাহারা ভোজন করিলে ভোজনপাত্র সংস্কারদ্বারা শুদ্ধ হয় না তাহারা নিরবসিত। ইতি।

কৈয়টভাষ্য দ্বারা অবগত হওয়া যায়:—

নিরবসিতা বহিস্কৃতা। উচ্যন্তে।
আদর্শাদয় পর্ব্বতবিশেষাঃ।
ঘোষো গো মহিষ্যাদিনিবাসঃ।
সংবাহো বণিক্ প্রধানঃ। সংস্থায়া
ইতি নিবাস বিশেষা ইত্যর্থঃ।

মৃতপা ডোম্বা ইত্যাহুঃ। শূদ্রাণাং পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠানেঽধিকারোঽস্তীতি। তক্ষায়স্কারমিতি তক্ষাদীনাং যজ্ঞেঽধিকারাভাবাদিতিভাবঃ।

ইহার অর্থ।

আদর্শ প্রভৃতি পর্ব্বত বিশেষের নাম। গো মহিষাদির বাসস্থান ঘোষ বলিয়া কথিত হয়। বণিক প্রধান স্থান সংবহ। সংস্ত্যয়া নিবাস বিশেষ। মৃতপা এক্ষণ ডোম বলিয়া কথিত হয়। শূদ্রগণের পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠানে অধিকার আছে। তক্ষা এক্ষণ সূতার বলিয়া কথিত হয়। অয়স্কার লৌহ কর্ম্মকার। তক্ষাদির যজ্ঞে অধিকার নাই।

ভাষ্য পাঠ করিলে দেখা যায় এক সময়ে কিষ্কিন্দ, গন্ধিক, শক, যবন, শৌর্প ক্রৌঞ্চ, তক্ষা, অয়স্কার চণ্ডাল, মৃতপা সকলেই শূদ্রজাতি মধ্যে পরিগণিত হইত। এক্ষণ ইহারা শূদ্র জাতি বলিয়া সমাজে পরিগণিত হয় না।

পুরাণ পাঠ করিলে এক্ষণ দেখা যায় নানা জাতি বর্ণশঙ্কর বলিয়া কথিত হয়। বাস্তবিক আর্য্য-সমাজের প্রথম অবস্থায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ব্যতীত আর কোন জাতি ছিল না।

শ্রীরেবতীমোহন গুহ।

দেবটিকা সম্প্রদায়।

৩

সুরেন্দ্রবাবু প্রস্থান করিলে কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু বলিলেন, "কি ডাক্তার এই 'দেবটিকা' সম্প্রদায়' সম্বন্ধে তোমার কি মত?"

আমি বলিলাম, "আমি তো কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না; আপনি কি স্থির করিলেন?"

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু কোন উত্তর না দিয়া আর্ম চেয়ার থানি বাতায়নের দিকে টানিয়া লইয়া গেলেন এবং পকেট হইতে 'সিগার-কেস্' বাহির করিয়া একটি সিগারে অগ্নি সংযোগ করিলেন। হাত দুইটী বক্ষোপরে স্থাপিত হইল, পদদ্বয় দুলিতে লাগিল, চক্ষু মুদ্রিত হইল এবং মুখ হইতে ধূমরাশি বহির্গত হইয়া ধীরে ধীরে জানালারদিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল। ক্রমে তিনটা চুরুট ভস্মে পরিণত হইলে হঠাৎ কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু আসন পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। চাহিয়া দেখিলাম তাঁহার বদনে স্থির সঙ্কল্পের ভাব সুস্পষ্ট অঙ্কিত হইয়াছে। তিনি বলিলেন অদ্য বোসের সার্কাসে ম্যাটিনি হইবে, তথায় যাইতে ইচ্ছা করি তোমার হাতে তো তেমন গুরুতর রোগী নাই?

"আজ আমার বিশেষ কোনও 'কল্' নাই ;"

"তবে উঠ"

উভয়ে দুইটি ছাতা লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলাম। যথাসময়ে ট্রামের প্রথম শ্রেণীর একটী আসনে আমরা উভয়ে উপবেশন করিলাম ট্রামে উঠিয়া কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু একখানি ষ্টেট্‌স্‌মেন্ ক্রয় করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন, আমি কেবল দেব টিকা সম্প্রদায়ের কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম ; ২০ মিনিট পর আমরা ক্লাইভ্ ষ্ট্রীটের নিকট উপস্থিত হইলে কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু 'বেল্' টানিয়া দিলেন ; গাড়ী সংযত করিলে আমরা অবরোহণ করিয়া পদব্রজে সুরেন্দ্র বাবুর গৃহাভিমুখে চলিলাম।

যথাসময়ে সুরেন্দ্রবাবুর বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম ; একটি ক্ষুদ্র একতালা গৃহের সম্মুখে, "সুরেন্দ্রনাথ সেন, মার্চ্চেণ্ট" এই কথাগুলি ইংরাজীতে লিখিত রহিয়াছে। দেখিতে পাইলাম ; কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু তাঁহার ছাতা দ্বারা রাস্তার উপরে আঘাত করিতে করিতে বাড়ীর সম্মুখে বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে পুনরায় বাড়ীর সম্মুখে থামিয়া দ্বারে সজোরে আঘাত করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে একটি যুবক দেখা দিল। সে আমাদিগকে ভিতরে যাইতে অনুরোধ করিল।

কৃষ্ণগোবিন্দবাবু বলিলেন "মহাশয়, এখান হইতে কোন দিক দিয়া লালদীঘি যাওয়া যায় বলিতে পারেন কি ?"

"তৃতীয় বাটী পার হইয়া ডানদিকে এবং পঞ্চম বাটী পার হইয়া বামদিকে যান।" এই বলিয়া লোকটী পুনরায় কবাট বন্ধ করিল।

কৃষ্ণগোবিন্দবাবু বলিলেন, "লোকটা অত্যন্ত চতুর।"

"সুরেন্দ্রবাবুর ঘটনার সঙ্গে যে এই লোকটীর বিশেষ সম্বন্ধ আছে তা হা আমি কতকটা অনুমান করিয়াছি।" "উহাকে কিরূপ দেখিলেন ?"

"উহাকে দেখিবার জন্য ডাকি নাই ;"

"তবে ;"

"উহার হাঁটুর কাপড় দেখিবার জন্য ;"

"কি দেখিলেন ?"

"যাহা আশা করিয়াছিলাম তাহাই ;"

"আচ্ছা, আপনি রাস্তায় ওপ্রকার ছাতায় আঘাত করিলেন কেন ?"

"এখন কথা কহিবার সময় নয় ; কাজের সময়। একবার সুরেন্দ্র বাবুর

ষ্ট্রীটের ও ক্লাইভষ্ট্রীটের মধ্যস্থিত গলিটা দেখিতে হইবে ;"

আমরা সুরেন্দ্র বাবুর বাড়ীর পশ্চাৎদিকের গলিতে প্রবেশ করিলাম ; বড় বড় মার্চ্চেন্টের গগনস্পর্শী অট্টালিকাশ্রেণীতে ক্লাইভ্ ষ্ট্রীট্ সুশোভিত, সর্ব্বদাই ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণের জনতায় পরিপূর্ণ ;—তাহার পশ্চাতে এপ্রকার নির্জ্জন সঙ্কীর্ণ গলির অস্তিত্ব থাকিতে পারে তাহা আমি কল্পনাও করিতে পারি নাই।

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু গলিটা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া লইলেন। তৎপর যথাসময়ে দুইখানি টিকিট ক্রয় করিয়া আমরা বোসের সার্কাসে আসন গ্রহণ করিলাম ৪টার সময় খেলা ভাঙ্গিয়া গেল, আমরা এস্প্লানেডের ট্রামের আড্ডায় উপস্থিত হইলে কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু বলিলেন, "তুমি বুঝি এখন বাড়ী যাইবে ডাক্তার ?"

"হাঁ,—অনেকক্ষণ আসিয়াছি ;"

"আমার কিছু কাজ আছে, কয়েক ঘণ্টা বিলম্ব হইবে ;—সুরেন্দ্র বাবুর 'কেসটি' খুব গুরুতর ;"

"কি রকম গুরুতর ?"

"কোনও ভীষণ ষড়যন্ত্র কার্য্যে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে ; তবে আমার বিশ্বাস যে আমরা উপযুক্ত সময়েই বাধা প্রদান করিতে সক্ষম হইব। বিশেষতঃ আজ শনিবার হওয়ায় ঘটনাটা অনেকটা সহজ হইয়া পড়িয়াছে। অদ্য রাত্রে তোমার সহায়তা আবশ্যক।

"ক'টার সময়

"১০টার মধ্যে আসিলেই চলিবে ;"

"রাত্রি দশটায় আপনার গৃহে উপস্থিত হইব।"

"বেশ ; কিন্তু ডাক্তার তোমার রিভলভারটি সঙ্গে লইও,—বিপদের সম্ভাবনা আছে ;"

এই বলিয়া কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু জনতার মধ্যে অদৃশ্য হইলেন, আমিও কালীঘাট গমনোন্মুখী একটি ট্রামে উঠিয়া পড়িলাম ; দেবটিকা সম্প্রদায়ের কথা ভাবিতে লাগিলাম ; আমি এ পর্য্যন্ত কিছুই অনুমান করিয়া উঠিতে পারি নাই, অথচ কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর কথাবার্ত্তায় প্রতীয়মান হইল তিনি যেন সকল বিষয়ই নিশ্চয় জানিতে পারিয়াছেন। পিস্তল লইয়া রাত্রি দশটার সময় তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইবার জন্য তিনি অনুরোধ করিয়া গেলেন ; সুরেন্দ্র বাবুর সেই চতুর গোমেস্তাটি কি কাহাকেও হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছে ? কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

(৪)

রাত্রি সোয়া নয়টার সময় গৃহ হইতে বাহির হইলাম. কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর গৃহে উপনীত হইয়া দেখিলাম একটা খড়ের গাড়ী দণ্ডায়মান রহিয়াছে ; গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর সহিত একটি দীর্ঘকায় মারোয়ারী ভদ্রলোক ও লালবাজার থানার ইন্স্পেক্টর বিনয় সেন উপবিষ্ট রহিয়াছে। মারোয়ারী ভদ্রলোকটির পরিচ্ছদ্ বেশ মূল্যবান।

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু আমাকে দেখিয়া বলিলেন, " আমাদের দল পূর্ণ হইল ; ডাক্তার. ইন্স্পেক্টর সেন তোমার পরিচিত ; অপর ভদ্রলোকটির নাম জহরচাঁদ বাবু ইনি, অদ্যরাত্রে আমাদের সহযাত্রী।"

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু বিনয় বাবুকে বলিলেন ইন্স্পেক্টর ;—তোমার আজ স্বর্ণযোগ উপস্থিত, যাহাকে ৩ বৎসর ধরিয়া খুজিয়া বেড়াইতেছ—সেই লোকটি।

"খুনি ব্রজেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ? লোকটা চোর, ডাকাত, খুনী জুয়াচোর একাধারে সব। বুঝিয়াছেন জহরচাঁদ বাবু লোকটার বুদ্ধি যেমন অত্যন্ত তীক্ষ্ণ কার্য্যতৎপরতাও উহার সেইরূপ অসাধারণ ; অদ্য ঢাকায় এক কাণ্ড বাধাইয়াছে দুইদিন পর কলিকাতায় হয়তো আর এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ; এ পর্য্যন্ত আমরা উহার সাক্ষাৎ লাভই"—

"আশা করি অদ্যরাত্রে পারিবেন ; লোকটা অত্যন্ত চতুর তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই ; যাহা হউক এখন দশটা বাজিয়াছে,—আমাদের রওনা হইবার সময় উপস্থিত।"

আমরা চারিজনে জহরচাঁদ বাবুর 'ল্যাণ্ডো'তে উপবেশন করিলাম, গাড়ী কলিকাতাভিমুখে বেগে ধাবিত হইল। বিনয় সেনের নিকট হইতে অবগত হইলাম জহরচাঁদ বাবু "সিটি সুবার্ব্বণ ব্যাঙ্কের" প্রধান পরিচালক ;

যথাসময়ে গাড়ী "সুবার্ব্বন্" ব্যাঙ্কের সুবৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া থামিল ; জহরচাঁদ বাবু স্বয়ং আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন। প্রথমে সদর দরজা পার হইয়া একটি গৃহে প্রবেশ করিলাম তথা হইতে একটি সঙ্কীর্ণ ঘরের ভিতর দিয়া একটি লৌহ নির্ম্মিত দ্বারের নিকটে উপস্থিত হইলাম ; জহরচাঁদ বাবু তালা উন্মুক্ত করিলে আমরা একটি গৃহে প্রবেশ করিলাম। গৃহটির অপর পার্শ্বে আর একটি লৌহ নির্ম্মিত দ্বার ; উক্ত দ্বার পার হইয়া আমরা একটি অন্ধকার গৃহে প্রবেশ করিলাম ; জহরচাঁদ বাবু হস্তস্থিত ইলেক্ট্রিক লাইটের বোতামে আঘাত করিলেন, উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকে ঘরের

পাটাতনের উপরে একটি সুবৃহৎ লৌহদ্বার প্রকাশিত হইল, জহরচাঁদ বাবু চাবি ঘুরাইতেই উহা সরিয়া গিয়া একটি অপ্রশস্ত সোপান পরিলক্ষিত হইল; উক্ত সোপান দিয়া নীচে নামিয়া আমরা একটি ক্ষুদ্র কুঠুরীতে উপস্থিত হইলাম, কুঠুরীটি প্যাকিং বাক্সে পরিপূর্ণ।

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু বলিলেন, 'উপর হইতে এখানে প্রবেশ করা অসম্ভব;"

'নীচ হইতেও তদ্রূপই" বলিয়া জহরচাঁদ বাবু পাটাতনের উপর আঘাত করিলেন তৎপর বলিলেন, "একি! শব্দটা যে ফাঁপা ফাঁপা বোধ হইতেছে!"

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু উগ্রভাবে বলিলেন, "মহাশয়!—একটু শান্তভাবে অবস্থান করুন, আপনি দেখিতেছি সমস্ত পরিশ্রম বিফল করিবেন। অনুগ্রহ পূর্ব্বক একটি বাক্সের উপরে উপবেশন করিয়া নীরবে অবস্থান করুন—আমাদিগের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া সমস্ত পণ্ড করিতে আসিবেন না।"

জহরচাঁদ বাবু লজ্জিত হইয়া একটি বাক্স গ্রহণ করিলেন, কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু কুঠুরীটি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। কয়েক সেকেণ্ড দেখিয়া বলিলেন "এখনও আমাদিগের হস্তে একঘণ্টা সময় আছে; যতক্ষণ পর্য্যন্ত সুরেন্দ্র বাবু শয্যা গ্রহণ না করিবেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা আসিতে চেষ্টা করিবে না। সুরেন্দ্র বাবু শয়ন করিলে পরে তাহারা যত শীঘ্র সম্ভব কার্য্য সমাপ্ত করিতে চেষ্টা করিবে! ডাক্তার! বুঝিতে পারিয়াছ কি? দুর্বৃত্তগণ কেন যে এখানে আসিবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে তাহার কারণ জহরচাঁদ বাবু অবগত আছেন।

জহরচাঁদ বাবু মৃদুস্বরে কহিলেন, টাকা—টাকা, টাকা!

আমরা আগ্রা ব্যাঙ্ক হইতে চারিলক্ষ টাকা আনাইয়াছি তাহা রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে; এই প্যাকিং বাক্স গুলি দেখিতেছেন, ইহাতে এখনও দুইলক্ষ টাকা মজুত রহিয়াছে!

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু বাধাদিয়া বলিলেন, "এখন আমাদের সাবধান হওয়া আবশ্যক; আমার বিশ্বাস ঘণ্টাখানিকের মধ্যেই তাহারা উপস্থিত হইবে এই সময়টুক আমাদিগকে অন্ধকারে অবস্থান করিতে হইবে;—জহরচাঁদ বাবু! ইলেক্ট্রিক্ লাইট নিভাইয়া দিন্।"

এখন আপনারা নিজ নিজ স্থান বাছিয়া লউন; দুর্বৃত্তগণ অত্যন্ত সাহসী,— যদিও তাহারা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত থাকিবে না তথাপি বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক; আমি এই বাক্সটির পশ্চাতে লুকাইত থাকিব আপনারা ঐটির পশ্চাতে অবস্থান

করুন, যেই আমি ল্যাম্প প্রজ্বলিত করিব অমনই সকলে—আক্রমণ করিবেন ; ডাক্তার ! যদি তাহারা পিস্তল চালায় তবে অবশ্য চাহিয়া থাকিবে না।"

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, "তাহাদের পলায়নের আর একটী পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে ;—পুনরায় সুরঙ্গ দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সুরেন্দ্র বাবুর বাড়ী দিয়া পলাইতে পারে ; বিনয় বাবু ! যাহা বলিয়াছিলাম করিয়াছেন তো ?"

"সুরেন্দ্র সেনের বাটীর সম্মুখে ৩ জন কনেষ্টবল সহ একজন সবইনেস্পেক্টর দণ্ডায়মান আছে ;"

"তাহা হইলে সকল পথই বন্ধ হইয়াছে ;" এই বলিয়া কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু নীরব হইলেন। আমরা সকলে নীরবে দণ্ডায়মান রহিলাম ; ক্রমে দেড়ঘণ্টা কাটিয়া গেল, কেহই আসিল না ! এই দেড় ঘণ্টা আমার নিকট এত দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল যে বোধ হইল বুঝি সমস্ত রাত্রিই কাটিয়া গেল।

দেড় ঘণ্টা কাটিয়া গেলে মেজের উপরে মট্ করিয়া একটা শব্দ শ্রবণগোচর হইল ;—ক্রমে তথায় একটী আলোকরশ্মি দৃষ্ট হইল। ক্রমে রশ্মিটুকু হ্যারিকেন্ লণ্ঠনে পরিণত হইল, অবশেষে একটি হস্তের কিয়দংশ দৃষ্টিগোচর হইল। তারপর আবার হঠাৎ অদৃশ্য হইল গৃহটি পুনরায় আঁধার হইল। পাঁচ মিনিট পর একটি লোক পাটাতনের একটি পাথর সরাইয়া গৃহের ভিতরে প্রবেশ করিল ; লোকটি নিজে উঠিয়া আর একটি লোককে টানিয়া তুলিল ; সঙ্গীটিও তাহার ন্যায় শ্মশ্রু গুম্ফহীন কিন্তু তাহার কপালে একটি সুবৃহৎ কৃষ্ণ তিল।

লোকটা ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল "প্রভাত ! তুই হাতুর, বাটাল, বাস্ ইত্যাদি আনিয়াছিস্ তো ?—সর্ব্বনাশ একি ! নীচে লাফাইয়া পর ;—আমি—"

ইতিমধ্যে কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু সজোরে তাহার গলা টিপিয়া ধরাতে 'আত্মরক্ষা করা" আর ঘটিয়া উঠিল না ; অপর লোকটি নীচে লম্ফ প্রদান করিয়াছিল, বিনয় বাবু তাহার সার্ট ধরিয়া ফেলিলেন ; কিন্তু সার্টের একাংশ তাঁহার হস্তে রহিয়া গেল—লোকটী সুরঙ্গের মধ্যে অদৃশ্য হইল।

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু বলিলেন, "পরিশ্রম অনাবশ্যক, বিনয় বাবু ;—লোকটী আপনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে।"

অপর দুর্ব্বৃত্ত ব্যঙ্গের সহিত কহিল, "তাহাই দেখিতেছি ;—প্রভাত মজুমদার এখন নিরাপদ !"

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু সহাস্যে বলিলেন, "একেবারে নিরাপদ নয় ; তাহার জন্য সুরেন্দ্র বাবুর গৃহে ৪ চারিজন লোক অপেক্ষা করিতেছে ;"

"বটে! তবে তো সকল দিকই ঠিক আছে; আপনাদিগকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না;"

"আমরাও তোমার প্রাপ্য প্রশংসা হইতে বঞ্চিত করিতে ইচ্ছা করি না,—তোমার "দেব-টিকা সম্প্রদায়ের" ফন্দিটি চমৎকার হইয়াছিল!"

ক্ষণকাল মধ্যেই দুর্বৃত্তেরা ধৃত হইল। সৌভাগ্য বশতঃ—রক্তপাত হইল না।

জহরচাঁদ বাবু বলিলেন—"বাস্তবিক, কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু! আপনার ঋণ আমরা কখন পরিশোধ করিতে পারিব না; আপনি যেরূপ অদ্ভুত উপায়ে অন্ধকার বিপদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিলেন তাহা অতুলনীয়।

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু বলিলেন. দেবটিকা-সম্প্রদায়ের একটা কিনারা করিতে পারিয়াই যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছি;—তদ্ব্যতীত আর কিছু চাই না।"

পরদিন প্রাতে কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর গৃহে চা পান করিবার সময়ে তিনি সমস্ত ঘটনা বুঝাইয়া দিলেন। বলিলেন, "দেখ ডাক্তার, যখন সুরেন্দ্র বাবুর নিকটে শুনিলাম প্রত্যহ তাঁহাকে চারি ঘণ্টা বিশ্বকোষ নকল করিতে হইত, অনুপস্থিত হইলে কিছুতেই চলিত না, তখন বুঝিলাম কতকগুলি লোক তাঁহাকে গৃহ হইতে অনুপস্থিত রাখিতে চায়; তারপর চিন্তা করিয়া দেখিলাম যাহারা প্রতি সপ্তাহে ২৫৲ টাকা করিয়া ব্যয় করে তাহাদের লোভ—বিশ পঁচিশ হাজারের নিম্নে নহে। "দেবটিকা সম্প্রদায়ের" ফন্দি—ব্রজেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর মস্তিষ্ক উদ্ভূত সন্দেহ নাই; যাহা হউক, যখন শুনিলাম সুরেন্দ্র বাবুর সেই গোমস্তাটি এত অল্প বেতনে থাকিতে স্বীকৃত হইয়াছিল, তখন বুঝিলাম, কোনও উদ্দেশ্য সাধনার্থ সে ঐ গৃহে থাকিতে চায়।"

"কিন্তু কি উদ্দেশ্যে সে ঐ গৃহে থাকিতে চায় তাহা অনুমান করিলেন কি প্রকারে?"

"যদি সুরেন্ বাবুর গৃহে কোনও সুন্দরী যুবতীর অস্তিত্ব থাকিত তাহা হইলে গুপ্তপ্রেমের' সন্দেহ হইলেও হইতে পারিত; সুরেন্ বাবু একজন গরীব লোক, তাঁহার গৃহে চুরি বা জুয়াচুরী করিতে কখনও এত আয়োজন ও অর্থব্যয়ের আবশ্যক হইতে পারে না; কাজেই বুঝিলাম ইহার সহিত বাহিরের ঘটনার সংস্রব আছে;—তাহা কি হইতে পারে চিন্তা করিয়া দেখিলাম; তার পর যখন শুনিলাম গোমস্তাটি ফটোগ্রাফির অজুহাতে একটা কুঠুরীর ভিতরে প্রবেশ করিত তখন কতকটা অনুমান করিয়া উঠিতে পারিলাম লোকটি দুই মাস ধরিয়া ঐ কুঠুরীতে বসিয়া কি করিত? তখন স্থির বিশ্বাস হইল, লোকটি নিকটবর্ত্তী কোনও বাড়ী

পর্য্যন্ত সুরঙ্গ করিতেছিল।

"ডাক্তার! যখন তোমাকে লইয়া ঐ স্থানে গেলাম তখন সুরেন্ বাবুর গৃহের সম্মুখে ছাতার আঘাত করিতেছিলাম; আঘাত করিয়া বুঝিলাম, সুরঙ্গ সে দিকে নয়; তখন দ্বারে আঘাত করিলাম, লোকটি—বাহির হইয়া আসিল; তাহার মুখের দিকে একবারও চাহিলাম না, তাঁহার উরুর কাপড় দেখিয়া লইলাম দেখিলাম কাপড়ের সেই অংশ অত্যন্ত মলিন ও স্থানে স্থানে ছিন্ন হইয়াগিয়াছে; তখন সুরঙ্গ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলাম,—কিন্তু ভাবিলাম কোন্ বাড়ীতে সুরঙ্গ কাটা সম্ভব; তারপর বাড়ীর পশ্চাৎদিকস্থ গলিতে আসিয়া যখন দেখিলাম, সিটি সুবার্ব্বণ ব্যাঙ্ক রাস্তার অপরপার্শ্বেই অবস্থিত তখন সকল কথা বুঝিতে পারিলাম।"

"তারপর বোসের সার্কাস্ দেখিয়া তুমি বাড়ী চলিয়া গেলে, আমি পুলিস কমিশনারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সহিত জহরচাঁদ বাবুর গৃহে গেলাম; তাহার পর সমস্তই তুমি অবগত আছ।"

"সবই বুঝিলাম; কিন্তু কল্যরাত্রিতেই যে তাহারা চুরি করিতে চেষ্টা করিবে তাহা ঠিক করিলেন কি প্রকারে?"

"কল্য তাহারা সম্প্রদায় ভাঙ্গিয়া যাইবার ঘোষণা পত্র টাঙ্গাইয়া ছিল, সুতরাং বুঝিলাম কল্য হইতে তাহারা সুরেন্দ্র বাবুর অনুপস্থিতি অনাবশ্যক মনে করে, অর্থাৎ কল্য তাহাদের সুরঙ্গনির্ম্মাণ শেষ হইয়াছিল; ইহাও বুঝিলাম যে তাহারা যত শীঘ্র সম্ভব কার্য্যোদ্ধার করিতে চেষ্টা করিবে কারণ বিলম্ব করিলে সুরেন্দ্র বাবু কর্ত্তৃক সুরঙ্গটি আবিষ্কৃত হইয়া যাইতে পারে। তারপর কল্য শনিবার,—বলিয়াছিলাম শনিবার হওয়ায় ঘটনাটা সহজ হইয়া পড়িয়াছে,—শনিবারদিন চুরি করিলে পলায়ন করা অতি সহজ, কারণ সোমবার পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কে চুরির কথা অজ্ঞাত থাকিত—;"

"আপনার যুক্তিগুলি অখণ্ডনীয়;"

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "জীবনটা কেবল পাপের রহস্য ভেদ করিয়াই কাটাইলাম!"

"সে জন্য সমাজ আপনার নিকট কৃতজ্ঞ, সন্দেহ নাই।"

সমাজ কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর নিকটে ঋণী কি না তাহার বিচারের ভার পাঠক পাঠিকার হাতে অর্পণ করিয়া বর্ত্তমান সময়ের জন্য বিদায় গ্রহণ করিলাম। *

সমাপ্ত। শ্রীঅ—

* Adventures of Sherlock Holmes হইতে গৃহীত।

ভুতের বাড়ী।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সংকল্প।

হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত অনল চাপিয়া রাণী অমলাবাই দিন কাটাইতে লাগিলেন। তাঁহার একমাত্র সুহৃদ্ কাঞ্চনও এখন কাছে নাই। কে তাঁহাকে এই দুর্দ্দিনে সান্ত্বনা করিবে? কে তাঁহার ব্যথার ব্যথী হইবে?

স্বামী স্ত্রী উভয়েই আরাম ভবনের দ্বিতলে বাস করেন। দুই জন দুই কক্ষে; একটী প্রাচীর মাত্র ব্যবধান। তবু পরস্পর আলাপ নাই। অমলাবাইএর কক্ষ অতিক্রম করিয়া কুমার সিংহ প্রতিদিন ২।৩ বার নীচে যান, আবার উপরে আসেন। রাজা দৃঢ় পদবিক্ষেপে অমলাবাইএর কক্ষ অতিক্রম করিয়া যান দ্বারের দিকে একবার দৃষ্টিপাতও করেন না। রাণী প্রতিদিন ঠিক সময়ে অতি সন্তর্পণে কপাটের কাছে দাঁড়াইয়া থাকেন আর কপাটের ছিদ্র-পথে স্বামীর দর্শনলাভ করেন, আবার বিষণ্ণ মনে শয্যা গ্রহণ করেন!

এইরূপ দিন গেল, সপ্তাহ গেল, মাস গেল, স্বামী স্ত্রীর সাক্ষাৎ হইল না। যদিও উভয়ে দেখা হইত না তবু কেহই কাহারও কথা এক মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিতে পারিলেন না।

কুমার সিংহ অমলাবাইএর কথা বিস্মৃত হইতে অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু পারিলেন না; পারা অসম্ভব। তিনি রাণীকে যে পাপে অপরাধিনী মনে করিয়াছিলেন সেই পাপের ক্ষমা নাই। অমলাবাইও স্বামীর ব্যবহারে অরুন্তুদ মর্ম্ম বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। স্বামীর অদম্য ক্রোধের কারণ তিনি কিছুই খুজিয়া পাইলেন না; তাঁহার চিঠির মর্ম্মও তিনি বুঝিতে সমর্থ হইলেন না। স্বীয় নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে অমলাবাইএর অটল বিশ্বাস ছিল। এইজন্য স্বামীর কঠোর নির্য্যাতন তাঁহার অধিকতর তীব্র বোধ হইতে লাগিল।

রাজা স্বীয় সম্মান অব্যাহত রাখিয়া রাণীকে আরাম ভবন হইতে অপসারিত করিবার উপায় দেখিতেছিলেন। উদ্দেশ্যের অনুরোধে তিনি স্থৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু এ গাম্ভীর্য্য কৃত্রিম। ঝড়ের পূর্ব্বাভাস মাত্র। রাজা চিত্ত-চাঞ্চল্য বিস্মৃত হইবার জন্য মৃগয়ায় অতিরিক্ত উন্মত্ত হইলেন। তিনি সকালে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া আরাম ভবন হইতে বাহির হইয়া যান আর সন্ধ্যার পূর্ব্বে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইল।

অমলাবাইএর দিন যায় না। তিনি আর নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিলেন না। স্বামীর হৃদয়ে কণ্টকের ন্যায় বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন, ইহা প্রতিমুহূর্ত্তে তিনি অনুভব করিয়া নিজের জীবনকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। অবশেষে একদিন স্থির করিলেন—"আর এরূপ ভাবে থাকা উচিত নয় যেরূপেই হউক স্বামীর হৃদয়ের ক্ষোভ দূর করিব।" স্বামীর সহিত নিজেই সাক্ষাৎ করিয়া স্বীয় অপরাধ কি জানিবার জন্য দৃঢ় সংকল্প করিলেন। রাজা যে কোন ভ্রম ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া বিচলিত হইয়াছেন সে বিষয়ে রাণীর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না।

সংকল্প স্থির হইল। কিন্তু রাণীর হৃদয়ে কোথা হইতে এক অজানিত বিপদের আশঙ্কা জাগিয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল এ দেখাই শেষ দেখা। তিনি সজল নয়নে ভগবানের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিলেন; অনেক ভাবিলেন কিন্তু কিছুতেই সংকল্প ত্যাগ করিলেন না।

নবম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বাভাস।

অমলাবাই নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া ভাবিতে ছিলেন কিরূপে স্বামীর সহিত এতদিন পর কথা বলিবেন! কি বলিয়া আরম্ভ করিবেন। কুমার সিংহের সহিত তাঁহার প্রথম দর্শনের কথা মনে পড়িল! তখন বালিকার হৃদয়ে কিরূপে অজ্ঞাতে প্রেম অঙ্কুরিত হইয়াছিল তাহা স্মরণ হইল। যুবক-যুবতীর আবেগ পূর্ণ উচ্ছ্বাসের কথা আবার হৃদয়ে জাগিল। বিবাহের পর স্বামী স্ত্রী কিরূপ সুখী হইয়াছিলেন তাহা মনে পড়িল। তারপর কয় বৎসর যাবৎ আরাম ভবনে কিরূপ বন্দিনীর ন্যায় দিন কাটাইতেছেন তাহাও মনে পড়িল। অমলাবাইএর চক্ষু হইতে অবিরল ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ একাকিনী বসিয়া তিনি কাঁদিলেন! এরূপ তৃপ্তির সহিত কাঁদিবারও তাঁহার পূর্ব্বে অবকাশ হয় নাই।

কিছু সুস্থ হইয়া অমলাবাই চক্ষু মুছিলেন এবং আসন হইতে উঠিয়া উন্মুক্ত জানালার নিকটে আসিলেন। তখন সূর্য্য পশ্চিমদিকে হেলিয়া পড়িয়াছে। বাগানের সমুন্নত বৃক্ষরাজির মস্তকের উপর দিয়া ম্লান তপন রশ্মি অমলাবাইএর কক্ষে উকি মারিতেছে। অমলাবাইএর পাণ্ডু বদন মণ্ডল লোহিত-কিরণ-রাগে রঞ্জিত হইয়াছে। তাহাতে বিষাদ কালিমা আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। অমলাবাই যেন নির্নিমেষ নয়নে অস্তাচলগামী রবি-করোদ্ভাসিত-কানন-শোভা দেখিতে ছিলেন, অথবা তিনি কিছুই লক্ষ্য করিতে ছিলেন না কেবল শূন্য দৃষ্টিতে তাকাইয়া

ছিলেন মাত্র। তাঁহার হৃদয়ে যে প্রবল ঝটিকা বহিতেছিল তাঁহার মন সেই দিকে। তিনি প্রাণপণে ধীরভাবে চিত্ত সংযত করিতে প্রয়াস করিতে ছিলেন।

দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব বৃক্ষান্তরালে তিরোহিত হইলেন। তরুলতা সমাকীর্ণ কানন আচ্ছাদিত করিয়া সন্ধ্যার কালছায়া নামিতে লাগিল। পাখীগুলি দলে দলে আসিয়া বৃক্ষচূড়ে আশ্রয় লইল। সেই দৃশ্য অমলাবাইএর হৃদয়ের অবস্থারই যেন অভিব্যক্তি। অমলাবাই একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া জানালার নিকট হইতে কক্ষের ভিতরে আসিলেন। কিছুকাল দাঁড়াইয়া কি ভাবিলেন, তারপর একটী বাক্স খুলিয়া চিঠি লিখিবার উপকরণ বাহির করিলেন এবং প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া নিবিষ্ট মনে লিখিতে বসিলেন। চিঠি খানি সমাপ্ত করিতে তিনি বহুবার চক্ষু মুছিলেন। কাগজ ভিজিয়া গেল। চিঠি খানি তাঁহার প্রিয়সখী কাঞ্চনের নিকট লিখিতেছেন। নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

প্রিয়তমাসু,

প্রাণের বোন্ কাঞ্চন, আজ তিন মাস হইল তোমার হাসিমাখা মুখখানি দেখি না। তোমাকে দেখিবার জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল কিন্তু আর দেখা হইবে না বোন্! আমি জন্মের মত চলিলাম। এই কথা বলিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। কিন্তু কাঞ্চন আমাকে আর দেখিবে না। অতি শৈশবে আমার মা মারা যান, আমি তাহাকে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কাল রাত্রিতে মাকে দেখিয়াছি। তিনি আমার কক্ষে আসিয়া বিছানায় বসিলেন এবং আমার মুখে হাত বুলাইয়া বলিলেন—"অমল আমি তোর মা;" তার পর মুখ চুম্বন করিলেন আর কহিলেন—"তোকে আমি নিতে আসিয়াছি, তোর কষ্ট আর আমার সহ্য হয় না।" আমার কাণে যেন সেই কথাগুলি এখনও অমৃত ঢালিয়া দিতেছে। আমি তাহার স্পর্শ-অনুভব করিয়াছি! আমার কেন বিশ্বাস হইতেছে আমার এ দুঃখময় জীবন শেষ হইয়া আসিয়াছে। সংসারে আসিয়া এক দিনের জন্যও সুখী হই নাই, তবু কেন বাঁচিবার সাধ হয়? মনে আছে কাঞ্চন একদিন বলিয়াছিলে—আমার সন্তান হইলে তুমি তাহাকে লালন পালন করিবে। সেই সুখ-স্বপ্ন ভুলি নাই! কাঞ্চন তোমার ঋণ এক বিন্দুও শোধ করিতে পারিলাম না। জন্মান্তরে যেন আবার তোমাকে পাই। আমার একটী অনুরোধ আছে কাঞ্চন; সেইটী বলিবার জন্যই চিঠি লিখিতেছি। কোন কারণ বশতঃ যদি তোমার বিপদ ঘটে কি অবস্থার পরিবর্ত্তনে এখানে থাকিতে অসুবিধা হয় তাহা হইলে আমার এই পত্রখানি লইয়া আলোয়ারে যাইও। সেখানে আমার বাবা

তোমাকে কন্যার ন্যায় যত্ন ও স্নেহ করিবেন। তোমাকে পাইলে পিতা অমলার শোক কতক পরিমাণে ভুলিতে পারিবেন। এখন বিদায় হই। কাঞ্চন, বোন্ আমার এ চির বিদায়। কিন্তু মৃত্যুর পর আবার উভয়ে দেখা হইবে। শরীর ধ্বংশ হয়, আত্মা অমর।

তোমার স্নেহের

অমলাবাই।

পত্রখানি শেষ করিয়া অমলাবাই কতক পরিমাণে শান্তিলাভ করিলেন। তাঁহার হৃদয় স্থির হইল। মানুষ সকল আপদ বিপদের মধ্যেও স্থিরসংকল্পে উপস্থিত হইতে পারিলে প্রাণে কতকটা তৃপ্তি ও বলপ্রাপ্ত হয়। অমলা বাই স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার মনোমালিন্যের কারণ জানিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন; তাই তাঁহার মনে বল ও নূতন আশা প্রবুদ্ধ হইয়াছে। তিনি নিভৃত কক্ষে স্বামীর পদধ্বনি শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

ঝটিকা বহিল।

সন্ধ্যা গেল, রাত্রি আসিল। অমলাবাই কক্ষে বসিয়া কতক্ষণ কি চিন্তা করিলেন; তারপর আপন কক্ষের সমস্ত গুলি প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিলেন। তাঁহার বিশ্বাস হইল আলোক যতই উজ্জ্বল হইবে রাজা তাঁহার বদনমণ্ডলে প্রশান্ত গম্ভীর ভাব ও মনের পবিত্রতা ততই সুস্পষ্ট দেখিতে সমর্থ হইবেন এবং তিনিও হৃদয়ে অধিকতর বল প্রাপ্ত হইবেন। কক্ষ খুব আলোকিত হইল এবং বহুদিন পর উহার দ্বার উন্মুক্ত হইল। তখন অমলাবাই উদ্বিগ্ন চিত্তে স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

হঠাৎ দ্বারদেশে অমলাবাই সেই চির পরিচিত পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ হৃদয়ের সমগ্র বল সংগ্রহ করিয়া আসন হইতে উঠিলেন এবং ধীর পদক্ষেপে বারেন্দায় গিয়া দাঁড়াইলেন। কুমারসিংহ তখন তল সিঁড়ির সর্ব্বোপরি ধাপে উঠিয়াছেন। তিনি বহুদিন পর সহসা আলোলায়িত কুন্তলা, বিষাদ মলিনা অমলাবাইকে সম্মুখে দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার বিশ্বাস হইল অমলাবাই বুঝি তাঁহাকে দেখেন নাই। তিনি বারেন্দায় সজোরে পদ নিক্ষেপ করিলেন। অমলাবাই স্থির নির্নিমেষ লোচনে চকিতা হরিণীর ন্যায় রাজারপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং চিত্রার্পিতার ন্যায় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া

রহিলেন! একপদও নড়িলেন না। নির্ভীক কুমারসিংহ যদি নিবিড় অরণ্যে ভীষণ দংষ্ট্রা ব্যাঘ্রীর সম্মুখেও পড়িতেন তবু তিনি বিচলিত হইতেন না কিন্তু অমলাবাইকে সহসা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন! তিনি ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া অমলা বাইএর প্রতি একবার দৃষ্টি করিলেন, তারপর গম্ভীরভাবে ধীর পাদক্ষেপে তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া স্বীয় কক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন।

এমন সময় অমলাবাই আসিয়া তাঁহার হাত ধরিলেন! রাণীর সুকোমল চম্পক অঙ্গুলী স্পর্শে কুমারসিংহের লৌহ পেশীময় দৃঢ় শরীর কাঁপিয়া উঠিল। তিনি চমকিয়া কহিলেন——কি চাও?

অমলাবাই ধীর গম্ভীরভাবে কহিলেন—একটী কথা বলিবার অবসর চাই।

রাজা—কখন?

রাণী—এই মুহূর্ত্তে, যদি তোমার কোন আপত্তি না থাকে।

রাজা—এখন? এই রাত্রে?

অমলা—হাঁ, দোষ কি?

রাজা—মনে আছে আমি তোমাকে কিছুকাল অপেক্ষা করিতে বলিয়াছি। আমি এখনও কিছুই স্থির করি নাই। আমার ক্রোধ একটু শান্ত হউক; আমাকে আবার উত্তেজিত করিও না।

অমলা—আমি অনেক অপেক্ষা করিয়াছি; আর সহ্য হয় না।

রাজা—তোমাকে সাবধান করিতেছি, তুমি জান আমার রাগ হইলে আমি আত্মসম্বরণ করিতে পারি না; এখনও সময় আছে, বল! আর এক দিন তোমার কথা শুনিব।

অমলাবাই কাতর বচনে বিনীতভাবে বলিলেন—আমার আর একমুহূর্ত্ত বিলম্ব সয় না; আমার ভয় করিবার কিছু নাই। আজ আমার কথা শুনিতেই হইবে।

রাজা গম্ভীরভাবে বলিলেন—আচ্ছা, চল।

রাণীর দৃঢ়তা দেখিয়া রাজা বিস্মিত হইলেন। তিনি যন্ত্র-চালিত-পুতুলের ন্যায় রাণীর পশ্চাতে তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

বহুদিন পর রাজা এই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। বহুদিন পর স্বামী স্ত্রীর দেখা হইল! কিন্তু উভয়ের হৃদয়ে আজ ঝটিকা বহিতেছে।

অমলাবাই কহিলেন আজ তোমার নিকট একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে ডাকিয়াছি।

রাজা রুক্ষস্বরে কহিলেন—আমিও তোমার নিকট একটা কৈফিয়ৎ চাহিতে

সংকল্প করিয়াছি। তুমিই আগে বল। এই বলিয়া তিনি তাঁহার রোষ কষায়িত কটাক্ষ পত্নীর মুখের উপর স্থাপন করিলেন।

কিছুকালের জন্য সুবৃহৎ কক্ষ নীরব হইল। বাহিরে মর্‌মর্ শব্দে বৃক্ষলতা সমূহ আন্দোলিত করিয়া বায়ু বহিতে ছিল, দুই একটা নিশাচর পক্ষীর বিকট চীৎকারও শুনা যাইতেছিল। অমলাবাই অবিচলিত চিত্তে গম্ভীরভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন—

মহারাজ শৈশবে আমি মাতৃহারা হই। পিতা তখন নিজের সুখ শান্তি যশ ঐশ্বর্য্য সকল ভুলিয়া এই হতভাগিনীকে লালন পালন করিয়াছেন। আমার কষ্ট হইবে বলিয়া বাবা আবার বিবাহ করিলেন না। আমিই তাহার সংসারের একমাত্র বন্ধন ছিলাম। আমার মুখে হাসি দেখিলে তিনি সংসারের সকল কষ্ট ভুলিতেন। হায়! কত সুখে বাল্য জীবন কাটাইয়াছি। তখন সংসার স্বর্গের ন্যায় সুখময় বোধ হইত; প্রাণ খুলিয়া হাসিয়াছি, দৌড়িয়াছি, খেলাইয়াছি; তখন হৃদয় আহ্লাদে, উৎসাহ ও স্ফূর্ত্তিতে পূর্ণ ছিল। বড় হইয়া যখন রাজপুতনার প্রাচীন ইতিহাস সকল পাঠ করিতে লাগিলাম, তখন প্রাণে বড় সুখ পাইতাম। ক্রমে আমার হৃদয় বাস্তব জগৎ ছাড়িয়া গৌরবময় অতীত রাজ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। রাজপুতনার অমর বীর পুরুষেরা যেন আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিতে লাগিলেন। যখন আমি যৌবনের প্রারম্ভে স্বপ্নময় জগতে বেড়াইতে ছিলাম তখন শিকার উপলক্ষে তুমি আসিয়া একদিন পিতৃগৃহে উপস্থিত হইলে। তোমার মুখে তোমার জীবনের উচ্চ আদর্শের কথা, তোমার স্বদেশ-প্রেম ও দয়া দাক্ষিণ্যের কাহিনী শুনিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম। আমি ভাবিলাম তুমি দেবতা, তুমি আমার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা জানিতে পারিয়া অতীতের অন্ধকার রাজ্য হইতে উঠিয়া আসিয়াছ! আমি তোমাকে আমার জীবনের সঙ্গী করিতে ব্যাকুল হইলাম। বাবা আমার মনের ভাব বুঝিয়া তোমার হাতেই আমাকে সমর্পণ করিলেন। হায়! তখন জানিতাম না মানুষ মনে এক, মুখে অন্যরকম হইতে পারে। বিবাহের কিছুদিন পরই জানিয়াছি আমি ভুল করিয়াছি; তুমি ধন ও প্রতিপত্তি লাভের জন্য আমাকে বিবাহ করিয়াছ।

কুমারসিংহ অমলাবাইয়ের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া কঠোর স্বরে কহিলেন,—সাবধান! আমি অনেক সহ্য করিয়াছি :—

অমলাবাই একটুও ভীত হইলেন না, তিনি পূর্ব্বের ন্যায় অবিচলিত চিত্তে কহিতে লাগিলেন;—"যে দিন তোমার পত্নী হইয়া এই গৃহে আসিয়াছি সেই

দিন হইতে তুমি আমাকে প্রকাশ্যভাবে অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করিয়াছ। আমার আশালতা পায় দলিয়া ছিন্ন করিয়াছ। আমি নীরবে সব সহ্য করিয়া আসিতেছি। বাবা বোধ হয় পূর্ব্বেই সব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি আসিবার সময় চক্ষের জলে ভাসিয়া আমাকে একটী উপদেশ দিয়াছিলেন—"মা, যদি সুখ তোমার ভাগ্যে না ঘটে তবে কর্ত্তব্যকার্য্য করিয়া তৃপ্তি লাভ করিও।" বাবার অমূল্য উপদেশ আমি ভুলি নাই। যে দিন জানিলাম আমার অদৃষ্টে সুখ নাই সেই দিন হইতে রমণীর কর্ত্তব্য—পতি-সেবায় অধিকতর উৎসাহে মন দিলাম।

কুমারসিংহ বিদ্রুপের বিকট হাস্য করিয়া কহিলেন—হাঁ! তা ঠিক কথাই।

অমলাবাই কহিলেন আমি তোমাকে দোষ দেই না, দোষ আমার অদৃষ্টের। তিরস্কার করিবার জন্যও আমি তোমাকে ডাকি নাই। তোমাকে সর্ব্বদা বিমর্ষ দেখি, তুমি আমার উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছ বুঝিতে পারিয়াছি। তোমার পত্র পড়িয়া আমি অবাক্ হইয়াছি। আমার কোন অপরাধ হইয়া থাকিলে বল, সেই জন্য আমাকে যে শাস্তি ইচ্ছা দেও। সামান্য নারীর জন্য তুমি প্রাণে এত কষ্ট পাইতেছ কেন? এই কথা ভাবিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে আমি মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। যদি তোমার সন্তান আমি গর্ভে ধারণ না করিতাম তাহা হইলে বিষ খাইয়া কবে প্রাণত্যাগ করিতাম।

কুমারসিংহ রাণীর শেষ কথাটী শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। বসিয়াছিলেন উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি একবার বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে রাণীর মুখের দিকে তাকাইলেন। অমলাবাইএর চক্ষু হইতে অবিরল ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হই-তেছে! বদনে স্বর্গীয় জ্যোতি ফুটিয়াছে! প্রাণের পবিত্রতা যেন তাঁহার মুখে দেদীপ্যমান! রাজা সেই দৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন হৃদয়ে ভীষণ পাপ গোপন করিয়া কি কেহ এমন নির্ভীক চিত্তে কথা বলিতে পারে। স্বামীর সম্মুখে কি ব্যভিচারিণী পত্নী ঈদৃশ গর্ব্ব করিতে সাহস পায়! নিজের কলঙ্কের কথা বলিতে-তো রাণীর জিহ্বা কম্পিত হইল না! এত তেজ এত আত্মাভিমান কি পাপিনীর হৃদয়ে থাকিতে পারে? রাজা ভাবিয়া স্থির করিলেন—রমণী সব পারে! তাহার অসাধ্য কর্ম্ম নাই!! কুমারসিংহ নীরবে চিন্তামগ্ন হইলেন।

অমলাবাই বলিলেন—মহারাজ বল আমার কি অপরাধ হইয়াছে? আমি আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিতে পারি না।

রাজা—আমার ক্রোধ আর উত্তেজিত করিও না; আমার কিছুই অজানা নাই।

রাণী নির্দ্দোষ। তিনি মনে কোন পাপ জানেন না। সুতরাং স্বামীর কথায় তাঁহার ভীত হইবার কোন কারণই নাই। তিনি একটু দৃঢ়তার সহিত কহিলেন—বল, সতী রমণী কিছুতেই ভীত হয় না। জানিতে চাই তুমি কেন আমার উপর এরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছ।

কুমার সিংহের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল; তিনি ক্রোধে অধর দংশন করিয়া কহিলেন—আমার সম্মুখে আবার সতীত্বের গর্ব্ব! বল্ তবে হীরা সিংহ কে? তার সহিত তোর কি সম্বন্ধ?

মুহূর্ত্ত মধ্যে বিদ্যুৎআলোকে যেমন সমস্ত পৃথিবী আলোকিত হয় তেমনি এই একটী কথায় অমলাবাইএর নিকট সকল ঘটনা পরিষ্কার হইল; তিনি সব বুঝিতে পারিলেন। তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন—মহারাজ হীরাসিংহ একজন অসহায় আহত সৈনিক পুরুষ। তাহাকে আমি এই গৃহে আশ্রয় দিয়াছিলাম। এবং তিনিই আমার সম্মান রক্ষা করিয়াছেন তাহার উপকার কথনও আমি বিস্মৃত হইব না।

উপকার? না আমার কুলে কুলঙ্ক!

রাণী উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং গ্রীবাউন্নত করিয়া তীব্রস্বরে কহিলেন—মহারাজ সতীর নামে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করা মহাপাপ; তুমি স্বামী, নতুবা এরূপ নিন্দা কিছুতেই সহ্য করিতাম না।

রাণীর মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। তিনি নিশ্চল-নিষ্কম্প-দীপশিখার ন্যায় রাজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার বদন মণ্ডল আরক্তিম, নয়ন পলকবিহীন, কিন্তু নয়নে জল নাই, চক্ষু শুষ্ক।

রাজা—আর অকারণ ক্রোধের ভাণ করিতে হইবে না। বল্ দেখি তুই আমার শয়ন ঘরে অপরিচিত যুবক হীরাসিংহের সহিত সর্ব্বদা কাটাইয়াছিস্ কি না?

পদদলিতা ভুজঙ্গিনীর ন্যায় ক্রুদ্ধ অমলাবাই মস্তক উন্নত করিয়া কহিলেন—তুমি আপনার ন্যায় সকলকেই মনে কর।

রাণীর কথায় কুমারসিংহ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। নরাধম পত্নীর বক্ষে সজোরে পদাঘাত করিয়া দ্রুতবেগে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

রাণী—নির্ম্মম আঘাতে চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিতা হইলেন।

একোনশ পরিচ্ছেদ।

শেষ আকাঙ্ক্ষা।

অমলাবাই তাঁহার শয়ন গৃহের পর্য্যঙ্কে শায়িতা। বিশাল কক্ষ, মধ্যস্থানে ঝাড়ের চারটী আলো জ্বলিতেছে কিন্তু কক্ষ যেন উজ্জ্বল হইতেছে না। বৈদ্য মলিন মুখে রাণীর বদনউপরে স্থিরদৃষ্টি স্থাপন করিয়া বসিয়া আছেন। পরিচারিকারা শুশ্রূষায় নিযুক্তা; কাহার মুখে কথাটী নাই। গৃহ নীরব, নিস্তব্ধ। সকলের মনের বিষাদ যেন জীবন্ত মূর্ত্তি ধরিয়া তথায় বিরাজ করিতেছে।

অমলাবাই গুরুতর আঘাত পাইয়াছিলেন। শরীরের আঘাত অপেক্ষা তাঁহার হৃদয়ের আঘাত অধিকতর সাংঘাতিক। তাঁহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল না। ঠাণ্ডা জল, ঔষধ, প্রক্রিয়া কিছুতেই কোন ফল হইল না। সকলেই নিরাশ হইলেন।

রাত্রি দুই প্রহরের সময় অমলাবাই একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। নীরবে শয্যা পার্শ্বে উপবিষ্টা শুশ্রূষাকারিণীদিগের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; তারপর আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পর তাঁহার কথা বলিবার শক্তি আসিল। তিনি আবার নয়ন উন্মীলিত করিয়া জল চাহিলেন। তৎক্ষণাৎ জল প্রদত্ত হইল রাণী জলপান করিয়া কতকটা সুস্থ বোধ করিলেন। শায়িতাবস্থায় কক্ষের এদিক ওদিক তাকাইয়া দেখিতে লাগিলেন, যেন কাহাকে খুঁজিতেছেন। যখন বাঞ্ছিত জনকে পাইলেন না তখন আবার চোখ বুজিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই তাঁহার প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইল। অমলাবাই যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে করিতে আবার মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। এই অবস্থায় তাঁহার একটী পুত্র সন্তান জন্মিল। প্রকৃতির কি নিগূঢ় রহস্য! নবজাত শিশু ভূমিষ্ট হইবা মাত্র জননীর মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া গেল। রাণী সন্তানের ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া স্বীয় দুর্ব্বল দুই হস্তে অবশ দেহভার স্থাপন করিয়া উঠিতে প্রয়াস করিলেন। বোধ হয় সন্তানের মুখ-কমল দেখিবার জন্য তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছিল। আহা! মাতৃ-স্নেহের কি অপার মহিমা!

সেই রাত্রিতে সন্তান ভূমিষ্ট হইবার পর রাণীর খুব প্রবল জ্বর হইল। সঙ্গে সঙ্গে প্রলাপও আরম্ভ হইল। পরদিন প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এক ভাবেই কাটিল। কিন্তু সন্ধ্যার পর তাঁহার অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে চলিল। ঘন ঘন মূর্চ্ছা হইতে লাগিল। দুর্ব্বল দেহ ক্রমে অধিকতর দুর্ব্বল হইল। অমলাবাই তাঁহার নিজের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। বুঝিলেন জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইবার আর বড় বাকী নাই। তিনি একজন পরিচারিকাকে কাছে ডাকিয়া

বলিলেন—ময়না, আমার একটা কাজ কর্ত্তে হবে। ময়না—কি কাজ রাণী মা?

অন্যে শুনিতে না পারে এরূপ মৃদুস্বরে রাণী কহিলেন—তুই একবার দেখে আয়-ত মহারাজ কোথায়। ময়না—এইমাত্র তিনি তাঁহার শুইবার ঘরে গিয়াছেন।

রাণী কাতর বচনে কহিলেন—ময়না তুই যা তাঁকে গিয়া বল্, আমি জন্মেরমত তাঁকে একবার দেখ্‌তে চাই। এই আমার শেষ আকাঙ্ক্ষা; স্বামীর পদধূলি লইয়া মরিব; বলিস্ আমার আর বিলম্ব নাই।

ময়না কুমারসিংহকে রাণীর শেষ অনুরোধ জানাইতে গমন করিল।

পূর্ব্বের রাত্রির ঘটনায় কুমারসিংহের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়াছিল রাণীর কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তিনি উন্মাদের ন্যায় ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছিলেন। একজন দাসী আসিয়া যখন তাঁহাকে জানাইল, রাণীর অবস্থা অতিশয় সঙ্কটাপন্ন, তিনি তৎক্ষণাৎ ভাল বৈদ্য আনিতে লোক প্রেরণ করিলেন এবং তাহার চিকিৎসার জন্য বিশেষ যত্ন লইতে কর্ম্মচারিদিগকে আদেশ করিলেন। কিন্তু রাজা নিজে আর রাণীকে দেখিতে গেলেন না। অমলাবাইএর সম্মুখে যাইতে তাঁহার সাহস হইল না। তাঁহার মনে প্রতিমুহূর্ত্তে এই প্রশ্ন হইতে লাগিল—রাণী কি নির্দ্দোষ? আমি কি তাঁহাকে মিথ্যা সন্দেহ করিয়াছি! কুমারসিংহের হৃদয়ে ভীষণ ঝটিকা বহিতেছিল। তিনি প্রবল চিন্তা স্রোতে তৃণের ন্যায় ভাসিতে লাগিলেন। সমস্ত রাত্রি তাঁহার নিদ্রা হইল না।

রজনী প্রভাত হইলে একজন পরিচারিকা আসিয়া কুমারসিংহকে সংবাদ দিল মঙ্গলমত একটী রাজ-কুমার ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। এই সংবাদ শুনিবামাত্র কুমারসিংহ উন্মত্তের ন্যায় লাফাইয়া উঠিলেন। কতক্ষণ নীরবে কক্ষের ভিতর পাদচারণ করিলেন, তারপর উন্মনস্ক ভাবে গৃহ কোণে স্থাপিত বন্দুকটী হাতে তুলিয়া লইলেন এবং যন্ত্র চালিত পুতুলের ন্যায় হৃদয়ের প্রবল আবেগ স্রোতে তাড়িত হইয়া কক্ষ হইতে বাহির হইলেন। পরিচারিকা বোধ হয় পুরস্কারের প্রত্যাশায় তথায় অপেক্ষা করিয়াছিল, মহারাজের ভাবান্তর দেখিয়া সে অতিশয় ভীত হইল। কিন্তু তাঁহার এরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তনের কোন কারণ নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া চিত্রার্পিতার ন্যায় নিশ্চল ভাবে তথায় দাঁড়াইয়া রহিল। কুমারসিংহ ধীর পদবিক্ষেপে রাণীর কক্ষ অতিক্রম করিয়া সিঁড়িতে নামিলেন। তখন পরিচারিকা নির্ভয়ে নিশ্বাস ফেলিল। কুমারসিংহ কাহাকেও ডাকিলেন না; একাকী বন্দুক স্কন্ধে করিয়া বাহির হইলেন। সে দিন তাহার মুখের দিকে যে দৃষ্টিপাত করিয়াছে

সেই ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়াছে। তিনি সমস্ত দিন অরণ্যে অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যার পর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তখনও তাঁহার কিছুই আহার হয় নাই, অথচ তাঁহার ক্ষুধা বা তৃষ্ণা বোধ হয় নাই।

কুমারসিংহ যখন গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন তখন তাঁহাকে রাণীর অনুরোধ জানাইবার জন্য ময়না তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিল। কুমার-সিংহ নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া আপন মনে কি ভাবিতেছিলেন। পরিচারিকার আগমনে তাঁহার চিন্তাস্রোত বাধাপ্রাপ্ত হইল। তিনি মস্তক উন্নত করিয়া চাহিলেন। ময়না কহিল—"রাণী মার অবস্থা এখন অত্যন্ত খারাপ হইয়াছে, তিনি আপনাকে একবার দেখিতে চাহিয়াছেন।"

কুমারসিংহ বজ্রগম্ভীরস্বরে কহিলেন—মৃত্যুর পর দেখিব! এখন নয়!

ময়না সেই নিদারুণ বাণী শুনিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

দীপ-নির্ব্বাণ।

অমলাবাইএর অন্তিমকাল উপস্থিত। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছে। হাত পা শীতল হইয়া গিয়াছে। দেহ একেবারে শিথিল হইয়াছে। কোন্ সময় প্রাণ-পাখী উড়িয়া যায় তাহার ঠিক নাই। কিন্তু কেবল ঐ এক আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য প্রাণবায়ু বাহির হইতেছিল না। প্রতি মুহূর্ত্ত তাহার নিকট বৎসরের ন্যায় সুদীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল। ময়না ফিরিয়া আসিল, কুমারসিংহ আসিলেন না। রাণী ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ময়না, মহারাজের দেখা পাইলে; তিনি কি বলিলেন?

মহারাজ যাহা বলিয়াছেন ময়নার তা বলিতে আর সাহস হইল না। ময়না ভাবিল প্রকৃত কথা বলিলে রাণীর মনে নিদারুণ আঘাত লাগিবে। শেষ মুহূর্ত্তে এরূপ নিষ্ঠুর কথা বলা ভাল হইবে না। তাই সে প্রকৃত কথা গোপন করিয়া কহিল—তিনি একটু পরে আসিবেন বলিয়াছেন।

রাণী কহিলেন—ময়না, আমার যে আর বিলম্ব নাই। তুই কি তা বলেছিস্?

ময়না আর চক্ষের জল রাখিতে পারিল না; সে আঁচলে চক্ষু ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

রাণী ময়নাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন—ময়না কাঁদিস্ না। কিসের দুঃখ, আমি রাজকুমারকে তোদের হাতে দিয়া যাইতেছি, বাছা আমার বেঁচে থাক্।

আমার কত সুখের মরণ ! গৃহ নীরব, নিস্তব্ধ ! কাহারও মুখে কথা নাই। রাণী কিছুক্ষণ পর আত্মসম্বরণ করিয়া কহিলেন—ময়না, আবার তোকে বিরক্ত করবো, যা, তুই গিয়া তাঁকে বল, আমার আর বিলম্ব নাই। ময়না রাণীর কাতর অনুরোধে উঠিল এবং সেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া পাশের ঘরের মেঝে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

রাণী প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন আর ব্যাকুল নয়নে বারংবার দরজার দিকে চাহিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ গেল, কুমারসিংহ আসিলেন না। ময়নাও ফিরিল না।

রাণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—হায় ! তাঁহার দয়া হইল না। তিনি শেষ দেখা দিতেও আসিলেন না। আমি হতভাগিনী মৃত্যুকালে স্বামীর চরণধুলি পাইলাম না। আচ্ছা না আসুন, ভগবান তাঁহার মঙ্গল করুন।

অমলাবাইএর চক্ষু হইতে অবিরল ধারায় অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। সকলেই নীরবে চক্ষের জল ফেলিতেছেন, সকলেই একদৃষ্টে রাণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। কক্ষে ভীষণ নীরবতা বিরাজ করিতেছে বাহিরে শীতল বাতাস সোঁ সোঁ শব্দে বৃক্ষলতার ভিতর দিয়া যেন কি এক নৈরাশ্যের গীত গাহিয়া বহিয়া যাইতেছে।

সহসা রাণী ডাকিলেন "ময়না।"

ময়না সেখানে ছিল না। অপর একজন পরিচারিকা বলিল—রাণী মা কি জন্য ডাক্‌ছেন ?

"আমার খোকা তো ভাল আছে ? একবার তাকে আমি দেখ্‌বো ।"

পরিচারিকা নবজাত শিশুকে বস্ত্র দ্বারা আকণ্ঠ আবৃত করিয়া রাণীকে দেখাইল।

রাণী পলক বিহীন দৃষ্টিতে আপনার প্রাণের পুতুলটীর দিকে চাহিয়া রহিলেন ; আর অবিরল ধারায় চক্ষের জল ফেলিতে লাগিলেন। রাণী কম্পিত হস্তে নবজাত শিশুর চিবুকখানি ধরিয়া আপন শুষ্ক অধরে স্পর্শ করিলেন এবং অস্পষ্টস্বরে কহিলেন,—বাছা আমার, জন্মিয়াই মাতৃহারা হলি ! কত আশা ক'রে ছিলাম ; সব ফুরাইল ! তোকে অকুলে ভাসায়ে আজ আমি পাষাণী চলিলাম। দুঃখিনীর ধন তুই, ঈশ্বর তোকে রক্ষা করিবেন। তুই জননীর মুখ উজ্জ্বল করিস্। রাণী আর কিছু বলিতে পারিলেন না। সহসা তাঁহার সম্পূর্ণ ভাবান্তর হইল। তিনি ঊর্দ্ধপানে দৃষ্টিপাত করিলেন। নয়নতারা স্থির, চক্ষে

পলক নাই। সহসা উন্মত্তের ন্যায় লাফাইয়া উঠিতে চাহিলেন। দুইজনে তাঁহাকে বিছানায় ধরিয়া রাখিল। রাণী প্রাণপণে চীৎকার করিয়া কহিলেন— তোমরা ছাড়, আমাকে ছেড়ে দাও। ঐ আমার মা! মা আমাকে ডাকৃছেন, "অমলা চলে আয় আর তোর দুঃখ আমি দেখ্‌তে পারি না। চলে আয়!" মহারাজ আমি চল্লেম; একদিন আমার জন্য কাঁদিবে, একদিন জানিবে আমি সতী। হায়! তার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম তাই তোমার সন্দেহ দূর করিতে পারিলাম না। একদিন সব জান্‌বে।" রাণী কতক্ষণের জন্য নীরব হইলেন। ইহার কিছুকাল পরে অমলাবাই আবার সহসা "আসি মা আসি" বলিয়া চীৎকার করিয়া শয্যার একধারে উঠিয়া বসিলেন; কিন্তু ক্ষণকালের মধ্যে অবশ হইয়া তিনি পুনরায় বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। সেই সময়েই অমলাবাই-এর জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণ হইল। প্রাণপাখী দেহ পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া শান্তির আশায় অনন্তধামের দিকে ছুটিয়া পলায়ন করিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ছায়াময়ী।

পরদিন প্রাতঃকালে রাণীর বিছানার নীচে একখানি চিঠি পাওয়াগেল। চিঠি কুমারসিংহের হস্তে প্রদত্ত হইলে তিনি তাহা খুলিয়া পাঠ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ কাঞ্চনের নিকট উহা পাঠাইয়া দিলেন। রাণীর ইচ্ছানুসারে নবজাত কুমারের প্রতিপালন ভার কাঞ্চনের উপর প্রদত্ত হইল। কাঞ্চন আরাম ভবনে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। সেই দিনই কুমারসিংহ আরামভবন পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। কোথায় গেলেন কেহ তাহা জানিল না।

দুই মাস পর একদিন সন্ধ্যার সময় কুমারসিংহ আবার প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তখন শিশুকুমার ভিন্ন অমলাবাইএর আর কোন চিহ্ন আরামভবনে বিদ্যমান ছিল না, কিন্তু রাত্রিতে যখন কুমারসিংহ রাণীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন তখন শত শত বিগত ঘটনার স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইয়া তীব্র বিষাক্ত কণ্টকের মত বিদ্ধ হইতে লাগিল। যে শয্যায় রাণী শয়ন করিতেন সেই শয্যা তেমনি আছে। যে আসনে রাণী বসিতেন তাহাও কক্ষে রহিয়াছে। কুমারসিংহ নির্জ্জন কক্ষে পদচারণ করিতে লাগিলেন। ঝাড়ের মধ্যে চারটা আলোক জ্বলিতেছিল কিন্তু কক্ষ তেমন উজ্জ্বল হয় নাই। আলোকরশ্মি যেন ক্রমেই ম্লান হইয়া পড়িতেছে। বাহিরে প্রবলবেগে বাতাস বহিতেছে। সাসি কবাটে আঘাত লাগিয়া ঝন্ ঝন্ শব্দ হইতেছে। যে রাত্রিতে রাণীর কক্ষে কুমারসিংহ শেষ

দেখা করিতে আসিয়া ছিলেন সে রাত্রিও ঠিক এইরূপ ছিল। কক্ষের সবই পূর্ব্বের ন্যায় রহিয়াছে কেবল অমলাবাইএর আসন শূন্য! কুমারসিংহ সেই আসনের দিকে একবার চাহিলেন তাহার শরীর কণ্টকিত হইল! কুমারসিংহ সাহসী পুরুষ তাঁহার মানসিক অবস্থার কথা ভাবিয়া তিনি একটু লজ্জিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার নিকট কক্ষ বড়ই অন্ধকারাচ্ছন্ন বোধ হইতে লাগিল। তাড়াতাড়ি তিনি আরও দুইটা প্রদীপ জ্বলাইলেন কিন্তু কক্ষ তেমনি আঁধার রহিল। কুমারসিংহ বিস্মিত হইলেন; তিনি বুঝিলেন না অন্ধকার বাহিরে নয়; অন্ধকার তাঁহার হৃদয়ে। কুমারসিংহ অন্যবিষয়ে মননিবিষ্ট করিবার জন্য দোয়াত, কলম ও কাগজ বাহির করিয়া একজন বন্ধুর নিকট চিঠি লিখিতে বসিলেন। এক ছত্র লিখিলেন—"সুহৃদ্বর, গত ২৬শে আশ্বিন অমলাবাইএর মৃত্যু হইয়াছে।" অমনি কে যেন বলিয়া উঠিল "নিরপরাধিনী অমলাবাইকে তুমি হত্যা করিয়াছ।" সেই কথাগুলি যেন ঠিক রাণীর কণ্ঠ নিঃসৃত। "তুমি হত্যা করিয়াছ" এই কথাগুলি বাতাসের সহিত ভাসিয়া ভাসিয়া কক্ষের প্রতিকোণে মুখরিত হইতে লাগিল। কুমারসিংহের অন্তর হইতেও সেই কথার প্রতিধ্বনি হইল। তিনি স্তম্ভিত হইয়া লেখনী রাখিয়া দিলেন। আবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন অন্যমনস্কভাবে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। সহসা অপর কক্ষ হইতে, শিশুর ক্রন্দনধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। অমলাবাইএর শিশুপুত্রও যেন তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়াছে। শিশুর ক্ষীণ চীৎকারে যেন সমগ্র আরাম ভবন কাঁপিয়া উঠিল। ক্রন্দনের বিরাম নাই। কুমারসিংহ মনে করিলেন কাঞ্চন নিদ্রিতা, অথবা বাড়ী গিয়াছে. এখনও ফিরিয়া আসে নাই। তিনি কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাচীর সংলগ্ন গুপ্তদ্বার কৌশলে উদ্‌ঘাটন করিয়া সেই কক্ষে উঁকি দিলেন। তখন শিশু শান্ত হইয়াছে। রাজা দেখিলেন কক্ষ উজ্জ্বল আলোকে প্রদীপ্ত; কাঞ্চন কক্ষে নাই; স্বয়ং অমলাবাই তাঁহার শিশু সন্তানকে কোলে লইয়া বসিয়া আছেন! সেই দীর্ঘ কেশ, উজ্জ্বল চক্ষু, প্রশস্ত ললাট, গম্ভীর মুখমণ্ডল। কণ্ঠে মুক্তার হার! তাঁহার বিবাহের রাত্রির বেশ! কুমারসিংহ সেই মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অমলাবাই রাজাকে নিকটে যাইতে হাতে সঙ্কেত করিলেন। কুমারসিংহের একপদ অগ্রসর হইতে সাহস হইল না। তিনি সেইস্থানে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিলেন।

অমলাবাই শিশুপুত্রকে কোল হইতে সন্তর্পণে শয্যায় স্থাপন করিয়া কুমারসিংহের নিকটে আসিলেন; কুমারসিংহ ছুটিয়া পলাইতে চাহিলেন কিন্তু

নড়িবার শক্তি নাই। রাণী কহিলেন—মহারাজ তুমি কি ভ্রান্ত! একদিন জানিবে অমলাবাই সতী; এই শিশু তোমারই পুত্র। সেই দিন আমার জন্য কাঁদিবে।

এমন সময় কাঞ্চনের পদধ্বনি শুনা গেল 'ছায়াময়ী' মুক্ত বাতায়ন পথে তিরোহিত হইলেন! কক্ষ অন্ধকার হইল! কুমারসিংহ চৈতন্য লুপ্ত প্রায়। তিনি তাড়িত চালিত পুতুলের ন্যায় কম্পিত হস্তে গুপ্তদ্বার বন্ধ করিলেন এবং স্বীয় কক্ষে আসিয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন

পরদিবস প্রত্যুষে কুমারসিংহ আরামভবন পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত কেহ তাহার সংবাদ পাইল না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সন্দেহ দূর হইল।

একদা নিদাঘ অপরাহ্নে একজন পথক্লান্ত পথিক আরামভবনের সম্মুখস্থ বাগানে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। তখনও সূর্য্য অস্তাচলে গমন করে নাই। সেই সময়ে সুন্দর দুইটী বালক-বালিকা ফুল কুড়াইতে বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সুকুমার দেব শিশু দুইটীকে দেখিয়া পরিশ্রান্ত পথিক চমকিত হইল। বালকেরাও পথিককে দেখিয়া বিস্মিত হইল। কৌতূহল পরবশ হইয়া তাহারা পথিকের নিকট গেল পথিক ভাল করিয়া একবার বালক বালিকার মুখ দুইখানি দেখিল। দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল তোমাদের এই বাড়ী? বালক বলিল—হাঁ।

পথিক—তোমার নাম? বালক—কিরণসিংহ।

পথিক—তোমার বাবার নাম? বালক—মহারাজ কুমারসিংহ।

পথিক ভাল করিয়া বালকের মুখখানি আবার দেখিলেন, একখানি সুন্দর বদনমণ্ডল তাহার স্মৃতিপটে পরিস্ফুট হইল উহা অমলাবাইএর!

পথিক বলিল—তুমি অমলাবাইএর পুত্র!

বালক চমকিত হইল,—কিরূপে পথিক তাহার মার নাম জানিতে পারিল! সে পার্শ্বস্থিত বালিকার দিকে বিস্ময়ে চাহিল।

পথিক বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিল—মা, তোমার নাম?

বালিকা—কমলা।

তুমি কার মেয়ে? বালক উত্তর করিল ওর বাবার নাম জীবনসিংহ। পথিক বলিল—তুমি কাঞ্চনের মেয়ে! বালক বালিকার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। তাহারা অবাক হইয়া পথিকের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। এই পথিক যে সকলকেই চিনে!

পথিক বালককে জিজ্ঞাসা করিল—মহারাজ কুমারসিংহ কি গৃহে আছেন; বালকের উজ্জ্বল বড় বড় চোক জলে পূর্ণ হইয়া গেল! সে কম্পিত কণ্ঠে বলিল—বাবাকে এ জীবনে কখনও দেখি নাই; তিনি নিরুদ্দিষ্ট।

পথিক—কি জন্য বলিতে পার?

বালক—কেহ বলিতে পারে না। পথিক নীরবে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে পথিক চিরপরিচিতের ন্যায় বালক বালিকার

দুইখানি হাত ধরিয়া কহিল—চল, আজ আমি তোমাদের অতিথি।

পথিক আরাম ভবনে প্রবেশ করিলে কর্ম্মচারীরা তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিল, পথিক বলিল—"হীরাসিংহ।" ইতঃপূর্ব্বে হীরাসিংহ আরাম ভবনে আসিয়াছিলেন তখন যে সকল কর্ম্মচারী ছিল তাহারা সকলেই কর্ম্মত্যাগ করিয়া গিয়াছে। সুতরাং কেহ তাঁহাকে চিনিল না। হীরাসিংহ কর্ম্মচারী দিগের নিকট হইতে রাজ পরিবারের শোকপূর্ণ ইতিহাস শুনিলেন। তাহার চক্ষু হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল। কেহ তাহার কারণ বুঝিল না।

সন্তপ্ত হীরাসিংহ অতি কষ্টে সে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। পর দিবস প্রভাতে নিরুদ্দিষ্ট মহারাজ কুমারসিংহও দীর্ঘকাল পর আরামভবনে আসিয়া উপনীত হইলেন। তিনি আসিয়া শুনিলেন 'হীরাসিংহ' নামক একব্যক্তি তাঁহার গৃহে অথিতি হইয়াছেন। 'হীরাসিংহের' নাম শুনিয়াই তিনি লাফাইয়া উঠিলেন 'হীরাসিংহ!' যাহাকে আমি বার বৎসর যাবৎ খুঁজিয়া বেড়াইতেছি সেই শত্রু আমার গৃহে! কোথায় সেই পাপিষ্ঠ! একজন কর্ম্মচারী বলিল তিনি উপরের ঘরে আছেন। কুমারসিংহ উন্মুক্ত তরবারী হস্তে ক্ষিপ্তের ন্যায় দ্বিতলে গমন করিলেন। হীরাসিংহ নির্জ্জন কক্ষে উন্মুক্ত বাতায়নপথে বাগানের দিকে চাহিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে কি ভাবিতে ছিলেন, এমন সময়ে তীক্ষ্ণ তরবারী হস্তে কুমারসিংহ তথায় উপস্থিত হইয়া ডাকিলেন "হীরাসিংহ!" হীরাসিংহ চমকিত হইয়া উঠিলেন; সম্মুখে ক্রুদ্ধ অবতার কুমারসিংহ। হীরাসিংহ তাহাকে দেখিয়া চিনিলেন এবং 'দাদা' 'দাদা' বলিয়া বিদ্যুৎ বেগে ছুটিয়া তাহার চরণতলে পতিত হইলেন। কুমারসিংহ চাহিয়া দেখিলেন তাঁহার প্রিয় সহোদর নির্ব্বাসিত অমরসিংহ! তিনি তাহাকে টানিয়া বুকে লইলেন ক্ষণকাল পর শান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন অমর, হীরাসিংহ কোথায়? অমরসিংহ কহিলেন আমিই সেই আহত সৈনিক হীরাসিংহ। তারপর তিনি সকল কথা প্রকাশ করিয়া কহিলেন রাণী কমলাবাইএর নিকট কৃতজ্ঞ অমরসিংহ আত্ম প্রকাশ করিলে তিনি তাঁহাকে কিরূপ যত্ন ও স্নেহ করিয়া ছিলেন তাহাও বলিলেন। কুমারসিংহ অটল প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় নীরবে সব কথা শুনিলেন। তাঁহার ভ্রম দূর হইল। সেই রাত্রেই তিনি আরামভবন হইতে প্রস্থান করিলেন। আর কেহ তাহার সন্ধান পাইল না। নির্ব্বাসিত অমরসিংহ সজল নয়নে বেওয়ার রাজ্য পরিত্যাগ করিলেন। কিছুদিন পর কমলাবাইএর পুত্র কিরণসিংহ কাঞ্চনের মেয়ে কমলাকে বিবাহ করিলেন। স্থানান্তরে তাহাদের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইল। অভিসপ্ত আরামভবন বিজন অরণ্যে অতীতের দুঃখময়ী স্মৃতি বহন করিতে লাগিল।

সমাপ্ত।